স্বাস্থ্য-সমাচার

সচিত্র মাসিক পত্র।

সম্পাদক

ডাক্তার শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু, এম, বি,

প্রথম বর্ষ

১৩১৯

কার্য্যালয়

৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বার্ষিক মূল্য এক টাকা

স্বাস্থ্য-সমাচার।

প্রথম বর্ষের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

বিষয়।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্"।

প্রথম বর্ষ। } বৈশাখ ১৩১৯ সাল { প্রথম সং

সূচনা।

ইহ জগতে মনুষ্যের যত প্রকার কর্ত্তব্য আছে, তন্মধ্যে নিজ শরীর পালন

আমাদের কর্ত্তব্য।

রক্ষা এবং তাহার উন্নতিসাধন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধা সম্যক্‌রূপে এই শরীর রক্ষা করিতে হইলে (অর্থ সুস্থ, সবল ও কর্ম্মক্ষম দেহে দীর্ঘায়ু লাভ করি হইলে) প্রত্যেকের শরীরপালন ও শরীররক্ষা সম্বন্ধীয় স্বাভাবিক নিয়ম সক সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়া ও প্রতিপালন করা আবশ্যক।

শরীর অসুস্থ হইলে তাহা আরোগ্য করিবার জন্য সকলেই সাধ্যমত যত্ন

সাধারণ চেষ্টা।

করিয়া থাকেন। কেহ ডাক্তার, কেহ কবিরাজ, কেহ বা হাকিম ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন, চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু রোগের আক্রমণ হইতে শরীরকে রক্ষা করিতে প্রায় অনেকেই কোনরূপ চেষ্টা বা যত্ন করেন না।

সাধারণের ধারণা,—অসুখ হইলে চিকিৎসা করাইতে হয়, "সুস্থ শরীরকে কদাচ ব্যস্ত করিতে নাই"। সুস্থ শরীরে যথেচ্ছা পান ভোজন করাই বিধি।

স্বাস্থ্যতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা।

শরীরপালন সম্বন্ধীয় তথ্যসকল অবগত না থাকাই উক্তরূপ ধারণার একমাত্র কারণ। অনেকেই জানেন না যে, রোগ কি প্রকারে শরীরে উৎপন্ন হয়, কি প্রকারে সংক্রামক ব্যাধিসমূহ বিস্তৃত হয়, কি প্রকারে জল বায়ু দূষিত হইয়া রোগ উৎপাদন করে। এই সকল বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত না হওয়ায়, সংক্রামক ব্যাধিসমূহ বিস্তৃত লাভ করে এবং আমরা নিজকৃত অনিয়ম বা অন্যায় কার্য্যের জন্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অনেকেই অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকি।

শিক্ষিতগণেরও এ সকল বিষয়ের অভিজ্ঞতা অতি অল্প, এমন কি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী চিকিৎসকেরাও, নিজের, অপরের বা দেশের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ অবগত নহেন।

আমাদের দেশের অধিকাংশ চিকিৎসক, স্বাস্থ্যরক্ষার তথ্যসকল, যাহা আধুনিক ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশে নিত্য নূতন কলেবরে সহজসাধ্য ও সরলীকৃতভাবে সাধারণের হিতসাধন করিতেছে, তাহা সময়াভাব বা অন্যান্য কারণ বশতঃ সম্যক্‌রূপ অবগত নহেন। সেই জন্য জনসাধারণকে উপদেশ দিতে অপারগ। সৌভাগের বিষয় এই যে, আজকাল সংবাদপত্রাদিতে মধ্যে মধ্যে দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় অনেকের স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা আগ্রহ জন্মিতেছে। আমাদের সহৃদয় গভর্ণমেণ্টও বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া অশেষ উপকার সাধন করিতেছেন।

চিকিৎসকের দায়িত্ব।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব সকল প্রচারের জন্য চিকিৎসকগণের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ধর্ম্মোপদেষ্টারা মানবের আত্মিক ও মানসিক উন্নতির জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করেন। তাঁহারা কেবল পাপী বা দুরাত্মাদিগকে পাপ বা দুষ্কর্ম্ম হইতে রক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত হন না। যাহাতে মানবেরা পাপ বা দুষ্কর্ম্মের আক্রমণ হইতে রক্ষা

পাইতে পারে তাহারও চেষ্টা করেন। সেইরূপ চিকিৎসকেরা কেবল রোগের চিকিৎসা করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যের সমাধা যেন না করেন। প্রত্যেক রোগীকে রোগমুক্ত হওয়ার পর যাহাতে পুনরায় তাহার রোগাক্রমণ না হয় তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দেওয়া এবং যাহাতে সুস্থ ও সবল ব্যক্তি রোগের দ্বারা আক্রান্ত না হন তাহারও ব্যবস্থা করা উচিত।

“Prevention is Better than Cure”

আরোগ্য করা অপেক্ষা রোগ আক্রমণ বন্ধ করাই চিকিৎসকের প্রথম কর্ত্তব্য। আজকাল আমেরিকা দেশে অনেকে রোগ আক্রমণ রোধ করিবার জন্য চিকিৎসকদিগকে নিযুক্ত করেন। চিকিৎসকেরা গৃহস্থের আহার, বিহার ও অন্যান্য নিত্য কার্য্যসকল পর্য্যাবেক্ষণ করেন, এবং যাহাতে রোগ না হয় তাহার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। যদি রোগ না হয়, তাহা হইলে তাহারা পূর্ণমাত্রায় পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন।

উন্নতি ও পরিবর্ত্তন।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব অতি বিশাল, এবং বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত ইহা দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকায় “Preventive medicine” “রোগ প্রতিষেধ” চিকিৎসা-শাস্ত্রের অত্যাবশ্যকীয় বিভাগরূপে আলোচিত হইতেছে, এবং নানাপ্রকার সহজ বোধ্য পুস্তক, সাময়িক পত্র ও বক্তৃতাদি সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষিত করিতেছে। আমাদের দেশে চরক সুশ্রুতাদি চিকিৎসাবিদ্‌ মহর্ষিগণের গ্রন্থে দিনচর্য্যা, রাত্রিচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যা ইত্যাদি নানাপ্রকার নিয়ম রহিয়াছে। কিন্তু সে সকলের কোন প্রচলন দৃষ্ট হয় না। সে সকল কেবলমাত্র পুঁথিতে আবদ্ধ রহিয়াছে। অপর দিকে সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত আমাদের দেশ, কাল ও অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিমাচলবাসী আর্য্যঋষিরা যাহা ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিংশশতাব্দীর সভ্যতাযুক্ত ও অভাবক্লিষ্ট মানবের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে।

পত্রিকার উদ্দেশ্য।

সকলে যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ প্রতিষেধ সম্বন্ধীয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিধানগুলি অবগত হইয়া নিজের এবং সাধারণের হিত সাধনে সমর্থ হন, সেই উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। ইহাতে পৃথিবীর নানাস্থানে স্বাস্থ্য বিষয়ক নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার সম্বন্ধীয় আলোচনা বিবৃত হইবে। আবশ্যক মত শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়ার বর্ণনা সাধারণের সহজবোধ্যভাবে বর্ণিত হইবে। রোগ কি? কি প্রকারেই বা রোগসমূহ উৎপন্ন হয়, কি প্রকারে তাহার প্রতিবিধান করা যাইতে পারে, এবং রোগ হইলে তাহার কি চিকিৎসা ইত্যাদি সরলভাবে বর্ণিত হইবে।

শরীর রক্ষার উপকরণ।

বায়ু, জল ও খাদ্য শরীর রক্ষার তিনটী প্রধান উপকরণ। উহাদের বর্ণনা, উহাদের কি মাত্রায় শরীরে আবশ্যক, এবং উহাদের অধিক বা দূষিতভাবে শরীরাভ্যন্তরে গ্রহণ করিলে কি কি ব্যাধি হইতে পারে, তাহার আলোচনা, সে সকল ব্যধির প্রতিষেধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা লিখিত হইবে।

খাদ্যদ্রব্যাদি।

খাদ্যাদির দোষে নানাপ্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয়। রোগের সময় কি পথ্য করা উচিত, তাহা সম্যক্ না জানায় পথ্যাদির দোষে রোগ বর্দ্ধিত হয়। আমাদের সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ সম্যক্‌রূপ না জানার জন্য এই সকল ভুল হইয়া থাকে। এই অভাব দূর করিবার জন্য খাদ্যদ্রব্য ও পথ্যাদির রাসায়নিক বিশ্লেষণ, তাহাদের গুণ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয় সকল বিশদরূপে বর্ণিত হইবে। এই সকল খাদ্য দ্রব্যাদিতে যে সকল ভেজাল দৃষ্ট হয় এবং তাহারা শরীরের কি অপকার করে তাহারও আলোচনা থাকিবে।

সংক্রামক ব্যাধি।

আবর্জ্জনা প্রভৃতির দূরীকরণ ও ধ্বংস সাধনের ব্যবস্থা, গ্রাম্য স্বাস্থ্য-বিধান, সংক্রামক রোগ সমূহের কি প্রকারে বিস্তৃতি ঘটে এবং কি কি উপায়ে বন্ধ হয় তাহা বিশদরূপে আলোচিত হইবে।

দেশের জলবায়ু। দেশের জলবায়ু বিকৃত হইয়া কি কি রোগ উৎপন্ন করে, বৎসরের কোন কোন ঋতুতে জলবায়ু কি প্রকার বিকৃত হয়, মশা, মাছি ও অন্যান্য কীট পতঙ্গাদি ও উদ্ভিজ্জাণু দ্বারা আমাদের শরীরে কি কি রোগ প্রবেশ করে তাহা বিবৃত হইবে। যখন কোন স্থান অস্বাস্থ্যকর হয়, অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ স্বচ্ছন্দে স্বাস্থ্যকর স্থানে বা শৈলাবাসে গমন করেন এবং অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু হইতে পরিত্রাণ পান। কিন্তু গৃহস্থ ও কৃষকেরা কোথায় যাইবে? তাহারা কি কি নিয়ম পালন করিলে এই সকল অস্বাস্থ্যকর স্থানে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে তাহাও আলোচিত হইবে।

দৈব দুর্ঘটনা। সর্পাদির দংশন, অগ্নিদাহ, নানা প্রকার আঘাত ও আকস্মিক দৈহিক দুর্ঘটনার প্রথমাবস্থায় "First aids" কিরূপ করিলে, আর ভোগ বৃদ্ধি না হইয়া, সত্বর আরোগ্য হইতে পারে, তাহার সাধারণের সহজ বোধগম্য ব্যবস্থা ইত্যাদি ধারাবাহিক ক্রমে লিখিত হইবে।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য। বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ এবং, বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাবস্থায় কি কি প্রকারে শরীর পালনকরা কর্ত্তব্য এবং কি প্রকারে স্বাস্থ্য ও সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারা যায়, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন রোগাদির উৎপত্তির পরিচয় ও তাহাদের প্রতিষেধ যথাযথ ভাবে বর্ণিত হইবে। এই সকল বর্ণনায় আমাদিগকে সকল কথা স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে। কোন প্রকার অলীক লজ্জা বা সংকোচ দ্বারা কর্ত্তব্য কথা বলিতে বিমুখ হইলে চলিবে না।

ব্যায়াম। শরীরের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যায়াম নিত্য প্রয়োজনীয়। এই ব্যায়াম কি প্রকারে করিলে শরীর সবল সুগঠিত ও সুদৃঢ় হইবে, সহজে কি প্রকারে সকলে নিজ নিজ দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের সহিত ব্যায়াম অভ্যাস করিতে পারেন, এবং কোন প্রকারের ব্যায়াম কাহার পক্ষে উপযোগী তাহা আলোচিত হইবে।

গৃহ-চিকিৎসা।

অনেক গৃহস্থ সাধারণ রোগাদিতে প্রায়ই চিকিৎসকের সাহায্য লইতে সক্ষম হন না। কোথায় বা একেবারে চিকিৎসক নাই। এই সকল অবস্থায় যাহাতে গৃহস্থেরা সামান্য মুষ্টিযোগ বা সাধারণ চলিত ঔষধ ব্যবহারে নিজেরাই চিকিৎসিত হইতে পারেন, তাহা বিবৃত হইবে। রোগের গতিবিধি না জানায় অনেক সময় বিপদে পড়িতে হয়, সেই জন্য সহজে সরল ভাষায় রোগের লক্ষণ, গতি ও গৃহচিকিৎসা ইত্যাদি বর্ণিত হইবে। ইহাদ্বারা সকলে রোগ সম্বন্ধে কিছু কিছু ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া রোগীর সেবা

শুশ্রূষা।

শুশ্রূষা ও চিকিৎসকের নিকট অবস্থা সকল আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতে শুশ্রূষাকারীদের ন্যায় পারদর্শী হইবেন।

গভর্ণমেণ্টের কার্য্য।

আমাদের সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট এই দেশে, কোন প্রকার সংক্রামক ব্যাধি উপস্থিত হইলে, উপযুক্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতসকল নিয়োগ করিয়া তাহার তথ্য অনুসন্ধান করাইয়া থাকেন। কি প্রকারে এই সকল সংক্রামক ব্যাধি লোপ প্রাপ্ত হয় তাহার বিধান করেন এবং সাধারণকে সাবধান করিয়া দেন।

এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্বাস্থ্যরক্ষক "Sanitary Commissioner" এবং তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গ নিযুক্ত আছেন। আবশ্যকমত রোগ নিবারণ কল্পে নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন। এই সকল সংবাদ, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ এবং কি উপায়ে সাধারণে তাঁহাদের কার্য্যের সহায়তা করিতে পারিবে তাহা সর্ব্বাগ্রে এই পত্রিকায় আলোচিত হইবে। স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় সরকারি কাগজ পত্রের মর্ম্মসকল সরলভাষায় প্রকাশিত হইবে।

সর্ব্বসাধারণ ও চিকিৎসকবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যসকল সম্মুখে রাখিয়া আমরা এই "স্বাস্থ্য-সমাচার" পত্রিকা সম্পাদনে ব্রতী হইলাম। এই বৃহৎ ও দুরূহ কার্য্যসাধনে কতদূর কৃতকার্য্য হইব, তাহা বলিতে পারি না। প্রথমে পরমেশ্বরের করুণা এবং তৎপরে সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি ও পোষকতার উপর সকলই নির্ভর করিতেছে। রোগ চিকিৎসায় এবং নানাপ্রকার লোক সংসর্গে আমাদের

যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা সাধারণে প্রকাশের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ক্রটি করিব না।

আমরা সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা প্রচারে উদ্যোগী হইতেছি না। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের তথ্য সকল প্রকাশ করাই আমাদের লক্ষ্য। ভাষা ও ভাবের বর্ণনার ব্যতিক্রম হইতে পারে, সেজন্য অগ্রেই সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এই মহৎ কার্য্যে অগ্রসর হইলাম। এক্ষণে চিকিৎসকবর্গ তাঁহাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া এই পত্রিকায় লিখিলে আমরা অতিশয় উৎসাহিত হইব, এবং সর্ব্বসাধারণে এই সকল বিষয় পাঠ করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যত্নবান হইলে আমাদের সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

-:(•):-

রোগ কি?

শরীরস্থ কোনও যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটিলে তাহাকে রোগ বলা যায়। শারীরিক কিংবা মানসিক অসুস্থতার দ্বারা আমরা রোগের অস্তিত্ব অনুভব করি। কিন্তু এমন অনেক রোগ আছে যাহাতে কোনরূপ অসুস্থতা বুঝিতে পারা যায় না। চিকিৎসকের সাহায্য ভিন্ন এইসকল রোগ নির্দ্ধারিত হওয়া অসম্ভব। অনেক সময় রোগ-ভিন্ন অন্য কারণেও শারীরিক

কিংবা মানসিক কষ্ট হইতে পারে। কোন সময়ে সুস্থতা ও অসুস্থতার মধ্যে অতি অল্পই ব্যবধান লক্ষিত হয় এবং এরূপ স্থলে শরীরে কোন রোগ আছে কিনা নিশ্চিতরূপে বলাও অসম্ভব হইয়া উঠে।

রোগের আক্রমণ নিবারণ করিতে হইলে, কিরূপে রোগ হয় তাহা জানা আবশ্যক। রোগ কি উপায়ে শরীরে প্রবেশ করে এবং কিরূপে বা তাহা পরিব্যাপ্ত হয় জানিতে পারিলে, আমরা পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতে পারি। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, শরীরস্থ কোন যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটিলে রোগ উৎপন্ন হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, একাধিক কারণ বর্ত্তমান না থাকিলে রোগ উৎপন্ন হয় না। কি কি কারণে শরীরিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটিতে পারে নিম্নে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা গেল।

(১) বংশগত।

পিতামাতা এবং পূর্ব্বপুরুষগণের অনেক দোষ গুণ সন্তানে বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। এক একটী বংশে এক একটী রোগের অধিক প্রাদুর্ভাব। যাহাদের ফুস্‌ফুসের দৌর্ব্বল্য আছে তাহাদের সামান্য কারণে সর্দ্দি, কাশী, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগ হওয়া সম্ভব। বাতগ্রস্ত ব্যক্তির পুত্রের বাতরোগের সম্ভাবনা অধিক। উপদংশ প্রভৃতি রোগ পিতামাতা হইতে পুত্রে সংক্রামিত হইতে পারে। এক এক বংশে পাগলের সংখ্যা অধিক দেখা যায়।

(২) স্বোপার্জ্জিত।

(ক) **জীবাণুঘটিত**—অধিকাংশ রোগই কোন না কোন জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয়। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, কলেরা ইত্যাদি রোগ জীবাণুঘটিত। এই সকল জীবাণু অতিশয় ক্ষুদ্র এবং অনুবীক্ষণ ব্যতিরেকে

দৃষ্টিগোচর হয় না। সুস্থ ও সবল শরীরে জীবাণু প্রবেশ করিলে, শরীরস্থ রক্ত তাহাদিগকে অনেক সময় বিনষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু ঠাণ্ডা লাগায় বা অন্য কোন কারণে শারীরিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে, জীবাণুসকল শরীরাভ্যন্তরে বংশ বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পায়। জীবাণুগণের শরীর হইতে এক প্রকার বিষাক্ত রস নির্গত হয়, এবং সেই রস শরীরস্থ যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া রোগ উৎপন্ন করে।

রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মলমূত্র, কফ্ ইত্যাদির সহিত অনেক সময় জীবাণুসকল নির্গত হয়। এইসকল বস্তু দ্বারা বায়ু, পানীয় জল, আহার্য্য দ্রব্য প্রভৃতি দূষিত হইলে রোগ সংক্রামক হইয়া পড়ে।

নিউমোনিয়া, সর্দ্দি, যক্ষ্মা—প্রভৃতি রোগের বীজ নিশ্বাসের সহিত আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। টাইফয়েড্, আমাশয়, কলেরা, উদরাময় প্রভৃতি রোগের জীবাণুসকল পানীয় জল, দুগ্ধ কিংবা খাদ্যদ্রব্যের সহিত শরীরে প্রবেশ করে। ম্যালেরিয়া, প্লেগ ইত্যাদি কতিপয় রোগ মশক-দংশন কিংবা মক্ষিকাদির দংশনে একের শরীর হইতে অন্যের শরীরে নীত হয়। সিফিলিস্, গণোরিয়া ইত্যাদির বিষ কুৎসিৎ সংসর্গ জন্য শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশ করে।

(খ) **রাসায়নিক দ্রব্যাদিঘটিত**—জীবাণুঘটিত বিষ ব্যতিরেকে অন্য প্রকার বিষ দ্বারাও রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। এমন অনেক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ও উদ্ভিদ আছে যাহা উদরস্থ হইলে উৎকট ব্যাধি, এমন কি, মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। সর্প, বৃশ্চিকাদির দংশনও অনেক সময় মারাত্মক। বাসি মৎস্য, মাংস প্রভৃতি খাওয়ায় অনেকের মৃত্যু হইতে দেখা গিয়াছে। অপ্রশস্ত বা অপরিমিত মাংসাহার অনেক রোগের কারণ। ডাইবিটিস্, গাউট্ মেদবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ আহারের দোষে হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণে জলপান করিলে অজীর্ণ ইত্যাদি রোগ হওয়া সম্ভব। আবার অল্প মাত্রায় জল পান করিলে শরীরাভ্যন্তরস্থ ক্লেদ নির্গত হইতে না পারিয়া পাথরি ইত্যাদি রোগ আনয়ন করে।

দূষিত জল (Water rich in lime salts) পানও অনেক সময় পাথরির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়।

(গ) **তাপের অল্পতা ও আধিক্যজনিত**—উপরিলিখিত কারণ ব্যতীত অন্য প্রকারেও ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে। অত্যধিক শীত বা গ্রীষ্ম স্বাস্থ্যের হানিকর। শীতপ্রধান দেশে ঠাণ্ডা লাগিয়া অনেকের প্রত্যঙ্গাদি নষ্ট হইয়া যায়। সর্দ্দিগর্ম্মীতে ও পুড়িয়া অনেক লোক মারা যায়।

(ঘ) **আকস্মিক বিপদ-জনিত**—পড়িয়া হাত, পা ভাঙ্গা, কোনও প্রকারে আঘাত লাগা, অস্ত্রে কাটিয়া যাওয়া প্রভৃতিও অসুখের মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

(ঙ) **ব্যবসাজনিত**—যাহারা কয়লার খনি কিংবা পাটের কল প্রভৃতিতে কাজ করে, তাহাদের ফুস্‌ফুসে সূক্ষ্ম ধূলিকণা প্রবেশ করিয়া একপ্রকার রোগ জন্মায়। সমুদ্রের ডুবারিদিগকে যন্ত্রের মধ্যে অত্যধিক বায়ুর চাপে কাজ করিতে হয় বলিয়া, তাহাদের এক প্রকার রোগ হয়। Aeroplane কিংবা ব্যোমযানে অত্যধিক উচ্চে উঠিলে শারীরিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে।

(চ) **মানসিক কারণজনিত**—হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি অনেক মানসিক রোগের কারণ খুজিয়া পাওয়া দুর্ঘট। মৃগি ও অনেক প্রকার পাগলামিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আজকাল এই সকল রোগ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইতেছে। আশা করা যায় যে, এই সকল রোগের তথ্য শীঘ্রই উদ্ঘাটিত হইবে।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে জীবাণু নিঃসৃত বিষ হইতে রোগ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ফাইলেরিয়া নামক এক প্রকার কৃমি শরীরের মধ্যে কোন বিষ উৎপাদন না করিয়াও রোগ আনয়ন করে। ইহারা এত অধিক সংখ্যক জন্ম গ্রহণ করে যে, তাহাতে শরীরের এক এক স্থানে রস চলাচল বন্ধ হইয়া যায় এবং মাংস বৃদ্ধি হইয়া কোরণ্ড, শ্লীপদ ইত্যাদি রোগ উৎপন্ন হয়।

শরীরের কার্য্য।

রোগ হইলে শরীর আপনা হইতেই তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করে। রক্তের জীবাণুনাশক ক্ষমতা আছে। রোগের সময়, এই ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সমস্ত জীবাণুকে নষ্ট করিয়া ফেলিলে রোগ আরোগ্য হয়।

জীবাণু অধিক প্রবল হইলে তাহাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য ঔষধাদির আবশ্যক হয়। সময় সময় কিছুতেই তাহাদের ক্রিয়া নিবারণ করা যায় না। এরূপ অবস্থায় শারীরিক যন্ত্রাদির অধিক বিকৃতির জন্য রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

এমন কতকগুলি রোগ আছে, যাহা একবার হইলে বার বার হইবার সম্ভাবনা। বাত, সর্দ্দি প্রভৃতি ব্যাধি এই শ্রেণীর। বসন্ত, উপদংশ প্রভৃতি একবার হইলে প্রায়ই আর দ্বিতীয় বার আক্রমণ করে না। ইহার কারণ এই যে, এ সকল রোগের জীবাণুনাশক পদার্থ শরীরের মধ্যে অধিক পরিমাণে চিরকাল থাকিয়া যায়।

ডাবের জল

সাধারণ ব্যবহার।

—:():—

ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ডাবের জল অতি উপাদেয় পানীয়। তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা ও পরিশ্রান্তের ক্লান্তি দূর করিতে ইহা অদ্বিতীয়। ডাবের জল এদেশে অতিথি সৎকারের এবং দেবপূজার একটী প্রধান উপকরণ। গ্রীষ্মকালে ডাব দান করা এদেশবাসীর নিকট একটি বিশেষ পুণ্য-কর্ম্ম বলিয়া গণ্য।

আয়ুর্ব্বেদ মতে—ডাবের জল, মধুর রস ও মধুর বিপাক শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ ও তৃপ্তিকর এবং পিত্ত, পীনস, তৃষ্ণা, দাহ, শোষ ও অম্লপিত্তে উপকারক।

রাসায়নিক পরীক্ষা—পৃথক ভাবে অনেকগুলি পরীক্ষা করিয়া গড়ে ডাবের জলে (শতকরা) নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া গিয়াছে।

জল (Water)	৯২.৩২
ছানাজাতীয় উপাদান (Proteids)	.৬২
শর্করাজাতীয় উপাদন (Total carbohydrate)	৬.২০
লবণজাতীয় উপাদান (Salts)	.২৬

বিশেষরূপ পরীক্ষা দ্বারাও ইহাতে তৈল জাতীয় কোন প্রকার উপাদান পাওয়া যায় নাই। এক একটী ডাবে ১০ আউন্স হইতে ১৬ আউন্স (৫ ছটাক হইতে অর্দ্ধ সের) পর্য্যন্ত জল পাওয়া গিয়াছে।

ঝুনানারিকেলের জল—অনেকগুলি ঝুনানারিকেলের জলও পরীক্ষিত হইয়াছিল। ইহাদের এক একটীতে ৬ আউন্স হইতে ১০ আউন্স পর্য্যন্ত জল পাওয়া গিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে—ঝুনা নারিকেলের জল ঈষৎ কটুরসযুক্ত মধুর রস, গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক ও মলভেদক।

রাসায়নিক পরীক্ষা—ঝুনা নারিকেলের জলে শতকরা নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া গিয়াছে।

জল (Water)	৯২.২৮
ছানাজাতীয় উপাদান (Proteids)	.৫৯
শর্করাজাতীয় উপাদান (Total carbohydrate)	৫.৯৩
লবণজাতীয় উপাদান (Salts)	১.১০

ঝুনা নারিকেলের বয়স ভেদে উহার জলের উপাদানের তারতম্য হইয়া থাকে, কিন্তু কচি ডাবের জলে অতি অল্পই তারতম্য দৃষ্ট হয়।

প্রাণীর উপর পরীক্ষা।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষাল মহাশয় ডাবের জল নানাপ্রকার জন্তুর উপর পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন—

১। ডাবের জল পাকস্থলী হইতে সম্পূর্ণরূপে শরীরাভ্যন্তরে শোষিত হয়।

২। ত্বকের মধ্যে সূচীদ্বারা প্রবেশ করাইলে ইহা অতি শীঘ্রই রক্তের সহিত মিলিত হয়। ডাবের জলের মধ্যে কোনপ্রকার জীবাণু নাই। (Perfectly sterile) যদি চিকিৎসকগণের জীবাণুশূন্য জল (Sterile water) পাওয়ার সুবিধা না ঘটে তাহা হইলে, তাঁহারা অনায়াসেই ডাবের জল ত্বকের মধ্যে সূচী দ্বারা প্রবেশ করাইতে পারেন। ইহা দ্বারা কোন প্রকার ক্ষতি বা স্ফোটক হইবার সম্ভাবনা নাই।

ব্যবহার।

আহারের পর অম্লজনিত পাকস্থলীর বেদনায় ডাবের জল বিশেষ উপকারী।

আহারের পর ডাবের জল পান করিলে, ইহা নিজের অম্লত্ব নিবন্ধন পাকস্থলী হইতে অধিক অম্ল নিঃসরণ রোধ করে।

জ্বরাদি রোগে পিপাসা শান্তির জন্য ইহা সদ্য ফলপ্রদ।

হিক্কা রোগে যখন অন্যান্য ঔষধসমূহ অকৃতকার্য্য হইয়াছে দেখিবে, তখন অল্প মাত্রায় বরফ টুকরার সহিত ব্যবহার করিলে অচিরাৎ উপশম হয়।

কলেরা রোগীর তৃষ্ণা ডাবের জল দ্বারা অনেকটা নিবারিত হয়। কারণ ইহা অতি সত্বর পাকস্থলী হইতে রক্তের সহিত মিলিত হয় এবং রক্তের জলায় অংশ বর্দ্ধিত করে।

ইহা অতি উত্তম মূত্রকারক। মূত্রকৃচ্ছ্র অর্থাৎ পথরি গণোরিয়া এবং Stricture রোগে ইহা সেবন করিলে প্রস্রাবের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

শিশুদিগের গরম হইয়া দুধ্ তোলাতে এক চামচ করিয়া ডাবের জল প্রত্যহ সেবন করাইলে, পাকস্থলীর উগ্রতা কমিয়া যায় এবং দুধতোলা বন্ধ হয়।

নিরামিষ ভোজীর বিপদ।

সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

সম্প্রতি জীবনবীমা ব্যাপারে ডাক্তারের নিকট পরীক্ষিত হইতে গিয়া আমাকে য কিরূপ নাকাল হইতে হইয়াছিল তাহা ভাবিলে এখনও আমি মনে মনে বশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত হই। তাহাতে আমার ন্যায় নিরামিষ ভোজীর পক্ষে থেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

সুচতুর এজেন্টের পাল্লায় পড়িয়া তাহার যুক্তি তর্কে হার মানিয়া জীবনবীমা করিবার জন্য আবেদন করিলে—"বীমা" অফিসের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে অফিসের ডাক্তারের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য এক হুকুমজারি পত্র প্রাপ্ত হইলাম।

বিলাত ফেরত মিঃ মল্লিক এম, বি মোহোদয় "বীমা অফিসের ডাক্তার।" অতএব আমাকে তাঁহার নিকট পরীক্ষিত হইতে হইবে এজেন্ট মহাশয় আসিয়া জানাইয়া গেলেন। এ সংবাদে আমি একটু বিব্রত হইলাম কারণ বিলাত-ফেরত ডাক্তারের নিকট পরীক্ষিত হওয়া আমার ন্যায় নিরামিষ ভোজীর নিকট একটা অসমসাহসিকতার কার্য্য বলিয়া মনে হইল।

যাহাহউক এ ক্ষেত্রে নিজেকে ডাক্তারের অনুগ্রহপ্রার্থী জানিয়া সাহসে বুক বাঁধিলাম ও বর্ত্তমান মাংসাশী যুগের সমকক্ষ স্থানাভিলাষী একজন সামান্য নিরামিষ ভোজীর কিরূপ পরিণাম হয় দেখিবার জন্য বিশেষ কৌতুহলী হইয়া ডাক্তার মল্লিকের নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

আরও ভাবিয়া দেখিলাম যে আজকাল সভ্যসমাজে আমিষ ভোজীরা প্রকৃত মনুষ্য নাম ধারণের উপযুক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত, সে স্থলে আমার ন্যায় একজন

নিরামিষ ভোজীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া একান্ত অসম্ভব তথাপি আমার উত্তীর্ণ হওয়ায় উপর ডাক্তার সাহেবের মুরুব্বি এজেণ্ট মহাশয়ের পারিশ্রমিক নির্ভর করিতেছে এই আশায় আশান্বিত হইয়া "বীমা" অফিসে গমন করিলাম এবং ডাক্তারের অপেক্ষায় বিশ্রাম কক্ষে আশ্রয় লইলাম।

ঘরের ভিতরে একটী তীব্র গন্ধে আমি আকুল হইয়া উঠিলাম এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া ডাক্তারের সাক্ষাৎ না পাওয়াতে আফিসঘর কোনও রূপ বিশোধক পদার্থের দ্বারা পরিস্কৃত করা হইতেছে মনে করিয়া বাহিরে আসিয়া একজন কর্ম্মচারীর নিকট খোঁজ লইলাম। কর্ম্মচারী সহাস্য বদনে আমাকে বিনীত ভাবে বলিলেন—"মহাশয় একটু অপেক্ষা করুন, ডাক্তার সাহেব অন্যান্য লোক পরীক্ষা করিতেছেন এবং ঐ গন্ধ আর কিছুই নহে উহা ডাক্তার সাহেবের ঘরের কয়েকটী ঔষধের মিলিত গন্ধ" কর্ম্মচারীর উত্তরে নিজের অজ্ঞতার বিষয় ভাবিয়া একটু অপ্রতিভ হইলাম এবং বাহিরের বেঞ্চে বসিয়া ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে আমার ডাক পড়িল; আমি একজন চাপরাসীর সহিত ডাক্তার সাহেবের "প্রাইভেট রুমে" গমন করিলাম।

তৎপরে পরীক্ষা আরম্ভ হইল। প্রথমে ডাক্তার সাহেব আমার নাম, ধাম, পেশা প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন ও তাহার যথাযথ উত্তর একখানি কাগজে লিখিয়া লইলেন। আমি ডাক্তার সাহেবের এইরূপ শিষ্ট ব্যবহারে বিশেষ বিস্মিত হইলাম ও নিজের ভুল ধারণার জন্য মনে মনে একটু লজ্জিত হইলাম।

তাহার পর ডাক্তার সাহেব আমার বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন ও বলিলেন কোনও দোষ নাই, আমি একটু আশ্বস্ত হইলাম। কেন না, নিরামিষাশী হইবার পর যদিও আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল তথাপি নিজেকে মনে মনে এই মাংসাশী যুগের মানব সমাজের গণ্ডীর বাহিরে বিবেচনা করিয়া ডাক্তারের নিকট পরীক্ষিত হইতে লাগিলাম। এবং কোনও রূপ গোলযোগ ঘটিবার আশঙ্কায় ডাক্তার সাহেবের নিকট আমার নিরামিষ ভোজনের কথা গোপন করিলাম।

তাহার পর আমার বক্ষ বিস্তৃতির মাপ লওয়া হইল, ফলে আমার বক্ষ প্রসারণের মাত্রা ২ ইঞ্চি অধিক হইল দেখিয়া আমি একটু বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হইলাম। কিন্তু ওজনে আমার গুরুত্ব একটু কম হইল। যাহা হউক ডাক্তার সাহেব ইহাকে ততটা গ্রাহ্য করিলেন না দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম।

সর্ব্বশেষে আমার মূত্র পরীক্ষিত হইল, পরীক্ষার পর ডাক্তার সাহেবের মুখের পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি মনে মনে প্রমাদ গণিলাম।

ডাক্তার সাহেব আমার দিকে ফিরিয়া বিশেষ দুঃখিত ভাবে বলিলেন—"মহাশয় আপনার মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব অত্যন্ত কম এবং বর্ণ অত্যন্ত ফিকে" এই বলিয়া তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি ডাক্তার সাহেবের ভাবগতিক দেখিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিলাম। এবার তাঁহার চাহনির ভাবে নিজের কোনও রূপ আসন্ন বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম।

অতঃপর ডাক্তার সাহেব আমার ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কতদিন ধরিয়া এরূপ অবস্থায় আছেন।"

আমি উত্তর করিলাম প্রায় ১২ বৎসর। ডাক্তার সাহেব আমার উত্তরে নিজের বহুদর্শিতা ও বিচক্ষণতা সপ্রমাণ করিবার জন্য তাড়াতাড়ি আমার নিকটে আসিয়া আমার পিঠের নীচের দিকে হাত দিয়া বলিলেন, আপনি নিশ্চিত এই স্থানে বিশেষ বেদনা অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার বিপরীত উত্তরে ডাক্তার সাহেব একেবারে অপ্রতিভ ও বিস্মিত হইলেন, তথাপি আমাকে নিতান্ত মূর্খ বিবেচনা করিয়া আমার নিকট নিজের দূরদর্শিতার বিষয় জ্ঞাপন করিবার জন্য দৃঢ়-স্বরে বলিলেন "মহাশয় বলিতে কি আপনি শীঘ্রই মূত্রাশয় সম্বন্ধীয় এক সংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইবেন।"

ডাক্তার সাহেবের নিকট হইতে এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া আমি সাতিশয় বিস্মিত ও কৌতুহলী হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। ডাক্তার সাহেব গম্ভীর ভাবে বলিলেন যে আপনার মূত্রে এলবুমেনরূপ, জান্তবপদার্থ পাওয়া

যায় নাই। কিন্তু লবণ ও ইউরিয়া (urea) কম হইয়াছে; ইহাই রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ। ডাক্তারের কথায় আমি একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিলাম—"মহাশয় আমি নিরামিষ ভোজী, আমি মাছ, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি খাই না, তবে আপনি এই সব জিনিষের অস্তিত্ব কিরূপে দেখিতে পাইলেন।"

ডাক্তার সাহেব আমার উত্তরে একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন "মহাশয় আমি সে জন্য বলিতেছি না, তবে ইহা আপনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার অনুকূল বোধে বলিতেছি।" ডাক্তার সাহেবের উত্তরে আমি একটু দুঃখিত হইলাম এবং মনের আবেগে তাঁহার নিকট আমিষ ভোজনের দোষ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলাম। ডাক্তার সাহেব আমার ভূমিকায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন "মহাশয় আমি আপনার সহিত আমিষ ভোজনের দোষগুণ সম্বন্ধে তর্ক করিতে চাহি না তবে এইমাত্র জানিয়া রাখুন যে, "বীমা" অফিসের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে হইলে এইরূপ কয়েকটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই।" অতঃপর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া একটু নরম হইয়া বলিলেন "মহাশয় আপনি এখন যান, তিন দিন পরে আপনাকে আর একবার পরীক্ষা করা হইবে।"

আমি ডাক্তারের নিকট পরীক্ষায় বিফল মনোরথ হইয়া বাড়ীতে ফিরিলাম। পরদিন আমি ডাক্তার সাহেবের নিকট হইতে একখানি উপদেশ পূর্ণ পত্র পাইলাম তাহাতে লেখা আছে—আপনি এই তিন দিন যথেষ্ট মাছ, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি আহার করিবেন। অযাচিতভাবে ডাক্তারের নিকট হইতে এইরূপ উপদেশ-পূর্ণ পত্র পাইয়া আমি একটু আশান্বিত হইলাম। সেই দিনই এজেণ্ট মহাশয় আসিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন, এবং আমার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলেন,—মহাশয় আপনার যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আপনার পক্ষে মাছ, মাংস প্রভৃতি আহার করা একান্ত আবশ্যক, নতুবা আপনার পরিণাম যে অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আর এখন যদি কোনও রূপে জীবন বীমা করিতে চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে উহা আপনার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে।

আমি এজেণ্টের এইরূপ উপদেশে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলাম,—"মহাশয় আমার শরীরের কোনও প্রকার অসুখ নাই বা হইবারও আশঙ্কা নাই; আমার শরীরে যথেষ্ট সামর্থ্য আছে; অধিকন্তু আমি নিরামিষ ভোজী হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় আমিষ ভোজীদিগের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী।"

এজেণ্ট মহোদয় আমার কথা শুনিয়া প্রলাপ বাক্য মনে করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, এবং আমাকে অনেক বুঝাইয়া ডাক্তার সাহেবের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অগত্যা আমি অনন্যোপায় হইয়া ডাক্তার সাহেবের উপদেশ পালন করিতে বাধ্য হইলাম।

সেইদিনই আমি বাজার হইতে যথেষ্ট পরিমাণে মাছ, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি কিনিয়া আনিলাম এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও জীবন বীমা করিবার জন্য মাংসভোজী হইয়া পড়িলাম। দুই দিনের ভিতর নিরামিষ ভোজীর গৃহ আমিষ ভোজীর আস্তাকুড় হইয়া পড়িল। আমার স্ত্রী, আমার এইরূপ পরিবর্ত্তনে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল, কিন্তু কোনও কারণ বুঝিতে না পারিয়া আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি হইয়াছে মনে করিয়া বিশেষ ক্ষুব্ধ হইল, শান্তির আশায় এবং গোলযোগ হইবার অশঙ্কায় চুপ করিয়া রহিল।

আমি দুই দিন মাত্র আমিষ ভোজী হইয়া আমিষ ভোজনের সুখ বিশেষ ভাবে অনুভব করিলাম। নানাবিধ মসলা ও লবণের ভাগ বেশী পরিমাণে উদরস্থ হওয়াতে শরীর ভয়ানক গরম হইয়া পড়িল এবং অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়া পড়িলাম। এমন কি শেষে মাছ মাংসের পরিবর্ত্তে জলই একমাত্র খাদ্য হইয়া দাঁড়াইল। তৃষ্ণার জ্বালায় বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিলাম যে আমিষ ভোজীরা কেন মদ খাইতে শিখে।

তিনদিন আমিষ ভোজন করিয়া ডাক্তার সাহেবের কাছে পুনরায় পরীক্ষা দিবার জন্য গমন করিলাম। এবার আমার মূত্র বেশ গাঢ়বর্ণ হইল এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী হইল। ডাক্তার সাহেব সহাস্যে বলিলেন "এই দেখুন মাংস

খাওয়ার কত গুণ তিন দিনেই আপনার প্রস্রাব স্বাভাবিক হইয়াছে। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে যান। আপনার বীমা মঞ্জুর হইল।”

আমি ডাক্তার সাহেবকে সেলাম ঠুকিয়া চলিয়া আসিলাম।

আমরা স্বভাবের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইলাম। ডাক্তার সাহেব আনন্দে আটখানা হইলেন এবং এজেণ্ট মহাশয় আমাকে এইপ্রকার বিপদসঙ্কুল অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া আমার বীমা মঞ্জুর করাইলেন বলিয়া আমার নিকট কত বড়াই করিলেন।

দন্ত।

ডাক্তার শ্রীসুবোধচন্দ্র মিত্র এল, এম, এস, লিখিত—

দন্ত আমাদের পাকযন্ত্র সমষ্টির মধ্যে অন্যতম যন্ত্র। ইহার দ্বারা খাদ্যদ্রব্য ভাল করিয়া চিবাইয়া তবে পাকস্থলীতে (Stomach) পাঠাইতে হয়। ইহাই দন্তের মুখ্য কার্য্য। এতদ্ব্যতীত দন্তের আরও অনেক উপকারিতা আছে। তাহা পরে বিশেষ করিয়া বলা যাইবে।

কিন্তু আমরা দন্তদ্বারা চিবানর কার্য্যটার বিষয়ে তত মন দিতে চাহি না। আহার্য্য বস্তু অনেক সময় তাড়াতাড়িতে গিলিয়া ফেলি; তাহা যে চিবাইতে হইবে ইহা একরূপ ভুলিয়া যাই। অনেকে এইরূপ কার্য্যে চিরাভ্যস্ত। ইহার যে কি বিষময় পরিণাম তাহা একটু মনোযোগ পূর্ব্বক ভাবিলেই প্রতীয়মান হয়।

প্রথমে দন্তের গঠনপ্রণালীর বিষয় বুঝাইয়া পরে এই সব বিষয়ের চর্চ্চা করিতে চেষ্টা করিব।

প্রধানতঃ মনুষ্যের দন্ত দুই প্রকার—(১) শৈশব বা অস্থায়ী দন্ত, অর্থাৎ যাহা শিশুর সাধারণতঃ ৬।৭ মাস বয়সে বাহির হইতে আরম্ভ হয় এবং (২) স্থায়ী দন্ত, অর্থাৎ যাহা শৈশব দন্ত পড়িবার পরে উঠে। এই দ্বিতীয় প্রকারের দন্তই আমাদের বিশেষ আলোচনার বিষয়।

(১) শৈশব দন্ত বা "দুধে দাঁত" :—

ইহা সংখ্যায় ২০টী। উপরের পাটীতে দশটী এবং নিচের পাটীতে দশটী। সম্মুখে চারিটী করিয়া আটটী দন্ত খুব পাতলা এবং ধারাল। নিম্নে শৈশব দন্ত বাহির হইবার সময়ের তালিকা দেওয়া গেল। যথা—

নিম্নের পাটীর মধ্যগত ইন্‌সাইসার।	উপরের পাটীর ইন্‌সাইসার।	নিম্নের পাটীর-পার্শ্ববর্ত্তী ইন্‌ ও প্রথম মোলার।	ক্যানাইন্‌।	শেষ মোলার।
৬—৯ মাস	৮—১০ মাস	১৫—২১ মাস।	১৬—২৬ মাস	২০—২৪ মাস

(২) স্থায়ী দন্ত :—

ইহা সংখ্যায় ৩২টী প্রত্যেক পাটীতে ১৬টী করিয়া বর্ত্তমান। তবে ৩২টী দন্ত সকলেরই যে আছে তাঁহা নহে। কারণ সব পশ্চাতের দন্ত চারিটী (যাহাকে আক্কেল দাঁত বা wisdom tooh কহে) কাহারও মোটে বাহির হয় না, কাহারও বা চারিটীর স্থলে ৩টী, কি ২টী কি ১টী মাত্র বাহির হয়। ইউরোপীয়ান-দের মতে এই আক্কেল দাঁত সভ্যতার লক্ষণ। ইহা সাধারণতঃ ১৮ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে বাহির হয়। ইহা বড় ধীরে ২ উঠিতে থাকে এবং সেই সময় অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়। অনেক সময় আক্কেল দাঁতের যন্ত্রণায় লোকে বে আক্কেল হইয়া পড়ে; তবে যেখানে ইহা সভ্যতার নিদর্শন সেখানে এ যন্ত্রণা মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হইবে; যেহেতু কথায় বলে,"পেটে খেলে পিঠে সয়।

স্থায়ীদন্ত সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত :—যথা, প্রত্যেক পাটীতে চারিটী ইনসাইসার বা কর্ত্তনকারী, দুইটী ক্যানাইন্‌ (কুকুর দন্ত) চারিটী বাইকাসপিড়

(bi-cuspid) বা দ্বিবেদী বিশিষ্ট দন্ত এবং সর্ব্বাশেষে ছয়টী মোলার (molar) বা বহুবেদী বিশিষ্ট দন্ত। আক্কেল দন্ত এই মোলার দন্তের অন্তর্গত। সম্মুখ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহারা পর্য্যায়ক্রমে অবস্থিত।

নিম্নে স্থায়ীদন্ত বাহির হওয়ার সময়ের তালিকা দেওয়া গেল :—

সম্মুখের মোলার।	মধ্যগত ইন্সাইসার	পার্শ্ববর্ত্তী ইন্সাইসর	ক্যানাইন্	প্রথম বাইকাস-পিড	পশ্চাদ্বর্ত্তী বাইকাস্-পিড্	মধ্যগত মোলার	পশ্চাদ্বর্ত্তী মোলার ব আক্কেল
৬—৭ বৎসর	৭ বৎসর	৮—৯ বৎসর	১০—১৩ বৎসর	৯—১০ বৎসর	১০—১২ বৎসর	১১—২২ বৎসর	১৮—৩০ বৎসর

প্রত্যেক দন্তের খানিকটা বাহিরে থাকে (অর্থাৎ যাহা আমরা সজীব অবস্থায় দেখিতে পাই)। ইহাকে crown বা দন্তের মস্তক কহে। অবশিষ্ট অংশ ভিতরে অবস্থিত; ইহা root বা fang অর্থাৎ মূল। মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম এজন্য এই স্থানকে neck বা গলা বলা যায়।* মোলার দন্তেই দুই, তিন বা ততোধিক মূল থাকে; অবশিষ্ট দাঁতের সাধারণতঃ একটী করিয়া মূল বর্ত্তমান। প্রত্যেক মূলের অগ্রভাগে একটী করিয়া ছিদ্র থাকে। ডেন্টিন্ (Dentine) নামে একটী পদার্থ দ্বারা দন্তটী নির্ম্মিত। ক্রাউনের ডেন্টিন্ একপ্রকার শাদা পদার্থদ্বারা মোড়া। ইহাকে Enamel বা কলাই কহে। ইহাই আমরা দেখিতে পাই। মূল আর একটী সূক্ষ্মতম পদার্থ দ্বারা আবৃত; ইহার নাম Cement বা জমাট। অভ্যন্তরে প্রত্যেক দন্তে একটী করিয়া গহ্বর আছে। ইহা ডেন্টিন্ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং ক্রাউন ও মূলের মধ্যে অবস্থিত। এই গহ্বর Pulp (বা শাঁস) নামে এক প্রকার পদার্থ পূর্ণ, তাহার মধ্যে স্নায়ু, ধমনী প্রভৃতি থাকিয়া দন্তকে সজীব রাখে। প্রত্যেক মূলের অগ্রভাগে যে ছিদ্র থাকে তদ্দ্বারা এই সব স্নায়ু, ধমনী দন্তগহ্বরে প্রবেশ করে।

এক্ষণে দন্তের উপকারিতা কি তাহা দেখা যা'ক :—

(১) দন্ত দ্বারা আমরা খাদ্যদ্রব্য চিবাইতে পারি।

(২) ইহা বয়স নিরূপণের পক্ষে সহায়তা করে।

(৩) দন্তের আকৃতি ও প্রকৃতি দেখিয়া চিকিৎসকেরা অনেক সময় অনেক ব্যারাম ধরিতে পারেন।

(৪) দন্ত অনেক বর্ণ উচ্চারণে সহায়তা করে। সকলেই জানেন যে দন্তহীন মনুষ্যের উচ্চারণ হাস্যোদ্দীপক এবং অনেক সময় দ্ব্যর্থব্যঞ্জক।

(৫) দন্ত মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। কালিদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব প্রভৃতির গ্রন্থে "সুদতি" শব্দের প্রয়োগ প্রাচুর্য্যই তাহার প্রমাণ। ইউরোপীয়ানরাও well set tooth বিশিষ্ট মহিলাদিগের সুন্দরী বলিয়া জ্ঞান করেন। যুবক যুবতীদের ত দূরের কথা, অনেক বৃদ্ধও নড়া দাঁত তুলিতে চাহেন না। দাঁত তুলিলে মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে ইহাই তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি।

(৬) যুদ্ধ স্থলে ইহা অস্ত্রের কার্য্য করে। অবশ্য ইতর জন্তুরাই দন্তকে এই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া থাকে। মনুষ্যজাতির মধ্যে এ দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। পাঠ্যাবস্থায় দন্তযুদ্ধে আহত ব্যক্তিকে যে চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে আসিতে দেখি নাই, তাহা নহে।

(১) আহার গলাধঃকরণ করিবার পূর্ব্বে আমরা তাহাকে দন্ত দিয়া চিবাইয়া থাকি। গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুরা প্রথমে আহার না চিবাইয়া তাড়াতাড়ি গিলিয়া ফেলে, তাহার পরে সময় মত পুনরায় সেই খাবার উগরাইয়া মুখে আনয়ন করে এবং পুনরায় তাহাকে ভাল করিয়া চিবাইয়া গলাধঃকরণ করে (রোমন্থন বা Rumination)। ইতর জন্তুরাই প্রকৃতির নিয়মাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া থাকে; কিন্তু আমরা মানবজাতি সেই সব নিয়ম প্রতি মুহূর্ত্তেই অবহেলা করি। অথচ আমরা প্রাণিশ্রেষ্ঠ বলিয়া অহঙ্কার ও স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি।

খাদ্যদ্রব্য মুখে রাখিয়া আমরা প্রথমে তাহা চিবাইতে থাকি—এই চিবানর সময় molar এবং bi-cuspid দন্তের দরকার হয়। আহার্য্য বস্তু

অপেক্ষাকৃত নরম হইলে প্রথমে তাহাকে কাঁচির ন্যায় সম্মুখের (incisor) দন্তের দ্বারা কাটিয়া পরে পশ্চাতের দন্ত দ্বারা চিবাইয়া থাকি। নিজের দাঁতে হাত দিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উপর পাটীর সম্মুখের দাঁত চারিটী নিম্নের পাটীর সম্মুখের দাঁতের ঠিক উপরে না আসিয়া অগ্রে আসিয়া পড়ে। কাঁচির মত ইহাদ্বারা খাবার জিনিষ কর্ত্তন করা যায়। কিন্তু পশ্চাতের দন্তগুলি ঠিক উপরে নিচে আসায় ইহাদের দ্বারা খাদ্য গুড়ান বা পেষা যায়।

খাবার যতই চিবান যায় ততই ইহার প্রত্যেক অংশ লালার সহিত মিশিতে থাকে। এই সঙ্গে জিহ্বাও চর্ব্বিত বস্তু অনবরত উল্‌টাইয়া দিয়া আহারের সহিত লালা মিশ্রণের কার্য্যের সহায়তা করে।

এখন বলিতে পারেন, লালা খাবারের সহিত মিশাইয়া আমাদের লাভ কি? লালাতে একপ্রকার বস্তু আছে, তাহার নাম টায়ালিন (Ptyalin)। এই টায়ালিন ভাত, ডাউল, রুটী, আলু প্রভৃতি শর্করাজাতীয় পদার্থ (Carbohydrates) হজম করাইতে সক্ষম। সাধারণের ধারণা যে, পাকস্থলীই হজমের একমাত্র আধার; কিন্তু তাহা নহে। শর্করাজাতীয় দ্রব্য হজম করিতে পাকস্থলীর ক্ষমতা লক্ষিত হয় না। পাকস্থলীর নিম্নে Pancreas (ক্লোমগ্রন্থী) নামে একটী পাকযন্ত্র আছে, তাহা হইতে একপ্রকার রস নিঃসৃত হয়। এই রসে Amylopsin (আমিলপসিন্) নামে একটী পদার্থ আছে। এই Amylopsin ও শর্করা জাতীয় পদার্থ হজম করিয়া থাকে। তবে Ptyalin এবং amylopsin এর হজমপ্রণালী একপ্রকার নহে। যাহা হউক এ বিষয় লইয়া মিছামিছি "পুঁথি বাড়ান" দরকার দেখি না; কারণ, ইহা আমাদের আলোচনার বিষয় নহে।

ভারতবাসীর প্রধানখাদ্য সাধারণতঃ শর্করাজাতীয়। চাউল, আটা, ময়দা, ছাতু, জনার, বাজরি প্রভৃতির মধ্যে কোনটী না কোনটী কোন প্রদেশে প্রধান খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মৎস্য, মাংস প্রভৃতি প্রাণিজ খাদ্য এদেশে খুব কম পরিমাণে চলিত; রাজপুতনা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশও গুর্জ্জর

(Guzrat) অঞ্চলে প্রাণিজ খাদ্য স্পর্শকরা পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ। অতএব আমাদের আহার যে আরও ভাল করিয়া চিবান দরকার, সে বিষয় বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ টায়ালিনের কার্য্য শর্করাজাতীয় খাদ্য হজম করান। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে মাছ, মাংস চিবাইতে হইবে না। মৎস্য, মাংস না চিবাইলে পাকস্থলীর রস তাহাদের প্রত্যেক অংশের সহিত মিশিতে পারে না। পক্ষীর পাকস্থলীর ন্যায় আমাদের পাকস্থলী আহার গুড়াইতে পারে না; সে কার্য্যটা করিতে দন্তের সাহায্য দরকার।

লালা ভুক্ত দ্রব্যের সহিত সম্যক্‌রূপে মিশিবার দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, ইহাতে ভুক্ত দ্রব্য বেশ পিচ্ছিল (হড়্‌হড়ে) হয় এবং তজ্জন্য সহজে গলাধঃকরণ হইয়া পাকস্থলীতে পৌছায়। ক্ষিপ্রভোজীদের গলায় বা বুকে খাবার আট্‌কে যাওয়া একটী নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

(২) দন্তের সাহায্যে অনেক সময় বয়স নিরূপিত হইয়া থাকে। কত বয়সে কোন ২ দন্ত বাহির হয় তাহার তালিকা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

(৩) (ক) পিতামাতার শরীরে উপদংশের বিষ থাকিলে পুত্রাদির শরীরেও ঐ বিষ থাকা সম্ভব। এইরূপ পুত্রাদির সম্মুখের দাঁতের অগ্রভাগে একপ্রকার খাঁজ থাকে। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ডাক্তার জোনাথান্ হাচিন্‌সন্ (Jonathan Hutchinson) এইরূপ খাঁজের অর্থ প্রথমে বাহির করেন; তজ্জন্য এই দন্তকে অনেক সময় (Hutchinson's tooth) হাচিন্‌সনের দন্ত কহে। Hutchinson's Tooth বিশিষ্ট ছেলেদের চিকিৎসা করান একান্ত আবশ্যক, নচেৎ উপদংশ বিষ শেষে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া উহাদিগকে চিররোগী করিয়া ফেলে এবং অকালে কালের কবলে নিক্ষেপ করে। (খ) অধিক পরিমাণে পারদ ঘটিত ঔষধ ব্যবহার করিলে সম্মুখের দাঁতের গাত্রে একপ্রকার দাগ দৃষ্ট হয়। ইহাকে Mercurial Tooth কহে। (গ) কখনও দন্তের সহিত সন্তান ভূমিষ্ট হইতে দেখা যায়। এতদ্দেশীয়দের মতে ইহা একটী কুলক্ষণ। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে; ইহা শিশুর শরীরে উপদংশ বিষ বর্ত্তমানের নিদর্শন।

এইস্থানে বলা দরকার যে mercurial tooth এবং Hutchinson's tooth দুধেদাঁতে হয় না।

এতক্ষণ দন্তের উপকারিতার বিষয় বলা গেল, এখন দন্তের কার্য্য ভালরূপ না হইলে আমাদের শরীরে কি কি অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহা দেখিতে হইবে।

আহার ভাল করিয়া না চিবাইলে তাহা পাকস্থলীতে যাইয়া উক্ত যন্ত্রকে উত্তেজিত করিয়া থাকে। না চিবাইয়া তাড়াতাড়ি ভোজন করিলে ঐ উত্তেজনা বশতঃ অনেক সময় উক্ত খাদ্য বমন হইয়া যায়। শিশুরা ভাল করিয়া না চিবাইয়া কাঁচাকুল, কাঁচাআম কি অন্যান্য ফল খাইয়া থাকে এবং কিছুক্ষণ পরে সাধারণতঃ ইহা বমি করিয়া ফেলে। দ্বিতীয়তঃ ভাত, ডাউল প্রভৃতি খাদ্য ভাল করিয়া না চিবাইলে ইহা টায়ালিনের সহিত মিশিতে পারে না, সুতরাং ইহা ভাল হজমও হয় না। ইহা তৎপরে পাকস্থলীতে পৌছাইয়া পচিতে থাকে। ইহার ফলে পাকস্থলী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, পাকস্থলীর মধ্যে হাওয়া জমিতে থাকে, মুখ দিয়া জল উঠে, পেটকামড়ায় এবং পরিশেষে অগ্নিমান্দ্য ও বদ হজমের সৃষ্টি হয়। মৎস্য মাংসও ভাল করিয়া না চিবাইলে পাকস্থলী ইহাদিগকে ভালরূপ হজম করাইতে পারে না; ফলে ইহাও বদহজম (Dyspepsia) আনয়ন করে।

যাহার দন্ত পড়িয়া গিয়াছে তিনি ত অনেক জিনিষের আস্বাদনে বঞ্চিত; অধিকন্তু যাহা আহার করেন তাহাও ভাল হজম হয় না। দন্তহীন লোকে প্রায়ই কোষ্ঠ কাঠিন্য বা কোষ্ঠাধিক্য ব্যাধিতে ভুগিয়া থাকেন। অধিক কথা কি, যাঁহার সমস্ত দন্তগুলি না পড়িয়া কেবলমাত্র ২।১টী দন্ত পড়িয়া গিয়াছে তিনিও ঐ রোগের হাত হইতে একেবারে এড়াইতে পারেন না। এই শেষোক্তদের পক্ষে ঔষধ দ্বারা ব্যারাম্ ভাল করিবার চেষ্টা করার অগ্রে দাঁত বাঁধান উচিত। ইহাতে উক্ত উপসর্গ দূরীভূত হইতে পারে।

পাকস্থলী প্রভৃতিতে বদহজমের সৃষ্টি হইলে প্রায়ই মুখে ঘা, দাঁতের মাড়িতে বেদনা বা ঘা, জিহ্বায় ঘা (Stomatitis) ও মুখে দুর্গন্ধ হয়; কখনও বা দাঁত নড়িতে থাকে এবং দাঁতের গোড়ায় পুঁয হয়। মস্তকঘূর্ণন, শারীরিক

দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অনেক উপসর্গ এই বদহজম হইতে জন্মিতে পারে সে বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

চিকিৎসা দ্বারা এই সকল উপসর্গের প্রতিকার করা দরকার তবে সঙ্গে সঙ্গে ব্যারামের কারণও দূর করা উচিত নচেৎ ব্যারাম সমূলে উৎপাটিত হইবে না।

গত বৎসর একটী বদহজমের রোগী আমার চিকিৎসাধীনে আসে। লোকটীর ব্যারাম অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠতারল্য ও বমন। প্রথম কয়েক দিবস অনেক রকম ঔষধ দিয়া ব্যারামের বিশেষ কোন প্রতীকার করা গেল না। অবশেষে আমি একদিন তাহার বমি দেখিতে চাহিলাম। দেখিলাম লোকটী গোটা গোটা ভাত বমি করিয়াছে। আমি তাহাকে খুব চিবাইয়া চিবাইয়া ধীরে সুস্থে আহার করিতে উপদেশ দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু ঔষধও ব্যবহার করিতে দিলাম। দেখিলাম লোকটী দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিল। এখন সে বেশ কার্য্যকর্ম্ম করিতেছে, এবং বদহজম বা বমির বিষয় কিছু বলে না।

ভাল করিয়া না চিবাইয়া তাড়াতাড়ি খাদ্য দ্রব্য গিলিলে যে তাহা বুকে আট্‌কাইয়া কষ্ট দিতে পারে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অনেক সময় তাড়াতাড়ি আহার করিলে বিষম লাগিতে পারে। ইহাও কম যন্ত্রণাদায়ক নহে।

আহার ভাল করিয়া না চিবানর আর একটী অপকারিতা এই যে, ইহাতে কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তিই হইয়া থাকে; রসনার পরিতৃপ্তি বিশেষ কিছু হয় না। যাঁহারা যথার্থ "খাইয়ে" লোক তাঁহারা কখনও তাড়াতাড়ি ভোজন করেন না। অবশ্য আমি অতি ভোজনের পক্ষপাতী নহি।

অতএব যে দন্তের এত উপকারিতা তাহার বিষয় যে আমাদের বিশেষ যত্নবান্ হওয়া উচিত তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া হাত ও মুখ উত্তমরূপে পরিষ্কার করার প্রথা এদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিত আছে। তবে উক্ত প্রথাটী আজকাল একরূপ হাস্যকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিদ্রা হইতে উঠিয়া অনেকে আজকাল একগণ্ডষ জল দ্বারা চক্ষু দুইটী ধৌত করেন এবং আর এক গণ্ডষ জল দ্বারা একটী

কুলকুচা করিয়া দন্ত পরিষ্কার করার কার্য্যটা সম্পন্ন করেন। ইহা ঠিক, উড়ে বেয়ারার দুগ্ধ পান করার মত। দুধ না খাইলে পাল্কি বহিতে পারিবে না সেই জন্য এক পোয়া দুধে সের খানিক জল মিশাইয়া ৮।১০ জনে পান করে। পাটনা অঞ্চলের লোকদের উপর আমরা "ছাতুখোর" প্রভৃতি অনেক শ্লেষ বাক্য বর্ষণ করি বটে, কিন্তু তাহাদের দন্ত পরিষ্কার করার প্রথা যে অনুকরণীয় তাহা আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না।

প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া চক্ষু এবং দন্ত বেশ ভাল করিয়া পরিষ্কার করা প্রয়োজন। দন্ত ভালরূপে পরিষ্কার না করিলে খাদ্যদ্রব্যের অংশ (টুক্‌রা) দুই দন্তের মধ্যে আট্‌কাইয়া থাকে এবং অধিকক্ষণ তথায় থাকায় তাহা পচিতে আরম্ভ হয় এবং তাহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। এইরূপ প্রত্যহ হইলে তথায় অনিষ্টকারী জীবাণুর (microbes) সৃষ্টি হয়। তাহার ফলে চতুঃপার্শ্বস্থ মাড়ি ফুলিয়া উঠে এবং ঘাও হইতে পারে। দাঁতের মূল খারাপ হইয়া যায়, দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত ও পুঁয পড়ে এবং দাঁতে পোকা লাগে (caries of the tooth)। পক্ষান্তরে এই সকল পচাজিনিষ পাকস্থলীতে যাইয়া তথায় বদহজম ও তজ্জনিত অনেকানেক উপসর্গ আনয়ন করে। এই সব ব্যাধি যে অতীব যন্ত্রণাদায়ক তাহা আর কাহাকেও ভাল করিয়া বুঝান নিষ্প্রয়োজন কারণ এদেশে শতকরা প্রায় ৮০।৯০ জন কখনও না কখনও দন্ত-পীড়ায় ভুগিয়া থাকেন কাহারও বা দন্তশূল, কাহারও বা দাঁতের গোড়ায় পুঁয বা রক্তস্রাব, কাহারও বা অকালে দাঁত শিথিল। অনেক সময় দন্তের পীড়া হইতে চোয়ালের হাড় পর্য্যন্ত পচিয়া যায় (Nicrosis of the Lower Jaw)। শুনা যায় আমেরিকায় দন্তরোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। আমেরিকা কর্ম্মবীরের স্থান। তথাকার লোকে ব্যবসা বাণিজ্য লইয়াই ব্যস্ত—আহারান্তে দন্ত পরিষ্কার করার দিকে তাঁহারা তত মন দিতে চাহেন না। ইহার ফলে আমেরিকার লোকে বড় দন্তরোগে ভুগিয়া থাকেন তবে যে দেশে মরুভূমি সেই দেশই উষ্ট্রের জন্মস্থান। আমেরিকাতেও দন্ত চিকিৎসার পরাকাষ্ঠা।

মাংসভোজীর দাঁত শীঘ্রই খারাপ হওয়া সম্ভব; কারণ মাংসের কুচি সহজে দুই দাঁতের মধ্যে আট্‌কাইয়া থাকে। বেশী পরিমাণে পান খাইলেও দাঁত খারাপ হইতে পারে। খয়ের লবঙ্গ যদিও দাঁতের পক্ষে উপকারী, পানের অন্যান্য মসলা কিন্তু অপকারী। রাজপুতানা প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা দাঁত বিন্ধ করিয়া "নাক ছাবির" মত একরূপ স্বর্ণালঙ্কার পরিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধারণা যে এই "দাঁতছাবি" পরিলে পরজন্মে তাঁহারা খুব মিষ্টভাষিণী হইবেন। এইরূপে দাঁত বিঁধিলে দন্তশূল হইতে পারে; এবং এই "দাঁতছাবী" যে আবর্জ্জনার আধার তাহার সন্দেহ নাই।

কোন কোন লোক পারদ ঘটিত ঔষধ ব্যবহার করিলে তাঁহাদের দাঁতের মাড়ি ফুলিয়া উঠে ও পাকিয়া যায় (mercurial stomatitis)। তাঁহাদের পারদ ঘটিত ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

এখন কিরূপে দন্ত পরিষ্কার রাখিতে হইবে। এদেশে দাঁতন করা চির-প্রসিদ্ধ। কলিকাতা প্রভৃতি সহরের লোক মাজন ব্যবহার করেন। তাঁহারা দাঁতন পছন্দ করেন না, এবং পছন্দ করিলেও ভাল দাঁতন পান না। এপ্রদেশে নিম ও আস্রাওড়ার দাঁতন প্রসিদ্ধ; কেহ কেহ বাবলার দাঁতনও ভাল বলিয়া থাকেন। এই সকল দাঁতনের উপকারিতা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ তাহাদের সরু সরু আঁইশ (ছিব্‌ড়ে) দাঁতের পার্শ্ববর্ত্তী ময়লা পরিষ্কার করে। দ্বিতীয়তঃ ইহাদের একপ্রকার কস্ আছে যাহা সঙ্কোচক ও কীটাণুনাশক। এই দ্বিতীয় প্রকার গুণের জন্য নিমের দাঁতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিমের যে কীটাণু বিনাশ করিবার ক্ষমতা আছে তাহা সকলেই অবগত। এখনও অনেকে নিমপাতার জল দিয়া ঘা ধুইয়া থাকেন। এবং নিমতৈল খোস্, চুলকানির উপর লাগান।

প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ তত্ত্বজ্ঞ গ্রেগ সাহেব আস্রাওড়ের দাঁতনের কথা তাঁহার গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন (Gregg's Indian Botany)। এইরূপ শাল, বাবলা, কচা (ভ্যারেণ্ডা) প্রভৃতি গাছের ডাল দাঁতনরূপে এদেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সহরের লোকে দাঁতনের অভাবে বুরুশ (Tooth brush)

ব্যবহার করিয়া থাকেন; তাহাতে দাঁত পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু দ্বিতীয় কাযটী (অর্থাৎ কীটাণুনাশ) সম্পাদিত হয় না।

দন্ত মাজন ব্যবহার করা মন্দ প্রথা নহে। তবে তাহাতে কেবল মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট করে এবং দন্তের শুভ্রতা বজায় রাখে, কিন্তু দাঁতের ফাঁকে যে ময়লা থাকে তাহা পরিষ্কার করিতে পারে না। তবে বেশী কড়া উপাদান বিশিষ্ট মাজন ব্যবহার করা উচিত নহে; কারণ তাহাতে দন্তনিকটস্থ নরমস্থান খারাপ হইয়া যাইতে পারে। খড়ির গুড়া, ঘুটের ছাই, তামাকের গুলের গুড়াও অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। পল্লী গ্রামে কেহ কেহ সরিসার তৈল দিয়াও দাঁত মাজিয়া থাকেন; তাহাতে কীটাণুবিনাশ ও দুর্গন্ধনাশ উভয়ই সাধিত হয়। বেশী মোটাদানা ওয়ালা জিনিষ মাজনরূপে ব্যবহার করা ভাল নহে, কারণ তাহাতে দন্তের Enamel বা কলাই শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারে। এখনও পল্লীগ্রামের অনেক বৃদ্ধ উই ঢিবির মাটির দ্বারা দাত মাজিয়া থাকেন যেহেতু উইমাটির দানা খুব ছোট অর্থাৎ করকরে নহে।

আমার মতে প্রাতে দাঁতন (কিম্বা বুরুশ্) এবং ভাল মাজন দুইই ব্যবহার করা উচিত, এবং প্রত্যেক বার আহারান্তে দাঁতন (বা বুরুশ্) ব্যবহার করা প্রয়োজন; তাহাতে দাঁতে ময়লা মোটেই জমিতে পারে না। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, আমি নিজে এইরূপে তিনবার দাঁত পরিষ্কার করণে অভ্যস্থ এবং ইহাতে আমি অনেক কালের দন্তরোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি।

প্রত্যহ সযত্নে পরিষ্কার করিয়া দন্ত পাটীকে "অমলশ্বেত, কুন্দকলিকাসন্নিভ" রাখা উচিত। এখনও পল্লীগ্রামের অনেক স্ত্রীলোকে দাঁতে তামাক পোড়া লাগাইয়া থাকেন, ইহাতে দাঁতের গোড়া শক্ত হয় শুনিয়াছি, কিন্তু তদ্দ্বারা দন্ত সব কাল হইয়া যায়। মিশি দাঁতে দেওয়ার প্রথা একরূপ লোপ পাইয়াছে। শুভ্র দন্ত যে মুখ শ্রীবর্দ্ধক তাহা কবিবরের এই দুই পংক্তি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়—

কি কায সিন্দুরে মাজি মুকুতার হার।
ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্ত পাঁতি তার॥ (ভারতচন্দ্র)

বায়ুর সহিত শরীরের সম্বন্ধ।

বায়ু বা প্রাণ।

জীবন ধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয়। মৎস্তেরা যেরূপ জল মধ্যে বাস করে আমরাও সেইরূপ বায়ু সমুদ্র মধ্যে বাস করি। আমরা বিনা আহারে তিন সপ্তাহ ও বিনাজলে তিন দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারি। কিন্তু বিনাবায়ুতে মাত্র পাঁচ মিনিট কালও প্রাণ রক্ষা করিতে পারি না। এই জন্যই বায়ুর অপর নাম প্রাণ।

নিশ্বাস প্রশ্বাস।

জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থায়, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা বায়ু সদা সর্ব্বদা আমাদের শরীরে যাতায়াত করিতেছে। শিশু ভূমিষ্ট হইবামাত্র ক্রন্দন করিয়া প্রথমেই বায়ু নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করে এবং আমরা শেষ প্রশ্বাস বায়ু পরিত্যাগ করিয়া জীবলীলা সমাধা করি।

বায়ুর উপাদান।

বায়ু মধ্যে চারিভাগ নাইট্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন নামক বাষ্প মিশ্রিত ভাবে বর্ত্তমান আছে। এতদ্ভিন্ন জলবাষ্প, কার্ব্বনিক এসিড, এমোনিয়া প্রভৃতি আরও কয়েকটী বাষ্পও বায়ু মধ্যে অল্প পরিমাণে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। এই সকল বাষ্প পরিমাণে অধিক থাকিলেই বায়ু দূষিত বলিয়া গণ্য হয়।

বায়ুর যাতায়াত।

দুই নাসারন্ধ্র দিয়া ফুসফুসের মধ্যে সদাসর্ব্বদা বায়ু প্রবেশ করিতেছে এবং বাহির হইয়া আসিতেছে। সাধারণতঃ মিনিটে ১৫ বার হইতে ১৭ বার বায়ু যাতায়াত করে। পরিশ্রম বা মানসিক উত্তেজনার সময় বায়ুর চলাচল দ্রুত হয়।

ফুস্‌ফুস্‌।

আমাদের বক্ষ গহ্বরের দুই পার্শ্বে দুইটী ফুস্‌ ফুস্‌ অবস্থিত। স্পঞ্জের ন্যায় ফুস্‌ফুস্‌ অসংখ্য কোষের সমষ্টি মাত্র। এই সকল বায়ুকোষ অতি ক্ষুদ্র, কেবল অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দৃষ্ট হয়। দুইটী ফুস্‌ফুসে ৭২৫ লক্ষ বায়ুকোষ আছে। এক একটী বায়ুকোষ অতি সূক্ষ্ম আবরণে আচ্ছাদিত ও অতি সূক্ষ্ম কৈশিক শিরাপুঞ্জ দ্বারা পরিবেষ্টিত। আমরা যখন নিশ্বাস গ্রহণ করি, তখন বাহিরের বায়ু এই সকল বায়ুকোষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে স্ফীত করে। বায়ুকোষ স্থিত অক্সিজেন রক্তের সহিত মিলিত হইলে সেই অক্সিজেন মিশ্রিত রক্ত (Oxygenated blood) ফুস্‌ফুস্‌ হইতে হৃৎপিণ্ডে গমন করে। পরে হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনী (Arteries) দ্বারা সমস্ত শরীরে পরিচালিত হয়।

শরীরস্থ-দহন ক্রীয়া।

আমাদের শরীর মধ্যে সদাসর্ব্বদা মৃদুদহন ক্রিয়া চলিতেছে এবং ইহার ফলে কার্ব্বনিক্‌ এসিড্‌ বাষ্প, জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ শরীর মধ্যে সর্ব্বদা উৎপন্ন হইতেছে। নিশ্বাস গৃহীত অক্সিজেন রক্তের সহিত সঞ্চালিত হইলে মাংসপেশী, স্নায়ু, মেদ, অস্থি ও শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি এবং রক্ত মধ্যস্থিত খাদ্যদ্রব্যের সারাংশ ঐ অক্সিজেন শোষণ করিয়া লয় এবং মৃদু দহন ক্রিয়া সংসাধিত করে।

রক্ত হইতে অক্সিজেনের অংশ অপসারিত হইলে, দহনক্রিয়া জনিত কার্ব্বনিক্‌ এসিড্‌ প্রভৃতি দূষিত পদার্থ রক্তের সহিত মিলিত হইয়া, হৃদপিণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া থাকে এবং সেখান হইতে ফুস্‌ফুস্‌ মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়া প্রশ্বাসের সহিত বহির্গত হইয়া যায়। এইরূপে শ্বাসক্রিয়া দ্বারা শরীরস্থ রক্ত সর্ব্বদাই শোধিত হইয়া থাকে।

কার্ব্বনিক্‌ এসিড্‌ বাষ্প—যে বায়ু আমরা নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করি তাহার প্রতি ১০,০০০ ভাগে ৪ ভাগ এবং যে বায়ু আমরা প্রশ্বাস রূপে পরিত্যাগ করি তাহার প্রতি ১০,০০০ ভাগে ৩০০ হইতে ৪০০ ভাগ কার্ব্বনিক

এসিড্ বাষ্প বিদ্যমান থাকে। প্রতি নিশ্বাসে আমরা বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুতে স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা শতগুণ অধিক কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প বাড়াইয়া দিতেছি। যে সকল স্বাভাবিক কারণে বায়ু সর্ব্বদা দূষিত হয় তাহার মধ্যে আমাদের শ্বাস ক্রিয়াই সর্ব্বপ্রধান।

কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প সোডাওয়াটার ইত্যাদির সহিত উদরস্থ হইলে কোনরূপ অনিষ্ট উৎপাদন করে না কিন্তু নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করিলে, রক্তের সহিত অক্সিজেন মিশ্রণের প্রতিবন্ধকতা সাধন করিয়া গৌণভাবে বিষের কার্য্য করে। বায়ু মধ্যে শতকরা ১ ভাগ কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প থাকিলে, উহা অধিকক্ষণ শ্বাস গ্রহণের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী। শতকরা ৫ ভাগ থাকিলে, শিরঃপীড়া ও দৈহিক অবসন্নতা উপস্থিত হয়। শতকরা ৮ বা ৯ ভাগ থাকিলে শ্বাস রোধ হইয়া মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

অর্গ্যানিক পদার্থ।

প্রশ্বাস বায়ুতে কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প ব্যতীত অর্গ্যানিক্ পদার্থও অধিক পরিমাণে থাকে। এই অর্গ্যানিক্ পদার্থ অতিশয় বিষাক্ত এবং শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী। প্রশ্বাসত্যক্ত অর্গ্যানিক পদার্থ বারম্বার নিশ্বাসের সহিত গৃহীত হইলে শরীর মধ্যে বিষ-লক্ষণ প্রকাশ পায়। কোন কোন স্থলে মৃত্যুও ঘটিতে দেখা যায়। এই অর্গ্যানিক পদার্থ বাষ্পাকারে থাকে বলিয়া উহা আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইলে এক প্রকার দুর্গন্ধ অনুভূত হয়।

যে গৃহে বায়ু চলাচলের উত্তম রূপ বন্দোবস্ত নাই, সেখানে কতকগুলি লোক কিছুক্ষণ থাকিবার পর, বাহির হইতে কেহ প্রবেশ করিলে একপ্রকার দুর্গন্ধ পাইয়া থাকেন। এই দুর্গন্ধ প্রশ্বাসত্যক্ত অর্গ্যানিক পদার্থ সঞ্চয়ের জন্যই অনুভূত হয়।

অর্গ্যানিক্ পদার্থ মিশ্রিত দূষিত বায়ু ক্রমাগত সেবন করিলে শিরঃপীড়া, শারীরিক অবসন্নতা ও বমনেচ্ছা উপস্থিত হয়। কাহারও গাত্রদাহ এবং জ্বর হইয়া থাকে। অনেক সময়ে রাত্রে সুনিদ্রা হইলেও প্রাতঃকালে উঠিয়া শরীরের স্ফূর্ত্তির অভাব, অত্যন্ত অলস্য ও শিরোবেদনা অনুভূত হয়, মনে হয় যেন কোনমতে ঘুম ছাড়িতে চায় না। রাত্রে রুদ্ধ গৃহের বিষাক্ত বায়ু সেবন করিলে অল্পদিনের মধ্যে

স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা। যে সকল কারণে আমরা অস্বাস্থ্য হইয়া আসিতেছি, রুদ্ধ গৃহে বাস তাহার একটী প্রধান কারণ।

ডাক্তার জর্জ্জ নিউম্যান্ মহোদয় তাহার কৃত Health of the State নামক গ্রন্থে অল্প কথায় বিবৃত করিয়াছেন—

Our individual moral responsibilities with regard to the air which we breathe are great. Our first duty is not to befoul the air any more than we can help; to keep all about us clean and pure inside our houses and our rooms free from dust; and not to allow accumulations of refuse outside.

(*Newman's Health of the State, p. 63.*)

ইহার ভাবার্থ :—যাহা আমরা নিশ্বাসরূপে গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করি, সেই বায়ু সম্বন্ধীয় আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য যথাসম্ভব বায়ু দূষিত না করা। আমাদের গৃহ ভ্যন্তর ধূলিকণাশূন্য ও গৃহসামগ্রী সমূহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা কর্ত্তব্য। পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি গৃহের বাহিরে স্তূপীকৃত হইতে দেওয়া উচিত নয়।

নিশ্বাসপ্রশ্বাস।

আমাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিশ্বাসপ্রশ্বাস সদাসর্ব্বদাই বহিয়া থাকে। সেজন্য তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার বিশেষ আবশ্যক বোধ হয় না। যেরূপেই হউক শ্বাসপ্রশ্বাস চালাইয়া আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তাহাদের দোষে নানারূপ ফুস্ফুস্ সম্বন্ধীয় পীড়া ও শারীরিক বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। যাহারা শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়মগুলি পালন করিয়া চলেন, তাহারা এই সকল রোগ মুক্ত

হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ করেন। সকলেরই যথাসাধ্য শ্বাসপ্রশ্বাসের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মগুলি পালন করা উচিত।

(১) নাসিকার মধ্য দিয়া সর্ব্বদা শ্বাস লওয়া উচিত।

যদি কেহ মুখ দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহার ফুসফুস্ সম্বন্ধীয় কোন পীড়া থাকিবার বা শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ বায়ুমণ্ডল ধূলিকণা পূর্ণ থাকে। আমরা সূর্য্যরশ্মির মধ্যে এই সকল ধূলিকণা স্পষ্টই দেখিতে পাই। ধূলিকণা সমূহ যদিও অতি ক্ষুদ্র তথাপি বায়ু চলাচলের পথ ও বায়ুকোষকে উত্তেজিত করে। এই সকল উত্তেজনা হইতে প্রদাহ উৎপন্ন হয়। যখন নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস গ্রহণ করি তখন এই সকল ধূলিকণা আমাদের নাসিকাগহ্বরের ঝিল্লির দ্বারা প্রতিরোধিত হয়। এইরূপে একত্রিত হইয়া ধূলিকণা সমূহ প্রশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া যায়। এবং যখন তাহারা ভিতরে উত্তেজক ভাবে ক্রিয়া করে, তখন আমরা হাঁচিয়া তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়া থাকি।

বায়ুমণ্ডলে রোগের বিষাক্ত জীবাণু এবং জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের পচনে উৎপন্ন দ্রব্য সকল বিদ্যমান থাকে। ইহারা ফুসফুস্ মধ্যে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপন্ন করে। যখন নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস গ্রহণ করা যায়, তখন এই সমস্ত বিষাক্ত দ্রব্য নাসারন্ধ্রেই আটকাইয়া যায়, সে জন্য শরীর মধ্যে কোন বিষাক্ত ক্রিয়া করিতে পারে না। আমরা পাকস্থলী পূর্ণ ও মুখ বন্ধ করিয়া সংক্রামক পীড়াগ্রস্তের নিকট নির্ভয়ে যাইতে পারি। বায়ুমণ্ডলের তাপ ফুসফুসের ভিতরের তাপ হইতে অনেক কম। আমরা নাসিকা মধ্য দিয়া যখন বায়ু টানিয়া লই, তখন সেই বায়ু উত্তপ্ত হয় এবং শরীরের মধ্যস্থিত তাপের অনুযায়ী হইয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে।

(২) পূর্ণ ও গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করা উচিত।

সাধারণতঃ আমরা অগভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি। ফুসফুসের সম্পূর্ণ পরিসর ব্যাপিয়া লই না। প্রত্যেকবার ফুসফুসের সম্পূর্ণ পরিসর ব্যাপিয়া নিশ্বাস লওয়াকে

যুক্তিযুক্ত নহে, ইহাতে অসুবিধা এবং ফুসফুস্ দুর্ব্বল হইতে পারে। কিন্তু অল্প অভ্যাস করিলে একবারে পূর্ণমাত্রায় না হইলেও আমরা গভীর (টানা) নিশ্বাস লইতে পারি।

(৩) সহজভাবে ও সম্পূর্ণরূপে প্রশ্বাস ত্যাগ করা উচিত।

সাধারণতঃ পূর্ণমাত্রায় নিশ্বাস লইলেই সম্পূর্ণরূপে প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু সকল সময়েই যে এইরূপ হইবে তাহা নহে। পূর্ণমাত্রায় নিশ্বাস টানিয়া অল্পে অল্পে প্রশ্বাস ত্যাগ করা যায়। কিন্তু সময়ে ইহা দ্বারা রোগ জন্মিতে পারে।

(৪) সকল সময়ে মস্তক সোজা রাখা উচিত।

যখন মস্তক সম্মুখে ঝুঁকিয়া থাকে, তখন ফুসফুসের উপরাংশ গুটাইয়া যায়। এই কারণে ফুসফুসের উপরাংশের ভিতর সম্যক্‌রূপ বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না এবং বিষাক্ত জীবাণু সকল অনায়াসে বাস করিবার ও বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ পায়। এই কারণে যক্ষ্মাকাশ রোগ প্রথমতঃ ফুসফুসের উপর ভাগেই আরম্ভ হয়।

ব্যায়াম।

ব্যায়ামের বর্ত্তমান অবস্থা।

সাধারণতঃ ব্যায়াম বলিলে আমরা কুস্তি, ড্যাম্বেল, ফুটবল, ক্রিকেট্ ও অন্যান্য শ্রমসাধ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা বুঝিয়া থাকি। যাহারা দুর্ব্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্য তাহারা দুর্ব্বলতার জন্য ব্যায়াম করেন না। কেবল বলবান, সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তিগণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সর্ব্বদা কাজে ব্যাপৃত থাকেন তাঁহারও সময়াভাব বশতঃ ইহা হইতে বিরত থাকেন। অনেকে লাজুক স্বভাব বশতঃ ব্যায়াম করেন না। সাধারণতঃ ব্যায়াম খেলোয়ার (Athelet) ও পালোয়ান ব্যক্তিদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে।

ব্যায়ামের উপর আমাদের শরীর ও মনের স্বস্থতা নির্ভর করে। যদি যথেষ্ট পরিমাণে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা না করা যায় তাহা হইলে মাংসপেশী ও মাংসতন্তু সকল দুর্ব্বল ও শিথিল হইয়া যায় এবং আমাদের শরীর মধ্যে যে সহস্র সহস্র ক্রোশ ব্যাপী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধমনী ও শিরা সকল রহিয়াছে তাহারাও অকর্ম্মণ্য এবং দুর্ব্বল হয়।

ব্যায়াম না ক্ষতি।

শরীরে স্বাভাবিক ক্ষয় ক্রিয়া প্রতিনিয়তই হইতেছে। এই ক্ষয় ক্রিয়া জনিত পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি প্রতিনিয়তই স্থানান্তরিত হইয়া নূতন তেজস্কর পদার্থ দ্বারা পূর্ণ হইলে, শরীর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সবল অবস্থায় থাকে। মনে হইতে পারে দৈনন্দিন কাজ কর্ম্ম কি আমাদের শরীরের প্রত্যেক অংশকে কার্য্যক্ষম রাখে না? সাধারণতঃ আমাদের পান, ভোজন এবং চালফেরা দ্বারা কতকগুলি মাংপেশী চালিত হয় কিন্তু শরীরের প্রত্যেক অংশের চালনা হয় না। এই কারণে অনেকের শরীরের অংশ বিশেষে মেদ বৃদ্ধি হইয়া ভুঁড়ি হইয়া থাকে। সাধারণ দৈনিক ক্রিয়ায় আমাদের কোনরূপ বিশেষ ভাবে চিত্ত আকর্ষিত হয় না বলিয়া মাংসপেশী সমূহ চালিত হয় মাত্র কিন্তু তাহাদের সম্পূর্ণ ক্রিয়া হয় না।

যখন আমরা চিত্ত সংযোগের সহিত কোন মাংসপেশী আকুঞ্চিত করি তখন তাহার মধ্যস্থিত সমুদয় রক্ত বিদূরিত হয় এবং সেই সঙ্গে ক্ষয়জনিত পদার্থ সমূহকে লইয়া যায়। পরে যখন শিথিল করি তখন ধমনী হইতে টাট্‌কা রক্ত প্রবাহিত হয় এবং নূতন পুষ্টিকর পদার্থ বহন করিয়া ধ্বংসের পরিপুরণ করে। প্রকৃতির নিয়ম অতি সুন্দর। যে মুহূর্ত্তে পরিচালন জন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহার পর মুহূর্ত্তেই তেজস্কর ও পুষ্টিকর পদার্থ দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহ বর্দ্ধিত ও বলপ্রাপ্ত হয়।

ব্যায়ামের আবশ্যকতা।

যদি এই পরিচালন ক্রিয়া কতিপয় মাংসপেশীতে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে

কেবল সেই সকল মাংসপেশীই বৰ্দ্ধিত হয়। এইরূপে কর্ম্মকারের হস্তের গুলি এবং সাইকেল আরোহীর পায়ের গোচ বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শরীরকে সম্পূর্ণরূপে বলবান করিতে হইলে প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে চিত্ত সংযোগ সহকারে ব্যায়াম দ্বারা বৰ্দ্ধিত করিতে হইবে।

যাহারা সর্ব্বদা আপন আপন নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন, তাহারা কতকগুলি মাংসপেশীর বর্দ্ধন ক্রিয়া সম্পাদন করেন। কিন্তু তাহাদের শরীরের অপর অংশগুলি নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। সেই জন্য প্রত্যেকেরই শরীরের সকল অংশকেই নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম দ্বারা বৰ্দ্ধিত ও বলবান করা কর্ত্তব্য, প্রত্যহই কিছু সময় ব্যায়াম করা আবশ্যক।

ব্যায়াম সকলেরই করা উচিত। ৫ বৎসরের বালক হইতে ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত শরীরের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন।

ব্যায়াম সকলের কর্ত্তব্য।

নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা ক্ষুধা বৰ্দ্ধিত হয়, উত্তমরূপে পরিপাক হয়। শরীর পুষ্ট ও বলবান হয়। স্নান ও গাত্রমার্জ্জন দ্বারা যেরূপ বাহ্যিক মলিনতা দূর হয় সেইরূপ নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা শরীরাভ্যন্তরিক ক্লেদ সমূহ পরিষ্কৃত হয়। মাংসপেশী চালনা দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে খাদ্যের দ্বারা পুনরায় তাহা পূর্ণ হয়। ব্যায়াম দ্বারা জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয়, এবং খাদ্য দ্রব্য হইতে সারাংশ সংগ্রহ করিয়া রক্ত দ্বারা ধ্বংস সকল পুষ্ট করিবার জন্য প্রেরণ করে। এই সকল কার্য্যের জন্য অধিক পরিমাণ অক্সিজেনের আবশ্যক হয়। ব্যায়ামের সময় নিশ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া অধিক বার হইয়া অক্সিজেনের অভাব দূর করে। বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় কি প্রকারে সকলে অনায়াসে ব্যয়াম অভ্যাস করিতে পারেন তাহা ধারাবাহিকক্রমে বর্ণিত হইবে।

ম্যালেরিয়া।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষাল, এল্, এম্, এস্, লিখিত—

আমাদের দেশে জ্বরে কষ্ট পায় নাই এরূপ লোক অতি বিরল। কিন্তু জ্বর রোগ একরূপ নয়, নানারূপ। তন্মধ্যে এক রকমের জ্বরকে ম্যালেরিয়া জ্বর বলে। এই জ্বর আবার একপ্রকার নহে, কোনও জ্বর একদিন অন্তর হয়, কোনও জ্বর দুইদিন অন্তর হয়, আবার কোনও জ্বর প্রত্যহ হয়, কোনও মতে ছাড়িতে চাহে না। প্লীহা ও যকৃৎ বৰ্দ্ধিত হয় এবং সময়ে ভালরূপ চিকিৎসা না হইলে রোগী অচিরাৎ অনন্তে মিশিয়া যায়।

এই জ্বরের জন্য কত লোক কালের কবলে পতিত হইয়াছে, কত শত সংসার ছারখার হইতেছে, কত গ্রাম শ্মশানে পরিণত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ—প্রকৃত কারণ—মশার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। কোন কোন জায়গায় সময়ে সময়ে উহাদের সংখ্যা এত বেশী হয় যে, সন্ধ্যা বেলাতেও বসিতে হইলে, মশারি খাটাইয়া বসিতে হয়। বিশেষতঃ বর্ষাকালে ইহাদের উপদ্রব অত্যন্ত অধিক হয়। বিশেষ মনোযোগ করিয়া না দেখিলে, সব মশা গুলিই এক রকমের বোধ হয়; কেবল কোনটী বড় কোনটী বা ছোট ইহা ছাড়া, তাহাদের যে কোন বিশেষত্ব আছে, তাহা কেহই বোধ হয় লক্ষ্য করে না। বিশেষ মনোযোগ করিয়া পরীক্ষা করিলে, বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাদের মধ্যে দুই রকমের মশা আছে। বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিলে, বুঝা যায় যে, এক প্রকার মশার কেবল মাত্র হুল আছে। এই হুলটী মশার শরীরের সহিত সমকোণ ভাবে থাকে। সচরাচর যে সকল মশা দেখা যায়, তাহারা ঐ জাতীয়। ইহাদিগকে সাধারণ মশা বলা যাইতে পারে। আর এক প্রকার মশা আছে, তাহাদের সাধারণ মশার ন্যায় হুল আছে, কিন্তু তাহা ছাড়া সেই হুলের দুই পাশে দুইটী শুঁড় থাকে, আর হুলটী সাধারণ মশার ন্যায় শরীরের সহিত সমকোণ ভাবে না থাকিয়া সরল ভাবে অবস্থান করে। এই মশাগুলিই ম্যালেরিয়া রোগীর শরীর হইতে ম্যালেরিয়ার জীবাণুগুলি সুস্থ ব্যক্তির শরীরে লইয়া যায়। যখন ঐ

জাতীয় মশা ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়ায়, তখন রোগীর রক্তের সহিত ম্যালেরিয়ার জীবাণুগুলি মশার পেটের ভিতর প্রবেশ করে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরে যখন ঐ মশা কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ায়, তখন সেই জীবাণুগুলি মশার হুলের ভিতর দিয়া দেহে প্রবেশ করে, এবং রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। ইহার পর ঐ জীবাণুগুলি সেই সুস্থ ব্যক্তির রক্তের ভিতরে বাস করিতে থাকে এবং একটী হইতে দুইটী, দুইটী হইতে চারিটী, এইরূপে ক্রমাগত উহাদের সংখ্যা বাড়িয়া যায়; এইরূপে বাড়িয়া বাড়িয়া ইহারা রক্তকে দূষিত করে এবং তাহা হইতেই ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি হয়। পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই মশা কিরূপে উৎপন্ন হয়, আর কিরূপেই বা ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবগুলি উহাদের শরীরে প্রবেশ করে। নর্দ্দামা কিংবা রাস্তার ধারে হাঁড়ি কলসীতে জল জমিয়া থাকিতে সকলেই দেখিয়াছেন। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার ভিতরে ছোট ছোট পোকার ন্যায় জীব জন্মিয়াছে, আর সেগুলি আপনা আপনি উপরের বা নীচের দিকে নড়িয়া বেড়াইতেছে, এবং আরও মনোযোগের সহিত দেখিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তন্মধ্যে কতকগুলি জলের নীচের দিকে মুখ করিয়া বেড়ায় ও অন্য গুলির অপেক্ষা অধিক গভীর জলে থাকে; আবার কতকগুলি জলের উপরে মুখ উঁচু করিয়া চলা ফেরা করে ও অল্প গভীর জলে ভাসিয়া বেড়ায়। এইগুলি দেখিতে ঠিক মশার ন্যায়, কেবলমাত্র পাখা হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে এইগুলি মশার ডিম, এইগুলিই বড় হইলে মশা হয়। তন্মধ্যে যেগুলি জলের উপরে মাথা উঁচু করিয়া থাকে, সেইগুলিই ম্যালেরিয়ার মশা। এই মশাগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জ্বরগ্রস্ত রোগীকে কামড়াইলে, রোগীর রক্তের সহিত ম্যালেরিয়ার জীবাণু হুলের ভিতর দিয়া উহাদের পেটের ভিতরে প্রবিষ্ট হয় এবং সেখানে থাকিয়া ক্রমে সংখ্যায় বাড়িয়া যায়; পরে ঐরূপ মশা যখন সুস্থ লোককে কামড়ায়, তখন তাহাদেরও ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। এইরূপে মশার দ্বারা ম্যালেরিয়া জ্বর ক্রমে ছড়াইয়া পড়ে।

গৌণ কারণ—বর্ষাকালে কিংবা বর্ষার শেষে, আমাদের দেশে যখন স্থানে স্থানে অল্প জল জমিয়া থাকে, অথবা খুব বেশী বৃষ্টি হইয়া, যখন বিল, ডোবা

প্রভৃতিতে জল বাড়ে, এবং বাড়ীর চারি ধারে বন জঙ্গল বেশী হয়, কিংবা বাড়ী ঘর সর্ব্বদা স্যাঁতসেঁ্যতে হইয়া থাকে, তখনই অধিক লোকের ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। ইহার কারণ প্রথমতঃ এই যে, ঐরূপ অবস্থায় চতুর্দ্দিকে জল বদ্ধ হইয়া থাকাতে, ম্যালেরিয়ার মশাগুলি ডিম পাড়িবার সুবিধা পায়; সুতরাং অসংখ্য ম্যালেরিয়ার মশা উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ জলজমা জায়গায় ও বর্ষার জলে পূর্ণ ঐইরূপ অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করার জন্য লোকের শরীর ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। দুর্ব্বল অবস্থায় ম্যালেরিয়ার মশাগুলি কামড়াইলে, লোক অতি সহজেই জ্বরগ্রস্থ হয়। এই দুই কারণে দেখা যায় যে বাটীর নিকটে বদ্ধজল এবং বনজঙ্গল থাকিলে, ম্যালেরিয়া জ্বর বৃদ্ধি পায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ এক প্রকার ক্ষুদ্র জীবাণু, তাহারা মশার সাহায্যে রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং তাহা হইতেই জ্বর হয়। মশাগুলি জলে জন্মায়, বিশেষতঃ যে স্থলে অল্প অল্প জল জমিয়া থাকে, সেই জায়গা গুলিতেই মশা উৎপন্ন হইবার বিশেষ সুবিধা হয়।

ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ।—প্রথমে শরীরটা একটু ম্যাটী ম্যাটী করে, যেন আড়ামোড়া ভাঙ্গে, চোখ মুখ ছল ছল করে, রৌদ্রে বসিয়া থাকিতে ভাল লাগে। এইরূপ হইলেই বুঝিতে হইবে যে, জ্বর আসিবার সম্ভাবনা। কিছু পরেই গা কাঁটা দিয়া উঠে। সর্ব্বশরীর অপেক্ষাকৃত রক্তহীন হয় সঙ্গে সঙ্গে খুব শীত করে, এরূপ কম্পও হইতে পারে যে, দুই তিন খানা লেপেও শীত ভাঙ্গে না। এইরূপে প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া যায়। মাঝে মাঝে বমিও হইতে পারে। তাহার পরে আর শীত থাকে না, মুখ খুব্ তম্‌তমে হয়, গা গরম হয়, এমন কি জ্বর ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। তখন আর গায়ে লেপ রাখা যায় না, খুব মাথা ধরে, কখন কখন বমি হয়, রোগী গায়ের জ্বালাতে ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পিপাসা হয়। বেশী জল খাইলে, বমিও বেশী হয়। এইরূপে সাধারণতঃ তিন ঘণ্টা হইতে ছয় ঘণ্টা কাটিয়া যায়, পরে জ্বরের প্রকোপ কমিতে থাকে ও অল্প অল্প ঘাম হয়। ক্রমে জ্বর ছাড়িবার সময় অত্যন্ত ঘাম হয়। মাথাধরা ও মাথার যন্ত্রণা কমিয়া যায়, গা

ঠাণ্ডা হয় ও ঘুম আসে এবং সচরাচর বার ঘণ্টার মধ্যে রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করে। এইরূপে দুই চারি দিন ভুগিয়া রোগী হয় ত আপনা আপনি ভাল হয়, নতুবা তাহার প্রত্যহ জ্বর হইতে থাকে ; শেষে জ্বর আর ছাড়ে না, ২৪ ঘণ্টা জ্বর ভোগ হয়, প্লীহা ও যকৃত বাড়ে, রোগীর চক্ষু হল্‌দে ও চেহারা রক্তহীন হইয়া যায়, হাত পা ফোলে, বুকের ভিতর ধড়ফড় করে, এবং ভালরূপ চিকিৎসা না হইলে রোগী মরিয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে এমন খুব কম লোক আছে যে, এই রোগে অন্ততঃ একবারও না একবার ভুগিয়াছে ; এমন কি, ম্যালেরিয়া জ্বরে গ্রামকে গ্রাম একেবারে উৎসন্ন ও জনশূন্য হইয়া গিয়াছে।

ইহা দ্বারা উপলব্ধি হইতে পারে যে ম্যালেরিয়া কিরূপ ভয়ানক রোগ। এই রোগ হইলেই ভালরূপ চিকিৎসা করান উচিত। পরন্তু যাহাতে এই রোগ না হয় তাহার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য।

ম্যালেরিয়া জ্বর কয় প্রকার?—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে ম্যালেরিয়া জ্বর অনেক প্রকার ;—(১) যে জ্বর প্রত্যহ হয়, আর ছাড়িয়া যায়, তাহাকে প্রাত্যহিক (Quotidian) জ্বর বলে ; (২) যে জ্বর একদিন অন্তর হয় তাহাকে একদিন অন্তর বা দ্ব্যাহিক জ্বর বলে (Tertian) ; (৩) আর এক প্রকার জ্বর আছে, যাহা দুই দিন অন্তর হয় তাহাকে দুই দিন অন্তর বা ত্র্যাহিক জ্বর বলে (Quartan) ; আর (৪) যে জ্বর পুরাতন হইয়া রোজ হয়, ছাড়ে না, প্লীহা যকৃৎ বাড়ে, রোগী অত্যন্ত কৃশ হইয়া পড়ে, তাহাকে পুরাতন ম্যালেরিয়া (Malarial Cachexia) বলে।

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়।—বাড়ীগুলি সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ঘরের ভিতর সকল জায়গায় যাহাতে আলো যায় ও হাওয়া খেলে, তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। ঘরের কোনও স্থলে যেন নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার না থাকে, তাহা হইলে, তথায় মশা জমিয়া থাকিবে। ঘরের মেজেগুলি যেন পরিষ্কার খট্‌খটে থাকে, কোনও মতে যেন স্যাঁতসেঁতে না হয়। বাড়ীর চারিপাশে অন্ততঃ কুড়ি পঁচিশ হাত জায়গার মধ্যে কোনও অপরিষ্কার কিংবা

পচা জিনিষ না থাকে। বাড়ীর চারিধারে কোন রকম বন জঙ্গল জন্মিতে দেওয়া উচিত নয়। যাহাতে অল্প অল্প জল জমিয়া থাকে এরূপ গর্ত্ত কিংবা ডোবা যেন বাড়ীর নিকটে না থাকে; থাকিলে, সে গুলি যেমন করিয়া হউক বর্ষার পূর্ব্বেই বুজাইয়া দেওয়া উচিত। কেননা, সেগুলি ভয়ানক বিপজ্জনক। ইহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই রকম গর্ত্ত বা ডোবাতেই ম্যালেরিয়ার মশা জন্মায়। আমাদের দেশের লোকের আর একটী খারাপ অভ্যাস আছে; তাহা এই যে, বাড়ীর সম্মুখে একটী গর্ত্ত খোঁড়া থাকে; তাহাতে গোবর এবং বাড়ীর সকল রকমের আবর্জ্জনা ফেলা হয়। কদাচ এরূপ করা উচিত নয়, কেননা বর্ষাকালে সেগুলিতে জল জমিয়া মশার বাসস্থান হয়। যদি এরূপ গর্ত্ত খোঁড়ার দরকার হয়, তবে বাড়ী হইতে অন্ততঃ পঞ্চাশ ষাইট হাত দূরে উত্তর পূর্ব্ব কোণে খুঁড়িয়া এবং বর্ষার পূর্ব্বে যেমন করিয়া হউক, গর্ত্তটী একেবারে জমির সঙ্গে সমান করিয়া বুজাইয়া দিতে হইবে। বাড়ীর নর্দ্দামাগুলি এমন ভাবে ঢালু হইবে, যেন বাড়ীর সমস্ত জল সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে এবং একটী গভীর পুষ্করিণী অথবা একেবারে বিল কিংবা নদীতে গিয়া পড়ে। হাঁড়ি, সরা প্রভৃতি পাত্র ফেলিবার সময় সেগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত; তাহা না করিলে, বর্ষাকালে ঐ পাত্রগুলিতে জল জমিয়া মশার বাসস্থান হইয়া থাকে। যে সকল নর্দ্দামা কিংবা ডোবার জল জমিয়া মশা জন্মিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হইবে, সেই নর্দ্দামা বা ডোবাগুলিতে কেরোসিন তৈল ছড়াইতে হইবে; বড় বড় পুষ্করিণীতে দিলেও কোন ক্ষতি নাই; পানীয় জলের পুষ্করিণীতে কেরোসিন তৈল দিলে অসুবিধা হইতে পার, কিন্তু যেখানে একটীর অধিক পুষ্করিণী আছে তথায় পালাক্রমে দিলে কোন অসুবিধা হইবে না। রাত্রিতে বিশেষতঃ বর্ষাকালে কখনও মশারি না খাটাইয়া শোওয়া উচিত নয়। রাত্রিতে বাহিরে যাইতে হইলে, সর্ব্বদা একটী জামা গায়ে দিয়া যাইতে হইবে। আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া পাঁচ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়া উচিত। আমি শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে সকলকে সপ্তাহে অন্ততঃ পাঁচ গ্রেণ হইতে দশ গ্রেণ কুইনাইন

খাইতে উপদেশ দিই। এইরূপ করিলে, ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি পাইতে পারা যায়।

জ্বর হইলে কি করা কর্ত্তব্য?—জ্বর হইবার পূর্ব্বে যখন গা মাটি মাটি করে তখন একেবারে পাঁচ গ্রেণ কুইনাইন খাইলে বড়ই ভাল হয়। জ্বর হইলে পিপাসার সময় জল দিবে। জল দেওয়া খুব ভাল। দাস্ত পরিষ্কার না থাকিলে, আধ ছটাক (এক আউন্স) রেড়ির তৈল (ক্যাষ্টারঅয়েল) খাইতে দিবে। দাস্ত পরিষ্কার হইলে ও জ্বর ছাড়িয়া গেলে, পাঁচ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন প্রত্যেক দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়া উচিত। যাহাতে জ্বর আসিবার পূর্ব্বে তিনবার কুইনাইন খাওয়া হয় তাহা করিবে। এইরূপ করিলে বোধ হয় আর জ্বর আসিবে না; যদি আসে তবে অল্পই হইবে এবং পরদিন এইরূপ করিলে আর জ্বর আসিবে না; কিন্তু সকলকে বিশেষ করিয়া বলিতেছি যে, জ্বর একেবারে ছাড়িলেও অন্ততঃ একমাস কাল প্রতিদিন ২ গ্রেণ করিয়া দুইবারে চার গ্রেণ কুইনাইন খাইতে হইবে। এইরূপ করিলে আর জ্বর হইবে না। যাহারা ম্যালেরিয়াপ্রধান দেশে বাস করে, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, জ্বরগ্রস্ত লোকের জ্বর ছাড়িলে এবং জ্বরের পরে ভাত খাইতে আরম্ভ করিলে, তাহারা আর কুইনাইন খায় না, কিন্তু এইরূপে প্রায়ই আবার জ্বরে পড়ে। আমার উপদেশ মত একমাস কাল নিয়মিত ভাবে কুইনাইন খাইলে, একদিন অন্তর ও দুইদিন অন্তর জ্বর হইতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে। যদি চিকিৎসার অভাবে ও বুদ্ধির দোষে জ্বর পুরাতন হইবার সম্ভব হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বাসস্থান ত্যাগ করিয়া অন্য কোন ম্যালেরিয়াশূন্য জায়গায় যাইয়া বাস করা এবং সুযোগ্য চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করান উচিত।

আর একটী বিশেষ কথা সকলের জানা উচিত; সেটী এই যে ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে (Thphoid) টাইফয়েড নামে এক প্রকার জ্বরের পার্থক্য ঠিক করিতে সাধারণ লোকের প্রায়ই ভুল হয়, এবং অনেক সময়ে ম্যালেরিয়াবোধে ভুলক্রমে টাইফয়েড রোগীকে খুব বেশী কুইনাইন খাইতে দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় না।

জ্বর টাইফয়েড্ কি ম্যালেরিয়া ইহা জানা অত্যন্ত আবশ্যক; কেননা, এই দুইটীতে গোলমাল হইবার সম্ভাবনা আছে।

যদি জ্বর প্রত্যহ বাড়িতে থাকে, খুব মাথা ধরিয়া থাকে, পাতলা দাস্ত হয়, গায়ে কোনও রকম রাঙ্গা দাগ বাহির হয়, পেট ফাঁপা থাকে, রোগী প্রলাপ বকে, প্লীহা সামান্য বাড়ে ও রোগী আপনাকে বিশেষ দুর্ব্বল বোধ করে, অল্প অল্প কাশী থাকে এবং রোগী এক প্রকার উদাসীনভাবে চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রায়ই রোগটী টাইফয়েড্ বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে। টাইফয়েড্ বলিয়া সন্দেহ হইলে খুব ভাল চিকিৎসককে দেখান উচিত। এরূপ রোগীকে চিকিৎসকের উপদেশ ব্যতীত কদাচ কুইনাইন দেওয়া উচিত নয়।

আমাদের দেশে আর একপ্রকার জ্বর আছে, তাহাও অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং প্রায়ই প্রাণঘাতী; তাহাকে কালাজ্বর বলে। ইহাতে প্রথম প্রথম ম্যালেরিয়ার মতই জ্বর হয়, কিন্তু প্লীহা ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে; শেষে প্লীহা এত বাড়ে যে, একেবারে পেট জুড়িয়া যায়। রোগী খুব দুর্ব্বল হয়, সঙ্গে সঙ্গে যকৃৎ বাড়ে। চেহারা অত্যন্ত খারাপ হয়। পেট্‌টা খুব বাড়ে এবং সময়ে সময়ে প্লীহা কামড়াইয়া অতিশয় কষ্ট দেয়। এ রোগও এক রকম জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাকে লীস্ম্যান-ডোনাভান্ জীবাণু (Leishman-Donavan Bodies) কহে। এ রোগ প্রায় চিকিৎসকের সাধ্যের অতীত ইহাকে পুরাতন ম্যালেরিয়া হইতে পৃথক বলিয়া ঠিক করা অতিশয় কঠিন, তবে কুইনাইনে ইহার কোনও উপশম হয় না এবং প্লীহা ফুঁড়িয়া রক্ত পরীক্ষা না করিলে, কোনও মতে রোগটাকে কালাজ্বর বলিয়া ঠিক করা যায় না। হস্ত হইতে রক্ত পরীক্ষা করিলেও অনেক সময়ে কতকটা ঠিক করা যায় বটে, কিন্তু চিকিৎসক ভিন্ন অন্য কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। এরূপ জ্বর হইলে রোগীকে একজন ভাল চিকিৎসকের দ্বারা প্রথম হইতেই চিকিৎসা করাইতে হইবে। দেরি হইলে, সরিবার আশা খুব কম।

বিবিধ সংগ্রহ।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান কি ?—যে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা শরীরকে সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত করিতে, শারীরিক ক্ষয়ের গতি হ্রাস করিতে, জীবনকে অধিকতর তেজস্কর এবং মৃত্যুকে দূরে অপসারিত করিতে পারি তাহাই স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

—o—

স্বাস্থ্যতত্ত্ব জ্ঞানের আবশ্যকতা।—সার আর, সি, হার্ট, এম, ডি, সি, সত্যই বলিয়াছেন কেবলমাত্র স্বাস্থ্যতত্ত্বের প্রাথমিক জ্ঞান অনেক কষ্টের হ্রাস করিয়াছে। লোকে তাহার প্রতিবেশীবর্গের অজ্ঞতা ও অসাবধানতার জন্য রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই জন্য প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মাবলী প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

—•—

ইউরোপে স্বাস্থ্যরক্ষা।—মনুষ্য প্রথমে বন্য পশ্বাদি হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। ইহাই সভ্যতার প্রথমাবস্থা। বর্ত্তমানে মনুষ্যগণ জীবাণু ও ঔদ্ভিদাণুর আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে শিক্ষা করিতেছে। শীঘ্রই এমন দিন আসিবে যখন ইউরোপের বার্লিন, লণ্ডন, এবং পারিস প্রভৃতি নগরীতে ডিপথিরিয়া, টাইফয়েড, স্কারলেট জ্বর, কলেরা ও যক্ষ্মাকাশ রোগে আর কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না। এক্ষণে এই সকল স্থানে সর্প কিম্বা হিংস্র জন্তুর দংশনে কোন লোকের মৃত্যু হয় না।

আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ লোক সর্প, কুকুর ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর দংশনে প্রতিবৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা নিজ চেষ্টা ও অধ্যবসায়

ফলে এই সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাপন করিতেছে। আমাদিগেরও এই সকল বিষয় শিক্ষা ও চেষ্টা করা অতি আবশ্যক।

প্লেগ নিবারণের উপায়—সার্জ্জন জেনারেল ডাক্তার লিউকিস্, ১৯১০ সাল ৫ই মার্চ্চ তারিকে, বড়লাট সভায় বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "স্বাস্থ্য রক্ষার কারণে কেবল অজস্র অর্থব্যয় করিলেই প্লেগ প্রতিরোধিত হইবে না। গার্হস্থ্য শরীর পালনই প্রতিরোধের প্রধান উপায়। প্লেগ প্রতিরোধ করিতে হইলে সাধারণে যাহাতে নিজ বাসভবনের চতুঃপার্শ্বে আবর্জ্জনার স্তূপ রাখিয়া ইঁদুরের বাসা নির্ম্মাণের সুবিধা না করে সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে। খাদ্যদ্রব্যাদির পরিত্যক্ত অংশ বাটীর নিকটে নিক্ষিপ্ত না হয় সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাহাতে ইঁদুর গৃহপালিত পশুর ন্যায় হইয়া না পড়ে, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। অধিকাংশ ভারতবাসীরই ভবনে ইঁদুর গৃহপালিত প্রাণীস্বরূপ হইয়া আছে। কিন্তু ইউরোপীয়গণের ভবনে এরূপ নহে। আমার মতে এই আত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে ভারতবাসীদিগকে শিক্ষিত করা কর্ত্তব্য। অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা গিয়াছে যে স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য অজস্র অর্থ ব্যয়ে প্লেগ নিবারণের প্রায় কোনই সুবিধা হয় না। সাধারণকে উপরোক্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়াই অধিকতর উত্তম উপায়।"

আস্বাদ গ্রহণ—আমাদের জিহ্বার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ গ্রহণের জন্য নিয়োজিত আছে। জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা আমরা মিষ্ট ও লবণাক্ত স্বাদ গ্রহণ করি। পশ্চাদ্‌ভাগ দ্বারা তিক্ত স্বাদ অনুভূত হয়। দুই পার্শ্ব দ্বারা অম্লের আস্বাদ পাওয়া যায়। জিহ্বার মধ্যস্থলের কোন স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা নাই। আমরা কেবল জল মিশ্রিত দ্রব্যের আস্বদ পাইয়া থাকি। জিহ্বা শুষ্ক হইলে, অতি সুস্বাদু শুষ্ক দ্রব্যেরও আস্বাদ পাওয়া যায় না। অতি উষ্ণ ও অতি শীতল পানীয় সেবনে জিহ্বার স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি অতি উষ্ণ কি অতি শীতল পানীয় সেবনের পর কুইনাইনের কোন স্বাদ পাওয়া যায় না। এই উপায় অবলম্বনে

বিস্বাদ ঔষধ সেবনের অনেক সুবিধা হইতে পারে। লঙ্কা, সরিষা, পেঁয়াজ ও ভিনিগার প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্যাদির দ্বারাও জিহ্বার স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

হাইতোলা—ভাল করিয়া হাই তুলিলে সমস্ত শরীরের উপকার হয়। বিশ্রামের আবশ্যক হইলে আমরা হাই তুলিয়া থাকি। অনেকে মনে করেন যে ঘুম পাইলেই হাই উঠে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ক্লান্তি হইলে হাই উঠে।

হাই আসিলে, ভাল করিয়া হাই তোলা উচিত। অভদ্রতা মনে করিয়া চাপিয়া থাকা অন্যায়। অন্ততঃ মুখে হাত চাপা দিয়াও হাই তোলা কর্ত্তব্য। হাই তুলিবার সময়, যতদূর পারা যায় শরীর বিস্তৃত করা ভাল। এইরূপ করিলে মাংসপেশী সকল বিস্তৃত হইয়া বিশ্রাম পায়।

——o——

মনুষ্য শরীরে সুরার কার্য্য—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিমস্ উডহেড মনুষ্য শরীরের তাপের উপর অল্পমাত্রা সুরার ক্রিয়া সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা মদ্যপান নিবারণী সভায় বক্তৃতা করেন। তিনি শরীরাভ্যন্তরের ও ত্বকের তাপ পৃথক্‌ভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অর্দ্ধ আউন্স সুরা জলের সহিত মিশাইয়া সেবনের পর ত্বকের তাপের বৃদ্ধি এবং আভ্যন্তরিক তাপের হ্রাস হইয়াছিল।

ইহা শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের নিকট নূতন নহে। কারণ বহুকাল হইতে সুরাবিশিষ্ট পানীয় সেবনের পর ত্বকের রক্তশিরা সমুহ বদ্ধিত হইতে দেখা যায়। এই প্রকারে অধিক পরিমাণ রক্ত ত্বকের উপর চলাচল করায়, তাপের বৃদ্ধি হয় এবং শরীরাভ্যন্তরে রক্ত চলাচলের হ্রাস বশতঃ সেখানে তাপের হ্রাস হয়। সর্দ্দি বোধ হইলে অনেকে হুইস্কি ও সোডাওয়াটার পান করিয়া শরীরকে গরম করে। যদিও একদিকে ত্বকের তাপ বৃদ্ধি হয় কিন্তু অপরদিকে আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির আবশ্যকীয় রক্ত পরিমাণ হ্রাস বশতঃ সহজেই সর্দ্দি লাগিবার ও প্রদাহ জন্মিবার সম্ভাবনা। এইপ্রকারে ব্রনকাইটিস্, নিউমোনিয়া ও মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ ইত্যাদি রোগ উৎপন্ন হয়. যদিও ইহা অনেক দিন হইতে জানা ছিল তথাপি অধ্যাপক উডহেড় পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্টই দেখাইয়া দিলেন।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্"।

প্রথম বর্ষ। } জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ সাল { দ্বিতীয় সংখ্যা।

স্বাস্থ্য।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত এম, বি, লিখিত :—

স্বাস্থ্য কাহাকে বলে ?—সাধারণতঃ আমরা রোগের অভাবকেই স্বাস্থ্য বলিয়া থাকি। অনেকে বলেন "আমার শরীরে কোনরূপ রোগ নাই, কিন্তু কোন্ কার্য্যে আমি অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে পারি না।" আবার অনেকে বলেন "রোগ নাই রোগা হইয়া যাইতেছি।" তাঁহাদিগকে আমরা সুস্থ বলিতে পারি না। গত বৎসর এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া বলেন, যে তিনি বড় দুর্ব্বল বোধ করিতেছেন, কিন্তু কোন রোগের লক্ষণ অনুভব করিতে পারেন না। আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলাম কিন্তু কোনরূপ রোগের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। অতঃপর তাঁহার প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলাম যে তিনি বহুমূত্র (ডায়েবিটিশ) রোগে ভুগিতেছেন। তাঁহার প্রস্রাবের সহিত শতকরা তিনভাগ চিনি নির্গত হইতেছে।

আমাদের শরীর এঞ্জিনের মত একটি যন্ত্র বিশেষ। ইহার প্রত্যেক অংশ যথানিয়মে নিজ নিজ কার্য্য করিলে শরীর রোগশূন্য হইয়া থাকে এবং শরীরের এইরূপ অবস্থাকেই প্রকৃত স্বাস্থ্য বলে। এঞ্জিন যেমন কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়মের অধীন শরীরও সেইরূপ। তাহাদের একটু ব্যতিক্রম হইলেই শরীর অসুস্থ হইতে থাকে। এঞ্জিনে যেমন কয়লা ও জলের প্রয়োজন, শরীর রক্ষার জন্যও সেইরূপ খাদ্য এবং পানীয়ের প্রয়োজন। এঞ্জিনের গতিবিধি যেমন চালকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, শরীররক্ষাও সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তি বা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে।

সকলেই শরীরকে সুস্থ রাখিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু অনেকে অজ্ঞানতা নিবন্ধন এমন কুঅভ্যাসে রত থাকেন, যাহাতে তাঁহারা রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে কালের কবলে নিপতিত হন। অতএব সকলেরই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত।

স্বাস্থ্যের লক্ষণ।—আমাদের শরীর ও মনের এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, যে একের অসুস্থতায় অপরটী পীড়িত হয়।

(১) অতএব সুস্থ শরীরের প্রধান লক্ষণ মনের প্রফুল্লতা। শরীর সুস্থ থাকিলে চিত্তের সকল বৃত্তির স্বাভাবিক স্ফুরণ হইয়া থাকে।

(২) শরীরের গঠন ও এরূপভাবে হইয়া থাকে, যাহাতে আমরা সুপুরুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারি। অতএব শরীরের সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্যের অপর একটী লক্ষণ।

(৩।৪) সুস্থ শরীর যে কেবল দেখিতে সুন্দর, তাহা নহে, বলবান্ ও কর্ম্মঠ হইয়া থাকে। সুস্থ শরীরে এমন একটী লাবণ্য থাকে, যে সকলেই তাহার প্রতি আকৃষ্টচিত্ত হইয়া থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে স্বাস্থ্যই সকল মানবের চিরবাঞ্ছনীয়। ইহা হইতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হইতে পারে।

স্বাভাবিক নিয়ম ঃ—স্বাস্থ্য কতকগুলি স্বাভাবিক নিয়মের অধীন। তাহাদের একটু ব্যতিক্রম হইলেই শরীর অসুস্থ হইতে থাকে। আমাদের মাতৃগর্ভে জন্মমুহূর্ত্ত হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই সকল নিয়মের অধীন হইয়া চলিলে প্রকৃত স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। তবে প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ জন্মমুহূর্ত্ত হইতে যে পর্য্যন্ত না আমাদের জ্ঞানোদয় হয় সে পর্য্যন্ত শরীর রক্ষার নিয়মগুলি আমাদের পিতামাতার উপর নির্ভর

করিতে হয়। অনেক সময়ে পিতামাতার অজ্ঞতা নিবন্ধন আমাদিগকে কষ্ট পাইতে হয়। এই নিয়মগুলির প্রত্যেকটীর বিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে। আপাততঃ সংক্ষেপে নিয়মগুলির উল্লেখ করা যাইতেছে। পরে যথাসময়ে প্রত্যেকটীর বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যাইবে।

(ক) মাতৃগর্ভে জন্মমুহূর্ত্তে পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পুত্রের শরীর ও মনের উপর প্রতিফলিত হয়। ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, রুগ্ন পিতামাতার সন্তান কখনও সবল ও সুস্থকায় হয় না। কতকগুলি রোগ আছে যাহা পিতামাতা হইতে পুত্রে সংক্রামিত হয়, যথা উপদংশ, যক্ষ্মা, বাত ইত্যাদি। এইত গেল শারীরিক অবস্থার কথা, মানসিক অবস্থাও ঠিক ঐরূপই হইতে দেখা যায়। ক্রোধী কিম্বা ভীরু পিতামাতার সন্তান ক্রোধী ও ভীরু হইয়া থাকে।

(খ) মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে মাতার স্বাস্থ্য ও মনের অবস্থার উপর সন্তানের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য ও মনের অবস্থা নির্ভর করে। অতএব গর্ভধারণকালে স্ত্রীলোকদিগের শরীর যাহাতে সুস্থ থাকে এবং মন সদা প্রফুল্ল ও পবিত্রভাবাপন্ন থাকে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কারণ গর্ভাবস্থায় সুস্থদেহ প্রফুল্লচিত্ত ও পবিত্রভাবাপন্নার পুত্রই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, বলবান্, ধর্ম্মভীরু ও বিদ্বান্ হয়।

(গ) শিশুপালনকালে পিতামাতার স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফল আমরা প্রত্যহ শত শত দেখিতে পাই। বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোক অল্প বয়সে সন্তানবতী হইয়া শিশুপালনরূপ গুরুতর ভার প্রাপ্ত হন তখন তাঁহারা নিজ স্বাস্থ্য রক্ষণেই অনভিজ্ঞা। এরূপ স্থলে সন্তানদের অবস্থা যে অতীব শোচনীয় ঘটিবে তাহা নিঃসন্দেহ। বালিকাদের বিবাহের পূর্ব্বে স্বাস্থ্য রক্ষা ও শিশুপালন সম্বন্ধে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া উচিত। শিশুপালনকালেও মাতার নিজ স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ লক্ষ রাখা কর্ত্তব্য। কারণ মাতা অসুস্থ হইলে তাঁহার স্তনদুগ্ধ শিশুর পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। ঐ শিশুপালন কালে কোনরূপ উত্তেজক দ্রব্য (মদ্য প্রভৃতি), অস্বাস্থ্যকর খাদ্য (পচা বা বাসি) কিম্বা কোনরূপ বিষাক্ত ঔষধ মাতাকে খাওয়ান উচিত নয়। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মগুলি যেমন শিশুর পক্ষে পালনীয় মাতার পক্ষেও সেইরূপ পালনীয় জানিবে।

(ঘ) খাদ্য ঃ—এঞ্জিন চালাইতে হইলে যেমন কয়লার প্রয়োজন, সেইরূপ শরীর রক্ষার্থে খাদ্যের প্রয়োজন। কয়লা যেমন অগ্নির সাহায্যে তাপ উৎপাদন করিয়া জলকে বাষ্পে পরিণত করে; এবং সেই বাষ্প হইতেই এঞ্জিন্ শক্তিবিশিষ্ট হয়। খাদ্যও শরীর মধ্যে নানারূপ জটিল রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে দুই অংশে বিভক্ত হয়। অজীর্ণ অংশ বিষ্ঠারূপে পরিত্যক্ত হয় এবং জীর্ণাংশ রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় ও শরীরের সকল স্থানে পরিচালিত হইয়া, উহার গঠন কার্যের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়। ক্ষুধা বা আহার আশক্তি সকল-প্রাণীরই আছে। ইহার অভাব অনিষ্টকর, কারণ আহার ব্যতীত শরীর রক্ষা হয় না। আবার আহারে অত্যধিক আসক্তি, আর আহার্য্যে লোভ একই কথা। লোভ মাত্রই দূষণীয়। আমরা জানি, অতিরিক্ত আহারের আশু কুফল—পেট হাঁস্‌ফাঁস্ করা। ইহার ভাবী কুফল বড়ই বিষম, যথা—অজীর্ণ, উদরাময়, মনের অবসন্নতা ও অনিদ্রা। আহারের সাধারণ নিয়ম উদরের তিন ভাগ আহার্য্যে পূর্ণ করিয়া একভাগ বায়ু সঞ্চালনের জন্য খালি রাখা উচিত।

(ঙ) পানীয় ঃ—সকল প্রকার পানীয়ের মধ্যে জলই প্রধান ও প্রকৃতি প্রদত্ত। আমাদের শরীর দশভাগের নয় ভাগ জলে পরিপূর্ণ। অতএব শরীরের প্রধান উপাদান জল। আবার এই জল প্রত্যহ নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত বাষ্পরূপে, ত্বক্ হইতে ঘর্ম্মরূপে ও প্রস্রাবরূপে শরীর হইতে পরিত্যক্ত হইতেছে। এই পরিত্যাগ জনিত শরীর মধ্যে জলের অভাব তৃষ্ণারূপে অনুভূত হয়। অতএব তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলপান করা উচিত। পানীয় জল বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। কারণ অপরিষ্কার জল পান করিলে অনেক প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়।

(চ) বায়ু ঃ—পৃথিবী বায়ুর দ্বারা বেষ্টিত। মৎস্য যেরূপ জলে ডুবিয়া থাকে, আমরাও সেইরূপ বায়ুতে ডুবিয়া আছি। জলশূন্য স্থানে যেমন মৎস্য বাঁচে না, আমরাও সেইরূপ বায়ুহীন স্থানে বাঁচিতে পারি না। এই বায়ু আমরা সর্ব্বদা নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। বায়ুর একটী উপাদান অক্সিজেন্ বাষ্প। এই অক্সিজেন নিশ্বাসের সহিত ফুস্‌ফুস্ মধ্যে যাইয়া রক্তের সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বশরীরে পরিচালিত হয়। আবার রক্ত হইতে কার্ব্বনিক এসিড্ বাষ্প প্রভৃতি দূষিত পদার্থ সকল প্রশ্বাস বায়ুর সহিত শরীর হইতে পরিত্যক্ত হয়। এইরূপে বায়ু

রক্ত পরিষ্কার করে। অতএব বায়ু দূষিত হইলে রক্ত দূষিত হয় এবং তজ্জন্য নানারূপ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন বিধেয়।

(ছ) ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম ঃ—আমাদের শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমুচিত চালনা আবশ্যক। চালনা না হইলে উহাদের পুষ্টি হয় না; পুষ্টি না হইলে উহারা সম্যক্‌রূপে আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। ইহার ফলে ক্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। কিন্তু আবার অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমের ফলও ঐরূপ অনিষ্টকর। শারীরিক পরিশ্রম অন্ত্র, মূত্রাশয় ও ত্বকের ক্লেদ দূরীকরণ-কার্য্য উত্তেজিত করিয়া উহাদিগকে সুস্থ ও কার্য্যক্ষম করিয়া থাকে। শারীরিক পরিশ্রমে পাকস্থলী, শোণিতসঞ্চালনযন্ত্র ও ফুস্‌ফুস্ উত্তেজিত হওয়ায়, আমাদের ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়, দেহের পরিপুষ্টি হয়, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এব কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা বাড়ে। ব্যায়াম এইরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে সকল অঙ্গেরই সমুচিত চালনা হয়। যাহাতে এক অঙ্গের অধিক চালনা হয় এবং অপর অঙ্গের চালনা একেবারেই হয় না, এরূপ ব্যায়ামে শরীর ভাল থাকে না। ব্যায়ামের পরিমাণ সকল ব্যক্তির পক্ষে সমান হওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির আপনার শরীর, অবস্থা ও বৃত্তি অনুসারে ইহার পরিমাণ ঠিক করিয়া লওয়া উচিত। প্রত্যুতঃ ক্লান্তিবোধ হইলেই ব্যায়াম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

(জ) বিশ্রাম বা নিদ্রা ঃ—স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে পরিশ্রম যেরূপ আবশ্যক, বিশ্রামও সেইরূপ আবশ্যক। নিদ্রাই বিশ্রামের উৎকৃষ্ট ও স্বাভাবিক উপায়। স্বভাবতঃ আমরা দিনের বেলায় কাজকর্ম্ম করি, তাহাতে আমাদের শরীরের ক্ষয় হইয়া থাকে। রাত্রিকালে নিদ্রার সময় সেই ক্ষয়ের পূরণ হইয়া যায়। শরীরের পক্ষে যেরূপ বিশ্রাম আবশ্যক, মনের পক্ষেও সেইরূপ বিশ্রাম আবশ্যক। মানসিক বৃত্তিগুলির ক্রমিক পরিচালনায় দেহ ও মন উভয়ই শিথিল ও অবসন্ন হয়।

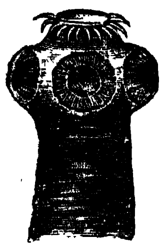
স্বাস্থ্যের এই নিয়মগুলি সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। এ গুলি প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতির বিরুদ্ধে কার্য্য করিলেই দুঃখ পাইতে হয়।

জীবাণু ও উদ্ভিজ্জাণু।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু বি,এস,সি,এম,বি লিখিত :—

কীট দ্বারা আক্রান্ত হইলে ও আগাছা জন্মিলে বৃক্ষাদি যেরূপ নষ্ট হয়, মনুষ্য শরীরও সেইরূপ উদ্ভিদ ও কীটাদির বাসভূমি হইতে পারে। তবে যে সকল কীট ও আগাছা বৃক্ষকে আক্রমণ করে তাহারা প্রায়ই আকারে বৃহৎ। কিন্তু মনুষ্য শরীরে সাধারণতঃ কোন প্রকার সেই রূপ বৃহৎ আকারের প্রাণী বা উদ্ভিদ্ বাস করিতে পারে না এইমাত্র প্রভেদ।

যে সকল চক্ষুরগোচর প্রাণী মনুষ্য শরীরে বাস করিতে পারে তাহাদের মধ্যে কৃমি, (চিত্র ১, ২, ৩,) উকুন (চিত্র ৪) ইত্যাদি সকলেরই পরিচিত। আমরা খোষ বা পাঁচড়া বলি তাহাও একপ্রকার কীট আক্রমণের ফল। এই কীট মাকড়সা জাতীয় এবং অষ্টপদ বিশিষ্ট (চিত্র ৫)। ইহারা অতিশয় ক্ষুদ্র এবং বিশেষ চেষ্টা না করিলে চর্ম্মচক্ষে ইহাদের দর্শন পাওয়া দুরূহ। ডিম পাড়িবার জন্য এই কীট চর্ম্মের নীচে গর্ত্ত করে এবং তাহাতেই ঘা উৎপন্ন হয়।

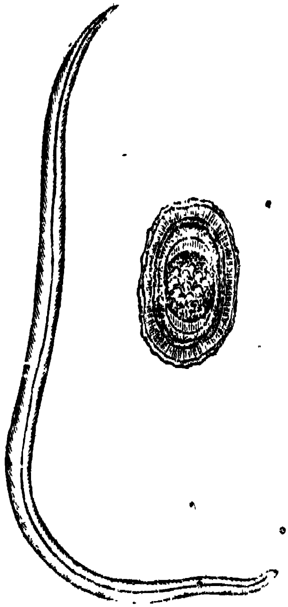




[চিত্র ১]

ফিতার ন্যায় কৃমি দেহ ও মুণ্ড।

ইহারা প্রায় ১০´ হইতে ২০´ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। দূষিত শূকর প্রভৃতির মাংস খাইলে এই কৃমি হইবার সম্ভাবনা। ইহারাও অন্ত্রমধ্যে অবস্থান করে এবং মানসিক বিকার ও পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়। সর্ব্বপ্রকার মাংসভোজী সাহেবদের মধ্যেই ইহা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।



[চিত্র ২]

সাধারণ কৃমি ও তাহার ডিম।

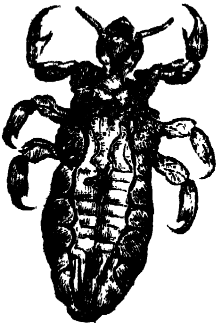
প্রায় ছয় ইঞ্চি লম্বা। ইহারা অন্ত্রমধ্যে অবস্থান করে। এইরূপ কৃমি জন্মিলে রোগীর প্রায়ই মানসিক বিকার ও হজমের গোলমাল দেখা যায়। ইহাও ছোট ছেলেদের মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।



[চিত্র ৩]

সূতার ন্যায় কৃমি।

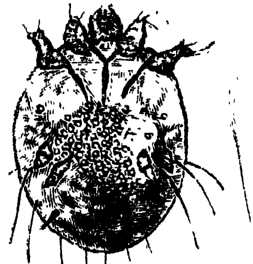
ইহারা প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি লম্বা। এই কৃমি গুহ্যদ্বারের নিকটে অবস্থিতি করে। ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে ইহা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। রাত্রিকালে এই কৃমি গুহ্যদ্বারের বাহিরে আসে এবং তজ্জন্য মলদ্বার সড়্ সড়্ করে ও চুলকায়।



[চিত্র ৪]

উকুন।

ইহার পরিচয় অনাবশ্যক। উকুনের ডিম চুলের সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়া থাকে এবং ইহাদিগকে নষ্টকরা দুরূহ ব্যাপার। প্রত্যহ কেরোসিন তৈল দিয়া মস্তক ধুইয়া ফেলিলে ডিম হইতে নির্গত ও পরিণত কীটগুলি নষ্ট হইয়া যায় এবং নূতন ডিম জন্মাইতে পারে না।



[চিত্র ৫]

খোষের কীট।

এই ছবি কীটের বাস্তবিক আয়তন অপেক্ষা প্রায় কুড়ি গুণ বৃহৎ। পাতলা চামড়া সংযুক্ত স্থানই খোষকীটের পক্ষে উপযোগী এবং হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের পাতাতেই খোষের অধিক প্রাদুর্ভাব।

চক্ষুর অগোচর প্রাণী।

বহির্জগতে এবং মনুষ্য শরীর মধ্যে এমন অনেকপ্রকার উদ্ভিদ্ ও প্রাণী আছে যাহা চর্ম্মচক্ষের অগোচর (চিত্র ৬ ও ৭)। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন তাহাদের অস্তিত্ব অনুভব করা কঠিন। ইহারা অতিশয় ক্ষুদ্র। ইহাদিগকে বীজাণু বলা যাইতে পারে। বীজাণুদিগের মধ্যে প্রাণী ও উদ্ভিদ দুইই দেখা যায়। এক ফোঁটা জলের মধ্যে ঐরূপ লক্ষ লক্ষ জীবাণু বা উদ্ভিজ্জাণু বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ইংরাজীতে এই জীবাণুর নাম Protozoa (প্রোটোজোয়া) উদ্ভিজ্জাণুর নাম Bacteria (ব্যাক্‌টিরিয়া)।

এই সকল জীবাণু বা উদ্ভিজ্জাণুর হস্তপদাদি বা শাখা প্রশাখা নাই। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সরু লেজের মত অবয়ব আছে। ইহার সাহায্যে তাহারা জলীয় পদার্থের মধ্যে সাঁতার দিয়া বেড়াইতে পারে। উদ্ভিজ্জাণুর মধ্যে যাহারা দেখিতে গোল তাহাদের নাম Cocci (ককাই) এবং যাহারা ঈষৎ লম্বাধরণের তাহাদের নাম Bacilli ব্যাসিলি।



[চিত্র ৬]

দাদ রোগের উদ্ভিজ্জাণু।



[চিত্র ৭]

ছুলির উদ্ভিজ্জাণু।

ইহারা দেখিতে অনেকটা দাদের উদ্ভিজ্জাণুর ন্যায়। ইহাদের বীজ দেখিতে ছোট ছোট বিন্দুর ন্যায়। দাদের উদ্ভিজ্জাণুর বীজ প্রায়ই দেখা যায় না।

বীজাণুর বংশ বৃদ্ধি প্রথা।

জীবাণু ও উদ্ভিজ্জাণুদিগের বংশ বৃদ্ধি প্রথা অতি অদ্ভুত। একটী প্রাণী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী প্রাণী উৎপন্ন হয় এবং ইহারা প্রত্যেকে পুনরায় বিভক্ত হইয়া চারিটী প্রাণী সৃষ্টি করে। এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটী প্রাণী হইতে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর উৎপত্তি হইতে পারে।

কোনরূপ জলীয় পদার্থ ব্যতীত ইহারা বাস করিতে পারে না। শুষ্ক করিলে ইহারা মৃতপ্রায় হয় এবং বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে না। এইরূপ শুষ্ক অবস্থায়

ধূলির সহিত বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া ইহারা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে নীত হয় এবং উপযুক্ত জলীয় পদার্থে সংক্রামিত হইলে পুনরায় বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে।

একেবারে বিশুদ্ধ জল অপেক্ষা ইহাদের বাস করিবার পক্ষে খাদ্য দ্রব্যাদি ও আবর্জ্জনা মিশ্রিত জল অধিক উপযোগী।

বীজাণুর খাদ্য।

অল্প পরিমাণ জলে খানিকটা মাংস সিদ্ধ করিয়া সেই জল ছাঁকিয়া লইয়া অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে তাহাতে কোন প্রকার জীবাণু বা উদ্ভিজ্জাণু দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ জল একদিন পরে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ইহাতে অসংখ্য উদ্ভিজ্জাণু জন্মিয়াছে এবং জলে একপ্রকার দুর্গন্ধ হইয়াছে। উদ্ভিজ্জাণু মাংসকে বিকৃত করে এবং সেই কারণেই জলে দুর্গন্ধ হয়। এই উদ্ভিজ্জাণু কোথা হইতে জলে আসিল? পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল যে বিকৃত মাংস হইতেই উদ্ভিজ্জাণু উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহা নহে ঐ উদ্ভিজ্জাণু ধূলিকণার সহিত বায়ু হইতে মাংসে আসিয়া মাংসকে বিকৃত করিয়া থাকে। সামান্য একটী পরীক্ষাতেই ইহা প্রমাণিত হইতে পারে। একটী বোতলের মধ্যে মাংসের যূষ পুরিয়া তুলা দ্বারা মুখ বন্ধ করিলে, তাহার মধ্যে বায়ু চলাচল থাকিবে কিন্তু কোন প্রকার ধূলিকণা বা উদ্ভিজ্জাণু প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না। এখন এই বোতল মধ্যস্থ মাংসের যূষ ফুটাইয়া লইলে তাহাতে যে সকল উদ্ভিজ্জাণু পূর্ব্ব হইতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহারা সকলেই নষ্ট হইয়া যাইবে। বোতলের মুখ তুলার দ্বারা আবৃত থাকার জন্য নূতন কোন উদ্ভিজ্জাণুও প্রবেশ করিতে পারিবে না। এইরূপ উপায়ে রাখিলে মাংসের যূষের ন্যায় পচনশীল পদার্থও চিরকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকিয়া যায়। আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি যে খাদ্যদ্রব্যাদি পচিয়া যাইবার প্রধান কারণই উদ্ভিজ্জাণু এবং ইহারা বায়ু সঞ্চালিত ধূলিকণার সহিত একস্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া এইরূপ বিকার জন্মাইয়া থাকে।—

জীবাণু ও উদ্ভিজ্জাণুর মধ্যে যেরূপ আকারের পার্থক্য আছে তাহাদিগের খাদ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। কেহবা শর্করাযুক্ত জল ভিন্ন বাঁচিতে পারে না। আবার কাহারও পক্ষে মাংসাদি সংযুক্ত জলই অধিক উপযোগী। কাহারও বা প্রাণ ধারণের পক্ষে বায়ু অত্যাবশ্যকীয় এবং কেহ বা কেবল বায়ুশূন্য স্থানেই

বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অত্যধিক ঠাণ্ডা বা অত্যধিক তাপে ইহারা বাঁচিতে পারে না এবং জলে ফুটাইলে সকল জীবাণু ও উদ্ভিজ্জাণুই মরিয়া যায়।

বীজাণু নিঃসৃত রস ও তাহার কার্য্য।

আমাদের শরীর হইতে যেরূপ ঘর্ম্ম, মূত্রাদি এবং অনেক বৃক্ষকাণ্ড হইতে যেরূপ জলীয় পদার্থ নির্গত হয় সেইরূপ এই সকল জীবাণু ও উদ্ভিজ্জাণুর শরীর হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হয়। ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিজ্জাণুর রস ভিন্ন ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট। দুগ্ধে একপ্রকার উদ্ভিজ্জাণু জন্মায় তাহার নাম ল্যাক্‌টিক্ ব্যাশিলস্। ইহাদের শরীর হইতে যে রস উৎপন্ন হয় তাহা ল্যাক্‌টোস্ (Lactose) নামক দুগ্ধস্থিত শর্করার ন্যায় মিষ্ট পদার্থকে ল্যাক্‌টিক্ এসিড (Lactic Acid) নামক অম্ল পদার্থে পরিণত করে; এই অম্ল পদার্থের জন্যই দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়। দুগ্ধে অতি সামান্য পরিমাণ দম্বল দিলেই সমস্ত দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়। এই দম্বল দেওয়ার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে কেবল দুগ্ধে কতকগুলি দধি উৎপন্নকারী উদ্ভিজ্জাণু ছাড়িয়া দেওয়া। এই অল্প সংখ্যক উদ্ভিজ্জাণু ক্রমে বংশবৃদ্ধি করিয়া সমস্ত দুগ্ধকে দধিতে পরিণত করে।

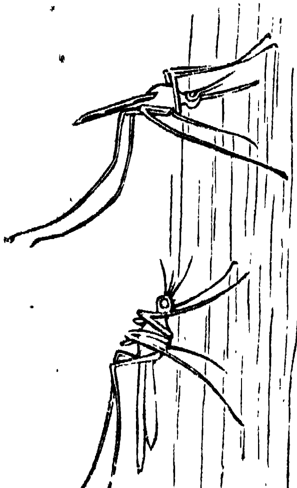
তালের রস হইতে তাড়ি, ইয়েষ্ট (Yeast) নামক একপ্রকার উদ্ভিজ্জাণুর সাহায্যে প্রস্তুত হয়। এই উদ্ভিজ্জাণু নিঃসৃত রস তালরসস্থিত শর্করাকে সুরাসারে পরিণত করে।

ণু ও রোগ।

যে উদ্ভিজ্জাণু মাংসকে বিকৃত করে তাহার রস অতিশয় বিষাক্ত। বাসি মাংস প্রভৃতি আহারের জন্য যে অসুখ হয়, এই বিষাক্ত রস উদরস্থ হওয়াই তাহার কারণ। এই সকল উদ্ভিজ্জাণু অনেক সময় আহারীয় দ্রব্যের সহিত আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং সুবিধা পাইলে পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে বংশ বৃদ্ধি করে। তখন উহাদের শরীর নিঃসৃত বিষাক্ত রস হইতে নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমরা যে বায়ু নিঃশ্বাসরূপে গ্রহণ করি, যে জল পান করি, যে দ্রব্য আহার করি, তাহার প্রত্যেকটীই অসংখ্য বীজাণু পরিপূর্ণ। এই সকল বীজাণু সতত্তই আমাদের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ইহারা সকলেই যদি শরীর মধ্যে বংশ

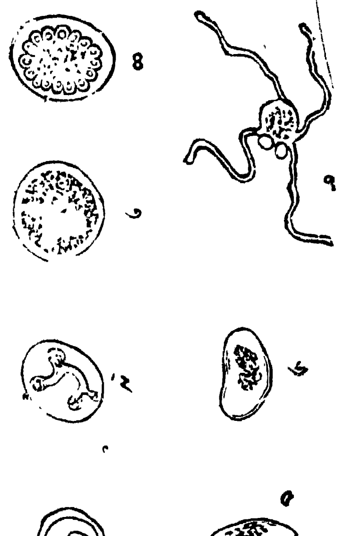
বৃদ্ধি করিতে পারিত তাহা হইলে অমাদের জীবনধারণ করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিত। যে সকল বীজাণু আমাদের শরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হয় তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পাকস্থলীতে যাইয়া পাকস্থলী নিঃসৃত রস (Gastric Juice) দ্বারা বিনষ্ট হয়। শরীরস্থ রক্তেরও এই সকল বীজাণু নাশ করিবার ক্ষমতা আছে।



চিত্র (৮)

ম্যালেরিয়া মশা ও সাধারণ মশা।

নিচের ছবিটী সাধারণ মশার। ইহারা দেওয়ালের গায়ে সোজা ভাবে বসে। উপরের চিত্রটী এনোফিলিস নামক ম্যালেরিয়াবাহী মশার। ইহারা দেওয়ালেরগায়ে বাঁকাভাবে বসে এবং ইহাদের পালকে ছিট ছিট দাগ আছে।



চিত্র (৯)

ম্যালেরিয়ার বীজাণু।

এই ছবিগুলি ম্যালেরিয়া বীজাণুর। ইহাদের আকৃতি মনুষ্য শরীরে লাল রক্ত কণিকার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে ইহাদের আকৃতি ১ নং ছবির মত থাকে তৎপরে ক্রমে ক্রমে আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া ৭ নং ছবির মত হয়। ইহারা ম্যালেরিয়াবাহী মশকের দ্বারা মনুষ্য শরীর মধ্যে নীত হয়।

ঠাণ্ডা লাগিলে কিংবা অন্য কোন কারণে শরীর অসুস্থ থাকিলে শরীরের বীজাণুনাশক ক্ষমতা কমিয়া যায়। তখন শরীরে যে সকল বীজাণু প্রবেশ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বংশবৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয় এবং তাহাদের শরীর নিঃসৃত রস হইতে রোগও উৎপন্ন হয়। বহির্জগতে পচন ক্রিয়া যেরূপ বীজাণু ঘটিত আমাদের অনেক রোগও সেইরূপ বীজাণু সম্ভূত। বীজাণুভেদে বিভিন্ন বিভিন্ন রোগ উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে আহারীয় ও পানীয় দ্রব্য এবং নিশ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত বীজাণু সকল শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। শরীরে কোনরূপ ক্ষত থাকিলে সেই ক্ষতস্থান হইতেও বীজাণু শরীরকে আক্রমণ করিতে পারে। কোন কোন বীজাণু মক্ষিকা ও মশকাদির শরীরে অবস্থান করে এবং ঐ সকল কীটাদির দংশনের দ্বারা আমাদের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। চিত্র (৮ ও ৯)

বীজাণু ঘটিত রোগে, রোগীর মল, মূত্র, কফ ইত্যাদির সহিত বীজাণু সকল নির্গত হয়। এই সকল দ্রব্য আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্যাদির সংস্পর্শে আসিলে তাহাদিগকে কলুষিত করে। দূষিত খাদ্যদ্রব্যাদি উদরস্থ হইলে সুস্থ ব্যক্তিরও পীড়া হইবার সম্ভাবনা। যাহারা রোগীর সেবা করেন তাঁহাদের বস্ত্র পরিবর্ত্তন এবং উত্তমরূপে হস্ত প্রক্ষালন না করিয়া কোন দ্রব্য আহার করা উচিত নহে। বীজাণু সংক্রান্ত অধিকাংশ রোগই সংক্রামক।

রোগ সংক্রামক কেন?

বীজাণু যে অনেক রোগের কারণ পরীক্ষা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। কলেরা রোগীর মল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে তাহাতে অসংখ্য কমার (,) ন্যায় উদ্ভিজ্জাণু দেখিতে পাওয়া যায়। উপযুক্ত পাত্রে এবং উপযুক্ত আহার্য্য সাহায্যে এই উদ্ভিজ্জাণুর "চাষ" করা যাইতে পারে। এই উদ্ভিজ্জাণু অতি অল্প পরিমাণও কোন কুক্কুটকে খাওয়াইলে তাহার কলেরা হইতে দেখা যায়। সেই কুক্কুটের মল পরীক্ষা করিলে তাহাতে প্রভূত পরিমাণে কমার ন্যায় উদ্ভিজ্জাণু দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এই উদ্ভিজ্জাণু খাইলে মনুষ্যেরও কলেরা হইবার সম্ভাবনা।

আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যশরণ চক্রবর্ত্তী, এম, বি, লিখিত।

অবতরণিকা।

পৃথিবীর সকল স্থানই অল্পবিস্তর বিপদসঙ্কুল। কার্য্যানুরোধে অনেকেই সহসা আহত ও নানাপ্রকার দুর্ঘটনা হেতু বিপদাপন্ন হইতে পারেন। আহত ব্যক্তিকে প্রথমে কি প্রকারে সাহায্য করিতে হয় এবং কিরূপ তত্ত্বাবধারণে রাখিলে ভবিষ্যতে অধিকতর বিপন্ন হইতে না হয় তাহাই এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইবে। অশেষ যন্ত্রণা ও ভাবী বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইতে অভিলাষীর এই শিক্ষা অমূল্য। যথাযথ ভাবে এই শিক্ষা প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক ইহা লোক সেবায় বিশেষ উপযোগী। এই শিক্ষা সকলের পক্ষে উপকারী হইলেও পুলিস কর্ম্মচারী, সৈনিক, কলকারখানার লোক, শিকারী, জাহাজের কর্ম্মচারী, শকট চালক, রেল কর্ম্মচারী, মাঝি, সর্ব্বদেশস্থ পথিক বা যে সকল স্থানে সুচিকিৎসক নাই সেই সকল স্থানবাসীর পক্ষে বিশেষ কল্যানকর।

আমাদের দেশে অনেক পল্লীতে আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিলে উপযুক্ত চিকিৎসক আসিবার পূর্ব্বে রোগীকে কি প্রকারে রাখিলে তাহার জীবন রক্ষার সুবিধা হয়, সেই উপায় না জানা হেতু অধিকাংশ স্থলেই রোগীকে অধিকতর বিপন্ন হইয়া পরিণামে প্রাণ হারাইতে হয়।

আশা করা যায় এই বিদ্যার চর্চ্চা জন সমাজে বর্দ্ধিত হইয়া আর্ত্তত্রাণে সহায়তা করিবে। যথাযথভাবে প্রাথমিক সাহায্য দান করিলে আহত ব্যক্তির যাতনার লাঘব হয় এবং উপকারকের মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হইয়া থাকে। যিনি একবার উক্তপ্রকার সাহায্য দানে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই সেই আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছেন।

আহত ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কোন উপায়ে তাহার যাতনার উপশম হয় তাহা না জানিয়া বা জানা সত্ত্বে প্রয়োগে অনুপযুক্ত হইয়া সেবা করিলে সময়ে সময়ে বিপরীত ফল হইতে দেখা যায়। শিরা হইতে রক্ত নির্গম হেতু

লোকে প্রাণত্যাগ করিতেছে দেখিয়াও অজ্ঞ ব্যক্তি কিছুই সাহায্য করিতে সমর্থ হন না সত্য। কিন্তু যাহারা প্রাথমিক সাহায্যদানে পারদর্শী হইবে তাহাদিগকে ঐরূপ শোকময় দৃশ্য দেখিতে হইবে না। শিক্ষা এই—যে অঙ্গ হইতে রক্ত বহির্গত হইতেছে সেই অঙ্গটী তুলিয়া ধরিয়া একটী পটী বান্ধিয়া দিলে রক্ত বন্ধ হয়। ইহা জানা থাকিলে শিক্ষিত দর্শক তখনই ঐরূপ করিবেন ও উপযুক্ত চিকিৎসক ডাকাইবেন। ইহাতে ঐ আহত ব্যক্তির প্রাণ নাশের স্থলে অচিরে সুস্থতা লাভ হইবে।

সন্ন্যাস বা এ্যাপেপ্লেক্সি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে মাতাল বলিয়া অনেক সময় পুলিস চালান দেয় এবং হাজতে বিনা চিকিৎসায় তাহার মৃত্যু ঘটে। প্রাথমিক সাহায্য বিজ্ঞানে শিক্ষিত ব্যক্তি ঐরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে যত্নের সহিত তাহার বাটীতে বা হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেন। শিক্ষিত ব্যক্তির উপরোক্ত রোগীকে উপযুক্ত স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া ও অজ্ঞ লোকের অধীনে থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া কত প্রভেদ।

এই বিষয়ে শিক্ষা থাকিলে পুলিসের লোকেরাও কোন অচেতন ব্যক্তির মুখে মদ্যের গন্ধ পাইলেই মাতাল জ্ঞানে ধরিবে না। কারণ নানা কারণে অচেতন হইতে ও মুখে ঐ রূপ গন্ধ পাওয়া যাইতে পারে। যখন কোন ব্যক্তি মদ্য পানে অচেতন হয়, তখন সে মরণাপন্ন ইহা মনে করিয়া যত্ন করা ও চিকিৎসা করান উচিত।

লোহার কারখানায় কোন কর্ম্মচারীর কার্য্য করিতে করিতে পায়ে আঘাত লাগিয়া অস্থি ভাঙ্গিয়া (simple fracture) গেল। তদীয় বন্ধুগণ আন্তরিক যত্ন সত্ত্বেও এই বিদ্যার অজ্ঞতা বশতঃ তাহাকে একেবারেই গাড়িতে তুলিয়া হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিয়া থাকে। কিন্তু নাড়াচাড়াতে ও একটী (splint) স্প্লিণ্ট অভাবে এই সিম্পিল ফ্রাক্‌চার কম্পাউণ্ড ফ্রাক্‌চারে পরিণত হয়। এইরূপ ঘটনায় প্রাথমিক সাহায্য দানে অভ্যস্ত ব্যক্তি প্রথমেই ভগ্ন অস্থির দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ পায়ে বাড় বাঁধিয়া তবে নাড়াচাড়া করেন। তাহাতে কম্পাউণ্ড ফ্রাক্‌চার হওয়া অসম্ভব।

খনিতে কার্য্য করিতে করিতে ঐরূপে আঘাত লাগিয়া কম্পাউণ্ড ফ্রাক্‌চার ও ধমনীরছিন্নতা হেতু রক্তস্রাব হয়। সেই অবস্থায় তাহাকে বাটীতে পাঠাইলে এবং অস্ত্রোপচার দ্বারা এ্যাম্পুটেশন করিলে আহত ব্যক্তি রক্তক্ষয়ে অবসাদ হেতু প্রাণ

ত্যাগ করিতে পারে। প্রাথমিক সাহায্য দানে অভ্যস্ত ব্যক্তি প্রথমে রক্তপাত নিবারণ করেন ও পরে স্পিলিণ্ট দ্বারা ভগ্ন স্থানটী দৃঢ়রূপে বন্ধন করেন। পরে অত্যন্ত সাবধানে খনি হইতে উত্তোলন করিয়া, আহত ব্যক্তিকে বাটী পাঠাইয়া দেন। এইরূপে রোগীর রক্তস্রাব না থাকায় দুর্ব্বল হইবার আশঙ্কা থাকে না ও পরে চিকিৎসক আসিয়া স্বল্পায়াসে রোগ মুক্ত করিতে পারেন।

প্রথম সাহায্য দানকারীর সকল সময় মনে রাখা উচিত যে তিনি চিকিৎসক নহেন। যতক্ষণ চিকিৎসক উপস্থিত না হন সেই পর্য্যন্তই তাঁহার চিকিৎসা করিবার অধিকার। এই উপদেশ ভুলিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করিলে বিপদ ঘটিতে পারে। বিশেষ অজ্ঞানাবস্থা ফিট্ ও ফ্রাক্‌চার ইত্যাদির চিকিৎসা অতীব দুরূহ অতএব যতশীঘ্র হইবার সম্ভব সুচিকিৎসক দেখাইয়া তাঁহার পরামর্শ মত কার্য্য করিবে। অনেক সময়ে অজ্ঞতাহেতু স্বেচ্ছাচারীর বিপরীত ফল ঘটিতে দেখা যায়।

প্রাথমিক সাহায্যদান প্রণালীতে আহত ব্যক্তির রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য তাগা বাঁধার রীতি আছে। উক্ত উপায়ে এক ব্যক্তির রক্তস্রাব প্রথমে বন্ধ করা হয়। তৎপরে তিন দিন পর্য্যন্ত অন্য কোনও চিকিৎসা এবং বন্ধন মুক্ত করা হয় না। ইহাতে ধমনীগুলির রক্তচলাচল বন্ধ হইয়া যায় এবং স্থানটী একেবারে পচিয়া যাওয়ায় রোগীর প্রাণ সংশয় হইয়া উঠে।

এই প্রবন্ধ লিখিত সাহায্য প্রণালী যথাযথ ভাবে প্রযুক্ত হইলে অতুলনীয় উপকার সাধিত হইবে। ইহার নিয়ম সামান্য হইলেও সম্যক্‌রূপে নিষ্পন্ন হওয়া উচিত। এই শিক্ষার প্রসার যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ততই ইহার উপকারিতা বিশেষরূপে সকলের অনুভূত হইবে। হাঁসপাতালের চিকিৎসকগণ বলেন এইরূপ প্রাথমিক সাহায্যপ্রাপ্ত রোগী সকল অপেক্ষাকৃত উত্তম অবস্থায় ও যত্নের সহিত আনীত হয় বলিয়া উহাদের চিকিৎসায় শীঘ্র সুফল পাওয়া যায়। এই জন্যই শিক্ষিত জগৎ ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন। (ক্রমশঃ)

খাদ্য ও পথ্য

দধি ও দধি বীজ।

প্রচলন।

দধি ভারতে সকলেরই নিকট বিশেষ পরিচিত। এদেশে দধি বিনা ভোজ মঞ্জুর হয় না; ইহা ভোজের একটী প্রধান উপকরণ। উত্তম দধি অতি উপাদেয়। প্রত্যেক নিমন্ত্রণ স্থলেই দধির অল্প বিস্তর গুণকীর্ত্তন শুনা যায় দধির প্রচলন নূতন নহে, অতি পুরাকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আয়ুর্ব্বেদে দধির গুণাগুণ, ব্যবহার বিধি ও নিষেধ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

ভারতের সর্ব্বত্রই দধির প্রচলন আছে বটে কিন্তু সকল স্থানে একই উপায়ে দধি প্রস্তুত করা হয় না। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের গোয়ালারা একটী এক মুখ বন্ধ বাঁশের চোঙার মধ্যে টাট্‌কা কাঁচা দুধ পুরিয়া ঝুলাইয়া রাখে। ঠিক সময়ে দুধ বেশ জমিয়া যাইলে সাবধানে বাহির করিয়া লয়। ইহা খুব জমাট অবস্থায় খাওয়া হয়। প্রতি দিন একই চোঙায় দধি জমান হয় বলিয়া কোন প্রকার দম্বল দিবার আবশ্যক হয় না।

ত্রিপুরায় সরার ন্যায় একপ্রকার অগভীর মৃত্তিকা পাত্রে দধি জমান হয়, এবং এক মাস রাখিয়া পরে ব্যবহার করা হয়। এই দধি খুব জমাট ও মিষ্ট-স্বাদযুক্ত হয়।

বাঁকিপুর অঞ্চলে মাখন প্রস্তুতের কারখানা সমূহে একটী বৃহৎ মৃত্তিকা পাত্রে মহিষ দুগ্ধ রক্ষিত হয়। এই পাত্রটী কখনও পরিষ্কার করা হয় না। অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঐ দুধ জমিয়া যায়।

বঙ্গদেশে দম্বলের অভাবে দুগ্ধে তেঁতুল দিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে প্রস্তুত দধি হইতে দম্বল লইয়া দ্বিতীয়বার দধি পাতিয়া পুনরায় তাহা হইতে দম্বল লইয়া তৃতীয়বার দধি পাতিলে বেশ জমাট বাঁধিয়া যায়।

রাজসাহী ও ফরিদপুরে উত্তম দধি প্রস্তুত হয় বলিয়া খ্যাতি আছে। এই দধি খুব জমাট সুগন্ধযুক্ত ও সুস্বাদু হইয়া থাকে।

দ্বারভাঙ্গার দধিও উত্তম বলিয়া খ্যাত কিন্তু ইহা ফরিদপুর ও রাজসাহীর দধি হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট।

দধি প্রস্তুতের সাধারণ নিয়ম এক হইলেও প্রত্যেক স্থানেই গোয়ালাদিগের উত্তম দধি প্রস্তুতের এক একটী পৃথক্ গোপনীয় নিয়ম আছে। সকলেই নিজের প্রণালী যাহাতে অন্য কেহ জানিতে না পারে সে জন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে।

নিম্নে গোয়ালাদিগের উত্তম দধি প্রস্তুতের একটী নিয়ম প্রদত্ত হইল।

ঢাকুনি সমেত একটী অল্প গভীর নূতন মৃত্তিকা পাত্র লইয়া, একখণ্ড শুক্‌নো কাপড় দ্বারা তাহার সমস্ত ধূলা পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। পরিষ্কার করিবার জন্য কখনও জল ব্যবহার করা হয় না। পাত্রের ভিতর দিক এবং ঢাকুনির তলা অগ্নির উপর বেশ করিয়া গরম করিয়া লওয়া হয়। অপর একটী পাত্রে দুগ্ধ জল মিশ্রিত করিয়া অন্ততঃ এক ঘণ্টা ফুটান হয়। ফুটাইবার সময় অনবরত নাড়িয়া দুগ্ধে সর জমিতে দেওয়া হয় না। গরম অবস্থাতেই দুগ্ধ পূর্ব্বকথিত মৃত্তিকা পাত্রে ঢালিয়া ঢাকুনি দ্বারা বন্ধ করা হয়। শীতকালে পাত্রটী মেজের উপর না বসাইয়া কতকগুলি খড়ের উপর বসান হয়। তাহার পর দুগ্ধ ঠাণ্ডা হইতে দেওয়া হয়। গোয়ালারা মধ্যে মধ্যে পাত্রের গায়ে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া থাকে। যখন দুগ্ধের উত্তাপ কমিয়া মনুষ্য শরীরের উত্তাপানুযায়ী হয়, তখন একটী খড় পূর্ব্বেকার প্রস্তুত দধিতে ডুবাইয়া ঐ দুগ্ধে ডুবান হয়। পরে উত্তমরূপে উহাতে ঢাকা বন্ধ করা হয়। এইরূপে শীতকালে ১২ ঘণ্টা এবং গ্রীষ্মকালে ১০ ঘণ্টার মধ্যে দুগ্ধ জমিয়া যায়।

কিরূপে দুগ্ধ কি প্রকারে দধিতে পরিণত হয়, তাহার মধ্যে কি পরিবর্ত্তন হয়

তাহা আমাদের সবিশেষ জানা ছিল না। কেবলমাত্র দুগ্ধ জমিয়া বায় ও অম্লরস বিশিষ্ট হয়, আমরা চক্ষে দেখিয়া ও আস্বাদ করিয়া ইহাই জানিতাম।

সাধারণতঃ দুগ্ধ বেশীক্ষণ রাখিয়া দিলে কতক জমিয়া যায়, কতক জল কাটে ও একপ্রকার দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয়। ইহাকে সাধারণতঃ দুগ্ধ পচিয়া যাওয়া বলে। ইহারও আস্বাদ সময় সময় টক হয়। কিন্তু সকল সময়ে একরূপ হয় না। বায়ুতে যে সকল উদ্ভিজ্জাণু সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে তাহারাই দুগ্ধ মধ্যে প্রবেশ করে, পরে তাহাদের বংশবৃদ্ধির সহিত দুগ্ধের এই সকল পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়।

দধি বীজ নির্ণয়।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের জীবাণুতত্ত্বের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দধিবীজ প্রথম নির্ণয় করিয়াছেন। ইহা একপ্রকার উদ্ভিজ্জাণু। গোয়ালারা যে সাঁজো দ্বারা দধি তৈয়ারি করে তাহা এই উদ্ভিজ্জাণুর সমষ্টি মাত্র। তবে ইহাদিগকে সম্পূর্ণ কার্য্যকারী করার ও বিশুদ্ধ অবস্থায় রাখার প্রণালী সকল গোয়ালা জানে না। সেজন্য সকলে উত্তম দধি প্রস্তুত করিতে পারে না। ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নির্ণয় করিয়াছেন যে, দধির মধ্যে দধির উদ্ভিজ্জাণু (Streptothrix Dadhi) তাড়ির উদ্ভিজ্জাণু (Yeast cells) এবং অপরাপর অল্পবিস্তর ক্ষতিকারক জীবাণু সকল বর্ত্তমান থাকে।

বিশুদ্ধ দধি।

বিশুদ্ধ দধি কেবলমাত্র দধির উদ্ভিজ্জাণু বৃদ্ধির দ্বারা দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত হয়। ইহা ভিন্ন অন্য কোন জীবাণু দধিতে থাকিলে সে দধিকে বিশুদ্ধ বলা যায় না।

বিশুদ্ধ দধি প্রস্তুতের নিয়ম।

বিশুদ্ধ দধি প্রস্তুত করা অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার। কারণ সামান্য অসাবধানতাতেই বায়ু হইতে ধূলিকণার সহিত অনিষ্টকারী বীজাণু সকল দধিতে আসিয়া পড়ে এবং বংশ বৃদ্ধি করে। নিম্নলিখিত উপায়ে বিশুদ্ধ দধি প্রস্তুত করিতে হয়।

যে পাত্রে দধি প্রস্তুত করা হইবে তাহা ও একটী চামচ জলে উত্তমরূপে ফুটাইয়া লওয়া উচিত। অপর একটী পাত্রে দুগ্ধ সম পরিমাণ জলের সহিত ফুটাইয়া নির্জল করিবে পরে পূর্ব্ব লিখিত পাত্রে ঢালিয়া ঢাকিয়া

রাখিতে হইবে। দুগ্ধের উত্তাপ কমিয়া মনুষ্য দেহের উত্তাপানুযায়ী হইলে পূর্ব্বলিখিত চামচ দ্বারা (Streptothrix Dadhi) দধির বীজাণু (সাঁজো) দুগ্ধে মিশাইয়া দিতে হইবে। পরে পাত্রটী উত্তমরূপে ঢাকা দিয়া উনানের নিকট ৮ হইতে ১২ ঘণ্টা বসাইয়া রাখিলে উত্তম দধি প্রস্তুত হইয়া থাকে। দুগ্ধ পূর্ব্বে উত্তমরূপে না ফুটাইলে, তাহাতে অন্যান্য বীজাণু রহিয়া যায় এবং উত্তম দধি প্রস্তুত হয় না।

ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা নির্ণীত
এদেশের দধিবীজাণু।
(Streptothrix Dadhi)



১০০০ গুণ বর্দ্ধিত।

দুগ্ধেতে কেজিন Casein (ছানা ভাগ) নামক যে পদার্থ তরলভাবে থাকে, তাহা দধিতে চাপ বাঁধিয়া যায়। দুগ্ধস্থিত অধিকাংশ Lactose (দুগ্ধ শর্করা) দধিতে ল্যাক্‌টিক্ এসিড নামক অম্ল পদার্থে পরিণত হয় এবং কিয়দংশ অবিকৃত অবস্থায় থাকে। দুগ্ধস্থিত মাখনের কোনরূপ পরিবর্তন দধিতে লক্ষিত হয় না।

দুগ্ধ ও দধিতে প্রভেদ।

দধির অম্লভাগ পরিপাকের কিয়ৎ পরিমাণে সহায়তা করে। দুগ্ধ কিংবা দধি কোনটী শীঘ্র পরিপাক পায়, নিশ্চিতরূপে তাহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত। একদিকে যেরূপ ল্যাক্‌টিক্ এসিড, অল্প পরিমাণে থাকিলে পরিপাকে সহায়তা করে, অপরদিকে কেজিনের ভাগ চাপ বাঁধিয়া যাওয়ায় দধি অপেক্ষাকৃত গুরুপাক হইয়া উঠে। আবার দধিতে ল্যাক্‌টিক্ এসিড অধিক পরিমাণে থাকিলেও পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত করে। অনেক সময় দধিতে (Streptothrix Dedhi) দধি বীজ ব্যতীত অন্যপ্রকার অনিষ্টকারী বীজাণুও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দধি উদরস্থ হইলে রোগ হইবার সম্ভাবনা।

রাসায়নিক পরীক্ষা।

খাঁটি দুগ্ধে ও সেই দুগ্ধ হইতে (Streptothrix Dadhi) দধিবীজ দ্বারা প্রস্তুত দধিতে শতকরা নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া গিয়াছে।

	খাঁটি দুঃ	দধি (দধিবীজ দ্বারা প্রস্তুত)
প্রোটিড	৪.২৮	৪.৭৭ (কেজিন ইত্যাদি)
মাখন	৩.৫	৩.৫৭
দুগ্ধ শর্করা	৩.৯	২.৮ ও .৪ (ল্যাক্‌টিক্ এসিড)
ভস্ম	.৯৮	.৬১
জল	৮৭.৩৪	৮৭.৮৪
		১০০.০০

সুস্থ লোকের পক্ষে দধি ভোজন উপকারী। কারণ দধিস্থিত (Streptothrix Dadhi) দধিবীজাণু অন্ত্র মধ্যস্থ অনিষ্টকারী বীজাণু সকলকে বিনষ্ট করে। পরিমিত দধি ভোজনে সুস্থ ব্যক্তির পরিপাক ক্রিয়ার কোন ব্যাঘাত হয় না। রোগীদের পক্ষে দধিস্থিত কেজিনের

দধি ও ঘোল

ভাগ পরিপাক করা শক্ত। সেই জন্য দধির পরিবর্ত্তে রোগীদিগকে ঘোল খাইতে দেওয়া ভাল। ঘোলেতেও দধি বীজ থাকে। যেখানে ঘোল প্রস্তুত করার অসুবিধা আছে, সেখানে দধি পাতলা কাপড়ের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লইলেই চলিবে। যে সকল রোগীর পেট ফাঁপা ও অন্যান্য পেটের পীড়া আছে, তাহাদের পক্ষে ঘোল পরম উপকারী। বাজারের দধিতে অনেক অনিষ্টকারী বীজাণু অবস্থান করে। সে জন্য কেবল (Streptothrix Dadhi) দধিবীজ দ্বারা প্রস্তুত দধিই ভোজন করা কর্ত্তব্য।

আয়ুর্ব্বেদমতে দধির গুণ।

আয়ুর্ব্বেদে সাধারণতঃ দধির এই সকল গুণ বর্ণিত আছে। দধি-উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি-দীপক, স্নিগ্ধ, কষায়ানুরস, গুরু, অম্লবিপাক, মলসংগ্রাহক এবং ইহা রক্তপিত্ত, শোথ, মেদ ও কফবর্দ্ধক। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রতিশ্যায়, শীতক জ্বর, বিষমজ্বর, অতীসার, অরুচি ও কার্শ্যরোগে প্রশস্ত। ইহা বল ও শুক্র বর্দ্ধক।

অধ্যাপক মেটসনিকফ্।

প্যারিস্ পাস্তুর ইনিষ্টাটিউটের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মেটসনিকফ ও অন্যান্য জীবাণুতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে মনুষ্যের বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহাদের অন্ত্রমধ্যস্থিত জীবাণু সকলের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ৪০ বৎসর বয়সের পরে এই সকল জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং যাহারা পচনক্রিয়াশীল ও খাদ্য দ্রব্যের প্রোটিডের ধ্বংসকারী তাহারা বিশেষভাবে বর্দ্ধিত এবং দলপুষ্ট হয়। আর যখন মনুষ্যের অন্ত্রসমূহের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা হয় অর্থাৎ যখন আমাদের পীড়া হয় তখনও এই সকল পচনক্রিয়াশীল জীবাণু সমূহ বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং নানাপ্রকার রোগের বিষ উৎপাদন করে।

অধ্যাপক মেটসনিকফ মনুষ্যের বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যেমন আমাদের বয়োবৃদ্ধির সহিত এই সকল জীবাণুর সংখ্যা অন্ত্র মধ্যে বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ তাহাদের শরীর নিঃসৃত বিষেরও পরিমাণ বাড়ে তখন তাহাই মনুষ্য শরীরের বার্দ্ধক্য জনক পরিবর্ত্তন সকল আনয়ন করে।

এই সকল ক্ষতিকারক জীবাণুর বৃদ্ধি ও ক্ষমতা কি প্রকারে প্রতিরুদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অধ্যাপক মেটস্‌নিকফ্‌ নির্ণয় করিয়াছেন যে, এই সকল ক্ষতিকারক জীবাণুর বৃদ্ধি ল্যাক্‌টিক এসিড নামক দ্রব্য সামান্য মাত্রায় বন্ধ করে।

ল্যাকটিক এসিড।

কিন্তু এই ল্যাক্‌টিক্‌ এসিড্‌ খাইলে তাহা পাকস্থলীর মধ্যেই রহিয়া যায়। অন্ত্রমধ্যে অর্থাৎ যে স্থানে এই সকল ক্ষতিকারক জীবাণু আপনাদের রাজ্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে সে পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। কিন্তু কি উপায়ে যেখানে আবশ্যক সেই থানেই ল্যাক্‌টিক এসিড্‌ প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার জন্য বহু চিন্তায় তিনি ল্যাক্‌টিক্‌ এসিড জীবাণুর ব্যবহার স্থির করিয়াছে।

যদি এই ল্যাক্‌টিক্‌ এসিড্‌ জীবাণু সকল সরলান্ত্র মধ্যে অবস্থিতি করে ও সেখানে ল্যাক্‌টিক এসিড প্রস্তুত করে তাহা হইলে ক্ষতিকারক জীবাণু সকল বর্দ্ধিত হইতে এবং শরীরে অকালবার্দ্ধক্য ও অন্যান্য রোগ সকল আনিতে পারে না।

ল্যাকটিক এসিডের জীবাণু।

তিনি অনেক চেষ্টা ও পরীক্ষার দ্বারা বুলগেরিয়া এদেশের প্রচলিত টক দুগ্ধের জীবাণুকে বিশেষ কার্য্যকারী এবং মনুষ্যের অন্ত্র মধ্যস্থিত দূষিত জীবাণুনাশক বলিয়া স্থির করেন। এই বুলগেরিয়া প্রদেশস্থ লোকসমূহ টক দুগ্ধ নিত্য আহার্য্যরূপে ব্যবহার করে বলিয়া অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেকে অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে। এই সকল কারণে অধ্যাপক মেটস্‌নিকফ্‌ ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে নিত্য ল্যাক্‌টিক্‌ এসিড্‌ ব্যাসিলস অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করাইলে মনুষ্য দীর্ঘজীবী হয় ও তাহাদের ইন্দ্রিয় সকল বেশ কর্ম্মক্ষম থাকে। এই সকল সত্য আবিষ্কারের সহিত ইউরোপ খণ্ডে এই জীবাণুর প্রচলনও বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বুলগেরিয়া প্রদেশের দধি বীজাণু।

আমাদের দেশের দধির মধ্যস্থিত ষ্ট্রেপ্টোথ্রিক্স দধি নামক যে বীজাণু ডাক্তার

এদেশের দধীবীজাণু

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক নির্ণীত হইয়াছে তাহা বুলগেরিয়া দেশস্থিত প্রচলিত টক দুগ্ধের জীবাণু হইতে অধিক ক্ষমতাশালী। পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় নির্ণীত বীজাণু প্রায় দ্বিগুণ ল্যাক্‌টিক্ এসিড প্রস্তুত করে এবং অনিষ্টকারী বীজাণুদিগকে বিনাশ করে।

কলেরার বীজাণু দধি বীজের সহিত মিশ্রিত হইলে ১২ ঘণ্টার মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ২৪ ঘণ্টার পরে তাহার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। টাইফয়েড জ্বরের (জ্বরাতিসারের) বীজাণু ধ্বংস হইতে ৪৮ ঘণ্টালাগে।

অনেকেরই বিশ্বাস যে উত্তম দধি খাইলে দধিবীজের সকল উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

দধিতে এই দধিবীজ ছাড়া শতকরা প্রায় দুইভাগ ল্যাক্‌টিক এসিড থাকে। এই ল্যাক্‌টিক্ এসিড আমাদের শরীরে অন্যান্য অম্লবর্গের ন্যায় ক্রিয়া করে। সর্দ্দি, কাশী, বাত, ও তজ্জনিত বেদনাও বৃদ্ধি করে। যদি পাকস্থলীতে অত্যধিক অম্ল ক্ষরণ রোগ বর্ত্তমান থাকে তাহাও বৃদ্ধি পায়। এই সকল কারণে সদাসর্ব্বদা রোগীকে বা সুস্থ লোককে দধি খাইতে দিলে উপরিলিখিত উপসর্গগুলির আবির্ভাব হয় এবং শরীরের মধ্যে অন্যান্য ব্যাধিও উপস্থিত হয়।

আজকাল ডাক্তার ও সাধারণ লোকের মধ্যে দধির যেরূপ বহুল প্রচলন

নিষেধ।

আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে কি কি অবস্থায় দধি সেবন অনুচিত, তাহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

(১) কাহারও দুগ্ধ বা দধি মোটেই সহ্য হয় না।

(২) দধি খাইলে অনেকের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না।

(৩) কোন কোন অম্ল রোগীর অল্প পরিমাণ দধি সেবনেও রোগ বৃদ্ধি পায়।

(৪) অন্ত্র সম্বন্ধীয় অনেক রোগেও দধি বা দুগ্ধ হানিকর।

(৫) সর্দ্দি কাশী হইলে দধি সেবন উচিত নহে। কারণ ইহাতে সর্দ্দি ভাল উঠিতে পায় না।

(৬) কোন কোন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর দধি সেবন করিলেই জ্বরের আক্রমণ হইতে দেখা যায়।

(৭) বাতগ্রস্ত রোগীর দধি সেবনে বেদনাদি বৃদ্ধি পায়।

দধি যে অপকারী তাহা দধিস্থিত কেজিন এবং ল্যাক্‌টিক্ এসিডের জন্য। তবে দধি বীজের এরূপ কোন অপকারিতা নাই বলিয়াই চিকিৎসায় ইহার এত অধিক প্রচলন।

রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না। ভোজন করিতে হইলে ঘৃত, চিনি, মুদ্গ যুষ,

আয়ুর্ব্বেদ মতে দধির নিষেধ।

মধু বা আমলকীর রস ইহাদের কোন একটী মিশ্রিত না করিয়া বা উষ্ণ না করিয়া পান করিবে না। অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্য সংযুক্ত বা উষ্ণ করিয়া দধি পান করিবে। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে রাত্রিতে দধি ভোজন প্রশস্ত নহে কিন্তু ঘৃত ও জল সংযুক্ত করিয়া পান করিলে দোষ হয় না। রক্তপিত্ত ও কফোত্থ রোগে দধি সেব্য নহে।

উপরোক্ত কারণে যখন শরীরের উপকারের জন্য দধি ভোজন আবশ্যক হয় তখন দধির পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ দধিবীজ সেবন করা সর্ব্বতোভাবে ফলদায়ক।

সম্প্রতি পণ্ডিতেরা প্রমাণিত করিয়াছেন, ইউরোপ খণ্ডে যে দধিবীজের বটিকা

দধিবীজের বটিকা।

প্রচলিত আছে এবং যাহা আমাদের দেশে বহুল পরিমাণ প্রচলিত হইয়াছিল তাহা উত্তম নহে, তাহার সেবনে ক্ষতি ভিন্ন কোন প্রকার উপকার ছিল না।

বিশুদ্ধ ও তেজস্কর দধিজীব।

সেই জন্য কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ও তেজস্কর দধিবীজ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। এইরূপ দধিবীজের দ্বারা নানা প্রকার রোগ আরোগ্য হয়।

আমাদের শরীরাভ্যন্তরে পচনক্রিয়া জনিত যত প্রকার রোগ হয় এই দধিবীজ নিয়মিত ব্যবহার করিলে তৎসমুদয় আরোগ্য হয়। ইহা ব্যবহারে পাচনক্রিয়াশীল জীবাণু সমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায় পচনক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ হয়।

কচি ও কাঁচা আম।

এদেশে গ্রীষ্মকালে কাঁচা আমের ব্যবহার বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে।

১। **কচি আম**—ইহা অল্প টক, ইহার ঝোল অতি সুস্বাদু ও মুখ-রুচিকর। অতি আগ্রহের সহিত এই আমের ঝোল সকলে খাইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহাতে রুচি বৃদ্ধি হয় কিন্তু ইহা বায়ু ও পিত্তকারক।

"আম্রং বালং কষায়াম্লং রুচ্যং মারুতপিত্তকৃৎ।" ইতি দ্রব্যগুণ।

২। **কাঁচা আম**—ইহা অম্বলে, চাটনিতে, কাসুন্দিতে এবং সদ্য কাঁচা অবস্থায় লবণ সহযোগে ভক্ষিত হয়। এই কাঁচা আম পোড়াইয়া উপযুক্ত পরিমাণ জল ও চিনির সহযোগে অতি উপাদেয় সরবৎ প্রস্তুত হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যখন লু বহিয়া থাকে—তখন গ্রীষ্মাধিক্য শান্তির জন্য তথাকার অধিবাসীরা উক্ত প্রকারে প্রস্তুত সরবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

গ্রীষ্মের সময় লোকের শরীরে লু লাগে অর্থাৎ মাধ্যাহ্নিক সূর্যের প্রচণ্ড কিরণের তাপে সর্ব্ব শরীরে ভীষণ জ্বালা উপস্থিত হয়, তখন এই আম পোড়া মাখাইলে সত্বর জ্বালার উপশম হয়।

কা[illegible]শতকরা) নিম্নলিখিত উপাদান গুলি পাওয়া গিয়াছে—

জল (Water)	৯৭·৬৯
ছানাজাতীয় উপাদান (Proteids)	·৫৯
শর্করাজাতীয় উপাদান (Carbohydrate)	৩·৩৮
লবণজাতীয় উপাদান (Salts)	০·২৭
অম্লভাগ (Acidity)	১·৯৩

এই সকল উপাদানের মধ্যে অম্লত্বই কাঁচা আমের বিশেষত্ব। ইহা টারটারিক, সিট্রিক ও মেলিক অম্ল রূপে বর্ত্তমান থাকে। এই টারটারিক অম্লই সাধারণ তেঁতুলের অম্ল।

কাঁচা আমের স্কারভি (Scurvy) রোগ নাশক ক্ষমতা আছে। এজন্য কাঁচা আমের আমসী আজকাল বোতলবন্দী লেবুর রসের পরিবর্ত্তে জাহাজে যথেষ্ট

পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা লেবুর রস অপেক্ষা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় এবং অধিক দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

টারটারিক এসিড্ উগ্র অম্ল—ইহা পাকস্থলীতে গিয়া অম্লত্ব বৃদ্ধি করে এবং যাহাদের অম্বলের অসুখ আছে তাহাদের আদৌ সহ্য হয় না। এই কারণে যাহাদের অম্বল, সর্দ্দি, কাশীর ও বাতের ধাত এবং বালক, বৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তির কদাচ ব্যবহার করা উচিত নহে।

"তরুণস্তু তদত্যম্লং রুক্ষং দোষত্রয়াস্রকৃৎ।"

ইহার অর্থ—তরুণ আম, অত্যন্ত অম্লরস বিশিষ্ট, রুক্ষ, ত্রিদোষ জনক এবং রক্ত দূষক।

উপরোক্ত বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিলে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে কচি আম উপাদেয় ও রুচিকর, ইহার অল্প অম্লত্ব জন্য ব্যবহারে কোন দোষ হয় না এজন্য সকলেই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু কাঁচা আম অধিক অম্লগুণবিশিষ্ট বলিয়া রোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ। তবে সুস্থ অবস্থায় অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিতে পারা যায়। অত্যধিক ব্যবহারে অম্লের উদ্গার, বুকজ্বালা, ক্ষুধামান্দ্য ও অন্যান্য উপসর্গ উপস্থিত হয়।

এইজন্য চিকিৎসকেরা টক কাঁচা আমের যথেচ্ছা ব্যবহার নিষেধ করিয়া থাকেন।

তামাক

ইহার ব্যবহার ও অপকারিতা।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মিত্র, এল, এম্, এস, লিখিত ঃ—

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতিই কোন না কোন নেশার বশীভূত। মদ, আফিং, ভাঙ, সিদ্ধি, তামাক, কোকেন প্রভৃতি দেশভেদে নেশার হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তামাক ব্যতীত কোন এক নেশার জিনিস প্রায় সকল দেশেই চলিতে দেখা যায় না। কিন্তু তামাক প্রায় সকল দেশেই আকার ভেদে চলিতেছে।

আজকাল তামাকের নেশা সভ্যতার নিদর্শন। তবে দেশভেদে ইহা ভিন্ন ভিন্ন আকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব এই সর্ব্বদেশব্যাপী নেশার দোষগুণ সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিলে বোধ হয় সহৃদয় পাঠকবর্গ পাঠ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

শুনা যায় তামাকের আদি জন্মস্থান আমেরিকা। তথা হইতে সার ওয়ালটার র‍্যালে (Sir Walter Raleigh) ইউরোপে লইয়া যান (*)। ইহা হইতেই ক্রমশঃ তামাক পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে।

তামাক একরূপ গাছের পাতা। আকারে এই পাতা প্রায় ১ হইতে ১॥ ফিট্ লম্বা হইয়া থাকে। তামাক গাছ প্রায় দুই হাত উচ্চ হয়। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞদের মতে তামাক গাছ সোলানাসি শ্রেণীভুক্ত (Nat order-Solanacae) আলু, বেগুণ, লঙ্কা, ধুতুরা, কণ্টীকারী, তোমাটো, বেলাডোনা প্রভৃতিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

তামাকের চাষ একটী দুরূহ ব্যাপার। ধানচাষ অপেক্ষা ইহা অতীব অর্থ ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। একটী নেশার উপকরণ উৎপাদন করিতে কৃষকেরা যে পরিশ্রম স্বীকার করে তাহা ধানের চাষে নিয়োজিত করিলে "সোণা ফলিতে" পারে। এ দেশের লোকে পাট, তামাক, প্রভৃতি অল্প আবশ্যকীয় দ্রব্যের চাষ লইয়াই ব্যস্ত অথচ অন্নাভাবে দেশে হাহাকার, এখানে দুর্ভিক্ষ হইবে না ত' কোথায় হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি তামাক প্রায় পৃথিবীর সমস্ত দেশেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশের লোকে প্রধানতঃ চুরুটই ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু এদেশে ইহা নানারূপে ব্যবহৃত হইয়া সহস্র সহস্র লোকের শরীরে আপাত মধুর কিন্তু পরিণামে বিষময় ফল উৎপাদন করিয়া থাকে।

---

* বেশ স্মরণ হয় শৈশবকালে কোন একটী পুস্তকে ইতিহাস বিখ্যাত মহারাণা ভীমসিংহ ও তাঁহার ভুবনবিখ্যাত পত্নী পদ্মিনীর প্রতিকৃতিতে মহারাণাকে সুদীর্ঘ নল বিশিষ্ট আলবোলায় ধূমপান অবস্থায় প্রাচীন রীতি অনুসারে চিত্রিত দেখিয়াছি। এই অঙ্কন কার্য্য যদি ভীমসিংহের জীবদ্দশায় হইয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সার ওয়াল্‌টার র‍্যালের পূর্ব্বে তামাক এদেশে ছিল যেহেতু পদ্মিনী-ভিমসিংহ কাহিনী র‍্যালে সাহেবের জীবনের প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে। কোন কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে 'কলঞ্জ শব্দের উল্লেখ আছে, তার অর্থ ঠিক তামাক কি না জানি না।

এ দেশের লোকে তামাককে কত প্রকারে ব্যবহার করেন তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) তামাক অর্থাৎ মাখা তামাক (অর্থাৎ যাহা হুকায় ব্যবহৃত হয়)।

(২) চুরুট, সিগারেট্ (Cigarette) ও বিড়ি।

(৩) দোক্‌তা। (৪) গুণ্ডি। (৫) জরদা। (৬) সুরতি। (৮) নস্য।

(৮) তামাক পোড়া এবং (৯) সুখা।

১। **তামাক অর্থাৎ মাখা তামাক**—ইহার প্রস্তুত প্রণালী অনেকেই অবগত আছেন ; অতএব বিশেষভাবে ইহা বিবৃত করার আবশ্যক দেখিতেছি না।

লোকে হুকার বা গড়গড়ার সাহায্যে এই তামাকের ধূমপান করেন। সাধারণতঃ হুকার (বা গড়গড়ার) মধ্যে জল দেওয়া হয় ; তামাকের ধূম উক্ত জলের মধ্য দিয়া গমন করিয়া ধূমপায়ীর মুখে প্রবেশ করে। ইহাতে তামাকের ধূমের অপকারিতা অনেক পরিমাণে মন্দীভূত হয় বটে, তবে ইহা যে একেবারে বিষশূন্য হয় এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। কৃষকেরা সাধারণতঃ মোটা তামাক কলিকায় সাজিয়া তাহার ধূমপান করে—হুকার ধার ধারে না।

(২) নিম্নের তিনটী দ্রব্যই এক জাতীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী। (ক) **চুরুট** তামাক পাতা জড়াইয়া তৈয়ারী। সব তামাক পাতায় চুরুট হয় না। বাঙ্গালা দেশে কেবল চট্টগ্রামের তামাকে চুরুট তৈয়ারী হয়। বিখ্যাত বর্ম্মা চুরুট এই চট্টগ্রামের তামাক হইতে প্রস্তুত। (খ) **সিগারেট্** (Cigarette) ইহা চুরুটের মত কেবল তামাকের উপাদানটী পাতলা কাগজে আবৃত। সাধারণতঃ ইহা বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে, তবে আজকাল মুঙ্গেরেও ইহা প্রস্তুত হইতেছে। (গ) **বিড়ি**—ইহা খাঁটি স্বদেশী চুরুট। কলিকাতার অলি গলিতে আজ কাল এই বিড়ি প্রস্তুত হইতেছে। কেবল নিকৃষ্ট জাতীয় তামাকের পাতার কুচি পলাশ পাতায় মুড়িয়া চুরুটের মত তৈয়ারী করিয়া বিক্রীত করে। ইহা আবার মৌরী ও এলাচের দ্বারা সুবাসিত হইয়াও বাঙ্গালি যুবকদের সর্ব্বনাশ সাধনের সহায়তা করে।

(৩) **দোক্‌তা**—এই পদার্থ তামাক পাতা ও কতিপয় পানের মশলা সংমিশ্রণে প্রস্তুত। ইহার গতি অপ্রতিহত যেহেতু ইহা আমাদের সুরক্ষিত অন্তঃপুরেও প্রবেশ

তামাকের অপকারিতা ঃ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি তামাকের কোন গুণ লক্ষিত হয় না ; কিম্বা তিল পরিমাণ উপকারিতা থাকিলেও তাহা তাহার অনন্ত অপকারিতার মধ্যে লোপ পাইয়া যায়।

অনেকে বলেন বৃদ্ধাবস্থায় হুকায় তামাক খাইলে দাঁতের গোড়া শক্ত থাকে এবং হজমও ভাল হয় কিন্তু দন্ত শক্ত করিবার বা হজম ঠিক রাখিবার অন্য কি উপায় নাই ?

স্থূলতঃ তামাকের অপকারিতা তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ঃ—

(ক) শারীরিক অপকারিতা।

(খ) আর্থিক ,,

(গ) সামাজিক বা নৈতিক অপকারিতা।

(ক) তামাক ব্যবহারে শারীরিক অপকারিতা ঃ—শরীরের উপর তামাকের বিষময় কার্য্য দ্বিবিধ ; প্রথমতঃ ইহার বিষ আমাদের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে যে যন্ত্রের সংস্পর্শে আসে তাহাদের বৈলক্ষণ্য জন্মায় এবং দ্বিতীয়তঃ শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পর রক্তের সহিত মিশিয়া স্নায়ুর বৈলক্ষণ্য জন্মাইয়া থাকে।

চুরুট, সিগারেট্ বা বিড়ি খাইলে বা হুকায় ধূমপান করিলে তামাকের ধূম প্রথমে মুখবিবরে প্রবেশ করে, পরে শ্বাসনলীর ভিতর দিয়া ফুস্‌ফুসের ভিতর যাতায়াত করায় তথাকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে (Mucous membrane) প্রদাহ উপস্থিত হয়। ইহার ফলে শুষ্ক কাশী, গলায় বেদনা, কণ্ঠস্বর বিকৃতি এবং হাঁপানির সৃষ্টি হইয়া থাকে। আজকাল এই দেশে যক্ষ্মা রোগ দিন দিন ভয়ানকরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্বাসনলীতে বা ফুস্‌ফুসে ধূমপান জনিত প্রদাহ থাকিলে যক্ষ্মা কীটাণু সহজেই এই স্থানে বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ পায়। তামাক খোরদের মুখের-দুর্গন্ধের বিষয় সকলেই অবগত আছেন।

এইরূপ দোকতা জরদা প্রভৃতি ব্যবহার করিলে তাহাদের রস শ্বাস নলীতে না যাইয়া পাকস্থলীর অভ্যন্তরে প্রদাহের সৃষ্টি করে। তজ্জনিত মুখ দিয়া জল উঠা, অগ্নিমান্দ্য, বদহজম, প্রভৃতি উপ সর্গের উৎপত্তি হয়।

তাহার পর শ্বাসনালী ও পাকস্থলী হইতে এই বিষ রক্তের সহিত মিশিয়া অন্যান্য স্থানে পরিচালিত হয়। এইরূপে ইহা হৃৎপিণ্ডের কার্য্যে বৈলক্ষণ্য ঘটায়, হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে থাকে (Palpitation of heart) এবং বুক কন্ কন্ করে (Heart cramp)। মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া যায়, মাথা ঘুরিতে থাকে, ও মাংস-পেশী শিথিল হইয়া পড়ে। কার্য্যে অনিচ্ছা, অবসাদ, উদ্যমহীনতা, স্মরণশক্তির হ্রাস, শিরঃশূল, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ ক্রমে ক্রমে তাম্রকূট সেবীর দেহ অধিকার করিয়া বসে। অতি মাত্রায় তামাক ব্যবহার করিলে (বিশেষ বর্ম্মা চুরুট খাইলে) চক্ষুর মূল স্নায়ুতে (Optic nerve) প্রদাহ হওয়ায় দৃষ্টি খারাপ হইয়া যায় (Tobacco amplyopia)। চক্ষু চিকিৎসকেরা এইরূপ রোগী প্রায়ই পাইয়া থাকেন।

অধিক পরিমাণে তামাকের ব্যবহারে রসনার আস্বাদন শক্তি কমিয়া যায়; কথনও কথনও কর্ণে বধিরতা আসিয়া পড়ে। আমেরিকার একটী বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন যে, ইহা হইতে পুরুষত্ব হানী হইতে পারে।

অধিক ধূমপান করিলে ওষ্ঠপ্রান্তে ক্যান্সর ঘা (Cancer) হইতেও দেখা যায়।

বঙ্গ-মহিলারা আজকাল দোক্তার বড় ভক্ত। স্ত্রীলোক সাধারণতঃ দুর্ব্বল; তাহার উপর অতিমাত্রায় দোক্তা, সুরতি ব্যবহার করিয়া পুরুষ অপেক্ষা তাঁহারাই স্নায়বিক উপসর্গে বেশী ভুগিয়া থাকেন এবং তাহাদের সৌখিন ব্যাধি হিষ্টিরিয়ার (Hysteria) পক্ষেও এই তাম্রকূট অন্যতম কারণ।

তামাক পোড়া দাঁতে দিলে দন্তপাটির শুভ্রতা নষ্ট হয়; ইহা যে মুখশ্রী অপহারক তাহার আর সন্দেহ নাই।

দোক্তাখোর পাচিকার অসাবধানতা প্রযুক্ত ব্যঞ্জনাদির সহিত তামাক পাতা মিশিয়া দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে তাহা দেখিয়াছি।

নাসিকারন্ধ্রে অত্যধিক নস্য প্রয়োগ করিলে তথায় প্রদাহ জন্মিয়া থাকে, তদ্দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

দোক্তা, চুরুট, সিগারেট ও বিড়ি সর্ব্বাপেক্ষা অপকারী; হুকায় তামাক খাইলে অপেক্ষাকৃত কম অপকার লক্ষিত হয়। নস্য সর্ব্বাপেক্ষা কম অপকারী।

(খ) আর্থিক অপকারিতা—এই অনিষ্টকারী নেশার জন্য দেশ হইতে প্রতিবৎসর কত টাকা যে, বিদেশে চলিয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

যদি প্রতিগৃহে একজন করিয়া তামাক ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা হইলে প্রতিগৃহে মাসে অন্ততঃ ।৷৹ আট আনা ঐ কারণে ব্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা নহে। আজ কাল বাঙ্গালীর ঘরে তামাকের যেরূপ আদর, তাহাতে গড়ে প্রতিগৃহে একজন করিয়া তামাকসেবী ধরিলে হিসাবের অনাদর করা হয়; বিদেশীয় চুরুট ওয়ালারা তাহাদের তৈয়ারী চুরুট এই দেশে বিক্রয় করিয়া লক্ষপতি হইয়া যাইতেছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি যে কলিকাতার কোন বিখ্যাত এটর্ণির মাসে একশত টাকার চুরুট খরচ হইয়া থাকে। গয়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতির তামাক ব্যবসায়ীরা তামাকের ব্যবসায়ে বেশ দু-পয়সা রোজকার করিয়াছেন এবং অদ্যাপি করিতেছেন বটে কিন্তু ইহাতে লাভ কি?—ইহা "রামের বিষয় শ্যামকে" দেওয়া নয় কি? মাঝে থেকে দেশে তামাক নেশার প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে।

দেশময় অন্নকষ্ট। তামাক খাইয়া পয়সা না উড়াইয়া তাহা ক্ষুধার্ত্ত, অন্ধ কিম্বা পঙ্গুকে দান করিলে কি মনে বেশী শান্তি হয় না? অধিকন্তু ইহাতে উক্ত গরিবদিগের বিশেষ উপকার হয় এবং দাতা নিজেও তাম্রকুট ব্যবহার জনিত পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যাধি-সমষ্টির হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন এবং সর্ব্বোপরি ইহাতে অর্থেরও সদ্ব্যবহার হয়।

(গ) সামাজিক ও নৈতিক অপকারিতা—তামাক, পান, মদ প্রভৃতি সবই নেশার উপকরণ। তবে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ অনেক। পানের ব্যবহার এদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিত আছে। বস্তুতঃ আহারান্তে ২।১টী পান খাইলে হজমের পক্ষে সুবিধা হয়। মদ, গাঁজা প্রভৃতি অতীব কদর্য্য নেশা। মাতাল, গেঁজেল প্রভৃতিদের সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্তও বিপজ্জনক।

কোন নেশার দ্রব্যই গুরুজনের সাক্ষাতে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে ইহা একটী গর্হিত কার্য্য। পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, খুড়া প্রভৃতির সম্মুখে এতদ্দেশীয় যুবকেরা তামাক ও চুরুট খান না বটে কিন্তু জননী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী বা খুড়ির সাক্ষাতে তামাক খাইতে কুণ্ঠিত বোধ করেন না। মা, খুড়ি যে স্ত্রীলোক!

তাঁহাদের কাছে আবার লজ্জা কিসের? তাম্রকূটসেবী বাঙ্গালী যুবকদিগকে ধিক! এবং শত ধিক তাঁহাদের নির্লজ্জতাকে! পূর্ব্বেকার লোকে বয়োজ্যেষ্ঠ অপরিচিত হইলেও তাঁহার সম্মুখে ধূমপান করিতে সাহস করিতেন না, কিন্তু আজকাল যুবকেরা পিতা, পিতামহের বয়সীদের সম্মুখে অম্লান বদনে ধূমপান করেন। রেলওয়ে ট্রেনে উঠিয়া যুবকদের আবার ধূমপানের মাত্রা বড় বাড়িয়া যায়। রসিকচূড়ামণি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একস্থানে লিখিয়াছেন যে, "গাড়ির ভিতরে...... বিলাতি বর্জ্জন ব্যাধির নূতন উপসর্গ বিড়ি সকলের মুখে রাবণের চিতার ন্যায় চির-প্রজ্বলন্ত, গন্ধে দশদিক আমোদিত (গন্ধটীও প্রকৃতি সাদৃশ্যে রাবণের চিতার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে)"। এই উক্তিটী অক্ষরে অক্ষরে যথার্থ। গাড়িতে উঠিয়াই অজাতশ্মশ্রু বালক হইতে পক্বকেশ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত একত্রে বসিয়া অম্লানবদনে সিগারেট বা বিড়ি ধরাইয়া ধূমপান করিতে বসিলেন। ধূমপানবিরতের পক্ষে যে এ মজলিশ কিরূপ অপ্রীতিকর তাহা সহজেই অনুমেয়।

শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে আজকাল দোক্তার আদর বাড়িতেছে। দোক্তা, সুরতি ব্যবহারের সময় তাঁহারা বিশেষ কোন লজ্জার পরিচয় দেন না, যত লজ্জা ধূমপান করিবার সময়।

যুবকেরাই দেশের ও সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। তাঁহারা বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান হইয়াও যে ধূমপান ও অন্যান্য কু-অভ্যাস দ্বারা নিজেদের শরীরকে এত অসুস্থ করিতেছেন ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। কেবল নিজেদের শরীর অসুস্থ করা নহে, কারণ ব্যাধিগ্রস্ত লোকের ঔরসজাত সন্তান পরম্পরা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে।

এখন মহিলাদের বিষয় দেখা যাক। এতদ্দেশীয় মহিলারা ধূমপান করেন না বটে কিন্তু দোক্তা, সুরতির আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। দোক্তা যে কেবল আজই আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে তাহা নহে। কবির "তাম্বুলে তামাকু রস, রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁট" এই পংক্তি হইতে বুঝা যায় যে ইহা অন্ততঃ ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বেও এদেশে কৃশাঙ্গীদের মধ্যে বিরাজ করিতেছিল;—অবশ্য এখন ইহা চরমে উঠিয়াছে। আমাদের অন্তঃপুরবাসিনীরা তাম্রকূট সেবায় দিন দিন যে মাত্রায় অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে বোধ হইতেছে যে আর কিছু দিন পরে তাঁহারা হুঁকা গড়গড়ার

সাহায্য গ্রহণ করিবেন। আজকাল দোক্তার কৌটা তাঁহাদের সঙ্গের সাথি। ২।৪ ঘণ্টার জন্য কোথাও যাইতে হইলে পান ও দোকতার কৌটা আঁচলে বাঁধিয়া লওয়া চাই। ছেলে বেলায় ঠাকুর মা প্রভৃতি বৃদ্ধাদের কোন স্থানে যাইতে হইলে হরিনামের মালা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। আজকাল নবীনারা হরিনামের মালা জপাকে অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে জ্ঞান করেন। তাঁহাদের কাছে দোক্তার কৌটা সেইস্থান অধিকার করিয়াছে।

আমাদের পর্দানবিশেরা পানের সহিত দোক্তা খাইবার সময় রঞ্জিত মুখামৃত কিছু বেশী মাত্রায় বর্ষণ করিয়া থাকেন; তাহাতে ঘর বিছানা অতি কদর্য্য হইয়া যায়।

যুবতীরা সাধারণতঃ মা খুড়ির নিকট হইতে দোক্তা খাওয়া শিক্ষা করেন। কিন্তু কোনও পিতা যে পুত্রকে তামাক খাইতে শিখান না ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এবিষয়ে পুরুষ স্ত্রীলোক অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। মা ও মেয়ের মধ্যে গোপনীয় বিশেষ কিছুই না। তাঁহাদের মধ্যে ঠাট্টা বিদ্রুপ যেরূপ চলে তাহা সমবয়স্ক পুরুষদিগের মধ্যে চলে কিনা সন্দেহ, বাপ, খুড়া ত দূরের কথা।

এইরূপে কন্যা মা ও অপরাপর গুরুজনের নিকট হইতে দোক্তা, সুরতি খাওয়া শিক্ষা করিয়া শেষে একটী পুরাদস্তুর তামাক খোর হইয়া উঠেন। পরিশেষে যখন অতি মাত্রায় তাম্রকুট বিষ সেবন জনিত মস্তকঘূর্ণণ, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যাধিতে কন্যারত্ন আক্রান্ত হন তখন সেই মার ভাবনার আর সীমা থাকে না। তখন জননী নানাস্থান হইতে মাদুলী, শিকড় সংগ্রহ করিয়া তদ্দারা দুহিতার বাহুলতা ও গলদেশ পরিশোভিত করেন। কখনও বা শান্তি, স্বস্ত্যয়নাদি করান কোন সময় বা দেবস্থানে “ধরণা” দেওয়া কার্য্যকরেন ও করাইয়া থাকেন।

এখন দেখিতে হইবে কাহারা সমাজের বেশী অনিষ্ট করিতেছেন, তাম্রকুটসেবী পুরুষে না তাম্রকুটসেবী স্ত্রীলোকে।

স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবিনী। সন্তানকে দশমাস গর্ভে ধারণ করার পরে প্রসবান্তে তাহাকে স্তন্যপান ও লালন পালন করায় তাঁহার যে সন্তানের উপর পুরুষ অপেক্ষা বেশী আধিপত্য তাহা সহজেই বুঝা যায়। মাতা সন্তানের এককালে গর্ভধারিণী, ধাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী। গর্ভাবস্থায় পিতার সহিত শিশুর কোনই সম্বন্ধ থাকে না এবং শৈশবা-

বস্থাতেও খুব কম। সন্তান প্রায়ই মাতাকেই অনুকরণ করিয়া থাকে। সকলেই জানেন যে "মাওড়া" ছেলে প্রায়ই অদম্য ও সেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে।

অতএব যে মায়ের সন্তানের উপর এত আধিপত্য সে মায়ের স্বাস্থ্য যে বিশেষ ভাল হওয়া দরকার তাহা আর কাহাকেও বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে না। দশমাস কাল রুগ্ন মা'র শোণিতে বৰ্দ্ধিত হইয়া পরে সেই রুগ্ন মা'র স্তন্যে পরিপুষ্ট হইয়া যে সন্তান সবল ও বলিষ্ঠ হইবে ইহা সম্পূর্ণ অপ্রাকৃতিক। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে কেবল দোক্তাই তাঁহাদের শরীর অসুস্থ করিয়া থাকে। দোক্তা যে তাঁহাদের হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি আধুনিক ব্যাধি আনয়নে বিশেষরূপে সহায়তা করে, এই কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য।

অতএব হে বঙ্গজননীকুল! আপনাদের নিকট করজোড়ে প্রার্থনা এই যে, যগুপি আপনারা প্রাণাধিক পুত্রকে ফুটন্ত ফুলের মত সুস্থ, সবল ও সদানন্দ দেখিতে চান যদি পতি, পুত্র, কন্যা লইয়া সুখে ঘর সংসার করিতে চান, যদি নিজে সুস্থ শরীরে জীবন অতিবাহিত করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ উপভোগ করিতে চান তাহা হইলে দোক্তা সেবন ও অন্যান্য স্বাস্থ্যক্ষয়কারী কু-অভ্যাস সকল ত্যাগ করুণ—তাহাতেই আপনাদের বেশী সুখ, তাহাতেই আপনাদের বেশী লাভ হইবে বুঝিতে পারিবেন। সমাজে আপনাদের স্থান অতি উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ যেহেতু ভবিষ্যৎ বংশাবলীর শিক্ষার ও চরিত্রগঠনের ভার আপনাদের হাতে ন্যস্ত। আপনারা ক্ষণিক সুখের মোহেতে ভুলিয়া নিজেদের মহৎ উদ্দেশ্যর বিনাশসাধন করিবেন না।

সাধারণের কর্ত্তব্য ঃ—আজ কাল তাম্রকুট ব্যবহারের প্রতিকূলে কোনরূপ ধর্ম্মের বা আইনের বন্ধনী নাই। কিন্তু পূর্ব্বেকার লোকে এবিষয় উদাসীন ছিলেন না। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে তামাকের বিরুদ্ধে এক নিয়ম বাহির হয়। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লস্ (Charles II) ইংলণ্ডে তামাকচাস বন্ধ করিয়া দেন। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে রোমের পোপ্ ধর্ম্ম হইতে বহিষ্করণের ভয় দেখাইয়া তামাকের ব্যবহার বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন। এইরূপ পারস্য, জাপান প্রভৃতি দেশেও তামাকের বিপক্ষে আন্দোলন হইয়াছিল।

তামাকে যে কোন উপকারিতা নাই তাহা এখন বেশ বুঝা গেল। শুনা যায়

যাঁহারা তামাক ব্যবহার করেন তাঁহারা উহার অভাবে অসুস্থ বোধ করেন; কিন্তু সেটী প্রধাণতঃ তাঁহাদের মনের ভুল। ইচ্ছা থাকিলে সহজেই তামাক পরিত্যাগ করা যায় এবং কোন অনিষ্টকারী ঔষধ বা অন্য কোন মাদক দ্রব্যেরও সাহায্য লইতে হয় না। আফিঙের মত কোন দ্রব্য খাওইয়া আফিঙখোরের অফিঙ খাওয়ার অভাবজনিত উৎকণ্ঠা দূর করার কথা অনেকের নিকটে শুনিয়াছি।

অযাচিতভাবে স্ত্রীজাতিকে খুব উপদেশ দেওয়া গেল; যেন আমরা পুরুষ মানুষ আমাদের কোনই দোষ নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে দোষ আমাদেরই বেশী।

দোক্তা বা তামাকের অন্য কোনও উপকরণ ব্যবহার করিলে যে শরীর খারাপ হইতে পারে তাহা বোধ হয় অনেক স্ত্রীলোকই অবগত নহেন। পরিবারস্থ সকলের শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখা ত পুরুষেরই উচিত। গৃহিণীর বা সন্তানের কোনরূপ ভুল বা অজ্ঞতা থাকিলে তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া আমাদেরই কার্য্য। আমরা মনে করি যেন অর্থোপার্জ্জনই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। আমরা সন্তানের বা তাহার জননীর কোনরূপ কু-অভ্যাস দেখিলে লজ্জায় বা ভয়ে তাহা সংশোধন করাইবার চেষ্টা করি না। তাই বলিতেছিলাম যে দোষ আমাদেরই বেশী। আমাদেরই শিক্ষার অভাবে বা দোষে তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন। "মাঝি পাকা হইলে নৌকার বিপদ ঘটে না।"

আবার আত্মসংযম বা আত্মবঞ্চনা ব্যতীত কোন মহৎকার্য্য সম্পাদিত হয় না। আমি নিজে ধূমপান করিয়া বা দোক্তা খাইয়া ছেলেকে বা গৃহিণীকে তামাক ব্যবহার না করিতে উপদেশ দিলে সে উপদেশ তত কার্য্যকারী হয় না। শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় আজ্ঞাকারী পুত্র বা সীতাদেবীর মত পতিপ্রাণা বণিতা অতীব দুর্লভ।

তামাকের অপকারিতার বিষয় বুঝাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা গেল। প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যদি একজন মাত্রও তামাক ব্যবহার ত্যাগ করেন তাহা হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

ফুস্‌ফুসের ব্যায়াম।

প্রাণায়াম।

"স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা কোন্‌ ব্যায়াম আবশ্যকীয়"

এই প্রশ্নের উত্তরে নিঃসন্দেহে বলিব।

"গভীর শ্বাস প্রশ্বাস"—আমাদের শরীরের সহিত যে ফুস্‌ফুসের কত নিকট সম্বন্ধ তাহা সকল সময় স্মরণ থাকে না। তিন মিনিট কাল ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া বন্ধ হইলেই আমাদের ইহসংসারের সহিত সকল সম্পর্ক শেষ হয়।

আমরা যদিও জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভাবে সদা সর্ব্বদা জীবন ধারণের জন্য শ্বাস প্রশ্বাস লইয়া থাকি কিন্তু বোধ হয় কেহই ফুস্‌ফুসের ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যবহার করি না।

আমাদের শরীরকে হৃষ্ট পুষ্ট ও সবল রাখিবার জন্য আমরা উত্তম আহার এবং নানাপ্রকার ব্যায়ামের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকি কিন্তু এই শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় ব্যায়াম সম্বন্ধে অনেকেই অমনোযোগী দেখিতে পাই। যাঁহারা গভীর শ্বাস প্রশ্বাস নিয়মমত লইয়া থাকেন তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে ৫ হইতে ১০ মিনিট কাল এই ক্রিয়ার পর শরীর বলিষ্ঠ ও মন প্রফুল্ল হয়। নিয়মিত অভ্যাসে মাংসপেশী সকল বর্দ্ধিত হয়, বক্ষ বিস্তৃত হয় এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়।

সাধারণ ও গভীর শ্বাস প্রশ্বাস।

গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় ফুস্‌ফুস্‌ সাধারণ শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া হইতে পাঁচ গুণ পরিমাণে বেশী বায়ু গ্রহণ করে। এই বায়ু ফুস্‌ফুস্‌ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তন্মধ্যস্থিত বায়ু কোষ (Air cells) সকলকে সম্পূর্ণরূপে স্ফীত করে এবং ইহার সুদূর অংশ সমূহেও পরিচালিত হইয়া তাহাদিগকে ক্রিয়াশীল করে।

গভীর শ্বাস প্রশ্বাসের অনুষ্ঠানে রক্তের সহিত অধিক পরিমাণ অক্সিজেন বাষ্প মিলিত হয়। এই জন্য চিত্ত প্রফুল্ল হয় ও শরীরে নব বলের আবির্ভাব হয়।

শরীর মধ্যে নানাপ্রকার ব্যাধির বীজাণু সকল ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া প্রবেশ করিয়া

জীবনীশক্তি বৃদ্ধি।

থাকে। কিন্তু আমাদের শরীরস্থ জীবনী শক্তি (Vital Power) তাহাদিগকে ধ্বংস করে। সেই জীবনী শক্তি আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া দ্বারা শরীর মধ্যে বর্দ্ধিত হয় এবং মাংসপেশী পরিপুষ্টির সহায়তা করে, সেই জন্য যাহারা যত অধিক পরিমাণে বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা শরীর মধ্যে লইতে সক্ষম হয়, ততই তাহাদের জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পায়, রোগসকল ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং পরমায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর যখন আমাদের শরীর ক্লান্ত হইয়া এলাইয়া পড়ে, তখন বার কয়েক দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিলেই এই ক্লান্তি বিদূরিত হয়।

যখন আমাদের শরীর ক্লান্ত থাকে তখন অন্য কোন প্রকার ব্যায়াম করিলে শরীরের উপকার না হইয়া বরং ক্ষতি হইয়া থাকে এবং কাহারও ক্লান্ত শরীরে কোন প্রকার ব্যায়াম করা উচিত নহে। কিন্তু এই পরিমিত গভীর শ্বাস প্রশ্বাসের অনুশীলনকে কোন ক্রমেই কষ্ট সাধ্য ব্যায়াম বলা যাইতে পারে না।

গভীর শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা চিত্ত স্থির হয়। প্রাণায়াম যোগের প্রথম সোপান।

চিত্ত স্থির হয়।

ইহার দ্বারাই যোগীরা চিত্ত স্থির অভ্যাস করেন। ইহার দ্বারা আমরা পাঠের বা অধ্যয়নের সময় চিত্তস্থির রাখিতে পারি।

যখন আমরা আবেগপূর্ণ হই বা চঞ্চল হই, তখন কয়েকটী গভীর শ্বাস প্রশ্বাস শরীর ও মনকে স্থির ও প্রফুল্লিত করে।

গভীর শ্বাস প্রশ্বাস অর্থাৎ প্রাণায়াম সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত বচনগুলি উদ্ধৃত হইল।

১। প্রাণোবায়ুরিতিখ্যাত আয়ামস্তন্নিরোধনং প্রাণায়াম্।
ইতিখ্যাতো যোগিনাং যোগসাধনম্॥ (তন্ত্রসার)

গভীর শ্বাস প্রশ্বাসকে শাস্ত্রকারেরা এবং যোগীরা প্রাণায়াম বলিয়া থাকেন। প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণরূপ বায়ুর আয়াম (অভ্যাস দ্বারা নিরোধ); অর্থাৎ জীবন বৃদ্ধির উপায়।

২। প্রাণায়ামং বিনা যদ্যৎসাধনং নিষ্ফলং ভবেৎ।
প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্র পূজনে নহি যোগ্যত ॥ (গৌতমীয়ে)

শাস্ত্রকারেরা প্রণায়াম বিহীন ভজন পূজন ইত্যাদিতে নিষ্ফল বলিয়াছেন। এবং প্রাণায়াম না করিয়া কেহই ভজন পূজনে অধিকারী হইতে পারেন না ইহাও বলিয়াছেন।

প্রাণায়াম গুণ সম্বন্ধে কুলার্ণবে এই প্রকার লেখা আছে—

৩। মানসং বাচিকং পাপং কায়িকঞ্চাপি যৎকৃতং।
তৎসর্ব্বং নিদহেচ্ছীঘ্রং প্রাণায়ামত্রয়েণেতু ॥

প্রাণায়ামত্রয় দ্বারা, মানস, বাচিক ও কায়িক সমস্ত পাপ অতি শীঘ্র ভস্মীভূত হয়।

৪। তপস্যা তীর্থযাত্রাদ্যাযমদান ব্রতাদয়ঃ।
প্রাণয়াম তস্যৈব কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥ (গৌতমীয়ে)

তপস্যা তীর্থযাত্রাদি সংযম, দান ও ব্রত সকল প্রাণায়াম ফলের ষোড়শাংশেরও যোগ্য নহে।

৫। প্রাণায়ামাৎ পরং তত্ত্বং প্রাণায়ামাৎ পরং তপঃ।
প্রাণায়ামাৎ পরং জ্ঞানং প্রণায়ামাৎ পরং পদং ॥
(গৌতমীয়ে)

প্রাণায়াম হইতে পরমতত্ব, পরম তপঃ, পরমজ্ঞান এবং পরমপদ লাভ হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে গভীর শ্বাসপ্রাশ্বাস দ্বারা আমরা নিশ্বাস বায়ুর পরিমাণ ৫গুণ বৃদ্ধি করিতে পারি কিন্তু এক দিনেই ইহা সম্ভবপর নহে। ক্রমিক অভ্যাসের ফলে অনেক দুরূহ কার্য্যেও সুসাধ্য হইয়া উঠে। বাহুর মাংসপেশী সকল ক্রমিক অনুশীলনে ৫মণ পর্য্যন্ত ভার উঠাইতে সক্ষম হয়; সেইরূপ ফুস্‌ফুস্‌কেও পূর্ণমাত্রায় কার্য্যক্ষম করিতে হইলে ক্রমিক ব্যায়ামের আবশ্যক।

অধুনা যক্ষ্মা রোগের খুব বেশী প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। গভীর শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা ইহা সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইতে পারে। পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত ফুস্‌ফুসে যক্ষ্মা বীজ কখনও স্থান পায় না। কেবল দুর্ব্বল ফুস্‌ফুস্ বশিষ্ট ও সংকীর্ণ বক্ষবিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

দুর্ব্বল ফুস্‌ফুস্‌ বিশিষ্ট লোকেরা পূর্ণ মাত্রায় বায়ু নিশ্বাসের সহিত শরীরাভ্যন্তরে গ্রহণ করিতে পারে না। এজন্য তাহাদের পরিপাক ক্রিয়া ও পুষ্টি ভালরূপ হয় না। পরিপাক ক্রিয়া ও পুষ্টি উত্তমরূপ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। আমাদের খাদ্য দ্রব্যের কয়লা (Carbon) বায়ুর অক্সিজেন সহিত মিলিত হইয়া শরীর মধ্যে মৃদু দহন ক্রিয়া সম্পন্ন করে এবং এই রাসায়নিক যোগ হইতেই শরীরস্থ সমস্ত শক্তি উদ্ভূত হয়। সেই জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে পরিপাক ও অন্যান্য ক্রিয়ার বিশেষ সাহায্য করে।

পরিপাক ও পুষ্টি।

ফুস্‌ফুসের ক্ষমতা সহজেই পরিক্ষা করা যাইতে পারে। পূর্ণমাত্রায় শ্বাস-গ্রহণ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত তাহা ধারণ করিবে। যদি ইহাতে মস্তক ঘূর্ণিত হয় তাহা হইলে ফুস্‌ফুস্‌কে বিশেষ দুর্ব্বল বলিয়া জানিবে।

ফুস্‌ফুসের ক্ষমতা পরীক্ষা।

অনেকে চিকিৎসকদের নিকট বক্ষ পরীক্ষা করাইয়া থাকেন এবং কোন প্রকার রোগ বা দুর্ব্বলতা আছে কি না প্রশ্ন করেন এবং মতামত জিজ্ঞাসা করেন।

চিকিৎসকেরা সাধারণতঃ বক্ষপরীক্ষা যন্ত্র (Stethescope) দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার শব্দ শুনিয়া এবং হৃৎপিণ্ডের শব্দ স্বাভাবিক বুঝিলেই উত্তম বলিয়া থাকেন কিন্তু পরীক্ষিত ব্যক্তি কতদূর নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারেন তাহার নির্ণয় করেন না।

যখন জীবন বীমার জন্য বক্ষের মাপ লওয়া হয় তখন পরীক্ষার্থীকে যতদূর সম্ভব শ্বাস গ্রহণ করিতে বলা হয় এবং এই শ্বাস গ্রহণের পর বক্ষের মাপ লওয়া হয়। পরে তাহাকে শ্বাস ত্যাগ করিতে বলা হয় এবং যখন শ্বাস পরিত্যাগ শেষ হয় সেই সময়ও পুনরায় মাপ লওয়া হয়। সাধারণতঃ এই মাপ ৩।৪ ইঞ্চি তফাৎ হয়। কিন্তু এই ক্রিয়ায় কোন কষ্ট হইল কি না, মাথা ঘুরিল কি না, তাহা প্রায়ই অনুসন্ধান করা হয় না।

গভীর শ্বাস গ্রহণের কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই মাথা ঘুরিলে ফুস্‌ফুস্‌ দুর্ব্বল ইহা ঠিক করিতে হইবে এবং এই প্রকারে ফুস্‌ফুস্‌কে গভীর শ্বাস দ্বারা পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

চিত্র ১ এবং চিত্র ২ দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবেন। চিত্র ১ ফুস্‌ফুস্‌ বৃদ্ধির পূর্ব্বে বক্ষস্থল সরু ও শরীর কৃশ ছিল। চিত্র ২ পূর্ণমাত্রায় ফুস্‌ফুস্‌ বৃদ্ধি হওয়ার পর লওয়া হইয়াছিল। শরীর বলিষ্ঠ ও হৃষ্টপুষ্ট এক্ষণে তাহার বক্ষঃস্থলের আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে মাংসপেশী সকল বর্দ্ধিত ও বলিষ্ঠ হইয়াছে এবং পূর্ব্বকার আকৃতি হইতে অনেক তরুণ বয়স বোধ হইতেছে।



[চিত্র ১]



[চিত্র ২]

ফুসফুসের ব্যায়াম প্রণালী—ঘেরণ্ড সংহিতায় প্রাণায়াম প্রণালী সম্বন্ধে এই প্রকার বিধি আছে।

নাসাভ্যাং বায়ুমাকৃষ্য বায়ুং বক্ত্রেণ ধারয়েৎ।
হৃদ্‌গলভ্যাং সমাকৃষ্য মুখমধ্যেবিধারয়েৎ ॥

নাসিকাদ্বয় দ্বারা বহিঃস্থ বায়ু ও হৃদয় গল দ্বারা অন্তঃস্থ বায়ু ধীরে ধীরে সমাকর্ষণ পূর্ব্বক মুখমধ্যে ধারণ করিবে।

"আশক্তিকুম্ভং কৃত্বা ধারয়েদবিরোধতঃ"। ঘেরণ্ড সংহিতা।

এইরূপে অনায়াসে যে পর্য্যন্ত ধারণ করিতে পারা যায়, সেই পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে ত্যাগ করিবে।

প্রণায়ামের শরীরের উপর ফলাফল সম্বন্ধে লিখিত আছে।

উজ্জায়ী কুম্ভকং কৃত্বা সর্ব্বকার্য্যানি সাধয়েৎ।
নভবেৎ কফরোগশ্চ ক্রূর বায়ুরজীর্ণকং॥
আমবাতক্ষয়ঃ কাসো জ্বরঃ প্লীহা ন বিদ্যতে।
জরামৃত্যু বিনাশায় চোজ্জায়ীং সাধয়েন্নরং॥

উজ্জয়ী কুম্ভক (অর্থাৎ বায়ুধারণ) করিলে সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। এবং কফরোগ, দুষ্টবায়ু, অজীর্ণ, আমবাত, ক্ষয়কাস, জ্বর, প্লীহা, জরা ও মৃত্যু (অকাল মৃত্যু) বিনষ্ট হয়।

আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রমতে ঃ—

১। ফুস্‌ফুসের ব্যায়াম, বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ুতে হওয়া আবশ্যক।

২। নাসিকা দ্বারা আস্তে আস্তে ফুস্‌ফুসে যত দূর বায়ু যায় তাহা টানিয়া লইতে হইবে। ধীরভাবে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া শ্বাস গ্রহণ করিবে। ফুস্‌ফুস্ পূর্ণ হইলে তিন সেকেণ্ড মাত্র বায়ু ধরিয়া রাখিবে (কুম্ভক করিবে) এবং পরে ধীরে ধীরে প্রশ্বাস বায়ু ত্যাগ করিবে। এই ব্যায়ামটী চারি বার অভ্যাস করিবে এবং প্রত্যেক বারে ১ সেকেণ্ড বেশী বায়ু ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে।

এই প্রক্রিয়া প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কয়েকবার অভ্যাস করিবে। যদি কার্য্যানুরোধে সদাসর্ব্বদা রুদ্ধ বায়ুতে থাকিতে হয় তাহা হইলে অবসর পাইলেই মুক্ত বায়ুতে যাইবে এবং তথায় এই প্রক্রিয়া করিবে। এই প্রক্রিয়াই ফুস্‌ফুসের আয়তন বৃদ্ধির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জানিবে।

৩। এই ব্যায়ামের সময় মনকে চিন্তাশূন্য রাখিবে। কেবলমাত্র এই চিন্তা থাকিবে যে এই ব্যায়াম ক্রিয়া দ্বারা বায়ু হইতে "জীবনী শক্তি" সংগ্রহ করিয়া শরীরে সঞ্চিত করিতেছি।

৪। এই ব্যায়াম দ্বারা শরীরকে কদাচ ক্লান্ত করিবে না।

এই প্রকার নিয়মমত ফুস্‌ফুসের ব্যায়াম অভ্যাস ও পালন করিলে শরীরে নানা প্রকার মঙ্গলকর পরিবর্ত্তন আসিবে।

এই পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে হইয়া থাকে। হঠাৎ কোন পরিবর্ত্তন বোধ করা যায় না। ইহাদ্বারা সমুদয় শরীর ও মন উৎফুল্ল হইয়া থাকে। রোগ নিবারণ ক্ষমতা শত গুণে বৃদ্ধি পায় এবং সুস্থ ও সুদীর্ঘ জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে।

ক্রোধের অপকারিতা।

ক্রোধ ষড়রিপুর মধ্যে অন্যতম। মত্ততাকে প্রশ্রয় দিলে যেমন তাহা ব্যাধিরূপে পরিণত হয় সেইরূপ ক্রোধকে প্রশ্রয় দিলে ইহাও একটা ব্যাধিস্বরূপ হইয়া উঠে। মদ্যপায়ীরা যেরূপ বলিয়া থাকে "মদ না খাইলে চলে না" সেইরূপ ক্রোধী ব্যক্তিরাও বলিয়া থাকে "কোন ক্রোধোদ্দীপক ব্যাপার দেখিলে ক্রোধ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।" প্রথমতঃ ভয়ঙ্কর ক্রোধজনক বিষয় না দেখিলে তাহাদের ক্রোধের সঞ্চার হয় না। কিন্তু ক্রমে তাহারা সামান্য কারণেই ক্রোধে অধীর হইয়া পড়ে ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা লোপ পাইয়া সে স্থলে সামান্য কারণে ভীষণ ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

কাহারও ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। কারণ ইহাতে উদ্যম ও স্নায়ু শক্তির হ্রাস এবং আত্ম সংযম শক্তির বিনাশ হয়। ক্রোধী বলিয়া পরিগণিত হওয়াতে সুযশ চলিয়া যায়। ইহার দ্বারা চরিত্রের হানি হয় এবং সামাজিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়ে। ক্রোধীর নিকট কোনরূপ সুখভোগ ভাল লাগে না। ক্রোধে স্মৃতি শক্তির হ্রাস হয় বলিয়া কোন কার্য্য ধৈর্য্যের সহিত করা যাইতে পারে না। এই দোষেই বন্ধুগণ বিরক্ত ও শত্রুগণ সন্তুষ্ট এবং নিজের প্রতি হেয়জ্ঞান উপস্থিত হও। ইহা মানসিক শক্তিকে খর্ব্ব করে এবং তজ্জন্য আমরা সামান্য প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকটেও

পরাস্ত হইয়া যাই। যথার্থই ক্রোধে যাবতীয় কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদনে অকর্ম্মণ্য, সমুদয় মানবোচিত গুণরাশি ধ্বংস এবং অকালে কালগ্রাসে পতিত করে। ক্রোধে শরীর রক্তবর্ণ হইলে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা।

হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক সহজেই ক্রোধের দ্বারা বিচলিত হয়। ক্রোধেতে যে কেবল মাত্র রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ হয় তাহা নহে, ইহাতে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য ধূমপানকারিগণের ন্যায় অনিয়মিতরূপে হইয়া থাকে। সকল বিষয়ে রুক্ষ প্রকৃতি (খিট্‌-খিটে) হওয়াতে স্নায়ু মণ্ডলের অত্যধিক পরিচালন হয়। ইহাতে যে অবসাদ উপস্থিত হয় তদ্দ্বারা আমাদের শারীরিক ও নৈতিক শক্তি নিচয় দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং বৃদ্ধ বয়সে সুখশান্তির অভাব হইয়া থাকে। মানসিক ও শারীরিক শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ এবং ভালবাসা ও পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল উদ্ধত প্রকৃতি ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায়ই পরিলক্ষিত হয় না।

কিন্তু ইচ্ছা করিলে ক্রোধকে জয় করা যাইতে পারে। কোন এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "আমি অতি সহজেই ক্রোধান্বিত হইতাম। ক্রমে আমি এই রিপুর এত বশীভূত হইয়া পড়িলাম যে কোন একটা বিষম ব্যাপার করিয়া ফেলিব বলিয়া আশঙ্কা হইল। তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আর কখনও ক্রোধ করিব না; এইরূপে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া ও সকল বিষয়ে যুক্তির সহিত কার্য্য করিয়া দেখিলাম যে আর ভয়ানক ক্রোধজনক ব্যাপারেও ক্রুদ্ধ হই না। তারপর হইতে এই গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে আর কখনও ক্রুদ্ধ হইয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না।" এইরূপে পরম শত্রু ক্রোধের আক্রমণ হইতে আত্মাকে রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

বিবিধ সংগ্রহ।

আমেরিকায় বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র পাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে। ইণ্ডিয়ানা প্রদেশে রুগ্ন ও বিকলাঙ্গ মনুষ্যের বিবাহ রহিত করিবার জন্য আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। আমাদের দেশে, পাত্র পাত্রীর পিতামাতারা তাঁহাদের সন্তানদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া যেন বিবাহ দেন। ইহা দ্বারা ভবিষ্যতের অনেক দুঃখ কমিয়া যাইবে।

বিলাতের পার্লামেণ্ট মহাসভা হইতে, মনুষ্য এবং জন্তু যক্ষ্মারোগের বীজাণু তত্ত্ব স্থির করিবার জন্য নিযুক্ত রয়েল কমিশন গত বৎসর জুন মাসে তাহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই মন্তব্যে তিন প্রকার যক্ষ্মারোগ বীজাণু স্থিরীকৃত হইয়াছে। ১। মনুষ্য জাত, ২। গব্যাদি পশু জাত, ৩। পক্ষী জাত।

বোম্বাই সহরে (১৬ই নভেম্বর ১৯১১) ম্যালেরিয়া কমিটীর দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। সারজন্ জেনারেল্ সি, পি, লিউকিস্ সভাপতি ছিলেন। তিনি ম্যালেরিয়া প্রতিষেধ সম্বন্ধে অতি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। অন্যান্য অনেক ডাক্তারেরাও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র বসু রায় বাহাদুর ম্যালেরিয়া মশকের অণ্ডোদ্গতকীট (larva) বিনাশের এক অতি সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাকস পাতা আমাদের দেশে সকল স্থানেই প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই কাঁচা বাকসের পাতা যদি মশক (larva) বিশিষ্ট জলে প্রক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে সেই সকল অণ্ডোদ্গত কীটেরা (larva) মরিয়া যায় এবং জলেও কোন দোষ হয় না। বাকস পাতায় কেবল উগ্র গন্ধ আছে কিন্তু কোন বিষাক্ত ক্রিয়া নাই।

সাধারণতঃ কেরোসিন তৈল এই সকল মশক (larva) বিশিষ্ট ডোবায় দিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহার জন্য কিছু সামান্য খরচ হইয়া থাকে। গৃহস্থেরা বিনা খরচে বাকস পাতা ডোবায় ফেলিয়া মশক বংশ ধ্বংস করিতে পারিবেন। ইহা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

গ্রন্থপ্রাপ্তি ও সমালোচনা।

"গৃহচিকিৎসা"—দ্বিতীয় সংস্করণ। বহুদর্শী ডাক্তার শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রকাশক রায় এণ্ড কোং; ৭৯।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য ১।০।

ইহা একখানি পারিবারিক চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক। বাঙ্গালা ভাষায় এই শ্রেণীর পুস্তক প্রায় নাই বলিলেই চলে এবং এই "গৃহচিকিৎসা" যে সেই অভাব পূরণের জন্য লিখিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার এই বিশাল চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রায় সকল রোগ এত সংক্ষেপে সুন্দর ও সরলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার বিশেষ কৃতীত্বের ও চিকিৎসাশাস্ত্রের বুৎপত্তির পরিচায়ক। এক্ষণে ইহা যাঁহাদের জন্য লিখিত হইয়াছে তাঁহারা সম্যক্ উপকার লাভ করিলেই আমরা সুখী হইব। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

—o—

"ব্যবসা ও বাণিজ্য" মাসিক পত্র—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু সম্পাদিত। কলিকাতা ৩৫ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৩।৵০ আনা।

আমরা প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। বাঙ্গালী চাকুরীজীবি, ব্যবসা বাণিজ্যের বড় ধার ধারে না। এই বঙ্গদেশের যত ব্যবসা-বাণিজ্য অন্য দেশীয় লোকেরা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। যাহা কিছু পূর্ব্ববঙ্গে ছিল তাহাও হস্তান্তর হইতেছে। এক্ষণে বাঙ্গালীর ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে সম্যক্ শিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য। এই "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকাখানি উপযুক্ত মূহূর্ত্তে বঙ্গদেশের মহা অভাব দূর করিবার জন্য এবং মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য বাহির হইয়াছে। ইহা বঙ্গের প্রত্যেক গৃহে গৃহে ধর্ম্মপুস্তকের ন্যায় পঠিত হউক এবং বাঙ্গালির প্রাণে ব্যবসা-বাণিজ্য লিপ্সা জাগ্রত করুক। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই পত্রিকার বহুল প্রচার ও উন্নতি কামনা করি।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্"।

প্রথম বর্ষ } আষাঢ় ১৩১৯ সাল { তৃতীয় সংখ্যা।

খাদ্যের সহিত শরীরের সম্বন্ধ।

জীবনধারণের জন্য প্রাণী মাত্রেরই খাদ্যের আবশ্যক। জন্তুগণ এবং অসভ্য মনুষ্যেরা স্বভাবজাত খাদ্যদ্রব্যাদির উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে কিন্তু সুসভ্য মনুষ্য রন্ধনাদির দ্বারা নানাপ্রকার উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে এবং এই সকল মুখপ্রিয় দ্রব্যের অপরিমিত ব্যবহারে স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া রোগগ্রস্ত হইতেছে। গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন সভ্যজগতে স্বল্পায়ুতার একটী প্রধান কারণ।

আজ প্রায় ৩০ বৎসরের কথা আমি যখন প্রথম চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করি তখন খাদ্য সম্বন্ধে কোনই আলোচনা দেখা যাইত না। কিন্তু অধুনাতন সকল দেশেই খাদ্য সম্বন্ধে চর্চা হইতেছে। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশেও কিছু কিছু চর্চা আরম্ভ হইয়াছে।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শরীরতত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক ম্যাকে সাহেব এবং তাঁহার সুযোগ্য সহকারীগণ ডাক্তার লালমোহন ঘোষাল, ডাক্তার সতীশ চন্দ্র বন্দ্যো-

পাধ্যায় এবং ডাক্তার মদনমোহন দত্ত আমাদের দেশীয় খাদ্যাদি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন।

খাদ্যের উপাদান উৎকৃষ্ট হইলে এবং উপযুক্ত পরিমাণে থাকিলেই যে আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে এরূপ নহে, কারণ খাদ্যের ফলাফল ব্যক্তিগত রুচি, স্বাস্থ্য ও অগ্নিবলের উপর নির্ভর করে। যে খাদ্য এক ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী অন্যের পক্ষে তাহা উপযোগী না হইতে পারে।

আজ প্রায় ৩০০০ বৎসরের কথা যখন জগতের সভ্যতা তিমিরগর্ভে নিহিত ছিল, যখন অন্যদেশের মনুষ্যেরা বস্ত্রাচ্ছাদন করিতে পর্য্যন্তও জানিত না, শীকারলব্ধ আম-মাংস ও গাছের ফলমূলাদি মাত্র জীবন ধারণের উপায় ছিল, তখন হিমালয়ের প্রান্তদেশে বসিয়া আর্য্য ঋষিরা কেবল খাদ্য সম্বন্ধে বিচার করিয়াই নিরস্ত হন নাই। তাঁহারা অগ্নিবল, শরীরের ক্ষমতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়া, খাদ্যের পরিমাণ ও বিভাগ নির্ণয় করিয়াছিলেন।

মহর্ষি চরক বলিতেছেন :—

"মাত্রাশী স্যাৎ। আহার মাত্রা পুনরগ্নিবলাপেক্ষিণী। যাবদ্ধ্যস্যাশনমশিতমনুপহত্য প্রকৃতিং যথাকালং জরাং গচ্ছতি তাবদস্য মাত্রাপ্রমাণং বেদিতব্যং ভবতি"।

ইহার অর্থ—ভক্ষ্য দ্রব্য মাত্রা প্রমাণ হওয়া উচিত। কিন্তু এই মাত্রা অগ্নিবল সাপেক্ষ। মাত্রার প্রমাণ এই যে ভোক্ত দ্রব্য বিনা ক্লেশে যথাকালে জীর্ণ হইবে।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে কেবল ভক্ষণ করিলেই শরীরের পুষ্টি হয় না। এই সঙ্গে পরিপাক করা চাই।

জীবন ধারন।

সাধারণের বিশ্বাস যে যত বেশী খাইবে সে তত বেশী হৃষ্ট পুষ্ট ও বলবান্ হইবে। এইরূপে সভ্য সমাজে ও অবস্থাপন্ন লোকদের মধ্যে খাদ্যের পরিমাণ ও গুরুত্ব অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়া নানাপ্রকার রোগের উৎপত্তি হইতেছে।

এই বিশ্বাসের বিপক্ষে আমেরিকার অধ্যাপক চিটেনডেন (Prof. Chittenden) প্রমুখ শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা মনুষ্য শরীরের উপর পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে অত্যধিক আহার জীবন হানিকর।

এই তথ্যই ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি চরক সংকলন করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্য শরীরের ও খাদ্য দ্রব্যাদির রাসায়নিক উপাদান সমস্ত প্রায় একই প্রকারের। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কারবণ, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং গন্ধক ইত্যাদি খাদ্যের এবং মনুষ্য শরীরের প্রধান উপাদান। (শরীরের ⅔ অংশ জল এবং খাদ্যেও প্রায় এই পরিমাণ জল থাকে)। খনিজ পদার্থ প্রায় শতকরা ছয় ভাগ উভয়েই বর্ত্তমান থাকে।

পৃথিবীর নানা স্থানে অসংখ্য প্রকারের খাদ্য দ্রব্য ব্যবহৃত হয় কিন্তু তাহাদের আবশ্যকীয় উপাদান সকল নিম্নলিখিত বিভাগের অন্তর্গত করা যাইতে পারে।

খাদ্যের বিভাগ।

১। প্রোটিড বা আমিষ জাতীয়।

২। চর্ব্বি বা স্নেহ জাতীয়।

৩। কার্ব্বোহাইড্রেটস, শর্করা বা শালীজাতীয়।

৪। লবণ জাতীয়।

৫। জল।

উপরোক্ত আহার্য্য দ্রব্য ব্যতীত চা, কাফি এবং আচারও খাদ্য দ্রব্য রূপে ব্যবহৃত হয়—যাহারা কেবল ক্ষুধার উদ্রেক করে কোন প্রকার পুষ্টি সাধন করে না।

প্রত্যেক বিভাগের কার্য্য।

১। প্রোটিড বা আমিষ জাতীয় খাদ্যের গুণ।

(ক) দৈহিক উপাদান সকল প্রস্তুত করে এবং শরীরমধ্যে যে ক্ষয় হয় তাহা পূরণ করে।

(খ) শরীরস্থ দহন ক্রিয়া নিয়মিত করে।

(গ) শরীরে তাপ উৎপাদন করে।

এই প্রোটিড দুগ্ধে কেজিন রূপে, ডিম্বে অণ্ডলাল রূপে, মাংসে মায়োসিনোজেন এবং ডালে লেগুমিন রূপে বর্ত্তমান আছে।

২। স্নেহ জাতীয় দ্রব্য—চর্ব্বি ও তৈল রূপে খাদ্যদ্রব্যাদির মধ্যে দৃষ্ট হয়। চর্ব্বি মৎস্য মাংস ইত্যাদিতে এবং তৈল উদ্ভিজ্জ পদার্থে পাওয়া যায়।

স্নেহ জাতীয় খাদ্যের গুণ ঃ—

(ক) শরীরে চর্ব্বি প্রস্তুত করে।

(খ) শরীরে উত্তাপ ও তেজ উৎপাদন করে।

আমাদের শরীরের শতভাগের ১৫ ভাগ চর্ব্বি। কোন কোন ব্যক্তির শরীরে অত্যধিক চর্ব্বি বৃদ্ধি দেখা যায়। কিন্তু ইহার কারণ অদ্যাবধি সবিশেষ স্থিরীকৃত হয় নাই।

৩। শালী জাতীয় (শ্বেতসার ও চিনি) খাদ্যই আমাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা স্নেহ জাতীয় খাদ্যের ন্যায় কার্য্য করে এবং তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহাদের কার্য্য—

(ক) চর্ব্বি প্রস্তুত করা।

(খ) শরীরের উত্তাপ এবং তেজ উৎপাদন করা।

৪। লবণ জাতীয়—আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নানা জাতীয় লবণ আবশ্যক হয়। ফল ও তরকারি ইত্যাদিতে যে সকল লবণ থাকে তাহা আমাদিগের শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। লবণ খাদ্যদ্রব্যে অল্প পরিমাণে বা একেবারে না থাকিলে স্কার্ভি রোগ উপস্থিত হয়। ফলমূলাদি এবং টাট্কা শাকসবজীর যদিও পুষ্টিকারিতা অতি অল্প তথাপি আমাদের খাদ্য দ্রব্যাদি হইতে ইহাদের বাদ দেওয়া চলে না।

লবণ (Common salt)—আমাদের জীবন রক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ আবশ্যকীয়। কারণ আমাদের মুখনিঃসৃত লালা ও পাকস্থলী নিঃসৃত রসের পরিপাক শক্তি লবণের উপর নির্ভর করিতেছে।

চূণ, ফস্ফরিক এসিড্, পটাশ এবং সোডা আমাদের শরীরের জন্য আবশ্যকীয়। গন্ধক মাংস জাতীয় খাদ্যে বর্ত্তমান থাকে। লৌহ অল্প পরিমাণে শরীরস্থ সকল উপাদানেই পাওয়া যায় এবং ইহা রক্তের প্রধান উপকরণ।

৫। জল—২ সের হইতে ৩ সের পর্য্যন্ত আমাদের জীবন ধারণ জন্য অত্যাবশ্যকীয়। যদিও শরীর মধ্যে জলের কোন রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় না কিন্তু অন্যান্য সকল প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্যই ইহার প্রয়োজন। শরীর মধ্যস্থিত কোন উপাদানই স্বাভাবিক অবস্থায় জল বিনা থাকিতে পারে না।

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান সমূহ শরীর মধ্যে কি প্রকার কার্য্য করে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল :—

আমিষ জাতীয় ছানা, ডিম, মাংস, রোলাম ইত্যাদি।	দৈহিক উপাদান প্রস্তুত কারক	
স্নেহ জাতীয় মাংসের চর্ব্বি, তৈল, মাখন ইত্যাদি।	চর্ব্বিরূপে সঞ্চিত থাকে।	ইহারা সকলেই ইন্ধনের কার্য্য করে ও তেজ উৎপাদন করে এবং এই তেজ শরীরের উত্তাপ ও কার্য্য করিবার ক্ষমতারূপে আমরা অনুভব করিয়া থাকি।
৩। শালী জাতীয় চিনি, শ্বেতসার ইত্যাদি।	চর্ব্বিতে পরিণত হয়।	

৪। খণিজ পদার্থ ফসফেট অফ লাইম, পটাশ, সোডা ইত্যাদি লবণ—লৌহ। — অস্থি প্রস্তুত করে এবং পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে।

এক্ষণে আমরা খাদ্যের মাত্রা অর্থাৎ পরিমাণ ব্যতিক্রমে শরীরের কি অবস্থা হয় বিচার করিব :—

আমাদের শরীরকে ষ্টীম ইঞ্জিনের সহিত তুলনা করিলে এই বিষয়টী সম্যক্ বোধগম্য হইবে। ষ্টীম ইঞ্জিনের সহিত আমাদের শরীররূপ যন্ত্রের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। ষ্টীম ইঞ্জিন চালাইবার জন্য যেরূপ কয়লার আবশ্যক আমাদের শরীরকেও কার্য্যকারী রাখিতে হইলে সেইরূপ খাদ্যের আবশ্যক। ষ্টীম ইঞ্জিনের চুল্লিতে কয়লা পোড়ান হয় (অর্থাৎ কয়লার সহিত বায়ুস্থিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ হয়) এবং এই কয়লা হইতে উৎপন্ন তেজই বয়লারস্থিত জলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া ইঞ্জিনকে চালিত করে। আমাদের শরীরাভ্যন্তরেও এইরূপ দহন ক্রিয়া অনবরত চলিতেছে। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি তাহা পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে জীর্ণ হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং রক্তের দ্বারা শরীরের বিভিন্ন অংশে নীত হইয়া অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয়। এই অক্সিজেন বায়ু হইতে নিঃশ্বাস দ্বারা সংগৃহীত হইয়া রক্তের সহিত শরীরের বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত হইয়া থাকে। অক্সিজেনের

সহিত খাদ্যের এই রাসায়নিক সংযোগ হইতে উৎপন্ন তেজই আমাদের শরীরের তাপের ও সর্ব্বপ্রকার শক্তির উৎপাদক।

ইঞ্জিনে অল্প কয়লা দিলে ইঞ্জিন যেরূপ অধিকক্ষণ চলে না সেইরূপ আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যাদি না পাইলে শরীর অধিকক্ষণ কার্য্য করিতে পারে না। খাদ্য দ্রব্যের অভাবে মনুষ্য বাঁচিতে পারে না।

খাদ্য দ্রব্যের যে অংশ শরীরের কাজে লাগে না তাহা মল, মূত্র ঘর্ম্ম ইত্যাদিরূপে শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। অধিক আহারের জন্য শরীরস্থ যন্ত্রাদির (মূত্রগ্রন্থি ইত্যাদি) কার্য্য অযথা বাড়িয়া যায় এবং ফলে এই সকল যন্ত্র অল্পেতেই বিকল হইয়া পড়ে। মধুমূত্র (Diabetes), বাতরোগ (Gout), মূত্রগ্রন্থি রোগ (Bright' Disease) এই কারণেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সকল দ্রব্যই ব্যবহারের জন্য ক্ষয় হইয়া থাকে। অনেক দিন ব্যবহারের পরে ষ্টীম ইঞ্জিনে যে সকল ক্ষয় হয় তাহা কারিকর দ্বারা মেরামত করাইতে হয় তবে ষ্টীম ইঞ্জিন কার্য্যক্ষম থাকে। সেই প্রকার আমাদের দেহেরও নিত্য ক্ষয় হইতেছে শরীরের এই ক্ষয় পূরণ কার্য্যের জন্য অন্য কোন কারিকরের আবশ্যক হয় না। শরীর নিজেই ইহা করিতে সক্ষম। এইটাই এই শরীররূপ কলের বিশেষত্ব। এই কল চলিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনাআপনি মেরামত করিয়া লয়। এই মেরামত কার্য্য আমিষ জাতীয় (Proteid) খাদ্যের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

এই আমিষ জাতীয় খাদ্য আমাদের শরীরের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় কেবল ইহারই দ্বারা শরীরের গঠন ও ক্ষয়পূরণ হইয়া থাকে। অপর জাতীয় খাদ্য দ্রব্যেরা এ কার্য্য করিতে পারে না। এই আমিষ জাতীয় খাদ্যও অত্যধিক আহার করিলে রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদের কি কি খাদ্য কত পরিমাণে আহার করা কর্ত্তব্য তাহা আমাদের বিশেষভাবে জানা উচিত।

শালী জাতীয় খাদ্য দ্রব্যই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে খাইয়া থাকি; দেশভেদে ইহাদের প্রকার ভেদ হয়। যথা—বাঙ্গালাদেশে চাউল, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গম, বেহারে ভুট্টা, মকাই ইত্যাদি প্রধান খাদ্য। এই শালী জাতীয় খাদ্যের উপর আমাদের প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হয় বটে কিন্তু খাদ্য দ্রব্যাদিকে সকল গুণ বিশিষ্ট

করিতে হইলে এই শালী জাতীয় খাদ্যের সহিত কিছু আমিষ এবং কিছু স্নেহ জাতীয় খাদ্য সংযোগ করিয়া লওয়া উচিত। এইজন্য ইংরাজেরা রুটির সহিত মাখন লাগাইয়া ভক্ষণ করে, আমরা ভাতের সহিত ঘৃত খাইয়া থাকি।

উপরোক্ত খাদ্য দ্রব্যাদির সহিত তরকারি যোগও সকল দেশে ব্যবস্থা রহিয়াছে। যাহারা অতিশয় দরিদ্র, যাহাদের কুটীরের চালে আচ্ছাদন পর্য্যন্ত নাই তাহারাও ভাতের সহিত শাক পাতা ইত্যাদি খাইয়া থাকে। লবণ জাতীয় পদার্থ এই সকল শাক সবজী ও তরকারীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে।

ফলমূলাদিতে লবণের প্রাচুর্য্য হেতু তাহারা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের গুণ আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে একই খাদ্য সকলের পক্ষে সমান পুষ্টিকর নহে। শিশুর বৃদ্ধি পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক অধিক এবং সেই জন্যই শিশুর খাদ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে প্রোটিড (আমিষ জাতীয় উপাদান) থাকা আবশ্যক। যাহারা অধিক কায়িক পরিশ্রম করে তাহাদের খাদ্যে শালীজাতীয় উপাদানের প্রাধান্য দেখা যায়। অত্যধিক শ্রমের পর আমাদের স্বভাবতই মিষ্ট সরবৎ খাইতে ইচ্ছা হইয়া থাকে। এসকিমো প্রভৃতি জাতি অতিশয় শীত প্রধান দেশে বাস করে এবং ইহাদের খাদ্যে চর্ব্বির পরিমাণ অধিক। স্নেহজাতীয় খাদ্যের তাপ উৎপাদিকা শক্তি, শালী ও আমিষ জাতীয় খাদ্য হইতে অনেক বেশী।

পরিমিত পরিশ্রমী বয়স্ক ব্যক্তির খাদ্যে—শতকরা ২০ ভাগ আমিষ জাতীয়, ৬০ ভাগ শালী জাতীয়, ১০ ভাগ স্নেহ জাতীয় এবং ২ ভাগ লবণ জাতীয় পদার্থ থাকা আবশ্যক।

আমরা পূর্ব্বেই খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিচার করিয়াছি। আমাদের কিরূপ খাদ্য ব্যবহার করা উচিত তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা কর্ত্তব্য।

(১) ভোক্তার শরীরের সমস্ত অভাব পূরণ হইলেই খাদ্যকে উত্তম বলা যায়।

(২) খাদ্য সুলভ হওয়া আবশ্যক। যে খাদ্য অসার তাহা সুলভ হইলেও ব্যবহার করা উচিত নহে। খাদ্যের মূল্যের অনুযায়ী সারবান পদার্থ থাকা উচিত। টাকায় আট সের জল মিশ্রিত দুগ্ধ অপেক্ষা টাকায় ৪ সের খাঁটি দুগ্ধ সুলভ।

(৩) যে খাদ্য সুলভ অথচ পুষ্টিকর তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীর উপযোগীতা সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

যক্ষ্মা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিত।

যে ভারত একদিন স্বাস্থ্যবহুল, প্রকৃতির চারু-লীলা-নিকেতন, ঋদ্ধিসম্পন্ন, স্বর্ণপ্রসূ বলিয়া বিশ্ব-বিশ্রুত ছিল, যে পীযূষপূর্ণ ভারতে পীযূষাহরণের জন্য মকরন্দ-লোভী দ্বিরেফকুলের ন্যায় এক কালে দুর্গম "খাইবার পথে" বিদেশীয়গণ আগমন করিত, যে ভারতের সুখৈশ্বর্য্যের বিষয় বিদেশীয় কোবিদকুলেরও বর্ণনার আদর্শস্থল ছিল, যাহার সৌভাগ্য একদিন ত্রিদিববাসীগণেরও ঈর্ষার জিনিষ ছিল, সেই পূতভূমি ভারত আজ কালের কঠোর শাসনে বহুবিধ ব্যাধির আকর ও দৈন্যের ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। দারিদ্র্যের সহিত পীড়ার নিত্য সম্বন্ধ। এসম্বন্ধটীর সত্যতা যেন ভারতে বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে দেশবাসীর ঘোর দারিদ্র্যেই যে স্বর্গোপম স্থান রোগ পিশাচের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং ইহাই বর্ত্তমান ভারতে নানাবিধ রোগোদ্ভব ও ব্যাপ্তির প্রধান ও প্রথম কারণ। শিক্ষার অভাবহেতু লোকের স্বাস্থ্যের প্রতি অমনোযোগ ইহার দ্বিতীয় কারণ। দেশের দারিদ্র্য যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই দেশমধ্যে নানাপ্রকার নব নব ব্যাধি দেখা দিতেছে এবং পুরাতন ব্যাধিসমূহ প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। মৃত্যুসংখ্যা ত্বরিৎ গতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যমরাজের প্রকৃতিপুঞ্জের পরিপুষ্টি ঘটাইতেছে। বস্তুতঃ ভারতের অবস্থা এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যে কি লিখিত আছে, কে বলিতে পারে?

বিউবনিক প্লেগ (Bubonic plague) বিসূচিকা এবং ম্যালেরিয়াই এতাবৎকাল ভারত ক্ষেত্রে আধিপত্য করিতেছিল, এখন যক্ষ্মাও মাথা জাগাইয়া উঠিতেছে। চার পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ভারতের কোনও কোনও প্রদেশে এই ব্যাধি কর্ত্তৃক মৃত্যু সংখ্যা দ্বিগুণ হইতে চতুর্গুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ব্যাধির সহিত জনসাধারণ পূর্ব্ব হইতে পরিচিত ছিল বলিয়া এই ভয়াবহ ব্যাধি তাহাদের ততটা আতঙ্ক বর্দ্ধিত করিতে পারে নাই সত্য কিন্তু ইহা প্লেগ অপেক্ষা কম মারাত্মক নহে। ইহা যেরূপ সংক্রামক ব্যাধি তাহাতে ইহার কোনরূপ প্রতিকার না হইলে অচিরে সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া অতি ভীষণ আকার ধারণ করিতে পারে। প্লেগ, বিসূচিকা যেরূপ কতকটা অপরিহার্য্য ব্যাধি, ইহা তদ্রূপ নহে। পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিলে এই ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। এমন কি এই ব্যাধি নিবারণের চেষ্টা করিলে এককালে পৃথিবী হইতেই এই ব্যাধির মূলোৎপাটিত হইতে পারে, এতদুদ্দেশ্যে আমেরিকাবাসীগণ তদ্দেশ হইতে এই ব্যাধি দূরীকরণের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন ; ইংলণ্ডও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহেন। আমাদের দেশেও ঐরূপ চেষ্টা হওয়া একান্ত আবশ্যক। জনসাধারণের মধ্যে এতদ্বিষয়ক জ্ঞান বিস্তার করিতে পারিলে এই রোগ নিবারণের পক্ষে প্রভূত সাহায্য করা যাইতে পারে।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক কোখ্ (Dr. Robert Koch) যক্ষ্মারোগের ব্যাসিলাস্ (Tubercle Bacillus) নামক এক প্রকার জীবাণু আবিষ্কার করেন। বায়ুতে বিচরণশীল এই সমস্ত জীবাণু নিঃশ্বাসের সহিত ফুসফুসে প্রবেশ লাভ করে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে তথায় অবস্থিতি করিতে থাকে ; ক্রমে বংশবৃদ্ধি করিয়া উহারা তথায় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং ফুসফুসে গহ্বর উৎপাদন করতঃ উহার ধ্বংস সাধন করিতে থাকে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই ব্যাসিলাসই এখন যক্ষ্মারোগের কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইংরাজিতে এই ব্যাধির নাম কনজাম্সন্ অথবা থাইসিস্ (Consumption or Phthisis)। আমাদের দেশে ইহাকেই যক্ষ্মা, রাজযক্ষ্মা অথবা ক্ষয়কাশ বলা হইয়া থাকে।

কোখ্ সাহেবের এই আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজকে যক্ষ্মারোগ চিকিৎসার পথ প্রশস্ত করিয়া দেয় এবং তদবধি ইহা উন্নতির পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া এখন

আশ্চর্য্যরূপে উন্নতি লাভ করিয়াছে। "এই রোগে অবশ্য মৃত্যু" বৈজ্ঞানিকদিগের এই ধারণা এখন তিরোহিত হইয়াছে। তাঁহারা এখন বলেন যে, অনেক স্থলেই ইহা হইতে আরোগ্য লাভ সম্ভবপর, এবং যে সমস্ত অবস্থায় ইহা সম্ভবপর নহে, সেই সমস্ত অবস্থায়ও রোগীর যন্ত্রণার পরিমাণ লাঘব করিয়া তাহার পরমায়ু বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। আধুনিক মতানুসারে নূতন চিকিৎসাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ায় পাশ্চাত্যদেশে এই ব্যাধির মৃত্যু সংখ্যা এখন ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতেছে, এবং জন সাধারণের মধ্যে এতদ্বিষয়ক জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাধির আক্রমণও দিন দিন কমিতেছে। আমাদের দেশে কিন্তু যক্ষ্মারোগের নিদান বহুপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, এখনও তাহার উপর নির্ভর করিয়াই অনেক স্থলে ইহার চিকিৎসা চলিতেছে। ইহার ফলে মৃত্যু সংখ্যা কিছুমাত্র হ্রাস হইতেছে না। অনেক স্থলে রোগী দীর্ঘকালস্থায়ী দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পঞ্চত্ব পাইতেছে। কোনও কোনও স্থলে রোগী তাহার পরমায়ু সহস্র দিন শুনিয়া মৃত্যুচিন্তায় অভিভূত হইয়া দ্রুতবেগে তৎপ্রতি ধাবিত হইতেছে। চিকিৎসার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও কোন সুফলপ্রাপ্তি না ঘটায় বহুরোগী বৃথা অর্থব্যয় জনিত দারুণ মনস্তাপ ভোগ করিতেছে। যদি আধুনিক পাশ্চাত্য উন্নত বিজ্ঞানের সুমধুর অভয়বাণী এবং যক্ষ্মারোগ আরোগ্যের উপায় ইত্যাদি বিষয় এই সমস্ত ব্যক্তির জ্ঞানগোচরে আনা যায়, তাহা হইলে যে, অনেকে দারুণ যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এমতাবস্থায়, ঐ সমস্ত মত আমাদের দেশে বিশদরূপে প্রচারিত হওয়া একান্তই আবশ্যক।

যক্ষ্মারোগী যে গয়ার (কফ, শ্লেষ্মা, Sputum) ফেলিয়া থাকে তাহাতে বহুসংখ্যক ব্যাসিলাস্ বিদ্যমান থাকে। এই সমস্ত ব্যাসিলাসের প্রাণ বড় কঠিন, সামান্য শীত অথবা উত্তাপে ইহাদের কিছুই হয় না। তবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রচণ্ড ভানু-তাপে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই ইহাদের প্রাণ বিনষ্ট হয়। যক্ষ্মারোগীর এই গয়ার শুষ্ক হইয়া ধূলিতে পরিণত হয়, তখন এই সমস্ত ব্যাসিলাস্ বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া ইতস্তত: ঘুরিতে থাকে এবং নিশ্বাসের সহিত আমাদের ফুস্ফুসে প্রবিষ্ট হয়। বায়ুতে ঘূর্ণ্যমান অবস্থায় ইহারা বহুদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে বিউবনিক প্লেগ যেমন ইঁদুর জাতীয় রোগ, এই যক্ষ্মাও তদ্রূপ গোজাতীয় রোগ। এই সমস্ত জীব হইতেই এই ব্যাধি আমাদের ভিতর সংক্রামিত হইতেছে। আমাদের দেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানগণ এই ব্যাধি দ্বারা অধিক আক্রান্ত হয়। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, কোনও কোনও বীজের পরিণতি বিষয়ে কোনও কোনও ক্ষেত্র সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, সেইরূপ যক্ষ্মাবীজ ব্যাসিলাসের বাসের এবং বৃদ্ধির পক্ষেও কোনও কোনও ব্যক্তির ফুসফুস্ সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং কোনও কোনও ব্যক্তির ফুসফুস সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কফাক্রান্ত, দুর্ব্বল এবং কৃশ ব্যক্তিগণের বিশেষতঃ, রক্তপিত্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের ফুসফুস্ ব্যাসিলাসের বাসের এবং বৃদ্ধির উপযুক্ত ক্ষেত্র। সুস্থ, বলবান ব্যক্তিগণের ফুসফুস্ ইহাদের বাসের অনুপযুক্ত। অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িলে বীজ যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ঐ সমস্ত ব্যক্তির ফুসফুসে ব্যাসিলাস প্রবেশ করিলে উহা ধ্বংস মুখে পতিত হইয়া থাকে।

যক্ষ্মারোগ যে একটী সংক্রামক (Contagious) ব্যাধি তদ্বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। তবে ইহার সংক্রামকতা সুস্থদেহ, বিশালোরস্ক ব্যক্তিগণের পক্ষে কার্য্যকারী নহে, কেবল দুর্ব্বল, রোগপীড়িত অল্পায়তবক্ষ মানবের ফুসফুসই সংক্রামকতার পক্ষে কার্য্যকারী হইয়া থাকে। যে সমস্ত ব্যক্তিগণের ফুসফুস্ ইহাদের বাসের অনুকূল, তাহাদের ফুসফুসে এই সমস্ত জীবাণু প্রবিষ্ট হইলে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। ইহা এরূপ ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধি যে বহুদূরদেশ অবস্থিত যক্ষ্মা-রোগীদের হস্ত লিখিত চিঠি দ্বারা অনেকে এই ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে।

In cattle as in man, the disease is not inherited but acquired

যক্ষ্মা প্রকৃত প্রস্তাবে বংশানুক্রমিক (Hereditary) ব্যাধি নহে। কেহ কাহারও পিতামাতা হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে এই ব্যাধি প্রাপ্ত হয় না। তবে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত পিতামাতার সন্তানগণের এই রোগপ্রবণতা থাকে বলিয়া তাহাদের ফুসফুসের সহিত এই সমস্ত ব্যাসিলাসের সংস্পর্শ ঘটিলে এই রোগদ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। পিতা এবং মাতা উভয়েরই এই রোগ থাকিলে তাহাদের সন্তানগণ এই রোগপ্রবণতা বিশেষভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু এই সমস্ত সন্তানগণকেও

কিছুকাল পিতামাতার নিকট হইতে অর্থাৎ ব্যাসিলাসের স্পর্শ হইতে দূরে রাখিয়া তাহাদের ফুসফুসের বল বিধান করিতে পারিলে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। যে সমস্ত ব্যক্তির ফুসফুস্ দুর্ব্বল, বক্ষঃ অপ্রশস্ত, এই রোগ দ্বারা তাহাদেরই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা; পরন্তু, বলবান্ প্রশস্তবক্ষ ব্যক্তিগণের ইহা দ্বারা কখনও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই সমস্ত ব্যক্তি প্রতিদিন শত সহস্র ব্যাসিলাস্ নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিলেও ইহা হইতে তাহাদের বিন্দুমাত্র ভয়ের কারণ নাই।

অধিকাংশ স্থলে ফুসফুসের ঊর্দ্ধাংশই ব্যাসিলাস দ্বারা প্রথম আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে আমরা লিখি, পড়ি, ভ্রমণ করি, শয়ন করি আমরা অন্য যা কিছু করি, তাহার অধিকাংশ কাজেই আমাদের মস্তক এবং স্কন্ধ সম্মুখের দিকে অবনত থাকে। এই কারণে আমাদের ফুসফুসের ঊর্দ্ধাংশ অনেক সময়ই সঙ্কুচিত থাকে এবং সাধারণতঃ শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ কালে এই অংশে বায়ু প্রবেশ করে না। যখন দৌড়াই অথবা জোরে শ্বাস গ্রহণ করি, তখনই এই অংশে বায়ু প্রবেশ করিয়া ইহাকে প্রসারিত করে; সুতরাং ফুসফুসের এই অংশ অধিকাংশ সময় অব্যবহার্য্য অবস্থায় থাকা হেতু এই অংশে ব্যাসিলাস্ প্রবেশ করিলে তথায় বসতি করিবার সুবিধা পায়। সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে এই সমস্ত ব্যাসিলাসের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে হইলে ফুসফুসের ঊর্দ্ধাংশ দ্বারাও শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া এই অংশের বল বিধান করা আবশ্যক। সূচীজীব, মসীজীবী, বর্ণযোজক এবং কার্পেট, গালিচা, পাদুকা, মাদুর ইত্যাদি প্রস্তুতকারী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদা একস্থানে বসিয়া অবনত- মস্তকে কাজ করাতে এই পীড়া হইবার সম্ভাবনা অধিক।

"Fresh air and disease germs are antagonistic," বিশুদ্ধ বায়ুই এইরোগের মহৌষধ। নির্ম্মল বায়ু এই রোগের বিষ সঞ্চারী ব্যাসিলাসগুলির উচ্ছেদ সাধন করিয়া থাকে। বিশুদ্ধ বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ অধিক থাকে এবং এই অক্সিজেনই ইহাদের ধ্বংস সাধনের মূল কারণ। এই হেতু-বাদে যক্ষ্মা-রোগীর পক্ষে সমুদ্রযাত্রা, সমুদ্রোপকূলে অথবা পর্ব্বতোপরি বাস বিশেষ হিতকর।

এই সমস্ত স্থানে সর্ব্বদাই সবেগে অপর্য্যাপ্ত নির্ম্মল বায়ু বহিতেছে। ঐরূপ কোন ভাল স্থানে বসবাস করিতে পারিলে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাধীন থাকিয়া প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিলে দুই তিন মাসের মধ্যে অনেক যক্ষ্মারোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে। কিন্তু দারুণ দারিদ্র্য নিবন্ধন আমাদের অনেকের পক্ষেই ইহা একেবারে অসম্ভব। বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দূরদেশে বাস করাও অনেকের পক্ষে দুষ্কর। এমতাবস্থায় নিজ বাসস্থানে থাকিয়া তাহারা যাহাতে দিবারাত্রি মুক্ত বায়ুতে থাকিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া স্যাঁতসেঁতে ম্যালেরিয়া বিষদুষ্ট স্থানে একদিনের জন্যও থাকা উচিত নহে। নগরে অবস্থানও তাহাদের পক্ষে বিধেয় নহে; যেহেতু নগর জনবহুল বলিয়া এবং কলকারখানার ধূমে নিরন্তর ধূমায়মান থাকা প্রযুক্ত সহরের বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে। সদাসর্ব্বদা গাড়ীঘোড়ার যাতায়াতেও বায়ু নিরন্তর ধূলিকণায় পরিপূর্ণ থাকে। তবে সহরের সকল স্থানই যে ঐরূপ তাহা নহে। সহরের কোন কোন অংশ ভালও থাকে। যাহা হউক, স্বাস্থ্যকর পল্লীগ্রামে বাস করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর। "সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা" পল্লীগ্রামের এখনও সম্পূর্ণ অভাব ঘটে নাই। ঐ সমস্ত পল্লীগ্রামের দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরে সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে মনপ্রাণ স্নিগ্ধকর নির্ম্মল বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। রোগী ঐরূপ স্থানে থাকিয়া যত অধিক কাল বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পারে ততই তাহার পক্ষে হিতকর।

"The Sun-light is a germ destroyer."—সূর্য্যরশ্মি কীটাণু ধ্বংস করিয়া থাকে ও বায়ুর বিশুদ্ধতা সম্পাদন করে। ইহা দৈহিক সন্তাপ এবং রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করিয়া থাকে। "Free exposure to the vivifying influence of sunlight and good air is one of the best blood restoratives"—Burney yeo.

এই সমস্ত কারণে সূর্য্যালোকে অবস্থিতি করা সমস্ত রোগীর পক্ষেই বিশেষ হিতকর। সূর্য্যালোকে মুক্তপ্রান্তরে সমস্ত দিন কাজ কর্ম্ম করে বলিয়াই আমাদের দেশে কৃষককুলের স্বাস্থ্য এত ভাল। আমেরিকায় যক্ষ্মারোগীদের জন্য যে সমস্ত স্বাস্থ্য-নিবাস স্থাপিত হইয়াছে, তথায় তাহাদিগকে ৯টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত রৌদ্রে

রাখা হয়। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের কিরণ যেরূপ প্রখর, তাহাতে ঐ সময় বিশেষতঃ দিবা দ্বিপ্রহরের কালে রৌদ্রে থাকা অনভ্যস্ত বলিয়া অনেকের পক্ষে সহ্য নাও হইতে পারে। তাহাদের ঐ সময় চতুর্দ্দিকে রৌদ্র থাকে এইরূপ কোন বৃক্ষছায়ায় অথবা কোনও আচ্ছাদনের নিম্নে থাকাই যুক্তিযুক্ত। যেন দিবাভাগে আতপ-শোধিত নির্ম্মল সমীরণ সেবনে কোনরূপ অসুবিধা না ঘটে। দিবালোকে বিটপিচ্ছায়ায় অবস্থানই অধিকতর হিতকর। যেহেতু দিবসে তরুরাজি অত্যধিক পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাস ত্যাগ করিয়া থাকে। অক্সিজেনই আমাদের জীবনধারণে এবং যক্ষ্মাবীজ ধ্বংসের প্রধান সহায়। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, যে কোন অবস্থায় শরীরের সমস্ত অংশে রৌদ্র লাগে, সেইরূপভাবে দিবসের মধ্যে কিছুকাল রৌদ্রে থাকা নিতান্ত আবশ্যক ; এবং সম্ভব হইলে তখন ফুসফুসের ব্যায়াম (Lungs or breathing exercise) করা অধিক হিতকর। যক্ষ্মারোগে দেবদারু বৃক্ষের (pine tree) হাওয়া মহোপকারক।

রাত্রিকালেও যাহাতে যক্ষ্মারোগী যথেষ্ট বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পারে তজ্জন্য মুক্তস্থানে অবস্থান ও নিদ্রা যাওয়া, উভয়ই তাহার পক্ষে বিধেয়। যক্ষ্মারোগীদের বাহিরে খোলা স্থানে রাত্রিবাসের নিমিত্ত পাশ্চাত্যদেশে নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে রোগীদের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে এক প্রকার তাবু করা হইয়াছে, তন্মধ্যে থাকিয়া তাহারা প্রচুর বায়ু সেবন করিতে পারে। অথচ তাহাদের দেহে কোন প্রকার তুষারবৃষ্টি, শৈত্যাধিক্য লাগিতে পারে না। রাত্রিবাসের নিমিত্ত আমেরিকায় প্রায় ২৫০৲ মূল্যে কেন্‌ভাস্ (Canvas) দ্বারা ১২ ফিট্ দীর্ঘ, ১২ ফিট প্রস্থ, ৮ ফিট্ উচ্চ এক এক ঘর (Cabinet) করা হইয়াছে। বাহিরে শয়নকালীন রোগীদিগকে তুষারপাত ইত্যাদি হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার কাগজের কম্বল (Paper blanket) প্রস্তুত করা হইয়াছে। যক্ষ্মারোগীদিগের রাত্রিকালে মুক্তবায়ুতে থাকা এবং নিদ্রা যাওয়ার রীতি নীতি এবং আশ্রয় স্থানের বিষয় ("Directions for living and sleeping in the open air" published by the National Association for the study and prevention of Tuberculosis, New York) নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে বিশেষ

ভাবে বর্ণন করা হইয়াছে। তবে তন্মধ্যে শীত প্রধান দেশের পক্ষে যে সমস্ত ব্যবস্থা হইতে পারে কেবল তাহাই লিখিত হইয়াছে। "Open air or Sanitarium Treatment of Pulmonary Tuberculosis (by Dr Rufenhct Walters), নামক পুস্তকেও ইংলণ্ডে যক্ষ্মারোগীদিগের বাসের নিমিত্ত নানা কৌশলে নির্মিত গৃহের বিষয় অতি সুন্দরভাবে বর্ণন করা হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে কেহ ঐ প্রকারের বাসভবন প্রস্তুত করাইয়া নিতে পারে, আবশ্যক বোধ করিলে কেহ ঐ প্রকার গৃহের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম ক্রয় করিয়াও আনিতে পারে, মূল্য খুব বেশী নহে। "Open air at home" (By Mr. Stanley Bates) ও আর একখানা ভাল পুস্তক। এই পুস্তকে বাহিরে খোলাস্থানে কি প্রকারে ঘর প্রস্তুত করিতে হয় তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

আমাদের দেশে বৎসরের প্রায় অর্দ্ধ সময় বাহিরে খোলাস্থানে কোনপ্রকার আশ্রয় ব্যতিরেকেও শয়ন করা যাইতে পারে, এবং সেইরূপ ভাবেই যক্ষ্মা রোগীদের থাকা উচিত। বৎসরের অপরার্দ্ধ সময়ের জন্যও শীতপ্রধান দেশের ন্যায় আমাদের দেশে বাহিরে খোলা স্থানে সামান্য একটা আচ্ছাদনের নিম্নে সহজে নাড়া চাড়া যায় এইরূপ হালকা কোনও আবরণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া একটা ক্ষুদ্র কুটীরের মত করিয়া তন্মধ্যে থাকা যাইতে পারে। আবশ্যক মত যেন চতুর্দ্দিকের আবরণ সম্পূর্ণ অথবা কথঞ্চিৎ খুলিয়া রাখা যাইতে পারে। সহরে যাহারা বাস করে তাহারা দালানের ছাদের উপরই সুবিধামত থাকিতে পারে। বাহিরে মুক্ত বায়ুতে থাকিতে প্রথম প্রথম অনেকে অনেক প্রকার আশঙ্কা করিতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ আশঙ্কা করিবার কোনই কারণ নাই। বাহিরে মুক্ত বায়ুতে থাকা যে কি উপকার এবং আমোদজনক; তাহা কিছুকাল বাহিরের মুক্ত বায়ুতে থাকিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"Night is a dead monotonous period under a roof, but in the open world it passes lightly, with its stars and dew and perfume and the hours are marked by the changes in the face of nature. What seems a kind of temporal death to people choked between walls and curtains is only a

light and living slumber to the man who sleeps afield"—Walters.

রাত্রিতে মুক্তবায়ুতে অবস্থান যদি রোগী নিতান্তই অসুবিধাজনক মনে করে, তবে ঘরের বারেণ্ডায় থাকাই যুক্তিযুক্ত। যে সমস্ত রোগী নড়িতে চড়িতে অক্ষম, রোগ যন্ত্রণায় অস্থির এবং শয্যাশায়ী তাহারা যদি ঘরে থাকিতে আরাম বোধ করে, তবে তাহাদের ঘরে থাকাই সঙ্গত ; কিন্তু তাহাদের ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, তাহাদের বাহিরে থাকিবার অক্ষমতা বা যন্ত্রণার তীব্রতার জন্য স্নেহশীল হইয়া রোগ কখনও নিজের শক্তি সঙ্কুচিত করিবে না। যাহা হউক গৃহে অবস্থান করিয়াও যাহাতে তাহারা বাহিরে থাকিবার উপকারিতা অনেকটা লাভ করিতে পারে তদ্রূপ ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। তাহাদের ঘরে বহু জানালা দরজা রাখার দরকার এবং তাহা সর্ব্বদাই মুক্ত থাকিবে (Letting in God's great healing agents, fresh air and sunlight) যেন ঘরের মধ্য দিয়া সর্ব্বদাই অবাধে বায়ু চলাচল করিতে পারে এবং দিবাভাগে ঘরের মধ্যে উত্তমরূপে সূর্য্যালোক আসিতে পারে। গৃহের নিকটে কোন বৃক্ষ, লতাদি থাকিবে না। রাত্রিকালে বৃক্ষ সকল অধিক পরিমাণে কার্ব্বনিক্ এসিড্ গ্যাস্ ত্যাগ করিয়া থাকে তাহা আমাদের পক্ষে বিষতুল্য। পীড়িত ব্যক্তিদের দ্বারা বায়ু অতি সত্বর দূষিত হয়। দূষিত বায়ুতে রোগীর একমুহূর্ত্তও থাকা উচিত নহে। অনেকের ঐরূপ কদর্য্য অভ্যাস আছে যে শৈত্য লাগিবার ভয়ে ঘরের দরজা জানালা এমন কি সামান্য ছিদ্র পর্য্যন্ত কাপড় কি কাগজ দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখে ইহাতে ঘরের বায়ু অতি সত্বর দূষিত হইয়া যায় এবং এই রোগের মহৌষধ অক্সিজেন বায়ু (গ্যাস) ঘরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না বলিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সংসাধিত হয়। ঐ সমস্ত ব্যক্তি মনে করে যে, শীতল বায়ু সর্দ্দি জন্মায় এবং সর্দ্দি হইতে যক্ষ্মার উৎপত্তি হয় ; কিন্তু এই উভয় ধারণাই নিতান্তই ভ্রমাত্মক। যক্ষ্মা রোগীর ঘর অতিশয় পরিষ্কার থাকিবে। ঘর ঝাঁটা দ্বারা কখনও পরিষ্কার না করিয়া ভিজা নেকড়া দ্বারা পুছিয়া পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। ঝাঁটা দ্বারা পরিষ্কার করিলে ধূলি উড়িয়া ঘরের বায়ু দূষিত করিয়া ফেলে। ঘরে রোগীর পোষাক পরিচ্ছদ কি আসবাব পত্র কিছু থাকিবে না ; তবে একান্ত

পক্ষে যাহা রাখা দরকার হইবে তাহা সর্ব্বদা সাবান ও জল দ্বার ধৌতা করিয়া পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

ডাক্তার ট্রুডো (Dr. Trudeau) দ্বাদশটী খরগোসদেহে যক্ষ্মাবীজ প্রবিষ্ট করাইয়া ছয়টীকে একটী দ্বীপে ছাড়িয়া দেন এবং ছয়টীকে সাধারণতঃ গৃহপালিত খরগোস যেরূপভাবে রাখা হয় সেইরূপে পিঞ্জরে রাখিয়া পালন করিতে থাকেন। পরীক্ষার দিন তিনি দেখিলেন যে দ্বীপে পরিত্যক্ত ছয়টী খরগোসই বেশ সুস্থ, সবল আছে এবং তাহাদের শরীরে যক্ষ্মাবিষের কোন চিহ্নই নাই, কিন্তু গৃহ রক্ষিত ছয়টীর পাঁচটীই যক্ষ্মারোগে পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে এবং অপরটীর অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন। সর্ব্বদা খোলা স্থানে বিশুদ্ধ বায়ুতে অবস্থিতি করাতেই প্রথম ছয়টা যক্ষ্মারোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে; কিন্তু অপর ছয়টী বদ্ধাবস্থায় অবস্থান হেতু তাহাদের শরীরে ধ্বংসকারী যক্ষ্মাকীটের প্রভাব অব্যাহত রহিয়াছে।

যে সমস্ত ব্যক্তি ঘরে থাকিতে ভালবাসে, বদ্ধ বায়ুতে নিদ্রা যায় এবং শীতল বায়ুকে ভয় করে তাহাদের সর্ব্বদা পিঞ্জরাবদ্ধ খরগোসগুলির বিষয় স্মরণ করিয়া সতর্ক হওয়া উচিত।

গত সেপ্টেম্বর মাসে (1910) ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় (Statesman) জর্ম্মাণির একজন যক্ষ্মারোগীর বিবরণ প্রকাশিত হয়; তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, উক্ত রোগী রাত্রিকালে বাহিরে মুক্তাকাশে নিদ্রা যাইত। তাহার শয়ন করিবার খাট ইত্যাদি তুষারে আবৃত হইয়া থাকিত, প্রাতে ঝাড়ুদার আসিয়া তাহা অপসারিত করিত। হিম লাগিবার ভয়ে আমাদের দেশে যে সমস্ত ব্যক্তি বদ্ধ গৃহে রাত্রিতে বাস করে এই ঘটনা স্মরণ করিয়া তাহাদের ভ্রান্তি নিরসন করা কর্ত্তব্য।

"The consumptive ought to become a wild Indian, as far as an outdoor life is concerned and eat and work and sleep in the open air" Dr. Forrest.

"Pulmonary Tuberculosis is the disease of the indoor worker." যে সমস্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা ঘরের মধ্যে থাকিয়া কাজ করে, ব্যবসায়ের জন্য অথবা অন্য কোনও কারণে যে সমস্ত ব্যক্তির বাহিরে খোলা স্থানে থাকিবার অবসর

হয় না অথবা থাকে না এই ব্যাধি দ্বারা তাহারাই অধিক আক্রান্ত হয়। পরন্তু, চিকিৎসক, আমিন, কনট্রাক্টর, কৃষক, শকটচালক, নৌকাচালক, ধীবর, ট্রাম-কণ্ডাক্টর, যোগী, সন্ন্যাসী ইত্যাদি যে সমস্ত ব্যক্তিকে অধিকাংশ সময় বাহিরে থাকিয়াই কাজ করিতে হয় তাহাদের এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অতি কম। যে সমস্ত ইতর জন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় সর্ব্বদা বাহিরে থাকে তাহাদের কখনও এই ব্যাধি হইতে দেখা যায় না; কিন্তু সেই সমস্ত জন্তুদিগকে গৃহে বদ্ধ অবস্থায় রাখিলে অনেক সময় এই ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

এই স্থলে আর একটী কথা বলাও নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করি যে, যক্ষ্মা রোগীর দিনরাত্রি খোলা ঘরে কি খোলা স্থানে থাকা পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট অত্যন্ত বিরক্তিকর হইতে পারে, এবং সমাজের অনেকের নিকট ইহা নিতান্ত "বাড়াবাড়ি" কি অসঙ্গত বিবেচিত হইতে পারে, এমন কি কোন কোন স্থানে রোগীকে কেহ বাতুলও সাব্যস্ত করিতে পারেন, কিন্তু তজ্জন্য রোগীর বিন্দুমাত্র বিচলিত হওয়া উচিত নহে। রোগীর সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে তাহার জীবন তুলাদণ্ডের একদিকে স্থাপিত, অপর দিকে ঈষৎ ভার বৃদ্ধি হইলেই তাহার মৃত্যু। মৃত্যুও সহজ মৃত্যু নয়, দীর্ঘকালস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু।

যক্ষ্মা রোগীদের শরীরে হঠাৎ ঠাণ্ডা প্রবল বায়ুপ্রবাহ না লাগে এবং শরীর সর্ব্বদা গরম থাকে এজন্য তাহাদের দেহ সর্ব্বদা উপযুক্ত বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। পরিচ্ছদ হালকা অথচ গরম হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। সর্ব্বনিম্নে অর্থাৎ প্রথমেই (next the skin) ফ্লানেলের জামা ব্যবহার করা অনেকের পক্ষেই হিতকর। যক্ষ্মারোগীদের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

যক্ষ্মারোগীর ফুস্ফুসের ব্যায়াম (প্রাণায়াম—Breathing or lung exercise) দ্বারা ফুস্ফুসের বলবৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। খুব দ্রুত ও গভীর শ্বাস গ্রহণ করিয়া এবং দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া (Deep and strong inhalation and long exhalation) যতদূর সম্ভব ফুস্ফুস্ প্রসারিত এবং সঙ্কুচিত করিবে; সময়ে সময়ে খুব দ্রুত ও গভীর নিশ্বাস দ্বারা ফুস্ফুস্ বায়ুপূর্ণ করিয়া উহা দুই এক

সেকেণ্ড ধারণ করিবে এবং পরে অতি ধীরে ধীরে উহা ত্যাগ করিবে। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া দিবসের মধ্যে বহুবার এরূপ করিবে, ব্যাসিলাস্‌গুলি যেন মুহূর্ত্তও বিশ্রাম না পায়। তাহারা যেন বুঝিতে পারে যে পশ্চাদ্দিক হইতে সর্ব্বদাই তাহা-দিগকে তাড়া করা হইতেছে। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে এই সমস্ত ব্যাসিলাসগুলি অবসর পাইলেই যক্ষ্মারোগীদের ধ্বংসকর কার্য্যে লিপ্ত থাকিবে। খুব গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ ফুস্‌ফুসের নিম্নদিকে চাপ দিয়া (নাভিমণ্ডল স্ফীত করিয়া) ফুস্‌ফুসের নিম্নাংশ বায়ুপূর্ণ করিয়া তৎপর ঐ প্রকারে উদ্ধাংশ এবং অবশেষে অপরাপর অংশ বায়ুপূর্ণ করিবে, তাহা হইলে সমস্ত ফুস্‌ফুস্ সম্পূর্ণভাবে বায়ুপূর্ণ হইবে। প্রশ্বাস কদাপি জোরে ত্যাগ করিবে না। সর্ব্বদা নাসিকার দ্বারা নিশ্বাস গ্রহণ করিবে। যত অধিক কাল এইরূপ ভাবে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিবে, ততই এই সমস্ত ব্যাসিলাসগুলির ধ্বংস হইতে থাকিবে এবং ততই ফুস্‌ফুসের অনাক্রান্ত সুস্থ অংশ শক্তিশালী হইয়া এই সমস্ত ব্যাসিলাসের আক্রমণে বাধা দিতে সক্ষম হইবে। খোলা স্থানে বিশুদ্ধ বায়ুতে যত অধিককাল এইরূপ শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করা যায় ততই উত্তম।

গ্লাস্‌গো মেডিকেল জার্ণেলে (Glasgow Medical Journal) ডাক্তার রিচার্ডসন্ বলেন যে, শারীরিক অন্য কোন যন্ত্র ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তাহা সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখা আবশ্যক, কিন্তু ফুস্‌ফুস্ রোগাক্রান্ত হইলে তাহাকে যত বিশ্রাম না দেওয়া যায় ততই ভাল।

যক্ষ্মারোগীর পক্ষে ভ্রমণ একটী উৎকৃষ্ট ব্যায়াম।

রোগীর গঙ্গার জলে ডুবিয়া গেলে তাহার অবস্থা বিশেষ সঙ্কটাপন্ন মনে করিতে হইবে, কিন্তু তা বলিয়া হতাশ হওয়া উচিত নহে ("To lose heart is fatal") "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।" "বিপদে অধীর হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ।" "চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই।" রোগ যতই কেন কঠিন হউক না, নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিব, মনে মনে এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া ঐকান্তিক একাগ্রতার সহিত অদম্য উৎসাহে অবিলম্বে এই সমস্ত ব্যাসিলাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হইতে পারিলে তাহাতে আরোগ্যলাভের বিশেষ সম্ভাবনা।

"হাইজিনিক ট্রিট্‌মেণ্ট" (Hygienic treatment) রচয়িতা সুবিখ্যাত হল্ সাহেবের (A. Wilford Hall) ২৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সাধারণে বক্তৃতা করিতে করিতে ফুস্‌ফুসের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে এবং পশ্চাৎ তিনি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হন। ক্রমে তাহার অবস্থা এইরূপ সাংঘাতিক হয় যে তাঁহার একটী ফুস্‌ফুস্ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় এবং অপরটীও বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার এক ভ্রাতাও এই রোগে ঈদৃশ অবস্থায় মারা গিয়াছেন। বিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসকদিগকে আহ্বান করা হইলে সকলেই তাঁহার আসন্ন মৃত্যু বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তিনি ইহাতে অত্যন্ত চমকিত হইলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই জীবনে হতাশ হইলেন না। সম্পূর্ণরূপে যক্ষ্মারোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিব মনে মনে তিনি এই সঙ্কল্প করিয়া কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং অচিরে এই ব্যাধি হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। কেবল তাহাই নহে, ক্রমে তিনি এরূপ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছিলেন যে, ৮০ বৎসর বয়ঃক্রম কালেও তাঁহাকে একজন যুবা ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইত। যক্ষ্মারোগের শেষ অবস্থা হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছে, এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

যক্ষ্মারোগীর শরীর অতি দ্রুতবেগে ক্ষয় হইতে থাকে, সুতরাং তাহার খাদ্য এইরূপ হওয়া আবশ্যক যে, তদ্দ্বারা যেন শারীরিক দৈনন্দিন ক্ষয় পূরণ হইয়া অতিরিক্ত বল সঞ্চয় হইতে পারে। এই নিমিত্ত তাহাকে প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া আবশ্যক। পুষ্টিকর খাদ্য দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলে রোগী সহজেই আরোগ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়। স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিজনক অথচ সহজ পাচ্য দ্রব্যাদি অল্প পরিমাণে দিবসের মধ্যে বহুবার ভোজন করা কর্ত্তব্য। ডাক্তার এণ্ডার্সন (Dr Mccall Anderson) রোগীর শক্তি বর্দ্ধনের নিমিত্ত তাহাকে সমস্ত দিবারাত্র এক ঘণ্টা কি আধ ঘণ্টা অন্তর পুষ্টিকর পেয়খাদ্য দিতে বলেন।

পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে কড্‌লিভার অয়েলই (Codliver Oil) সর্ব্বপ্রধান। ইহাকে ঔষধ না বলিয়া খাদ্য বলাই সঙ্গত। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে, ভুক্ত জিনিষের পরিপাকের সহায়তা করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, এবং দেহের ওজন বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ডাক্তার হুইট্‌লা (Dr. Whitla) বলেন যে, যে পরিমাণে

কড্‌লিভার অয়েল সেবন করা যায় সেই পরিমাণে দেহের ওজন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আমি (লেখক) কিন্তু নিজে ইহা বহুবৎসর যাবৎ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি ; কিন্তু ইহার ঈদৃশ গুণ উপলব্ধি করি নাই। কড্‌লিভার অয়েলের সহিত হাঙ্গরের তৈল ভেজাল দেওয়া হয় বলিয়া যে জনরব শুনা যায় বর্ত্তমান সময়ের উক্ত তৈলের গুণ দেখিয়া, ঐ জনরব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, ইহার উপকারিতা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। সকলেরই ইহা সেবন করা উচিত। আমি নিজে ইহার সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হই নাই বলিয়া যে অন্যে ফল প্রাপ্ত হইবে না, তাহা বলা যায় না। কড্‌লিভার অয়েল প্রথম প্রথম অনেকের সহ্য হয় না। প্রথম অতি অল্পমাত্রায় দিবসের মধ্যে একবার, কি দুই একদিন পরে একবার, এই প্রকারে সেবন করিয়া ক্রমে মাত্রা ও বার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা উচিত। কডলিভার অয়েল সহ্য হওয়া একটী সুলক্ষণ মনে করিতে হইবে। কারণ এতদ্দ্বারা পাকস্থলীর অবস্থা যে ভাল আছে, তাহাই সূচিত হইয়া থাকে। বাজারে বহুপ্রকার কডলিভার পাওয়া যায়। ব্যবহারের দ্বারা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে কেপলার্স (Keepler's) কড্‌লিভার অয়েলেই অধিক ভাল বলিয়া বোধ হয় ; যক্ষ্মারোগীদের দীর্ঘকাল ইহা ব্যবহার করা উচিত। কড্‌লিভার অয়েলের পরিবর্ত্তে ডাক্তারগণ নারিকেল তৈল ভক্ষণেরও ব্যবস্থা দেন, কিন্তু ইহা অপেক্ষাকৃত অল্প গুণবিশিষ্ট বলিয়া ইহার ব্যবহার অতি কম। ঘৃত, মাখন, সর, দুগ্ধ, সুজি, আটা, ডিম্ব ইত্যাদিও অত্যন্ত পুষ্টিকর জিনিস। গোদুগ্ধ অপেক্ষা ছাগদুগ্ধ এবং গাধার দুগ্ধ অধিক ভাল। পক্ব সুমিষ্ট কমলা লেবু যক্ষ্মারোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। তবে ইহা অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করা অবিধেয় ; দিবসের মধ্যে তিনবারের অধিক ভক্ষণ করা উচিত নহে ; এবং সর্ব্বদাই আহারকালীন ভক্ষণ করিবে। যক্ষ্মারোগে কমলা লেবু-চিকিৎসা (Orange cure) ক্রমেই আদৃত হইতেছে। অত্যধিক বা গুরুপাক খাদ্য দ্বারা পরিপাক-শক্তি ক্ষীণ হইয়া না পড়ে, যক্ষ্মারোগীর তৎপ্রতি সর্ব্বদাই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

রোগীর কোষ্ঠ বেশ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। মাঝে মাঝে, কি আবশ্যক বোধ হইলে প্রতিরোজই ডুশ্‌ দ্বারা অন্ত্রধৌত করা ভাল। শীতল জলে স্নান সহ্য

না হইলে উষ্ণ জলে স্নান করা বিধেয় এবং তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ সামুদ্রিক লবণ (Sea salt) মিশ্রিত করিয়া স্নান করা অধিক ভাল। সমুদ্র জলে স্নান অনেকের পক্ষেই বিশেষ হিতকর। কোনপ্রকার স্নানই সহ্য না হইলে গরম জলে গামছা ভিজাইয়া এবং উহা নিংড়াইয়া তদ্দারা উত্তমরূপে গা পুঁছিয়া ফেলা উচিত। যে প্রকারে হউক যক্ষ্মারোগীদের শরীর উত্তমরূপে পরিষ্কার রাখা একান্ত আবশ্যক। স্নান ইত্যাদির পর শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা অন্ততঃ কিয়ৎকাল শরীর আবৃত করিয়া রাখা ভাল। ইহাতে শরীর হইতে ঘর্ম্ম বাহির হওয়ায় শরীরের প্রভূত উপকার সাধিত হয়। স্নানের পূর্ব্বে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন করা বিশেষ ভাল।

প্রথম অবস্থায় এই রোগ এরূপ গুপ্ত ভাবে থাকে যে ইহা কিয়ৎদূর অগ্রসর না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই ইহার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। কিয়ৎপরিমাণে ফুস্‌ফুসে "টিউবারকেল" (Tubercle—স্ফোটক বিশেষ) অনেক সময় বিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসকগণ নির্ণয়ে সমর্থ হন না। এমতাবস্থায় কফ্, সামান্য কাশী, ঘন শ্বাস প্রশ্বাস, শরীর দুর্ব্বল, সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্তিবোধ এবং ত্বকের উষ্ণতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই এই রোগ সন্দেহ করা উচিত।

যক্ষ্মারোগ অতি ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া যখন যে স্থানে এই রোগ একবার দেখা দেয় তখন সেই স্থানের বহু দুর্ব্বল ও রুগ্ন ব্যক্তি ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে. সুতরাং তৎকালে ঐ সমস্ত ব্যক্তির বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানে যত্নশীল হওয়া উচিত। ঐ সমস্ত ব্যক্তির নিজেদের দেহ যক্ষ্মারোগগ্রস্ত মনে করিয়া উক্তরোগে আরোগ্যার্থ যে সমস্ত বিধিব্যবস্থা প্রতিপালিত হইয়া থাকে পূর্ব্ব হইতেই তৎপ্রতিপালনে সচেষ্ট থাকা উচিত। ব্যাধি জন্মিতে না দেওয়া যেমন সহজ, জন্মিলে তাহা রোধ করা তত সহজ নহে। সময়ের একটী ফোঁড় অসময়ের দশটী ফোঁড়ের সমান। পূর্ব্বে চেষ্টা করিলে অতি অল্প আয়াসেই ইহার আক্রমণ ব্যর্থ করা যাইতে পারে; কিন্তু পরে বহু চেষ্টা কি ক্লেশ করিলেও অনেক সময়ে বিশেষ কোন ফল লাভ হয় না। অনেক সময় ইহা যেরূপ ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু আনয়ন করে তাহা মনে করিয়াও ঐ সমস্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য রক্ষা প্রতি মনযোগী হওয়া উচিত।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে যক্ষ্মারোগীর গয়ারে বহুসংখ্যক ব্যাসিলাস্ বিদ্যমান থাকে সুতরাং তাহার গয়ার ফেলিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। একটী পাত্রে কার্ব্বলিক্ এসিড্ রাখিয়া তন্মধ্যে গয়ার ফেলা উচিত, অন্য কোনও স্থানে যাহাতে বিন্দুমাত্র গয়ার না পড়ে তাহা করা তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। পরে ঐ গয়ার মাটীতে প্রোথিত করিয়া ফেলা বিশেষ আবশ্যক এবং প্রাগুক্ত পাত্রটী ফুটন্ত জল এবং সাবান দ্বারা অতি উত্তমরূপে পরিস্কৃত করা উচিত। এতদ্দ্বারা রোগের সংক্রামকতা নিবারিত হয়, সুতরাং রোগ ব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। অন্য কোনও ব্যক্তি ইহার দ্বারা আক্রান্ত না হয় কেবল তজ্জন্যই ইহা করা আবশ্যক নহে, ইহা দ্বারা রোগীরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। ঐ সমস্ত নিক্ষিপ্ত ব্যাসিলাস দ্বারা সে নিজেই প্রবল রোগে আক্রান্ত হইতে পারে, এবং সমস্ত শরীর বিসে জর্জ্জরিত হইয়া অচিরে মৃত্যু মুখে পতিত হইতে থাকে। অনেক স্থলে রোগী আরোগ্যোন্মুখ হইয়াও পুনর্ব্বার ইহার দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, এরূপ দেখা গিয়াছে। যক্ষ্মারোগীর গয়ার যে পর্য্যন্ত শুষ্ক না হয় সে পর্য্যন্ত তাহা হইতে আশঙ্কা থাকে না। কার্ব্বলিক্ এসিড্ অভাবে পিকদানে জল রাখিয়া তন্মধ্যেও নিষ্ঠিবন ফেলা যাইতে পারে, কিন্তু যাহাতে তদুপরি মাছি ইত্যাদি বসিয়া রোগ ব্যাপ্তি না ঘটায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।' পিকদানে কিঞ্চিৎ কেরোসিন তৈল কি চূণের জল ইত্যাদি রাখিলে এই উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে। যক্ষ্মারোগীদের সাধারণ পিকদান অপেক্ষা "স্পুটাম্ মাগ" (Sputum mug) এ নিষ্ঠিবন ফেলা অধিক নিরাপদ। একটী স্পুটাম্ মাগের মূল্য প্রায় দুই টাকা।

যক্ষ্মারোগীকে সকলেই অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক রোগী যদি বুদ্ধিমান্ হয়, তাহার গয়ার সে যত্নপূর্ব্বক কোনরূপ আধারে সঞ্চিত করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে, তবে সেই রোগী হইতে ভয়ের কোনও কারণ থাকে না। যক্ষ্মারোগীদের বাহিরে ব্যবহার করার জন্য একরূপ "পকেট-ফ্লাস্ক" (Pocket flask) পাওয়া যায়। উহা সঙ্গে করিয়া রোগী যথা ইচ্ছা তথা যাইতে পারে। উহা সঙ্গে থাকিলে রাস্তায় কি অন্য কোন স্থানে থুথু না ফেলিলেও চলে। উহাতে ফেলিলে বাহিরে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না। উহা লইয়া রোগীর সভ্যসমাজে চলা ফেরা

করিতে কোন অসুবিধা ঘটে না। উহা আয়তনে ক্ষুদ্র বলিয়া বড় কাহারও নজরে আসেনা। সর্ব্বদা পকেটে করিয়া রাখা যায়। যক্ষ্মারোগী যাহাতে তাহার নিজের গয়ার গিলিয়া না ফেলে তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখা আবশ্যক। গয়ার গিলিয়া ফেলিবার দরুণ অনেক সময় তাহার অন্ত্র তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। দৈবাৎ গিলিয়া ফেলিলে ভয়ে নিতান্ত আরষ্ট হওয়াও অবিধেয়। যক্ষ্মা রোগীদের প্রশ্বাস বায়ু-দ্বারা কখনও এই রোগ ব্যাপ্তি ঘটে না। তবে কথা বলিবার সময় এবং কাশীবার সময় যে নিষ্ঠিবন নির্গত হয়, তদ্দ্বারা রোগব্যাপ্তির সর্ব্বদাই সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং কথা বলিবার সময় এবং কাশীবার সময় মুখের নিকট তাহাদের রুমাল কি নেকড়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক এবং তৎপরে উহা ফুটন্ত জলে সিদ্ধ কিম্বা অগ্নিতে ভস্ম করা কর্ত্তব্য।

যক্ষ্মারোগীর সেবাশুশ্রূষাকারীগণের বেশ স্বাস্থ্যবান্ হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, সুস্থ ব্যক্তির কখনও ইহা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তবে সেবাশুশ্রূষাকারীগণের সর্ব্বদা রুগ্ন ব্যক্তিগণের ন্যায় সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলাই ভাল।

* যক্ষ্মাবীজের "টীকা" দ্বারা এই রোগ আরোগ্য করার যে চেষ্টা হইয়াছিল তাহা অনেক সময় বিপজ্জনক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারাও সুফল লাভ হয় নাই। ঔষধ সেবন দ্বারা এই রোগ আরোগ্যের সম্ভাবনাও অতি অল্প।

* **যক্ষ্মাবীজের টীকা**—অধ্যাপক Koch কর্ত্তৃক Tubercle Bacillus আবিষ্কৃত হইলে সমগ্র Bacillus মাড়িয়া টীকা রূপে যক্ষ্মা আরোগ্য করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা Old Tuberculin of Koch নামে অভিহিত। এই টীকাতে কোন ফল হয় নাই অপর পক্ষে অনেক ক্ষতি হইয়াছিল এবং সেই জন্যই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অধুনাতন অধ্যাপক রাইট (Wright) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত Vaccine Therapy অবলম্বন করিয়া যক্ষ্মাবীজ হইতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় Tuberculin প্রস্তুত হইয়াছে (New Tuberculin)। এই New Tuberculin কয়েক বৎসর যাবৎ টীকা রূপে (Injection) যক্ষ্মারোগীদিগের রোগ আরোগ্য জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। যে সকল রোগীর জ্বর নাই বা অতি অল্প জ্বর থাকে তাহাদিগের বিশেষ সুফল দেখা যাইতেছে। আমি এই চিকিৎসা হইতে অতি সন্তোষজনক ফল পাইতেছি।

এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে এই চিকিৎসার সহিত মুক্ত বায়ু, পুষ্টিকর খাদ্য ইত্যাদিরও সমান আবশ্যক।

রোগীর বরং কোনও প্রকার ঔষধ পত্র সেবন না করাই ভাল। কারণ তদ্দ্বারা অনেক সময় যে সামান্য একটু পরিপাক শক্তি থাকে তাহাও নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং রোগীর খাদ্য দ্বারা পুষ্টিলাভ করার যে সম্ভাবনা থাকে তাহা বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবন করিতে হইলে একমাত্র ক্রিয়জোট (Creosote) সেবন করাই বিধি। ইহা যক্ষ্মা-রোগের একমাত্র ঔষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ক্রিয়জোট কীটাণু ধ্বংস করিয়া থাকে ("Creosote is a germ destroyer"). কিন্তু পাকস্থলী হইতে রক্তে শোষিত হইয়া কি এক অদ্ভুত উপায়ে ফুস্‌ফুসে নীত হইয়া ইহা ঈদৃশ কার্য্য করে তাহা আজও ভালরূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। কড্‌লিভার অয়েলের সহিত দুই বিন্দু ক্রিয়জোট মিশ্রিত করিয়া অথবা ইহার বটিকা (Capsule—ডাক্তারি দোকানেই পাওয়া যায়) দিবসের মধ্যে ৩।৪ বার সেবন করা যাইতে পারে। ক্রিয়জোট একপ্রকার বিষ, সুতরাং খালিপেটে ইহা সেবন করা উচিত নয়। অন্ততঃ সামান্য কিছু দুগ্ধ পান করিয়াও ইহা সেবন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ক্রিয়জোট সেবন না করিয়া রেস্পিরেটার যন্ত্রযোগে ইহা আঘ্রাণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। এতদ্দ্বারা ইহা প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যাসিলাসের উপর কাজ করিয়া থাকে। একটী বহু ছিদ্রযুক্ত রেস্পিরেটার (Antiseptic inhaling respirators) যোগে দশ বিন্দু "বিচউড ক্রিয়জোট" (Beechwood cresote) প্রাতে ও রাত্রিতে আঘ্রাণ করা যাইতে পারে। ক্রিয়জোট যক্ষ্মারোগীর গয়ার নির্ব্বিষ করিয়া থাকে বলিয়া ইহা ব্যবহারে যক্ষ্মারোগী কখনও তাহার গয়ার গিলিয়া ফেলিলে তদ্দ্বারা তাহার অন্ত্র কখনও আক্রান্ত হয় না এবং গয়ারের সংস্পর্শে ফুসফুসের অন্য স্থানেও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বিদূরিত হয়। ক্রিয়জোট একটী কফঘ্ন (Expectorant) ঔষধ।

ফুস্‌ফুসে কি ব্রঙ্কিয়েল টিউব (Bronchial tube) নামক বায়ু-নলীতে সঞ্চিত কফ্ বিদূরিত করিবার জন্য ফুস্‌ফুসের ব্যায়াম এবং গরম দুগ্ধ কি গরম জল পান অতি উৎকৃষ্ট নির্দ্দোষ উপায়। নিদ্রাভঙ্গের পর প্রাতে উঠিয়া একবাটী গরম দুগ্ধ কি গরম জল পান করিলে রাত্রিকালের সঞ্চিত শুষ্ক কফ্ উত্থিত হয়। এতদ্দ্বারা পাকাশয়ও পরিস্কৃত হয়। প্রাতে এইরূপ গরম জল কি গরম দুগ্ধ পানের অব্যবহিত পরে খোলা স্থানে ভ্রমণ অথবা প্রাণায়াম কি কোনওরূপ ব্যায়াম করা বিশেষ হিতকর।

যক্ষ্মারোগীদের কথনও কাশী দমন করা উচিত নহে। কাশী দ্বারা কফ উত্থিত হয় বলিয়া উহা দমন না করিয়া বরং (অবশ্যই অত্যধিক না হইলে) উহার বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত।

নৌকাযোগে নদীবক্ষে বিচরণ কি বাস এবং স্থান পরিবর্ত্তন ও পারিপার্শ্বিক যাবতীয় দ্রব্যাদির সংশ্রব ত্যাগ প্রত্যেক রোগীর পক্ষেই বিশেষ হিতকর। " A complete change of sourroundings is often the best tonic mentally and physically."

রাত্রিজাগরণ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা, মানসিক উদ্বেগ, মাদক দ্রব্য সেবন, অধিক ধূমপান ইত্যাদি যাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিজনক, তাহা যক্ষ্মারোগীদের বিশেষ অনিষ্টকর। যক্ষ্মারোগীদের কথনও থিয়েটার কি সভাসমিতি ইত্যাদি জনাকীর্ণ স্থানে যাওয়া উচিত নয়। উহাদের পক্ষে বিশ্রাম বিশেষ হিতকর। যে কোনও উপায়ে হউক, রোগীর শক্তির সংরক্ষণ ও বৰ্দ্ধন করা আবশ্যক। রোগীর দেহের ভার বৃদ্ধি হইলে এবং নিজেকে সবল বোধ করিলে সে আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে বুঝিতে হইবে।

বিশুদ্ধ বায়ু, পুষ্টিকর খাদ্য, ব্যায়াম, বিশ্রাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি যাহা দ্বারা যক্ষ্মারোগের আরোগ্যলাভ সম্ভব, একমাত্র খাদ্য ব্যতীত তৎসমুদয়ই দরিদ্রব্যক্তি-গণেরও অতি সহজ লভ্য। যে সমস্ত ব্যক্তি দিবসে অধিকাংশ সময় বিষয়কর্ম্মের জন্য নিতান্তই বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ইত্যাদি করিতে অক্ষম তাহাদেরও দিবসের অবশিষ্ট সময় এবং রাত্রি কালে ঐ সমস্ত করিতে কোন বাধা নাই।

"নিউমেটিক চেম্বার" (Pneumatic chamber) নামক এক প্রকার যন্ত্র আছে, উক্ত যন্ত্র সাহায্যে ঘনীভূত (Compressed) বায়ুর নিশ্বাস গ্রহণ এবং প্রয়োজনানুসারে তরলীকৃত (rarified) অথবা ঘনীভূত বায়ুতে প্রশ্বাস ত্যাগ করা যায়। ঘনীভূত বায়ুর অত্যধিক চাপ বশতঃ নিশ্বাস গ্রহণকালে যাবতীয় বায়ুকোষগুলির মধ্যে সবেগ বায়ু প্রবেশ করিয়া উহাকে সম্পূর্ণভাবে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিয়া থাকে। তরলীকৃত বায়ুতে প্রশ্বাস ত্যাগ কালেফুস্‌ফুস্ মধ্যস্থিত প্রায় সমস্ত বায়ু বহির্গত হওয়ায় ফুস্‌ফুস্‌টী প্রায় সম্পূর্ণভাবে সঙ্কুচিত হইয়া যায়; ইহাতে শ্লেষ্মাদিও

সহজে বহির্গত হইয়া থাকে। ঘণীভূত বায়ুতে প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে প্রশ্বাস দীর্ঘ হয়, যেহেতু প্রশ্বাস সহজে বহে না নিশ্বাস এবং প্রশ্বাসের মধ্যে বিরামকাল দীর্ঘ হয়, সুতরাং মিনিটে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া কম হয়। বিশুদ্ধ বায়ুতে থাকিয়া এই যন্ত্র ব্যবহার করিলে অপর্য্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের সমস্ত উপকারিতাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্দ্বারা একস্থানে বসিয়া অল্প সময়ে অতি সুন্দরভাবে ফুস্ফুসের ব্যায়ামের (Lungs gymnastic) কার্য্য সাধিত হয়। হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস্, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগে অতি যোগ্যতার সহিত এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সমস্ত ব্যাধির অত্যুৎকৃষ্ট অবস্থায়ও ইহা ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। ইউরোপে এই যন্ত্রের বহুল প্রচলন আছে। তথায় অনেক স্থানে নিউমেটিক চিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠিত আছে। আবশ্যক হইলে এই স্থানে ক্রিয়জোট ইত্যাদি রাখিয়া তাহার আঘ্রাণও লওয়া যায়। এতদ্বিষয়ক অক্লেশে বহনযোগ্য বিবিধ যন্ত্রও উদ্ভাবিত হইয়াছে। "Translation of Oertel's Respiratory Therapeutics", by I. Burney Yeo M. D. F. R. C. P. নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। উক্ত প্রকারের লিখিত "A Manual of Medical Treatment (Vol. I. Pg. 556, 580, 692) নামক পুস্তকেও ইহার বিবরণ আছে। মূল্যাধিক্য বশতঃ এই যন্ত্রলাভ দরিদ্র ব্যক্তিগণের পক্ষে অসম্ভব। মুক্ত বায়ুতে উত্তমরূপে প্রাণায়াম করিলেও ইহার সমস্ত উপকারিতাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণের উত্তমরূপে প্রাণায়াম অভ্যাস করা ভাল।

যক্ষ্মারোগের আরোগ্য বিষয়ে যে সমস্ত ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা গেল, কেবল তৎসমুদয় যথাযথরূপে পালন করিলে ইহা হইতে আরোগ্য লাভ সম্ভবপর। এই সমস্ত ব্যবস্থা কাহারও কাহারও নিকট অতি কঠোর বলিয়া বোধ হইবে বটে, কিন্তু ঐ সমস্ত উপায় ব্যতিরেকে যক্ষ্মারোগ হইতে আরোগ্যলাভের অন্য কোন উপায় নাই। অন্ততঃ বিজ্ঞানে আজ পর্য্যন্ত তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। ঔষধপত্রদ্বারা অথবা অন্য কোনও উপায়ে যাহারা এই রোগ হইতে আরোগ্যলাভের আশা করেন তাহাদের আশা দুরাশা মাত্র। এই সম্বন্ধে ডাক্তার বাউসওয়েল বলেন :—

"The surgeon cannot help him (the consumptive), and

there is little scope for physician's medicine. Ultimate cure depends mainly on himself. Good food, fresh air, rest and suitable recreation—these are the simple but powerful remedies. The patient who habitually neglects them will pay the invitable penalty, but should they be made use of intelligently, he may face the future with powerfulness and reasonable measure of confidence." :—Advice to consumptives.

"There is no drug or medicine that can be regarded as a cure for consumptives. The natural cure consists of a healthful environment with fresh air, pure food, suitable exercise, and all-day-and-night out-of-door life"—Alfred Bolsen. M. D.

দুই তিন মাস হইতে চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে কোন সময়ই মনুষ্য এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে, তবে বিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক এই ব্যধি কর্ত্তৃক অনেক কম আক্রান্ত হয়। পার্ব্বত্যদেশবাসীগণের মধ্যে এই ব্যাধির প্রকোপ খুব কম। গর্দ্দভ এবং ছাগলের মধ্যে এই ব্যাধি কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কুকুরের এই ব্যাধি কখনও হয় না।

যক্ষ্মারোগ আরোগ্যার্থ যে সমস্ত বিধিব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা গেল কোন সুস্থ ব্যক্তি তৎসমুদয় প্রতিপালন করিয়া চলিলে স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করিতে পারেন। স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিয়ৎপরিমাণে ঐ সমস্ত নিয়মাদি পালন করিয়া চলা আবশ্যক।

প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বাড়িয়া যায় বলিয়া ইহা এই খানেই শেষ করা গেল। প্রণায়াম, অনুধাবন, সর্দ্দি বিষয়ে বারান্তরে কিঞ্চিৎ বলিবার বাসনা রহিল।

উপসংহারে যে তিনটী বিষয়ের উপর প্রধানতঃ যক্ষ্মারোগ আরোগ্য নির্ভর করে তাহা পুনর্ব্বার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে—

১। দিবারাত্র সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা, পুনঃ পুনঃ গভীর শ্বাস গ্রহণ করিয়া ফুস্‌ফুসের বলবৃদ্ধি করা।

২। প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যদ্বারা দৈনন্দিন শারীরিক ক্ষয়পূরণ করিয়া শক্তির সঞ্চার করা।

৩। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা এবং সর্ব্বাঙ্গীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমাদের দেশে যক্ষ্মারোগীদিগের জন্য বহু স্বাস্থ্য নিবাস (Sanitarium) স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। স্বাস্থ্যনিবাসে রোগীদিগকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত নিয়ম পালন করিতে বাধ্য করা হয় বলিয়া তথায় থাকিয়া তাহারা অতি অল্প সময়ে আরোগ্যলাভ করিতে পারে।

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু বি, এস, সি, এম্, বি, লিখিত।

ম্যালেরিয়া পল্লীগ্রামবাসীর প্রধান শত্রু। বর্ষার পরেই ম্যালেরিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকোপ দেখা যায়। ডাক্তার লালমোহন ঘোষাল বৈশাখ মাসের স্বাস্থ্য-সমাচারে বর্ষার পর ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বর্ষা আগতপ্রায়, আমরা এই প্রবন্ধে ম্যালেরিয়া হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য পল্লীবাসীর এখন কি করা কর্ত্তব্য সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

একপ্রকার জীবাণু হইতে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়। মশক দংশনের দ্বারা এই জীবাণু মনুষ্যশরীর মধ্যে প্রবেশ করে। সকলপ্রকার মশক ম্যালেরিয়াবাহী নহে। 'এনোফিলিস্' নামক কেবল এক জাতীয় মশকই ম্যালেরিয়া বিষ বহন করিয়া থাকে। যে দেশে "এনোফিলিস" নাই সে দেশে ম্যালেরিয়া নাই। "এনোফিলিস্" দংশন করিলেই যে জ্বর হইবে তাহা নহে। ম্যালেরিয়া জীবাণু 'এনোফিলিস্'এর শরীর মধ্যে স্বতঃ উৎপন্ন হয় না। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে মশক দংশন করিলে রোগীর শরীর-

হইতে বিষ মশকে সংক্রামিত হয়। এই মশক কোন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিলে তাহার ম্যালেরিয়া হইবার সম্ভাবনা। আমাদের দেশে "এনোফিলিস্" মশক চিরকালই আছে, অথচ পূর্ব্বে এত ম্যালেরিয়া ছিল না। ইহার কারণ ম্যালেরিয়া রোগীর অভাব। এই কথাটী আরও পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। ম্যালেরিয়া রোগীই সুস্থ ব্যক্তির ম্যালেরিয়া হইবার কারণ। "এনোফিলিস্" বহুল স্থানে ম্যালেরিয়া রোগী আসিলেই তথাকার অধিবাসীদিগের অসুখ হইবার সম্ভাবনা, কারণ যে যে মশক রোগীকে দংশন করিবে তাহারা সকলেই ম্যালেরিয়া বিষযুক্ত হইবে এবং পরে তাহারা সুস্থব্যক্তিকে দংশন করিলে রোগ ক্রমশঃ সংক্রামিত হইয়া পড়িবে। এখন কথা এই যে প্রথম ম্যালেরিয়া রোগী কোথা হইতে আসিল? ইহার কোন সন্তোষ-জনক উত্তর দেওয়া যায় না।

ম্যালেরিয়াবাহী মশক ও সাধারণ মশকে কিছু পার্থ্যক আছে। সাধারণ মশকের পেটের নিচে ডোরা ডোরা দাগ আছে, এনোফিলিসের শরীরে সেরূপ কোন দাগ নাই। সাধারণ মশক দেওয়ালের গায়ে সোজা হইয়া বসে কিন্তু এনোফিলিস্ বক্রভাবে বসিয়া থাকে। সাধারণ মশক অপেক্ষা এনোফিলিস্ দেখিতে সরু। এনোফিলিস্ অন্ধকারে থাকিতে ভালবাসে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রায়ই বাহির হয় না। ইহারা অধিক উচ্চে উড়িতে পারে না এবং বাড়ীর উপরের ঘরে ইহাদিগকে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। এনোফিলিস্ খানা, ডোবা ইত্যাদি যে সকল স্থানে বদ্ধ জল থাকে তথায় ডিম পড়ে। কচুপাতায় এবং কলা গাছের বাসনার মধ্যে যে জল জমে তাহাতেও এনোফিলিসের ডিম দেখিতে পাওয়া যায়; এমন কি গোষ্পদেও এনোফিলিসের জন্ম হইতে পারে।

এনোফিলিসের ডিম হইতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র শুঁয়াপোকার-ন্যায় মশক শাবক সকল নির্গত হয়। কিছুকাল যাবৎ ইহাদের পালক বাহির হয় না। এই সকল মশক-শাবক একবার করিয়া নিশ্বাস লইবার জন্য জলের উপরে ভাসিয়া উঠে এবং পরক্ষণেই আবার ডুবিয়া যায়। জলে কিঞ্চিৎ কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিলে জলের উপর তৈলের একটী আবরণ পড়ে এবং মশক শাবক জলের উপর আসিয়া আর নিশ্বাস লইতে পারে না; এই কারণে অল্পকাল মধ্যেই তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়।

মশক শাবকের পক্ষোদ্গম হইলে তাহারা জল হইতে উড়িয়া যায়। মশক শাবকের অনেক শত্রু। জলে ক্ষুদ্র মৎস্য থাকিলে তাহারা এই মশক শাবকদিগকে খাইয়া ফেলে। ব্যাঙ্ ও ব্যাঙাচি মশক ধরিয়া ভক্ষণ করে। অনেক পতঙ্গও মশক খায়। টিক্‌টিকি, গিরগিটি, মাকড়সা প্রভৃতি মশকের শত্রু।

আবর্জ্জনাদিই জঙ্গলের মশকের প্রধান খাদ্য। লোকালয়ে মশক প্রথমতঃ গলিত খাদ্যদ্রব্যাদির দ্বারা আকৃষ্ট হয়; পরে মনুষ্য-শোণিতের আস্বাদন পাইলে গৃহমধ্যেই বসবাস করিতে থাকে। দিবাভাগে মশক সকল অন্ধকার গৃহের কোনে, বাক্স, আলমারি, সিন্দুক ইত্যাদির মধ্যে কিম্বা তলদেশে, আর্সি, ছবি প্রভৃতির পশ্চাৎভাগে, আলনাস্থিত কাপড় জামার ভাঁজের মধ্যে, গৃহস্থিত কলসী প্রভৃতির ভিতরে এবং এমন কি পুরাতন জুতার মধ্যেও লুক্কাইত হইয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় ইহারা শিকার অন্বেষণে বহির্গত হয় এবং এই সময় আলোক দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বাহির হইতেও বিস্তর মশক গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। সন্ধ্যাকাল ব্যতীত অতি প্রত্যুষেও দরজা জানালা খোলা পাইলে মশক সকল বাহির হইতে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে।

ম্যালেরিয়া হইতে উদ্ধারের উপায় নিরূপণ করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয় গুলিই মনে রাখিয়া কার্য্য করা উচিত। উপায়গুলির নিম্নে বর্ণনা করা গেল :—

(১) ম্যালেরিয়াবাহী মশকের বিনাশ সাধন করা।

(২) ম্যালেরিয়া রোগী ও সুস্থ ব্যক্তিকে মশকের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা।

(৩) ম্যালেরিয়া জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলেও যাহাতে বংশ বৃদ্ধি করিতে না পারে তাহার উপায় করা।

(৪) ম্যালেরিয়া জ্বর হইলে তাহা অচিরে আরোগ্য করিবার চেষ্টা করা।

আমরা একে একে এই উপায়গুলির আলোচনা করিব।

(১) ম্যালেরিয়াবাহী মশকের বিনাশ সাধন করা।

মশক বংশ নির্ম্মূল করিবার কথা শুনিলে অনেকেই হাঁসিয়া থাকেন। তাঁহারা এই কার্য্যটীকে আকাশের নক্ষত্রগণনার সহিত তুলনা করেন; কিন্তু আকাশের নক্ষত্র গণনা যেরূপ বাস্তবিকই সম্ভবপর সেইরূপ মশকবংশ ধ্বংস করা আয়াস

সাধ্য হইলেও অসম্ভবপর নহে। সাধারণ মশক বাদ দিয়া কেবল এনোফিলিসের বিনাশ সাধন সম্ভবপর নহে।

যাহাতে নূতন মশক জন্মাইতে না পারে আমাদের প্রধানতঃ সেইরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বদ্ধ জল না থাকিলে মশকশাবক জন্মাইতে পারে না। বর্ষার প্রারম্ভেই বাসগৃহের সন্নিকটস্থ খানা ডোবা ইত্যাদি বুজাইয়া দেওয়া উচিত। নর্দ্দমা হইতে জল নিঃসরণের পথ পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য এবং যত দূর সম্ভব জঙ্গল কাটিয়া ফেলা আবশ্যক। অধিক বৃক্ষাদিযুক্ত স্থানে রৌদ্র প্রবেশ লাভ করিতে পারে না এবং মৃত্তিকা ভিজা থাকা প্রযুক্ত সহজেই জল জমে এবং এই সমস্ত কারণ মশকের বংশ বৃদ্ধির সহায়তা করে। যে সকল খানা ডোবা বুজাইয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে কিংবা যাহারা জল নিঃসারণেরও উপায় হইতে পারে না তথায় কেরাসিন তৈল দিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অল্পপরিমাণ তৈলেতে অনেকটা জল ঢাকিয়া রাখিতে পারে। বহুছিদ্র সংযুক্ত পিচকারীর সাহায্য তৈল দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে লতাগুল্মাদি সংযুক্ত জলেও তৈল সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হইতে পারিবে। সপ্তাহে দুই দিন করিয়া এইরূপ তৈল দিলেই যথেষ্ট হইবে।

আমরা অনেক সময় ভাঙ্গা টিনের বাক্স, ফুলগাছের টব প্রভৃতি ইতস্ততঃ ফেলিয়া রাখি। বৃষ্টির জলে এই সকল পাত্রাদি পূর্ণ হইয়া মশক জননের সহায়তা করে। গরুর জল খাইবার পাত্রে এবং জালা, কলসী প্রভৃতি যে সকল পাত্রে পানীয় জল সঞ্চিত থাকে তাহাদের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। পুষ্করিণীতে মৎস্য থাকিলে মশকশাবক বাস করিতে পারে না। খানা, ডোবা প্রভৃতিতে মৎস্য ছাড়িয়া দিবে তাহারা তত্রস্থ মশককুল ধ্বংস বিষয়ে অনেক সহায়তা করে।

গৃহস্থিত মশক ধ্বংস করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব্যাপার। অনেকে বলেন গন্ধকাদির ধূমে মশক বিনষ্ট হয়; ইহা চেষ্টা করিয়া দেখিতে কোন ক্ষতি নাই। মশক বিনষ্ট না হইলেও গন্ধকের ধূমে নিশ্চয় পলাইয়া যাইবে। নূতন মশক জন্মাইতে না দিলে মশক বংশ ক্রমে আপনিই লোপ পাইয়া থাকে।

(২) ম্যালেরিয়া রোগী ও সুস্থ ব্যক্তিকে মশকের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা। "আমাদের সুস্থ শরীরকে মশক দংশন হইতে রক্ষা করিতে পারিলে ম্যালেরিয়া হইবার

কোন সম্ভাবনা থাকে না। মশক যাহাতে গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য আজকাল কেহ কেহ দরজা জানালা প্রভৃতি সদাসর্ব্বদা তারের সরু জাল দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে উপদেশ দেন। ইহা ব্যয়সাধ্য এবং ইহাতে গ্রীষ্মকালে গৃহমধ্যে বায়ু চলাচল বন্ধ হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সন্ধ্যার পরেই এনোফিলিসের উপদ্রব অধিক; মশারি ব্যবহার করিলে ইহাদের আক্রমণ হইতে অনেকটা উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে। মশারির ভিতর অনেক সময় মশক লুকাইয়া থাকে; মশারি খাটাইবার সময় মশারির অভ্যন্তর উত্তমরূপে পরীক্ষা করা উচিত। বৈকালেই মশারি খাটান কর্ত্তব্য কারণ সে সময় যথেষ্ট আলোক থাকে। বলাবাহুল্য মশারিতে ছিদ্র থাকিলে সকল উদ্দেশ্যই নিষ্ফল হইয়া থাকে।

কেহ কেহ একেবারেই মশক দংশন সহ্য করিতে পারেন না, এমন কি মশকের ডাকে তাঁহাদের ঘুম হয় না। আবার কেহ সহস্র মশক দংশন সত্ত্বেও অকাতরে নিদ্রা যান। এই শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদেরই ম্যালেরিয়া হইবার অধিক সম্ভাবনা।

মশক-বহুল স্থানে সন্ধ্যাকালে শরীর উত্তমরূপে আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। পাতলা কাপড়, জামা, মোজা ইত্যাদির ভিতর দিয়া মশক সহজেই দংশন করিতে পারে, তজ্জন্য পুরু বস্ত্রাদি ব্যবহার করা যুক্তি সঙ্গত। কাল, নীল ইত্যাদি ঘোর রং মশকের প্রিয়, তজ্জন্য শ্বেত বস্ত্রই পরিধান করা শ্রেয়ঃ। উগ্র গন্ধ বিশিষ্ট দারুচিনি ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি তৈলের মশক দূর করিবার ক্ষমতা আছে।

(৩) ম্যালেরিয়া জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলেও যাহাতে বংশবৃদ্ধি করিতে না পারে তাহার উপায় করা :—

সুস্থ শরীরে জীবাণু প্রবেশ করিলেও সহজে বংশবৃদ্ধি করিতে পারে না কারণ শরীরস্থিত রক্ত ও রসাদি জীবাণুগণকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। দুর্গন্ধময় ও ভিজা জমিতে বাস, ঠাণ্ডা লাগান, আহার বিহারে অত্যাচার, রাত্রি জাগরণ, মাদক দ্রব্যাদি-সেবন ইত্যাদি কারণে শরীরের জীবাণুনাশক ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং ম্যালেরিয়া জীবাণুও শরীর মধ্যে বংশবৃদ্ধি করিবার সুযোগ পায়। দেশের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। দূষিত পানীয় জল পান করিয়া পল্লীগ্রামে অনেককেই অসুস্থ হইতে দেখা যায়। দেশের বড় লোকেরা পল্লীগ্রামে যদি

পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করাইবার ব্যবস্থা করেন এবং সেই মৃত্তিকাদ্বারা ছোট ছোট খানা, ডোবা প্রভৃতি বুজাইয়া দেন তাহা হইলে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হয়। রৌদ্র ও বিশুদ্ধ বায়ু প্রায় সকল রোগেরই শত্রু। বাসগৃহে যাহাতে এই দুইএর প্রাচুর্য্য বিদ্যমান থাকে সেই বিষয়ে সকলেরই লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

হুগলি সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত "ম্যালেরিয়া" নামক প্রবন্ধে শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এস, সি, মহাশয় বলেন "যে প্রণালীতে দেশের রেলপথ সমূহ ও এক নগর হইতে অন্য নগর সংযোগকারী রাস্তাসমূহ নির্ম্মিত হইতেছে তাহা একান্ত দোষ। উহা দ্বারা রেলপথের উভয় পার্শ্বে বহুসংখ্যক ডোবার সৃষ্টি হইতেছে মাত্র। দেশে রেল ও রাস্তা হইয়া কাজ নাই বলা চলে না, কারণ দেশের সভ্যতা বৃদ্ধির পক্ষে উহাদের একান্ত আবশ্যক। রাস্তা প্রস্তুত করিবার মাটী উহার উভয় পার্শ্বের বহুস্থান হইতে অল্প অল্প করিয়া না লইয়া এক এক স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে লওয়া শ্রেয়ঃ। তদ্দ্বারা সেই সেই স্থানে এক একটী বড় খাল বা দীর্ঘিকা হইয়া যাইবে। এরূপভাবে মাটী সংগ্রহ করিতে যে ব্যয় হইবে তাহা সম্ভবতঃ ঐ প্রকার ভাবে পথ নির্ম্মাণ করাতে যে জমি লাভ হইবে, তাহা হইতে এবং ঐ সকল পুষ্করিণীর মাছ হইতে উঠিয়া যাইবে এবং তদ্দ্বারা দেশের স্বাস্থ্যেরও যে উন্নতি হইবে তাহাও নিতান্ত কম লাভ নহে।"

এই প্রস্তাবটী সমীচীন বলিয়াই বোধ হয় কিন্তু ইহাকে কার্য্যকারী করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের আবশ্যক।

পল্লীগ্রামে যে পুষ্করিণীর জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয় তাহাতে অনেকেই মল মূত্রাদি ত্যাগ করেন। ইহা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ও দূষণীয় প্রথা। পানীয় জলে বস্ত্রাদি প্রক্ষালন করাও কর্ত্তব্য নহে।

উপরিউক্ত উপায় অবলম্বনে পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যের উন্নতি করিলে তত্রস্থ অধিবাসীদিগের ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের জীবাণুনাশক ক্ষমতা স্বতঃই বর্দ্ধিত হইবে এবং ক্রমে দেশও ম্যালেরিয়া শূন্য হইয়া স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিবে।

(৪) ম্যালেরিয়া রোগী যাহাতে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে তাহার উপায় করা উচিত, কারণ একটী রোগী হইতে অনেক মশকের শরীরে ম্যালেরিয়া জীবাণু প্রবেশ করিলে ক্রমে রোগ শীঘ্রই সংক্রামিত হইয়া বিস্তৃত হইতে পারে। কুইনাইন

ম্যালেরিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেকের ধারণা কুইনাইন সেবনে জ্বর আটকাইয়া থাকে মাত্র সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয় না। এই ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। ২।৪ দিন কুইনাইন খাইলে জ্বর বন্ধ হয় বটে কিন্তু শরীরস্থ ম্যালেরিয়ার সমস্ত জীবাণু বিনষ্ট হয় না। একেবারে নির্দোষ আরোগ্য লাভ করিতে হইলে কিছু অধিক দিবস কুইনাইন সেবন করা আবশ্যক। জ্বর বন্ধ হইয়া যাইবার পরও সপ্তাহে ২ দিন ১০ গ্রেন করিয়া কুইনাইন খাওয়া উচিত। ২।৩ তিন সপ্তাহ পরে ১০ গ্রেণকে কমাইয়া ৫ গ্রেণ করা যাইতে পারে। দেড়মাস দুইমাস এইরূপ কুইনাইন খাইলে ম্যালেরিয়ার পুনরাক্রমণের আর সম্ভাবনা থাকে না।

কুইনাইনের ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ক্ষমতাও আছে। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থানে প্রত্যহ ৪ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন খাইলে জ্বর হইবার ভয় থাকে না।

কেহ কেহ মনে করেন কুইনাইন শরীরকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। অত্যধিক মাত্রায় কুইনাইন সেবনে বধিরতা ইত্যাদি নানা উপসর্গ আসিতে পারে বটে, কিন্তু পরিমিত মাত্রায় সেবন করিলে ইহাতে কোন দোষই হয় না। ডাক্তারেরা প্রত্যহ ৪০ গ্রেণ পরিমাণ কুইনাইন ৮ মাস কাল খাইতেও উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রত্যহ ১০।২০ গ্রেণ কুইনাইন নির্বিঘ্নে সেবন করা যাইতে পারে।

কাহারও কাহারও কুইনাইন মোটেই সহ্য হয় না; তাহাদিগকে কুইনাইনের পরিবর্তে ছাতিম বা গুলঞ্চ দেওয়া যাইতে পারে। ছাতিম বা গুলঞ্চের ম্যালেরিয়া নাশক ক্ষমতা কুইনাইন অপেক্ষা কম।

দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করা কিছু অসম্ভব বা দুরূহ ব্যাপার নহে। গভর্ণমেণ্টের উপর সমস্ত কার্য্যভার নির্ভর না করিয়া আমাদের সমবেত চেষ্টায় অনেক সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান যতই দেশের লোকের মধ্যে বিস্তার লাভ করিবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। এই উদ্দেশ্যে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে সরল ভাষায় প্রবন্ধ সকল ছাপাইয়া পল্লীগ্রামবাসীদিগের মধ্যে বিতরণ করা উচিত। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বা মিউনিসিপালিটি অনায়াসেই ইহার ভার লইতে পারেন। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য পল্লীবাসীর কি কর্ত্তব্য নিম্নে তাহা ধারাবাহিক রূপে লেখা গেল,—

(১) প্রত্যেক গ্রামে ১০।১২ জন উৎসাহশীল যুবক মিলিত হইয়া ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি গঠন করিবেন। ইঁহারা গ্রামের লোককে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে উপদেশ এবং কি করিয়া মশক বিনাশ করিতে হয় তাহার শিক্ষা দিবেন। ইঁহারা সপ্তাহে একবার করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর ও তৎসংলগ্ন স্থান সমূহ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবেন এবং যে সকল ছোট ছোট গর্ত্ত ইত্যাদিতে জল জমিয়া মশক জন্মাইবার সম্ভাবনা, তাহা ভরাট করাইয়া দিবেন। যাহাতে নর্দ্দামা হইতে উত্তমরূপ জল নিঃসরণ হয় তাহার উপায় দেখিবেন এবং ভাঙ্গা টব, বাক্স প্রভৃতি যাহাতে জল জমিতে পারে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। যে সকল খানা, ডোবা ভরাট করা সম্ভবপর নহে তাহাতে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিবেন। বৃষ্টির সময় যাহাতে জল জমিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। প্রত্যুত যে যে স্থানে মশক জন্মাইবার সম্ভাবনা এইরূপ সকল স্থানেই তাঁহাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গৃহের সন্নিকটে ধানের ক্ষেত থাকিলে তাহাতে কেরোসিন দেওয়া যাইতে পারে। কেরোসিনে ধানের কোন ক্ষতি হইবে না।

(২) ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির চেষ্টা ব্যতীত প্রত্যেক গৃহস্থকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন তাহাদের গৃহসংলগ্ন কোন স্থানে মশক জন্মাইতে এবং থাকিতে না পারে। গৃহ প্রাঙ্গণে আবর্জ্জনাদি থাকিলে তাহাতে মশক আসিয়া উপস্থিত হয়।

(৩) সন্ধ্যাকালে বা অতি প্রত্যূষে মশক সঙ্কুল স্থানে শৌচাদির জন্য অনাবৃত গাত্রে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে।

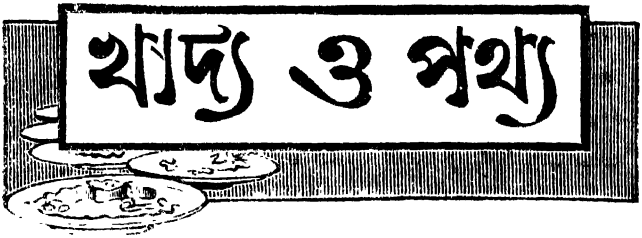
(৪) সন্ধ্যাকালে গৃহমধ্যে ধুনা দেওয়া ভাল; ইহাতে মশক পলাইয়া যায়।

(৫) সঙ্গতি থাকিলে প্রত্যেকেরই মশারি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। মনে রাখা উচিত তিন শিশি ঔষধের দামে একটী মশারির খরচ উঠিয়া যায়।

(৬) জামাদ্বারা গাত্রাদি আবৃত থাকিলে মশক দংশন করিতে পারে না।

(৭) সপ্তাহে দুই দিন উপরি উপরি ৪ গ্রেণ কুইনাইন খাইলে ম্যালেরিয়ার ভয় থাকে না।

(৮) ম্যালেরিয়া রোগীকে যাহাতে মশক দংশন করিতে না পারে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।



পাকা আম।

বাল্যকালে আমরা পদ্যমালায় পড়িয়াছিলাম :—

অমৃত স্বর্গেতে থাকে লোকে এই বলে।
তাত নয় আমাদের আম গাছে ফলে ॥

কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা কথার কথা নহে সত্যই পাকা আম অমৃত ফল। আমের সমকক্ষ হইতে পারে এরূপ ফল দেখা যায় না। আমই সকল ফলের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

সুমিষ্ট পাকা আম সকলেরই প্রিয়। শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই আম খাইতে ভালবাসে। নানাগ্রন্থে আমের বহুবিধ নাম ও গুণ বর্ণনা দেখা যায়।

আমের বর্ণিত নাম সকল—আম্র, চূত, রসাল, কামাঙ্গ, মধুদূত, মাকন্দ ও পিকবল্লভ। অতি সুগন্ধি আমের নাম সহকার।

পাকা আম নানা রকমের হয়। যথা গাছপাকা আম, কৃত্রিম পাকা আম, পর্য্যুষিত আম, অধিক পাকা আম ইত্যাদি।

আয়ুর্ব্বেদে পাকা আমের অবস্থাবিশেষে অনেক গুণ বর্ণিত আছে।

গাছপাকা আম—মধুরাম্লরস, গুরুপাক, বায়ুনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর।

কৃত্রিম পক্ক আম—অম্লরস-বিহীন ও মধুররস বলিয়া উহা পিত্তনাশক।

পর্য্যুষিত আম অর্থাৎ পক্ক আম—বাসি হইলে তাহা অতি রুচিকারক, বলপ্রদ, বীর্য্যবর্দ্ধক, লঘু, শীতবীর্য্য, শীঘ্রপাকী, বায়ুপিত্তনাশক ও সারক হইয়া থাকে।

পক্ক আমের গলিত রস—বলকারক, গুরুপাক, বায়ুনাশক, সারক, অসন্তৰ্পণজনক, অত্যন্ত পুষ্টিকারক এবং কফবর্দ্ধক।

আম খণ্ড খণ্ড করিয়া লইলে তাহা গুরু, রুচিকারক, চিরপাকী (অর্থাৎ বিলম্বে পরিপাক হয়), মধুর রস, শরীরের উপচয়কারক, বলকর, শীতবীর্য্য ও বায়ুনাশক হয়।

পাকা আম সকলেরই প্রিয়। রোগীরা আম খাইতে পারে কি না, এসম্বন্ধে প্রায়ই আমাদিগকে ব্যবস্থা দিতে হয়।

পাকা আমের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও প্রত্যেক উপাদানের শরীরের উপর কার্য্য-সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে না জানা থাকায় আমাদিগকে ব্যবস্থাদিবার সময় ইতস্ততঃ করিতে হইত।

সে বৎসর (দুই বৎসর পূর্ব্বে) খুব আম হইয়াছিল। বোম্বাই, ল্যাংড়া আমও বেশ সস্তা হইয়াছিল। সেই সময় এই সকল বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য শরীর-তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষাল মহাশয় পাকা আমের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও শরীরের উপর পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরীক্ষার প্রণালী ও ফলাফল "Food and Drugs" (Vol I No II oct 1010) নামক ইংরাজি ত্রৈমাসিক পত্রিকাতে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই তথ্য সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া আমি পাকা আম রোগীদিগকে পথ্যরূপে ব্যবস্থা করিতেছি ও করিয়াছি তাহা সাধারণের জ্ঞাতার্থ লিপিবদ্ধ করিলাম।

ডাক্তার ঘোষাল মহাশয় কলিকাতার বাজারে যে পাকা ল্যাংড়া বা বোম্বাই আম পাওয়া যায় তাহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেন এবং এই সকল আম খাওয়াইয়া মনুষ্যের উপর পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই সকল আমকে আয়ুর্ব্বেদ লিখিত পরিভাষা অনুসারে কৃত্রিম পক্ক ও পর্য্যুষিত আম্র বলা যাইতে পারে। ইহাদের ভক্ষণীয় অংশের শতভাগে নিম্নবর্ণিত খাদ্য জাতীয় উপাদান সকল পাওয়া গিয়াছিল।

১। আমিষ জাতীয়—১·২।

২। স্নেহ জাতীয়—·৭৬।

৩। শালি-জাতীয়—১৭·৫৮ { গ্লুকোজ—৫·৯ ; অন্যান্য শর্করা ১১·৬৮ }

৪। লবণ জাতীয়—১·২৩ { ক্যালসিয়াম অক্সালেট্ আদৌ বর্ত্তমান ছিল না।

৫। জল—৭৫·৫.

উপরিলিখিত উপাদান ব্যতীত শতকরা ৩·৭৩ ভাগ সেলিউলোজ (Cellulose) নামক অসার উপাদান বর্ত্তমান ছিল। পাকা আমে যত বেশী আঁস হইবে ততই বেশী সেলিউলোজ থাকিবে। আঁস আমের অসারাংশ। তাহাতে কোন পুষ্টিকারীতা নাই। কেবল দাঁতের মধ্যে আট্‌কাইয়া যায় এবং পেটে গিয়া গুরুত্ব উৎপাদন করে।

ল্যাংড়া, বোম্বাই প্রভৃতি উৎকৃষ্ট আমে আঁস অতি অল্প সেই জন্যই আমাদের পরীক্ষায় অতি অল্পমাত্রায় সেলিউলোজ পাওয়া গিয়াছিল। সাধারণ আঁসযুক্ত আমে সেলিউলোজ যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। সেই জন্য এই সকল আম গুরুপাক ও পেটের পীড়া উপস্থিত করে।

কেবলমাত্র আম খাইয়া জীবনধারণ করা যাইতে পারে কি না ইহা ঠিক করিবার জন্য আমাদের এই পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীমান্ কপিল দেব দত্ত পাঁচদিন পাঁচরাত্রি কেবল ল্যাংড়া বোম্বাই আমের সদ্ব্যবহার করেন। অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য খান নাই। কেবলমাত্র আবশ্যক মত জল খাইয়াছিলেন। এই কয়দিন তাঁহারা তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ কর্ম্ম সকলই করিয়াছিলেন।

পাঁচদিন কেবলমাত্র আম খাওয়ার পর তাহাদের দুই জনেরই ওজন কমিয়া গিয়াছিল; যদিও তাহারা উদরপূর্ণ করিয়া আম খাইত, পেটে কিছু ক্ষুধা রাখিত না তথাপি তাহাদের মুখের চেহারায় অনশনের চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইয়াছিল। এবং পঞ্চম দিনে দুই জনেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল ও তাহাদের মাথা ঘুরিতেছিল।

যদিও শালি-জাতীয় খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে ভক্ষিত হইয়া ছিল তথাপি আমিষ জাতীয় ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যের মাত্রার অভাব জন্য এ সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

প্রত্যহই তাহাদের মূত্র পরীক্ষা করা হইত। তাহাতে শর্করা আদৌ দৃষ্ট হয় নাই।

এবং তাহাদের প্রস্রাবের লবণাংশও কমিয়া গিয়াছিল। প্রস্রাবের ফস্‌ফরাস্ ও অন্যান্য লবণের অংশ অবিকৃত ছিল।

অনেকের ধারণা আছে যে বেশী আম খাইলেই প্রস্রাবে শর্করা হইয়া থাকে। তাহা সম্পূর্ণ ভুল। দিবারাত্র ৫দিন কেবল আম খাইয়াছিল তথাপি মূত্রে শর্করা দৃষ্ট হয় নাই।

রোগ বিশেষে পাকা আমের ব্যবস্থা—রোগীর জন্য কেবলমাত্র সুপক্ক সুমিষ্ট উৎকৃষ্ট আমেরই ব্যবস্থা হইতে পারে। অম্লরস থাকিলে তাহা অসেব্য। বেশী আঁস থাকিলে আম গুরুপাক হয় ও অজীর্ণ উৎপাদন করে।

বহুমূত্র রোগে—যখন যে মনুষ্য বেশ উপার্জ্জনক্ষম হয়, যখন দশ জনের মধ্যে একজন হয়, তখনই প্রায় বহুমূত্র রোগ অতর্কিত ভাবে তাহার শরীরে আশ্রয় লয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, আমাদের আহারের সচ্ছলতার সহিত শরীরের বেশী পুষ্টি সাধন করিবার জন্য খাদ্যের পরিমাণ নিজ হইতেই অলক্ষিত ভাবে বাড়িয়া যায়। আমরা দুধটুকু মারিয়া ক্ষীর খাইতে আরম্ভ করি। মাংস সিদ্ধ করিয়া আক্‌ণী বা সুরুয়া খাইতে অভ্যস্ত হই। এই প্রকার অত্যধিক গুরুদ্রব্য সকল ভোজন করিয়া আমরা নিজেই বহুমূত্র রোগের সৃষ্টি করি। এই বহুমূত্র রোগ স্বকৃত।

যখন বহুমূত্র রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা চিকিৎসকের গণ্ডির মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করেন, তখন তাহারা চিকিৎসার কঠোর শাসনে খাদ্য সুখে বঞ্চিত হন এবং অনেক সময় একটী আম খাইতে পারি কি না জিজ্ঞাসা করিয়া সোৎসুক নেত্রে চিকিৎসকের আদেশের প্রতীক্ষা করেন। বহুমূত্ররোগীর খাদ্যের পরিমাণ কম করা আবশ্যক। খাদ্যের মাত্রার আধিক্যের জন্যই সাধারণতঃ প্রস্রাবে শর্করা হইয়া থাকে। আম প্রস্রাবে শর্করা তৈয়ারি করে না সেজন্য বহুমূত্ররোগীগণ স্বচ্ছন্দে আম খাইতে পারেন।

বাতাদি রোগে—(Gout, Rheumatism) এই সকল রোগ আমিষ-জাতীয় খাদ্যের আধিক্যের জন্য হইয়া থাকে। আমে যখন আমিষাংশ অতি অল্প, তখন এই আম্র ফল বাতব্যাধি রোগগ্রস্ত লোকেরা ঔষধ ও পথ্যরূপে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন।

শোথরোগে—সাধারণতঃ রক্তাল্পতা, মূত্রগ্রন্থির পীড়া, হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা

ও পীড়া ইত্যাদি রোগে হাত, পা, মুখ ও সময় সময় সর্ব্বশরীর ফুলিয়া থাকে। প্রস্রাবের পরিমাণ কম হওয়াও শরীর মধ্যে লবণাংশ থাকিয়া যায় এবং শোথ উৎপাদন করে। এই শোথ অতি কষ্টসাধ্য উপসর্গ। রোগীরও অরুচি, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে হইয়া থাকে। এই সকল রোগীর জন্য যথাসম্ভব কম লবণ খাইবার ব্যবস্থা দিয়া থাকি। কবিরাজ মহাশয়েরা কেবল দুগ্ধ ও মান মণ্ড খাইবার ব্যবস্থা দেন। লবণ জলও বন্ধ করেন। আমি Distilled water এবং যে যে খাদ্যে অতি অল্প পরিমাণে লবণ ও আমিষ জাতীয় উপাদান থাকে তাহারই ব্যবস্থা দিয়া অতি সত্বর ফল পাইয়া থাকি। এই জন্য এই সকল রোগীকে অবাধে পাকা আম খাইতে ব্যবস্থাও দিই।

মূত্রগ্রন্থি ও মূত্রনলীতে বালুকা ও পাথরির জন্য বেদনায়—

আজকাল Renal colic (রেনাল কলিক) প্রায় অনেকেরই হইয়া থাকে। ইহা অতি কষ্টদায়ক ব্যাধি। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ বেদনা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং রোগীকে অসহ্য যন্ত্রণা দেয়। এই রোগ শরীরাভ্যন্তরে খাদ্যদ্রব্যাদির পরিপাক এবং তজ্জনিত পুষ্টির অসামঞ্জস্য হইতেই হইয়া থাকে। খাদ্য বিশেষে শরীরের উপর বিশেষ ভাবে কার্য্য করে। প্রায় অধিকাংশ চিকিৎসকেরা যে সকল রোগীর প্রস্রাবে অক্সালেট (Oxalate Crystals) দানা পাওয়া যায় তাহাদিগকে আম খাইতে নিষেধ করেন। আমে অক্সালেট্ আছে কি না তাহা আমি পরীক্ষা করি এবং কোন প্রকারে অক্সালেট্ পাই নাই। প্রস্রাবে যে অকসালেট্ দৃষ্ট হয়, তাহা শরীরের আভ্যন্তরিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইতেই শরীর মধ্যে তৈয়ারি হইয়া প্রস্রাবের সহিত নির্গত হয় এবং যদি প্রস্রাব ঘন হয়, তাহা হইলে এই অকসালেট্ দানা বাধিয়া অধঃপতিত হয় এবং মূত্রগ্রন্থি ও মূত্রনলীর বেদনা উৎপন্ন করে। সেই জন্য এই সকল পীড়ায় যাহাতে প্রস্রাব পরিষ্কার থাকে তাহারই ব্যবস্থা করা উচিত। বৃথা রোগীকে আম খাইবার জন্য নিষেধ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এই সকল রোগীদের আহারের পরিমাণ যাহাতে কমে এবং যাহাতে প্রস্রাব যথেষ্ট পরিমাণে হয়, তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আম তাহারা স্বচ্ছন্দে খাইতে পারেন।

স্কার্ভি রোগে—(Scurvey) পাকা আম বিশেষ উপকারী। ছোট

ছেলেদের (Rickets) রিকেটস্ রোগে সুমিষ্ট ও উৎকৃষ্ট আমের ছোট ছোট টুক্রা খাইতে দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পোষণে ও বলবর্দ্ধনে—যে সকল রোগে শরীরের পুষ্টির আবশ্যক, যাহাদের শরীরে বলের আবশ্যক, তাহারা দুগ্ধের সহিত পাকা আম খাইলে বিশেষ ফল পাইবেন। দুগ্ধ সংযুক্ত আম শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, মধুর রস, গুরু. শীতবীর্য্য বায়ু পিত্ত নাশক, রুচিকারক, পুষ্টিকারক ও বলবর্দ্ধক। (দ্রব্যগুণদ)

স্বাভাবিক কোষ্ঠকাঠিন্যে—যাহাদের কোষ্ঠ স্বভাবতঃ কঠিন তাহারা প্রত্যহ দুই চারিটী উত্তম আম খাইলে এই কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

জোলাপের ঔষধ কিনিবার মূল্যে ভাল আম কিনিয়া খাইলে জোলাপ লওয়া অপেক্ষা বেশী উপকার হয়।

নিষিদ্ধ ব্যবহার—অম্লরসযুক্ত আম ব্যবহার করিলে নানাপ্রকার দোষ ও রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। সেই জন্য দুর্ব্বল ব্যক্তির ও রোগীর জন্য অম্ল রসযুক্ত আম্রের ব্যবহার নিষেধ।

আম খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং ইহা মৃদু জোলাপের কার্য্য করে সেই জন্য পেটের পীড়ায়, তরল দাস্ত (Diarrhoea) এবং অমাশয় রোগে (Dysentery) আম খাওয়া একেবারে ত্যাগ করিবে।

আমফোড়া—গ্রীষ্মকালে গাত্রে ঘামাচি ও ঘামাচির গোড়ের সহিত ফোড়া প্রায়ই দেখা যায়। ইহাদিগকে সাধারণতঃ আম ফোড়া বলা যায়। (Mango Boils)। ইহারা কেবল চর্ম্মেই হইয়া থাকে। ঘর্ম্ম বহা নলী রুদ্ধ হওয়ায় এই সকল ফোড়ার উৎপত্তি হয়।

আম খাওয়ার সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তবে এইমাত্র সম্বন্ধ যে, যখন খুব গরম পড়ে তখন আমও পাকে আমরা আমও খাই এবং তৎকালে এই সকল ফোড়াও হইয়া থাকে। বৃষ্টি পড়িলেই এই সকল ফোড়া লুকাইয়া যায়। কেবল এই সকল সাময়িক ফোড়ার জন্য বৃথা আমরা আমের উপর দোষ দিতে পারি না।

চর্ব্বণের উপকারিতা।

ঈশ্বর আমাদের মুখ ও দন্তপাতি বৃথা সৃজন করেন নাই। পরিপাক যন্ত্রের প্রথমেই মুখ ও দন্তপাতি অবস্থিত। আমাদের শরীরাভ্যন্তরস্থ পচনক্রিয়া জনিত অনেক রোগ এই দন্তের কার্য্য সম্যক্‌রূপে সাধিত না হওয়ার জন্য উৎপন্ন হয়। এই মুখগহ্বর ও তন্মধ্যস্থিত দন্তপাতির সাহায্যে পরিপাক ক্রিয়া আরম্ভ করে।

(১) খাদ্য দ্রব্যাদি মুখগহ্বরে দন্তপাতি দ্বারা উত্তমরূপে চর্ব্বিত হয় ও মুখনিঃসৃত লালার সহিত মিলিত হয়।

(২) এই লালার দ্বারা সিক্ত হইয়া খাদ্য দ্রব্যাদি অনায়াসে পাকস্থলীতে নীত হয়। আমরা যত বেশী চর্ব্বণ করি, ততই অধিক লালা নিঃসৃত হয় এবং ততই সহজে খাদ্য দ্রব্যাদি পাকস্থলীতে যাইতে পারে। না চিবাইয়া তাড়াতাড়ি খাইতে গেলে অনেক সময় খাদ্য দ্রব্যাদি গলায় আটকাইয়া যায়।

(৩) উত্তমরূপে চর্ব্বিত হইলে খাদ্য দ্রব্যাদি সূক্ষ্ম অংশে পরিণত হয় এবং পাকাশয়স্থ রস তাহাদের উপর উত্তমরূপে ক্রিয়া করিতে পারে ও ভুক্ত দ্রব্যাদি ও সহজে পরিপাক পায়।

(৪) উত্তমরূপে চিবাইলে মুখনিঃসৃত লালা দ্বারা খাদ্য দ্রব্যাদি, মুখগহ্বরে আংশিক ভাবে পরিপাক পায় যথা শ্বেতসার চিনিতে পরিণত হয়।

(৫) রুষদেশীয় বিখ্যাত শরীরতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক প্যাভলওর (Pavlaw) মতে ভুক্ত দ্রব্যাদি উপমরূপে চর্ব্বিত হইলে এবং মুখগহ্বরে অধিকক্ষণ থাকিলে, পাকাশয়স্থ রসাদি অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয় এবং পরিপাক ক্রিয়ার বিশেষ সুবিধা করে। ইহা দ্বারা জিহ্বার স্নায়ু উত্তেজিত হয় এবং উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে শরীরস্থ স্নায়ুমণ্ডলীও উত্তেজিত ও বলিষ্ঠ হয়। ইহার দ্বারা কেবল যে পরিপাক উত্তমরূপে সম্পাদিত হয় তাহা নহে অধিকন্তু স্নায়ুমণ্ডলীর শক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং অনেক রোগেরও উপশম হয়।

(৬) উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিলে অল্প খাদ্যই যথেষ্ট পরিমাণে শরীরের পুষ্টি সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। খাদ্য দ্রব্যাদি চর্ব্বণ দ্বারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে পরিণত হইলে পাকাশয়স্থ রসাদির দ্বারা শীঘ্রই পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া

শরীরের পুষ্টি সাধন করে। অতি অল্পই আবর্জ্জনা শরীরকে পরিত্যাগ করিতে হয়। সেই জন্য শরীরের অনেক পরিশ্রম লাঘব হয় এবং অল্প খাদ্য দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টি সাধিত হয়।

নিয়মমত চর্ব্বণ করিয়া খাইলে মন্দাগ্নি, বদহজম ইত্যাদি রোগ শীঘ্রই আরোগ্য হয়। শরীরাভ্যন্তরে খাদ্য দ্রব্যাদির পচন ক্রিয়া জনিত রোগ সকল নির্ম্মূল হয় এবং যাবতীয় স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য জনিত রোগও আরোগ্য হয়।

যখন তরল দ্রব্যাদি খাইতে হয় তখন অল্প অল্প করিয়া লালার সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে চর্ব্বণের সকল গুণ পাওয়া যায়।

অধুনা সভ্যতার বিস্তারের সহিত আমাদিগকে যে আহারের সময় চর্ব্বণ করিতে হয় তাহা আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি। ভক্ষ্য অন্নের সহিত ঝোল, ডাইল, তরল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া আমরা তাড়াতাড়ি উদরস্থ করিয়া থাকি। চর্ব্বণের অবসরও দিই না এবং সেই জন্য ভূক্ত দ্রব্যের সহিত লালাও উপযুক্তমাত্রায় মিশ্রিত হইবার সুবিধা পায় না। যদিও আমরা তরল ঝোল, দাউল, দুগ্ধ ইত্যাদির সাহায্যে অন্ন পাকস্থলীতে লইয়া যাই কিন্তু পরিপাকের প্রথম কার্য্যটি অসম্পূর্ণ থাকে। এই জন্য আজকাল বাঙ্গালীদের মধ্যে অজীর্ণ, অম্ল ইত্যাদি রোগ নিত্য সহচর হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রাস অন্ন যদি উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া ও সেই সঙ্গে মুখনিঃসৃত লালার সহিত মিশ্রিত করিয়া উদরস্থ করি তাহা হইলে শীঘ্রই তাহাদের পরিপাক হয় এবং তাহারা শরীরের পূর্ণমাত্রায় পুষ্টিসাধন করিতে সক্ষম হয়।

মহামতি গ্লাডষ্টোন ৮০ বৎসর বয়সেও প্রায় ১২ জন সাধারণব্যক্তির সমতুল্য মানসিক কার্য্য করিতেন। তিনি আহারের সময়ে প্রত্যেক গ্রাসকে ৩২ বার চিবাইয়া উদরস্থ করিতেন এবং পাছে ভুল হয় বলিয়া চিবাইবার সঙ্গে সঙ্গে ৩২ গুনিতেন।

যাহারা তাড়াতাড়ি খাইয়া থাকেন তাহারা যেন মহামতি গ্লাডষ্টোনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ৩২ বার চিবাইয়া তবে উদরস্থ করেন। ইহা দ্বারা তাহাদের সম্পূর্ণরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইবার রীতি অভ্যস্ত হইবে।

ইংরাজিতে প্রবাদ আছে যে "Chew as many times as you have teeth" অর্থাৎ তোমার দন্ত-পাতিতে যত দাঁত আছে ততবার প্রত্যেক গ্রাস চর্ব্বণ করিবে।

সংক্রামক রোগে সাধারণের কর্ত্তব্য।

ডাক্তার শ্রীলালমোহন ঘোষাল এল্, এম্, এস, লিখিত—

বসন্ত।

ইহা একটী ভয়ানক রোগ। বসন্ত দুই প্রকার—পানিবসন্ত (Chicken Pox) ও ইচ্ছাবসন্ত (Small Pox) এই দুই রোগই অতিশয় ছোঁয়াচে।

পানিবসন্ত।—প্রথম একদিন কি দুই দিন জ্বর হয়, কোনও কোনও সময়ে জ্বর হয় কি না তাহা বুঝা যায় না; তার পরেই গায়ে, জলে ভরা ছোট ছোট গুটি বাহির হয়। পরে সেগুলি পাকিয়া যায় এবং পনর কুড়ি দিনের ভিতরেই রোগী আরোগ্য লাভ করে। এ রোগ অতিশয় ছোঁয়াচে, কিন্তু ইহাতে প্রাণনাশের আশঙ্কা অতি কম; এই রোগ একজনের হইলে, তাহাকে কোনমতে কাহাকেও ছুঁইতে না দিলে, অন্য কাহারও হইবার সম্ভাবনা নাই। এমন দেখা গিয়াছে যে, এই রোগ বাড়ীতে একজনের হইবার পর, সকলেরই হইয়াছে। কিন্তু এ রোগে কাহারও মৃত্যু হইতে দেখা যায় নাই।

প্রতিকার।—কাহারও পানিবসন্ত হইলে, এমন বন্দোবস্ত করিবে যে যেন কেহ তাহাকে না ছোঁয়। রোগীকে দুগ্ধ, সাগু প্রভৃতি লঘু আহার দিবে; কোনও ঔষধ দিবার দরকার নাই।

ইচ্ছাবসন্ত।—এই রোগ অতিশয় ভয়ানক; ইহাতে প্রাণনাশের আশঙ্কাও অধিক। এই রোগে প্রথম দুই তিন দিন খুব জ্বর হয়, অত্যন্ত বমি হয়, কোমর কামড়ায়, মাথায় খুব যাতনা হয়, রোগী ঘুমাইতে পারে না, কষ্টের একশেষ হয়। পরে তিন কি চারিদিনের দিন কপালে এবং হাতে খুব ছোট ছোট লাল গুটি বাহির হয়, গুটি বাহির হইলেই আনুসঙ্গিক কষ্ট অনেকটা দূর হয়। ক্রমে সেগুলি গায়ে ছড়াইয়া পড়ে এবং ছয় সাত দিনের মধ্যে তাহাতে জল ও মুখগুলি বসিয়া যায়; পরে সে গুলি পাকিয়া উঠে, ক্রমে খুব জ্বর হয় এবং কষ্টও খুব বাড়ে। কাহারও কাহারও গুটিগুলি সহজেই পাকিয়া উঠে, এবং আনুসঙ্গিক কষ্ট তত

বেশী হয় না। এরূপ হইলে, ক্রমে জ্বর কমিয়া যায়, পুঁয বাহির হয় ও গুটির মুখগুলি শুকাইয়া যায়, পরে ঘায়ের উপর মাড়ি পড়ে এবং উহা শুকাইয়া গিয়া ক্রমে ছাড়িয়া যায়। এই বসন্ত, সাংঘাতিক হইলে, জ্বর কমে না, পুঁয বাড়ে, রোগী প্রলাপ বকে এবং ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও মরিয়া যায়।

আর এক রকম ইচ্ছাবসন্ত আছে, উহা হইলে শরীরে বসন্ত একেবারে একস্থানে অনেকগুলি একত্র হইয়া বাহির হয়। এই রকম বসন্ত পাকে না এবং রোগী প্রায় পাঁচ সাত দিনের ভিতর মরিয়া যায়।

প্রতিকার।—এই রোগ অতিশয় ভয়ময়; এজন্য যাহাতে এই রোগ না হয়, তাহা করা আমাদের সকলেরই সর্ব্বতোভাবে উচিত। প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর সকলেরই টিকা লওয়া উচিত। তাহা হইলে অনেক সময় বসন্তের হাত এড়াইতে পারা যায়। যাহার বসন্ত হইবে তাহাকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিবে। যাহারা রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিবে, তাহারা ভিন্ন রোগীকে কেহ ছুঁইবে না। যে বাড়ীতে বসন্ত হইয়াছে, সেই বাড়ীর সকলে টিকা লইবে। টিকা লইলে, কোনও অসুখ বা ভয়ের কারণ নাই, পরন্তু বসন্তের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার অনেকটা সম্ভাবনা। বাড়ীতে অন্য কাহাকেও আসিতে দিবে না বা বাড়ীর লোক যতদূর পারে কাহারও বাড়ীতে যাইবে না। যতদিন রোগী একেবারে সারিয়া না যায় এবং সারিয়া গেলেও তাহার পরে দশদিন পর্য্যন্ত রোগীর বাড়ীর লোকের অপর বাড়ীর লোকের সহিত মেশা উচিত নয়।

বসন্ত হইলে, ভাল চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

প্লেগ।

ইহা আর একটী ভয়ানক রোগ। ইহাতে কুঁচকি, বগল অথবা গলার বীচি ফুলিয়া অত্যন্ত জ্বর হয়। রোগী প্রলাপ বকে, অথবা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে। এই রোগে বাঁচিবার আশা অতিশয় অল্প; ইহা অতিশয় সংক্রামক; যাহারা এই রোগের সংস্পর্শে আসে, তাহাদেরই এই রোগ হইবার সম্ভাবনা। অতএব এই রোগেও সাবধান হওয়া অতিশয় আবশ্যক। বসন্ত রোগে যে সকল নিয়ম পালন করিতে

বলিয়াছি, ইহাতেও সেইগুলি মনযোগের সহিত পালন করা উচিত। কাহারও প্লেগ হইলে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক রাখা উচিত, কাহাকেও তাহার সংস্পর্শে আসিতে দেওয়া উচিত নয়, সর্ব্বদা রোগীর ঘরের চারিপাশে ফিনাইল (Phenyle) ছড়াইয়া দিবে। বাড়ীতে দুইবেলা গন্ধক পোড়াইবে, যে সেবা করিবে সে সর্ব্বদা সাবান ও ফিনাইল দিয়া হাত ধুইয়া ফেলিয়া, পরে অন্য কাজ করিবে। বাড়ীর চারিধারে বিশেষতঃ দরজার গোড়ায় চুণ ছড়াইয়া দিবে। প্লেগের সময়ে প্লেগের টিকা লইলে উপকার হইতে পারে; রোগীকে সুচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে ইন্দুর দ্বারা রোগ সংক্রামিত হয়। সেজন্য যাহাতে বাড়ীতে ইন্দুর বাস করিতে না পারে তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কলেরা বা ওলাউঠা

এই রোগের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ইহাও অতিশয় ভয়ানক রোগ এবং এই রোগ হইলে, প্রাণরক্ষা হওয়া সুকঠিন। ইহা অতিশয় কষ্টদায়ক রোগ, এ রোগেও বিশেষ সাবধানতার দরকার।

রোগের লক্ষণ।—প্রথমে পেট কামড়ায়, পাতলা পাতলা দাস্ত হয় অথবা দুই তিন দিন ভাল দাস্ত হয় না; তৎপরে একেবারে অত্যন্ত পাতলা দাস্ত হয় এবং উপর্য্যুপরি দুই তিনবার ভয়ানক দাস্ত হয়, দাস্ত ঠিক চাল-ধোয়ানি জলের মত হয়। খুব ভয়ানক পেট কামড়ায়। দুই তিন দাস্তের পরেই প্রস্রাব বন্ধ হয়। রোগী আর উঠিতে পারে না, বমন কি যেখানে দাস্ত হয়, সেইখানেই শুইয়া পড়ে। হাতে পায়ে খিল ধরে, তাহাতে ভয়ানক যাতনা হয়, ইহার পর ভয়ানক বমি হয়, মুখ দিয়া জল উঠে। খুব ভয়ানক পিপাসা হয়। জল যত খায়, কিছুতেই পিপাসার উপশম হয় না, ইহার উপর আবার বমি হয়। ক্রমে রোগী ভয়ানক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এমন কি কথা কহিতে পারে না, নাড়ী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া, একেবারে ছাড়িয়া যায়। খুব ঘাম হয়, গা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়। এই রোগ এমন সংঘাতিক হইতে পারে যে, রোগীর পাঁচ ছয় ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। যাহারা ২৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টা বাঁচে, তাহারা ক্রমশঃ সারিয়া উঠিতে পারে; আবার কেহ কেহ পরে দুর্ব্বলতায়

ভোগে, জ্বর হয়, রোগী ক্রমে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, খুব ছট্‌ফট্ করে, চথের ভিতর ঘা হইতে পারে, রোগী ভুল বকে, শেষে ভুগিযা ভুগিয়া মারা যায়।

প্রতিষেধ।—এই রোগ অতিশয় ভয়ানক; এরূপ দেখা গিয়াছে যে, গ্রামকে গ্রাম কলেরায় একেবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। অতএব এই রোগেও সাবধানতার বিশেষ দরকার। খাদ্যের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। দূষিত জল পান করার দরুণই এই রোগ হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। খাদ্য ও জল সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। জল প্রথমে সিদ্ধ করিয়া, পরে ঠাণ্ডা করিয়া খাইবে। বাজারের অথবা পচা বা বাসি খাবার খাওয়া একেবারে পরিত্যাগ করিবে। বাড়ীতে কাহারও কলেরা হইলে, মলমূত্র আলাহিদা করিয়া রাখিবে ও পরে উহা পোড়াইয়া ফেলিবে। কোনও মতে মলমূত্র-সংযুক্ত কাপড় কিংবা ন্যাক্‌ড়া পুকুরের জলে কাচিবে না। তাহাতে যে কেবল নিজেদের মধ্যে অন্য কাহারও হইবার সম্ভাবনা তাহা নহে; সমুদয় গ্রামের লোক, যাহারা সেই জল ব্যবহার করে,তাহাদেরও হইবার সম্ভাবনা। বাড়ীর চারিধারে ধুনা ও গন্ধক পোড়াইবে। যে ঘরে রোগী থাকে, তথায় যে সেবা করিবে, সে ব্যতীত আর কাহাকেও যাইতে দিবে না রোগীর সেবার পর, প্রত্যেকবারে সাবান ও ফিনাইল দিয়া হাত ধুইয়া ফেলিবে। রোগীর ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং ঘরে হাওয়া যাতায়াতের সুবিধার জন্য দরজা জানলা ইত্যাদি সর্ব্বদা খুলিয়া রাখিবে। কলেরার সময় যাহাতে ভাল হজম হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। নিমন্ত্রণ খাওয়া পরিত্যাগ করিবে। রাত জাগিবে না। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে। বাড়ীর চারিধারে ফিনাইল ছড়াইয়া দিবে।

প্রতিকার।—এই রোগে রোগীর যন্ত্রণা অতিশয় কষ্টদায়ক হয়। পিপাসায় জল খাইতে দিবে, তাহাতে বমির যাতনা কম হইবে। বরফ পাইলে, জলের বদলে বরফ খাইতে দিবে। পেটের উপর বরফ দিবে। জল সামান্য লবণের সহিত মিশাইয়া খাইতে দিলে ভাল হয়। এক চামচ অথবা আধ ঝিনুক লবণ ও এক সের জল, এই পরিমাণে খাইতে দিবে। রোগীকে বিছানা হইতে উঠিতে দিবে না।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্"

থম বর্ষ। } শ্রাবণ ১৩১৯ সাল { চতুর্থ সংখ্যা।

পানীয় জল।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত—

স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য, নির্ম্মল পানীয় জল, বিশুদ্ধ বায়ু এবং নিয়মিত বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়ামের বিশেষ আবশ্যক। স্বাস্থ্য-সমাচারে সমস্তগুলির আলোচনা হইতেছে এবং হইবে। আজ আমরা এ প্রবন্ধে পানীয় জলের সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিব। রোগক্লিষ্ট বাঙ্গালাদেশে শতকরা ৯৯ জনের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতাই অনেক স্থলে রোগের কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। দেশ হইতে রোগ তাড়াইতে হইলে এই সমস্ত অজ্ঞতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে।

আমাদের দেশের অনেকেই জানেন না যে পানীয় জল হইতে নানাপ্রকার উৎকট রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। এই কারণে অনেকে এ বিষয়ে আদৌ

মনোযোগ দেন না। কিন্তু বস্তুতঃ জল হইতেই অধিকাংশ উৎকট রোগ হয়। জীবাণু ও উদ্ভিজ্জাণু হইতে যে সমস্ত রোগ হয় তাহা জলের সাহায্যেই শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। টাইফয়েড্, কলেরা, পাকযন্ত্রের অন্ত্রে নানারূপ উৎকট ঘা প্রভৃতির জীবাণু, উদ্ভিজ্জাণু ও পরাঙ্গপুষ্ট জীবের ডিম্বাদি পানীয় জলের সহিত উদরস্থ হয়। এই সমস্ত বিপজ্জনক, উৎকট ক্লেশদায়ক এবং মারাত্মক জীবাণুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে পানীয় জলের সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই বিষয়ে লক্ষ্য না রাখায় এবং অন্যান্য অজ্ঞতানিবন্ধন প্রতিবৎসর কত লোক যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে তবে পানীয় জল কিরূপ হওয়া উচিত? নির্ম্মল, স্বচ্ছ কোন বিশিষ্ট স্বাদহীন এবং নির্গন্ধ হওয়া উচিত; পানীয় জলের এই গুণগুলি যাহাতে বর্ত্তমান থাকে সে বিষয়ে প্রথম লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য কতকগুলি বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে নিম্নে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে বিভিন্ন জল সরবরাহের উপায় দেখা যাউক।

১। বৃষ্টির জল।
২। পুষ্করিণীর জল—Surface water.
৩। কূপাদির জল—Subsoil water.
৪। ঝরণার জল।
৫। নদীর জল—Current water.
৬। গভীর কূপাদির জল।

১। **বৃষ্টির জল**—সমস্তগুলিই বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে। তাহা ছাড়া পানীয় হিসাবে ইহাতে প্রায়ই সর্ব্বপ্রকার গুণ বর্ত্তমান। কখন কখন অল্প পরিমাণে নানারূপ বায়ু দ্রব হইয়া থাকে। সহরে এই দ্রব বায়ুর (gas) মাত্রা অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু বৃষ্টির জল সর্ব্বদা পাওয়া যায় না অতএব এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই।

১। **পুষ্করিণীর জল**—ইহাই বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ লোকের জীবন ধারণের উপায় কাজেই আমরা এ সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব। সাধারণতঃ পুষ্করিণীর জল বদ্ধ (Stagnant) অতি অল্প পুষ্করিণীর জল "মাটী হইতে উঠে।" প্রকাণ্ড গর্ত্তের মধ্যে বৃষ্টির জল জমিয়াই পুষ্করিণীর বা চলিত ভাষা "পুকুরের" উৎপত্তি। পুষ্করিণীর আভিধানিক অর্থ যাহাই হউক সাধারণতঃ যাহাকে পুকুর বলা হয় এবং যাহার জল পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহার উৎপত্তি এইরূপ। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে বদ্ধ জলের যাহা দোষ পুষ্করিণীর জলেরও অল্প বিস্তর তাহাই দোষ।

পানীয় জল হিসাবে বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে একটীও পুষ্করিণী নাই বলিলেও চলে। বিজ্ঞানমতে জলাধার বলিলে এই পুকুর বোঝায় না। এইরূপ জলাধার বাঙ্গালায় অতি অল্পই দেখিয়াছি। অধিকাংশ স্থলে এগুলি নানাপ্রকার জলজ উদ্ভিদের (যথা,—পানা, ঝাজি, কমিশাক, শালুক, পদ্ম, প্রভৃতি জলজ পুষ্পের ডাঁটার) আবাস ভূমি। তাহা ছাড়া রৌদ্র এ স্থানে আসিতে পারে না। চারিদিকে নানাপ্রকার লতাগুল্ম আগাছায় পরিপূর্ণ। দিবারাত্রই পাতা পড়িয়া পচিতে থাকে। তাহাতে জলে একপ্রকার দুর্গন্ধ হয়। সময়ে সময়ে Sulphuretted hydrogen নামক দ্রবণীয় বায়ুর গন্ধও পাওয়া যায়। জীবজন্তুর ধ্বংসই এই Sulphuretted hydrogen এর কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। স্বাস্থ্যের হিসাবে ইহা কোনক্রমেই পান করা বিধেয় নহে। জলে জীবজগতের নিম্নস্তর হইতে আরম্ভ করিয়া অতি উর্দ্ধস্তরের জন্তু পর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকে। এই জলের একবিন্দু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে নানাপ্রকার (Protozoa) প্রোটোজোয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অদ্ভুত বিচিত্র প্রাণী, নানাপ্রকার কৈশিক পদার্থ (hairs) বিভিন্ন প্রাণীর ডিম্বাদি দেখা যায়। ইহাদের অধিকাংশই মনুষ্য শরীরে প্রবেশলাভ করিলে নানাপ্রকার পীড়ার উৎপত্তি করিয়া থাকে।

এ সমস্ত কারণে ইহার জল পানীয় বলিয়া ধর্ত্তব্য হইতে পারে। তাহা ছাড়া ইহাদের শরীর নিঃসৃত নানাপ্রকার মলাদির দ্বারাও জল দূষিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অনৈসর্গিক উপায়েও জল কিরূপ অপরিষ্কার হয় তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে।

ইহার কতকগুলি রুচি বহির্গত তাহা বলিয়া ইহার উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত হওয়া আদৌ কর্ত্তব্য নহে। এই জলে অনেক সময় মলমূত্রাদিও ত্যাগ করা হয়। পল্লীগ্রামে স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ পুষ্করিণীর জলে মূত্রাদি ত্যাগ করিয়া থাকেন। স্নান, হস্তমুখাদি প্রক্ষালন শৌচকার্য্যাদি অবাধে চলিয়া থাকে; যে স্থলে পানীয় জলের জন্য আলাদা পুষ্করিণী বা পুকুর আছে তাহাতেই স্নানাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। অনেকে হয়ত বলিবেন স্নান হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিলে কোনও প্রকার ক্ষতি হয় না। কিন্তু একটী উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত পুষ্করিণীতে এগুলিতে কোন প্রকার ক্ষতি হয় কিনা। ধরুন যক্ষ্মাকাশরোগগ্রস্ত এক ব্যক্তি এই পুষ্করিণীতে দাঁতন করিতেছে এবং থুৎকার ফেলিতেছে। সকলেই জানেন যে যক্ষ্মারোগের বীজাণু রোগীর কফাদির সহিত বাহির হয়। এক্ষণে বুঝুন যে রোগ সংক্রামিত হইতে পারে কি না।

মলমূত্রাদির সহিত যে বীজাণু বহির্গত হয় তাহা সকলেরই জানা উচিত। সেইজন্য জলে (বিশেষতঃ যাহা হইতে পানীয় জল সংগৃহীত হয়) কদাচ এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে নাই। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে বিশেষ করিয়া বলা আছে যে জলে কদাচ মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। তাহা ছাড়া জলকে নারায়ণ বলা হইয়াছে। বঙ্গললনাগণের নিকট আমাদের সবিনয় অনুরোধ যেন তাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

ইহা ছাড়াও নানা প্রকারে জল দূষিত হয়। উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদি কখন কখনও জলে ফেলা হয়। বস্ত্রাদি ধৌত করাও অনৈসর্গিক উপায়ে জল অপবিত্র করিবার কারণ বলা যাইতে পারে। মহামারি কলেরা বা ওলাউঠার সময় এই "বস্ত্র ধোয়া" হইতেই রোগের প্রসার বৃদ্ধি ও প্রকোপ বাড়িতে থাকে। রোগীর পরিধানের বস্ত্রাদি জলে ধৌত করায় বীজাণু সমূহ জলে আসিয়া বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং কেহ সেই জল পান করিলে উক্ত রোগাক্রান্ত হয়। গ্রামবাসীরা এসমস্ত বিষয়ে নিজে নিজে সাবধানতা অবলম্বন না করিলে এই ভীষণ রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ কোথায়? অধিকাংশ

স্থলে পুষ্করিণীর চতুঃসীমা অন্য স্থান অপেক্ষা ঢালু, বৃষ্টি হইলে যত প্রকার ময়লা এমন কি মনুষ্যের মলাদিও ধুইয়া আসিয়া পুষ্করিণীতে জমিতে থাকে। এইরূপ জল পান করিলে রোগের হাত হইতে কিরূপে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে?

রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে পুষ্করিণী সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত নিয়মগুলি পালন করিলে সুফল ফলিবার আশা করা যাইতে পারে।

(ক) চতুঃপার্শ্বের জমির উপর লতাগুল্মাদি আগাছা বা বড় বৃক্ষাদি থাকা উচিত নহে। তাহাতে জলের উপর সূর্য্য কিরণ পড়িতে পারে না আর তাহা ছাড়া নানাপ্রকার পাতা পচিয়া জলকে বিষময় করিয়া তুলে।

(খ) জলে কোনওরূপ জলীয় আগাছা জন্মিতে দিতে নাই এমন কি অধিক-মাত্রায় পদ্মও জন্মিতে দিতে নাই।

(গ) পুষ্করিণীর চতুঃসীমা যেন সাধারণ জমির অপেক্ষা উচ্চ হয় তাহা হইলে অপরিষ্কার জল পুষ্করিণীতে ঢুকিতে পারে না।

(ঘ) অনৈসর্গিক উপায়ে যেন তাহাতে কোনরূপ দূষণীয় পদার্থ না আসিতে পারে। এস্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে রোগীর দেহ নিঃসৃত কোন দ্রব্য যেন জলে না পড়ে।

(ঙ) কোনও জীবজন্তু বিশেষতঃ মানুষ যেন পুষ্করিণীর সন্নিকটস্থ জমিতে মলমূত্রাদি ত্যাগ না করে সেটী বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

(চ) পুষ্করিণীর তলদেশে যেন "পাঁক" না থাকে। মধ্যে মধ্যে পাঁক তুলাইয়া দিয়া বালি অভাবে কয়লার "ঘেঁস বা কাঁকর" দিলে ভাল হয়।

(ছ) অত্যধিক পরিমাণে জীবের বাসা হইতে দিতে নাই। শামুক, ঝিনুক এমন কি অধিক পরিমাণে মাছও থাকিতে দিতে নাই। বিশেষতঃ কাল মৎস্যাদি 'Black shallow-water fishes' যেমন "কই, মাগুর, শোল, সিংহি, লেঠা ইত্যাদি রোগ বহনকারী (Propagators of diseases) বলিয়া বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তবে অল্প পরিমাণে মাছ থাকা ভাল। তাহারা নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনিষ্টকারী জীব খাইয়া মানুষকে রোগের হাত হইতে নিস্তার পাইতে দেয়।

(জ) জলে মধ্যে মধ্যে (Bleaching Powder) অভাবে পাথুরিয়া চুণ ফেলিলে ভাল হয়। তবে অত্যধিক পরিমাণে ফেলাও বিধি সঙ্গত নহে। অনেকে Potassium Permanganate ফেলিবার ব্যবস্থাও দিয়া থাকেন।

উল্লিখিত নিয়ম পালন করিয়া পুষ্করিণীর জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইলে অকাল মৃত্যুর সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোক পুষ্করিণীর জলের উপর নির্ভর করেন বলিয়া এ বিষয়ে অতি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইল। ইহার দ্বারা যদি কখনও কাহার উপকার হয় শ্রম স্বার্থক বিবেচনা করিব। প্রতি গ্রামে যদি এইরূপ বিজ্ঞান সম্মত জলাশয় দুইটী করিয়া থাকে তাহা হইলে আগামী Census বঙ্গের জন সংখ্যা বহুল পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। এক্ষেত্রে আমরা বঙ্গের ধনিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। পুত্রকন্যার বিবাহের সময় বিলাস দ্রব্যের ব্যয়ভার অল্প করিয়া 'আলো ও বাজনার' সংখ্যা কিঞ্চিৎ হ্রাস করিয়া যদি স্বীয়গ্রামে এইরূপে বিজ্ঞান সম্মত পুষ্করিণী কাটাইয়া দেন তাহা হইলে বংশ পরম্পরায় তাহার যশঃ গীত হইবে।

৩। **কূপাদির জল** ঃ—পুষ্করিণীর ন্যায় ইহারও জল অত্যন্ত দূষিত হইয়া থাকে। ইহাতে অনেক সময়ে অত্যধিক মাত্রায় রাসায়নিক দ্রব্যাদি দ্রব থাকে। ইহার কতকগুলি মনুষ্যের উপকারী এবং কতকগুলি অপকারী; বাঙ্গালায় কূপাদির সংখ্যা অল্প বলিয়া এ বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইল না।

৪। **ঝরনাদির জল** ঃ—ইহাতেও অনেক পরিমাণ দ্রবণীয় লবণাদি বিদ্যমান থাকে। ইহার জলে অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভ্রের কুচা থাকে। এই জল অধিকমাত্রায় পান করিলে নানাপ্রকার পেটের ব্যাধি হইয়া থাকে। কিন্তু সচরাচর এরূপ রোগীর সংখ্যা অতি অল্প।

নদীর জল ঃ—ইহাতেও নানা প্রকার দ্রব লবণাদি থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নদীর জল পান করিলে কোনও প্রকার রোগ হয় না। জল প্রবহমান বলিয়া কোন প্রকার স্থানীয় ময়লা পচিতে পারে না। কিন্তু নদীর জলে নানারূপ দ্রব্যাদি ভাসা অবস্থায় থাকে। কিছুকাল রাখিয়া দিলে জল 'থিতায়' অর্থাৎ ময়লাগুলি পাত্রের তলদেশে জমে।

জলে কি কি থাকে এবং তাহার গুণাগুণ।

অদ্রবণীয়।

(১) জীবিত—

[illegible] জ্জ।

(ক) জলীয় গাছ গাছড়া—অপকারী।

(খ) অতি সূক্ষ্ম ডাইয়াটম, ছাতা (Fungii Bacteria) অপকারী।

প্রাণীজাত।

(ক) নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু ... অপকারী।

(খ) মৎস্যাদি ... ... উপকারী।

(গ) নানাপ্রকার জলজ-জন্তুর ডিম্বাদি ... অত্যন্ত অপকারী।

(২) প্রাণহীন—

(ক) বালি, কাদা নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিশেষ অপকারী নহে।

[রাসায়নিক দ্রব্যাদির গুণাগুণ পর তালিকায় দেখুন]

প্রাণিজাত :—

(খ) চুল, ধ্বংসোন্মুখ মৃতজীবদেহ (Decomposed), মল মূত্রাদি অত্যন্ত অপকারী।

উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় :—

(গ) নানাপ্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গাছের শিকড় পচিতে আরম্ভ হইলে অত্যন্ত অপকারী।

দ্রবণীয় দ্রব্যাদি।

জীবজাত (*Organic*)

(ক) Urea জীবদেহ ত্যক্ত মূত্রাদি ... অত্যন্ত অপকারী।

(খ) কলকারখানার ত্যক্ত দ্রব্যাদি ... ,, ,,

[আমাদের দেশে নাই]

জড় বা নিরিন্দ্রিয় (*Inorganic*)

Carbonates, Chlorides, Sulphates, Nitrates etc.

[গুণাগুণ পরের তালিকায় দ্রষ্টব্য]

দ্রবণীয় বায়ু (*Gas*)

(ক)	অম্লজান	...	উপকারী।
(খ)	সোরজান	...	মনুষ্য দেহ সম্বন্ধে নির্গুণ।
(গ)	Sulphuretted hydrogen		অপকারী।
(ঘ)	Sulphur dioxide		অপকারী।
(ঙ)	Ammonia	...	অতি অল্পমাত্রায় অপকারী নহে।

পানীয় জল বিশুদ্ধ করিবার উপায়।

১। ছাঁকিয়া লইলে বা "থিতাইয়া" লইলে অদ্রবণীয় দ্রব্যাদির হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

২। জলকে চোলাই করিয়া লইতে পারিলে প্রায় সমস্ত বিপদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারা যায়। সুবিধা না হইলে জলকে খুব উত্তমরূপ ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া পান করিলে প্রায় সমস্ত জীবাণুজাত রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। গ্রামে কলেরা মহামারী উপস্থিত হইলে এই প্রথা অবলম্বন করিলে রোগের হাত হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। কারণ বীজাণু সমূহ এত উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না মরিয়া যায়।

৩। অনেকে জলে কর্পূর দিয়া থাকেন। ইহা মন্দ প্রথা নহে ইহাতে অনেকে উপকার হয়। জল বেশ করিয়া ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া কর্পূর দিয়া রাখিলে নির্ভয়ে পান করিতে পারা যায়।

৪। নানা প্রকার ঔষধাদি দিয়া জল পান করিবার কথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। আমি সে বিষয়ের বিশেষ পক্ষপাতী নহি। তাহা ছাড়া সেরূপ প্রথা সকলে অবলম্বন করিতে পারেন না কাজেই তাহা আমাদের আলোচনা বহির্ভূত।

৫। বিদেশে ভ্রমণের সময় উপযুক্ত পানীয় জল না পাইলে চায়ের পাতা দিয়া সিদ্ধ করিয়া নির্ভয়ে জল পান করা যাইতে পারে।

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের রাসায়নিক মাননীয় F. N. Windsor M. B. B. SC. I. M. S. মহোদয় জলে কি কি দ্রব্য কত পরিমাণে থাকিলে তাহাকে পানের উপযোগী বলিয়া ধরা যাইতে পারে তাহার একটী তালিকা দিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

মোট দ্রবণীয় দ্রব্যাদি	প্রতি হাজার ভাগে	৫০
মোট উদ্বায়ী (volatile) দ্রব্যাদি	,,	১ বা ২
ক্লোরিন ক্লোরাইডরূপে	,,	৪
এমনিয়ার লবণ বা গ্যাস	,,	-
এমনিয়া প্রাণিজ (albuminoid)	,,	·০১
নাইট্রিক্ এসিড নাইট্রেট্রূপে	,,	২·৫
নাইট্রাস্ ,, নাইট্রাইটরূপে	,,	না
Oxidisable matter	,,	২
Hardness Total	,,	৮
,, Fixed	,,	২
Phosphoric acid as Phosphates	,,	নামমাত্র
সালফিউরিক্ এসিড সালফেটরূপে	,,	৩
Heavy metals, lead etc.	,,	নামমাত্র
Sulphuretted hydrogen	,,	না

আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা।

ডাক্তার শ্রীসত্যশরণ চক্রবর্ত্তী, এম, বি, লিখিত—

প্রথম অধ্যায়।

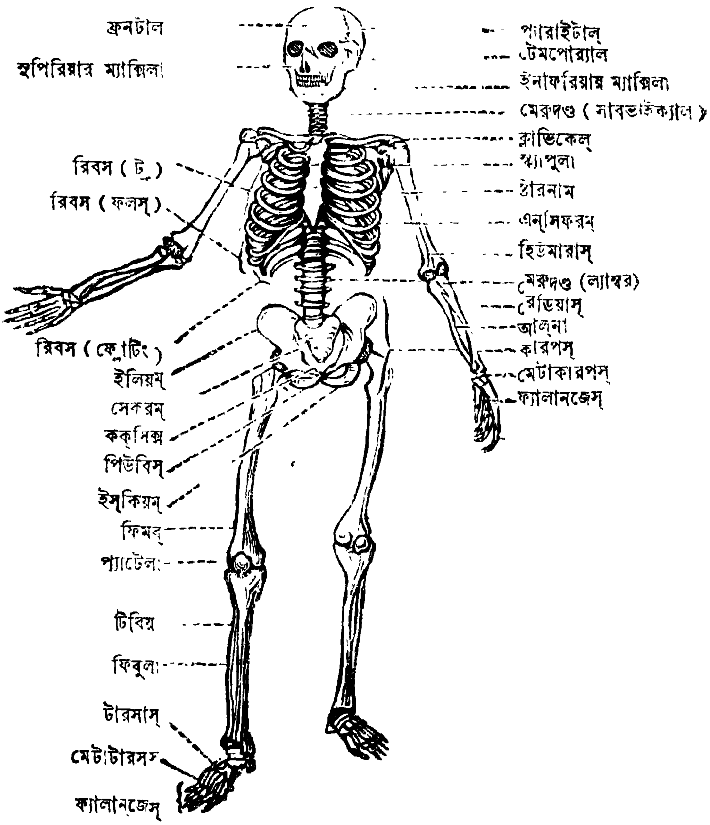
শরীরের গঠন ও ক্রিয়া।

জ্যৈষ্ঠমাসের স্বাস্থ-সমাচারে আকস্মিক বিপদের চিকিৎসার অবতরণিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই চিকিৎসা সম্যকরূপে বুঝিবার জন্য শরীরের গঠন ও প্রত্যেক যন্ত্রাদির ক্রিয়াও মোটামুটী জানা আবশ্যক। সেইজন্য প্রথম অধ্যায়ে শরীরের গঠন ও যন্ত্রাদির ক্রিয়া সকল বিবৃত হইল।

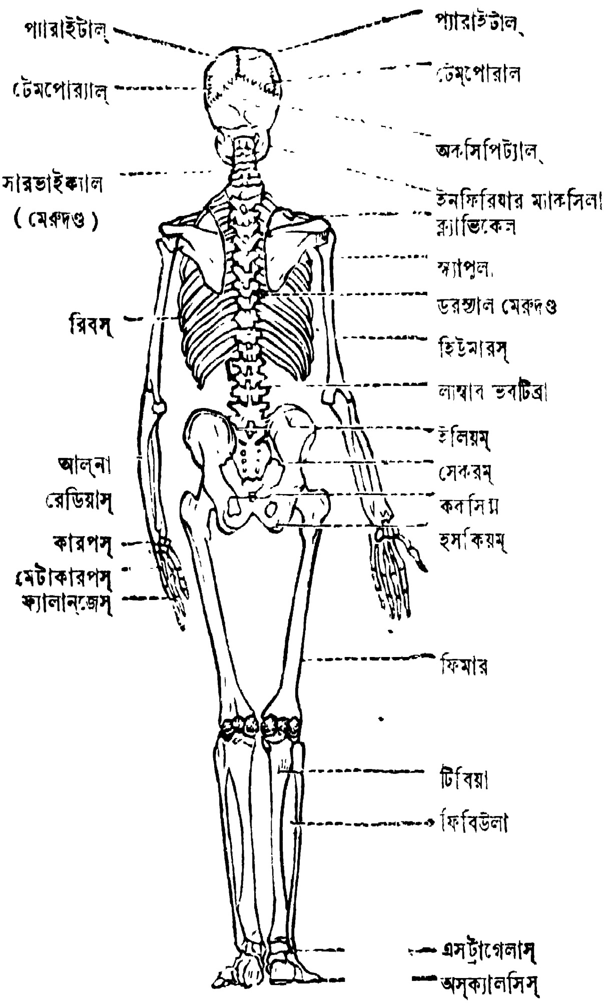
অস্থি বা হাড় শরীরের কাটাম বা ভিত্তির ন্যায় কার্য্য করে। শরীরের কোমল এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম পদার্থ সকল অস্থিতে সংলগ্ন থাকে। শরীরের প্রধান প্রধান যন্ত্র গুলি অস্থি দ্বারা রক্ষিত ও বেষ্টিত. যথা—মস্তিষ্ক. হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্‌ প্রভৃতি। যে সকল মাংসপেশীর দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালিত তাহারাও অস্থিতে সংলগ্ন থাকে। গ্রন্থি সমূহও হাড় দ্বারা নির্ম্মিত। হাড়ে দুইভাগ খনিজ পদার্থ ও একভাগ জান্তব পদার্থ আছে। খনিজ পদার্থ প্রধানতঃ ক্যালসিয়ম্‌ ফস্‌ফেট্‌ ও কার্ব্বনেট্‌। বাল্যকালে জান্তব পদার্থের আধিক্য ও বৃদ্ধাবস্থায় খনিজ পদার্থের বাহুল্য দেখা যায়। এই নিমিত্ত বৃদ্ধাবস্থায় যত হাড়ভাঙ্গিয়া যাওয়া সম্ভব শৈশবাবস্থায় তত নহে। শৈশবাবস্থায় হাড় বাঁকিয়া যায় কিম্বা ফাটিয়া গিয়া অৰ্দ্ধভগ্ন হয় ও ভাঙ্গিতে বেশী জোর লাগে। বৃদ্ধাবস্থায় অতি সামান্য জোর লাগিলেই হাড় ভাঙ্গিয়া যায় ও সম্পূর্ণ ভাঙ্গে।

মনুষ্য শরীরে ন্যূনাধিক ২০০ দুই শত খানি হাড় আছে; ইহাদিগকে চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যেমন (১) লম্বাহাড়—বাহু ও উরুর হাড়, (২) ক্ষুদ্র হাড়—কবজীর বা পায়ের গোড়ার হাড়, (৩) চেপ্টা—মাথার খুলির হাড়। (৪) অসম—শিরদাঁড়ার হাড়। মনুষ্যের সমগ্র অস্থিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা,—মস্তক, দেহকাণ্ড ও হস্তপদাদি। মস্তকে

সর্ব্বশুদ্ধ বাইশখানি হাড় আছে। ইহার মধ্যে মাথার আটখানি ও মুখের চৌদ্দখানি। নীচের চোয়াল ব্যতিরেকে মস্তকের অন্যান্য সমস্ত হাড়গুলি কাছে কাছে এরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট যে উহাদিগকে একখানি হাড় মনে করা যাইতে পারে।



মনুষ্যের অস্থি (সম্মুখ দৃশ্য)।



মনুষ্যের অস্থি (পশ্চাৎ দৃশ্য)।

দেহকাণ্ড নিম্নলিখিত ভাবে গঠিত :—পশ্চাতে মেরুদণ্ড, উভয়পার্শ্বে পঞ্জরাস্থি, সম্মুখে বক্ষের হাড় এবং নিম্নে বস্তি গহ্বরের হাড়। ঊর্দ্ধ অঙ্গাদির হাড় যথা,—স্ক্যাপুলা, ক্ল্যাভিকেল, বাহুর হাড়, নীচের হাতের দুইখানি হাড়, কব্জি, হাতের তাল্ এবং অঙ্গুলীর হাড় সমূহ। নিম্নাঙ্গের হাড় যথা উরুর হাড়, মালইচাকি, হাঁটুর নীচের দুইখানি হাড় ও পায়ের হাড় সকল। পায়ের গোড়াতে বা টারসাসে ৭ খানি হাড়, পায়ের তলার ৫ খানি ও পায়ের আঙ্গুলের ১৪ খানি হাড় আছে। মেরুদণ্ডে ৩৩ খানি; ইহার মধ্যে পৃথক্ ভাবে ২৪ খানি অবস্থিত ও বাকি ৯ খানির মধ্যে ৫ খানিতে একটী সেক্রম ও ৪ খানিতে অপরটী কক্সিক্স বলিয়া অভিহিত হয়। পূর্ব্বোক্ত ২৪ খানির মধ্যে গলার ৭ খানি, পৃষ্ঠের ১২ খানি ও কোমরের ৫ খানি। মেরুদণ্ডের ভিতর যে কোমল পদার্থ থাকে তাহাকে স্পাইনেল কর্ড কহে।

দুই বা বহু সংখ্যক হাড়ের মিলনস্থানকে সন্ধিস্থান কহে। যে সকল সন্ধি দ্বারা অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালন করা যায় তাহারা নিম্নলিখিত উপাদানে নির্ম্মিত; যথা হাড়ের প্রান্তভাগ ও উহার উপরের কার্টিলেজ বা উপাস্থি, লিগামেণ্ট বা সূত্রতন্তু নির্ম্মিত মজবুত বাঁধন, (যাহার দ্বারা অস্থির প্রান্তদেশ স্থানচ্যুত হয় না) এবং সাইনোভিয়াল মেম্‌ব্রেন। ইহা সন্ধিস্থলের ভিতরেরদিকে বিস্তৃত থাকে ও উহা হইতে এক প্রকার তৈলের ন্যায় পদার্থ নির্গত হয়। এই পদার্থই সন্ধিস্থানের গতি অক্ষুন্ন রাখে। সন্ধিস্থল দুই প্রকার; যথা সঞ্চালনশীল—(১) কব্জার ন্যায় যেমন কনুই ও হাঁটু, (২) বল্ ও সকেট্ সন্ধিস্থল যেমন স্কন্ধ-সন্ধি বা উরু-সন্ধি আর একপ্রকার—সন্ধিস্থলের সঞ্চালন হয় না—যেমন মস্তকের ভিন্ন ভিন্ন হাড়ের সন্ধিস্থল।

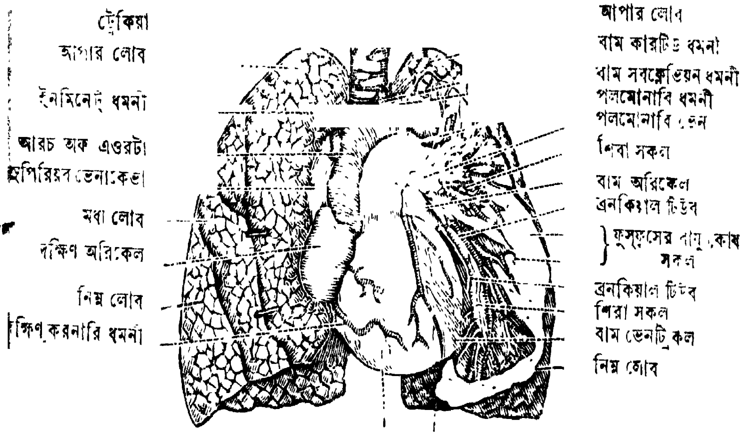
মাংসপেশী—লালবর্ণের সূত্র সমষ্টিমাত্র এবং ইহারা সঙ্কোচনশীল কিন্তু সমস্ত মাংসপেশী ইচ্ছামত সঙ্কুচিত করা যায় না। হস্তপদাদি সংলগ্ন মাংসপেশী অবশ্য ইচ্ছাধীন কিন্তু হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যস্থ মাংসপেশী সমূহ ইচ্ছাধীন নহে অর্থাৎ মনে করিলেই ইহাদিগকে হস্তপদাদি সংলগ্ন মাংসপেশীর ন্যায় সঙ্কুচিত করা যায় না।

স্নায়ুমণ্ডল—নিম্নলিখিত উপাদানে নির্ম্মিত; যথা মস্তিষ্ক, দক্ষিণে ও বামে ইহা হইতে উৎপন্ন দ্বাদশটী স্নায়ু, মেরুদণ্ডমধ্যস্থিত কোমল পদার্থ ও ইহা হইতে উৎপন্ন ইহার বামে ও দক্ষিণে একত্রিশটী স্নায়ু; এতদ্ব্যতীত কতকগুলি স্নায়ু এবং স্নায়ুকোষের

সমষ্টি (গ্যাংগ্লিয়ন্) মস্তিষ্ক বা মেরুদণ্ডস্থ কোমল পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় না ; ইহারা রক্তনলী সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করে। ইহারা ভাসোমোটার বা সিম্প্যাথেটিক্ নার্ভ বলিয়া অভিহিত হয়। মস্তিষ্ক প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—সেরিব্রাম্, সেরিবেলাম্ ও মেডুলা অব্‌লঙ্গেটা।

সেরিব্রাম্—বুদ্ধি, ইচ্ছা ও বিভিন্ন ভাব সমূহের আশ্রয় ভূমি, সেরিবেলাম্ দৈহিক গতি নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করে, মেডুলা অব্‌লঙ্গেটা স্পাইন্যাল কর্ডের উপরিস্থ বিস্তারিত অংশ। মস্তিষ্কের কোন স্থান নষ্ট হইলে অপরদিকের মাংশপেশী সমূহ শক্তিশূন্য হইয়া পড়ে। কারণ মস্তিষ্কের একদিকের স্নায়ুসূত্র সকল অপরদিকের মাংসপেশীতে শেষ হয়। মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন দ্বাদশটা স্নায়ুর মধ্যে কতকগুলির গতি, কতকগুলির অনুভূতি ও অপর গুলির উভয় প্রকার প্রক্রিয়া শক্তিই আছে। কতকগুলি স্নায়ু (মোটর নার্ভ) মস্তিষ্ক হইতে মাংসপেশীতে উত্তেজনা আনয়ন করে। আর কতকগুলি (সেন্সারি) স্নায়ু—মস্তিষ্কে কোন প্রকার জ্ঞান আনয়ন করে এবং মিশ্রস্নায়ুতে উভয় প্রকারের সূত্র বর্ত্তমান আছে ও সেইজন্যই ইহারা উভয়বিধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। একত্রিশ জোড়া স্প্যাইনেল্ নার্ভ উভয় প্রকারের সূত্রে গঠিত বলিয়া উভয় প্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ। সিম্প্যাথিটিক স্নায়ুমণ্ডল মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে দুইটী মালার ন্যায় অবস্থিত এবং এই মালা স্নায়ুকোষ সমষ্টি দ্বারা নির্ম্মিত। কোনও স্থানের প্রয়োজনানুসারে রক্ত সঞ্চালনের হ্রাস ও বৃদ্ধি করা এবং যে সমস্ত মাংসপেশী ইচ্ছাধীন নহে তাহাদের সঞ্চালনাদির ও যে সমস্ত যন্ত্র হইতে সিক্রিশন্ ও এক্সক্রিশন্ উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে নিয়মানুসারে কার্য্য করান সিম্প্যাথিটিক্ স্নায়ুমণ্ডলের কার্য্য।

শ্বাস যন্ত্র—শ্বাস যন্ত্র নিম্নলিখিত কয়েকটী অংশে বিভক্ত ; (১)—বাক্‌যন্ত্র—ইহা মুখবিবরে পশ্চাৎ ও নিম্নভাগে এবং গলদেশের উপরি অংশে অবস্থিত ; (২)—Trachea বা প্রধান শ্বাসনলী—ইহা বক যন্ত্রের নিম্নভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া গলদেশের সম্মুখ দিয়া বক্ষ গহ্বরে প্রবিষ্ট হয়। (৩)—বক্ষ গহ্বর মধ্যে এই শ্বাসনলী দুইটী বায়ুনলী বা bronchusএ বিভক্ত হয়। (৪)—ফুস্‌ফুস্ ; ফুস্‌ফুস্ দুইটী একটী বক্ষ গহ্বরের দক্ষিণ এবং অপরটী বাম ভাগে অবস্থিত।



হৃৎপিণ্ড, প্রধান প্রধান ধমনী ও শিরা এবং ফুসফুস্ (সম্মুখ ছবি)

পূর্ব্বোক্ত অংশগুলির মধ্যে ফুসফুসের বিশেষ বিবরণ সকলের জানা উচিত। মোচার নিম্নার্দ্ধ কাটিয়া ফেলিলে যেরূপ দেখিতে হয় ফুস্ফুসের আকৃতিও অনেকটা সেইরূপ। বক্ষ গহ্বরের মধ্যদিকে ফুস্ফুসের যে অংশ থাকে সেই অংশ দিয়া বায়ুনলী ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে; তথায় ঐ বায়ুনলী প্রথমে দুইটী, পরে দুইটী হইতে চারিটী ও চারিটী হইতে আটটী, এইরূপে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুনলীতে বিভক্ত হয় এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুনলী সকল বায়ুকোষে গিয়া সমাপ্ত হয়। বায়ুকোষের চতুর্দ্দিক কৈশিক রক্তনালী জাল দ্বারা বেষ্টিত থাকে।

আমরা নিশ্বাসের সহিত যে বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করি তাহা বায়ুনলী দিয়া ফুস্ফুসে প্রবেশ করে এবং ক্রমে বায়ুকোষে উপস্থিত হয়। বায়ুকোষের গাত্রস্থ কৈশিক রক্তনলীস্থিত রক্ত এই বায়ু হইতে অম্লজান্ বাষ্প গ্রহণ করিয়া অঙ্গারাম্ল বাষ্প পরিত্যাগ করে। এইরূপে ঐ রক্ত অবিশুদ্ধ শৈরিক অবস্থা হইতে বিশুদ্ধ ধামনিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং প্রশ্বাস বায়ুতে বিশুদ্ধ বায়ু অপেক্ষা অম্লজানের পরিমাণের হ্রাস ও অঙ্গারিক অম্লবাষ্পের পরিমাণের বৃদ্ধি হয়।

শ্বাস ক্রিয়া—শ্বাস ক্রিয়ার দুইটী অংশ আছে, যথা—শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস পরিত্যাগ। মানবে সাধারণতঃ মিনিটে ১৫ হইতে ১৮ বার শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে, প্রত্যেক নিশ্বাসের সহিত প্রায় ৩০ কিউবিক্ ইঞ্চ বায়ু ফুস্‌ফুস্ মধ্যে প্রবেশ করে এবং বহির্গত হইয়া যায়। বক্ষ গহ্বর একটী বায়ুশূন্য বাক্সের ন্যায়। ইহার মধ্যে ফুস্‌ফুস্ হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি যন্ত্র অবস্থিত। নিশ্বাস গ্রহণ কালে পঞ্জরাস্থি সংলগ্ন External Intercostal এবং Diaphragm নামক মাংসপেশীদ্বয় সঙ্কুচিত হয় তাহাতে পঞ্জরাস্থিগুলি স্বস্থান হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উত্থিত হয় ও Diaphragmএর উপরিভাগ কিছু নিম্নে নামিয়া যায়, ফলে বক্ষগহ্বর সম্মুখে এবং নিম্ন ভাগে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এই গহ্বর মধ্যস্থ ফুস্‌ফুস্‌দ্বয়ও প্রসারিত হয়। এই প্রসারণ ফলে বায়ু ফুস্‌ফুস্ মধ্যে প্রবেশ করে। নিশ্বাস পরিত্যাগ কালে পূর্ব্বোক্ত পেশী দ্বয়ের সংকোচন দুরীভূত হইয়া তাহারা স্বভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাতে বক্ষগহ্বরের আয়তন ও পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ফুস্‌ফুসের Elastic tissuea স্থিতিস্থাপকতা গুণে ফুস্‌ফুস্‌ও পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ফুস্‌ফুস্ দ্বয়ের মধ্য হইতে প্রশ্বাস বায়ু বহির্গত হইয়া যায়। পুরাদম নিশ্বাস লইবার পর যে পরিমাণ বায়ু সাধ্যমত বাহির করিতে পারা যায় তাহাকে Vital capacity কহে।

রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র—হৃৎপিণ্ড, ধমীন কৈশিক রক্তনালী এবং শিরা সমূহের দ্বারা শরীরের সর্ব্বত্র রক্ত সঞ্চালিত হয়।

হৃৎপিণ্ড—ইহা রক্ত সঞ্চালনের পম্প স্বরূপ। ইহা বক্ষ গহ্বরের মধ্যে দুইটী ফুস্‌ফুসের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা দেখিতে অনেকটা নোনা ফলের ন্যায়। ষ্টারনাম্ নামক অস্থির মধ্যমাংসের পশ্চাতে ইহা অল্প বঙ্কিম ভাবে অবস্থিত। হৃৎপিণ্ডের প্রশস্ত অংশ উপরিভাগে এবং অপ্রশস্ত অংশ নিম্নভাগে এবং কিঞ্চিৎ বাম দিকে হেলিয়া থাকে। সাধারণতঃ বামচুচুক হইতে দুই ইঞ্চি নিম্নে এবং ½ ইঞ্চি ভিতরেরদিকে হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণ হেতু বক্ষ প্রাচীরের স্পন্দন দ্বারা কোণাগ্রস্থান নিরূপিত হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তর ভাগ ফাঁপা এবং চারটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। সেই প্রকোষ্ঠ চতুষ্টয়ের মধ্যে দুইটী বামদিকে এবং দুইটী দক্ষিণদিকে অবস্থিত। দক্ষিণ

দিকের দুইটী এবং বাম দিকের দুইটীর মধ্যে একটী মাংসপেশী নির্ম্মিত পরদা আছে; এই পরদায় কোনও ছিদ্র নাই। একারণ হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণদিকের প্রকোষ্ঠ হইতে রক্ত অন্যস্থান দিয়া না ঘুরিয়া সোজাসুজি বামদিকে পৌঁছিতে পারে না। বামদিকের বা দক্ষিণদিকের প্রকোষ্ঠ দ্বয়ের মধ্যে একটী আর একটীর উপরে অবস্থিত এবং তাহাদের মধ্যবর্ত্তী পরদায় একটী করিয়া ছিদ্র আছে ঐ ছিদ্রদ্বয় ভ্যাল্‌ভ্‌ দ্বারা এরূপভাবে রক্ষিত যে উপরকার প্রকোষ্ঠের সঙ্কোচন কালে ইহা হইতে রক্ত অনায়াসে নিম্ন প্রকোষ্ঠে যাইতে পারে কিন্তু নিম্ন প্রকোষ্ঠের সঙ্কোচন কালে রক্ত উপরকার প্রকোষ্ঠে ফিরিয়া যাইতে পারে না। তখন ঐ রক্ত অপর একটী ছিদ্র দিয়া ধমনীতে পৌঁছায়, এই ছিদ্রও ভ্যাল্‌ভ্‌ দ্বারা এরূপভাবে রক্ষিত যে হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ কালে ঐ রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া যাইতে পারে না। দক্ষিণ ও বামদিকের উপরকার প্রকোষ্ঠদ্বয়কে দক্ষিণ এবং বাম অরিকেল্‌ এবং নিম্ন প্রকোষ্ঠদ্বয়কে যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম ভেণ্টি্রকেল্‌ কহে। শরীরস্থ শিরা সমূহ ক্রমশঃ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে দক্ষিণ অরিকেলে আসিয়া শেষ হয়। ফুসফুস্‌ হইতে বিশুদ্ধ রক্ত এইরূপে ফুসফুসস্থ শিরা দ্বারা আসিয়া বাম অরিকেলে পড়ে। ঐ রক্ত তথা হইতে বাম ভেণ্টি্রকেলে যায় এবং তথা হইতে এ্যাওর্টা বা প্রধান ধমনীতে পৌঁছায় এবং ক্ষুদ্র ধমনী সমূহ দ্বারা সমস্ত শরীরকে পোষণ করে। শিরার দ্বারা আনীত অবিশুদ্ধ রক্ত দক্ষিণ অরিকেল্‌ হইতে দক্ষিণ ভেণ্টি্রকেলে আইসে এবং ভেণ্টি্রকেলের সঙ্কোচন কালে তথা হইতে একটী ধমনী (Pulmonary artery) দিয়া ফুসফুসে আনীত হয়। ঐ রক্ত ফুসফুস্‌ মধ্যে বায়ুকোষের চতুর্দ্দিকস্থ কৈশিক রক্তনালী জালে আসিয়া তথায় বায়ুর সংস্পর্শে বিশুদ্ধ হয় এবং চারটী শিরা (Pulmonary veins) দিয়া বাম অরিকেলে পৌঁছায়। এইরূপে শরীরের সর্ব্বত্র রক্ত সঞ্চালন হয়।

ধমনী—বাম ভেণ্টি্রকেল হইতে প্রধান ধমনী (এ্যাওর্টা) বহির্গত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া শরীরের সকল অংশকে বিশুদ্ধ রক্ত দ্বারা পোষণ করে। এই ধমনী সমূহ ক্রমশঃ নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়ে এবং অবশেষে কৈশিক রক্তনালীতে পরিণত হয়। দক্ষিণ ভেণ্টি্রকেল্‌ হইতেও একটী ধমনী

বহির্গত হয় কিন্তু এই ধমনী এবং ইহার শাখা প্রশাখার বিশুদ্ধ ধামনিক রক্তের পরিবর্ত্তে শৈরিক অপরিস্কৃত রক্ত থাকে। এই ধমনীর শাখা প্রশাখা ফুসফুসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর শাখায় বিভক্ত হয় এবং পরিশেষে কৈশিক রক্তনালী জালে পরিণত হইয়া বায়ুকোষের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া থাকে। এইখানে অবিশুদ্ধ শৈরিক রক্ত বায়ুকোষস্থ বায়ু হইতে অম্লজান বাষ্প গ্রহণ ও অঙ্গারাম্ল বাষ্প পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ধামনিক রক্তে পরিণত হয়। ধমনী গাত্র, শিরাগাত্র অপেক্ষা অনেক পুরু এবং ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা শিরার অপেক্ষা অধিক।

কৈশিক রক্তনালী—ইহারা সূক্ষ্ম জালের ন্যায় শরীরের সর্ব্বত্র অবস্থিত। রক্ত সেইখানে শরীরের বিভিন্ন অংশের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আসে। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণ জনিত রক্ত স্রোতের স্পন্দন কৈশিক রক্তনালী পর্য্যন্ত পৌছায় না, এজন্য কৈশিক রক্তনালীস্থিত রক্তস্রোত একবার প্রবল ও একবার মৃদুভাবে প্রবাহিত না হইয়া সমভাবে প্রবাহিত হয়। কৈশিক রক্তনালীস্থিত রক্ত শরীরের সমস্ত অংশ হইতে অঙ্গারাম্ল বাষ্প এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় পদার্থ গ্রহণ করিয়া ঐ সমস্ত অংশকে অম্লজান বাষ্প প্রদান করে। এইরূপে রক্ত এইস্থানে বিশুদ্ধ ধামনিক অবস্থা হইতে অবিশুদ্ধ শৈরিক রক্তে পরিণত হইয়া শিরা দিয়া দক্ষিণ হৃৎপিণ্ডাভিমুখে চালিত হয়

শিরা—কৈশিক রক্তনালী সমূহের শেষ ভাগ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা উৎপন্ন হয়। ইহারা ক্রমশঃ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শিরার প্রাচীরের স্থূলতা ধমনী প্রাচীরের স্থূলতা অপেক্ষা অনেক কম। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণ জনিত স্পন্দন শিরা পর্য্যন্ত আইসে না এজন্য শিরার রক্তস্রোত সমভাবে প্রবাহিত হয়। রক্ত যাহাতে শিরা মধ্যে কেবলমাত্র একদিকে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডাভিমুখে প্রবাহিত হইতে পারে তজ্জন্য শিরার মধ্যে স্থানে স্থানে এক এক জোড়া ভ্যাল্‌ভ আছে। ধমনী বা কৈশিক রক্তনালী মধ্যে সেরূপ ভ্যাল্‌ভ নাই। শরীরের ঊর্দ্ধ ভাগের সমস্ত শিরা পরস্পর মিলিত হইয়া একটী প্রধান শিরা উৎপন্ন হয়; এইরূপে শরীরের নিম্নভাগের সমস্ত শিরা ও পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া একটী প্রধান শিরায় পরিণত হয়। ঐ দুই প্রধান শিরা দক্ষিণ অরিকেলে যাইয়া শেষ হয়।

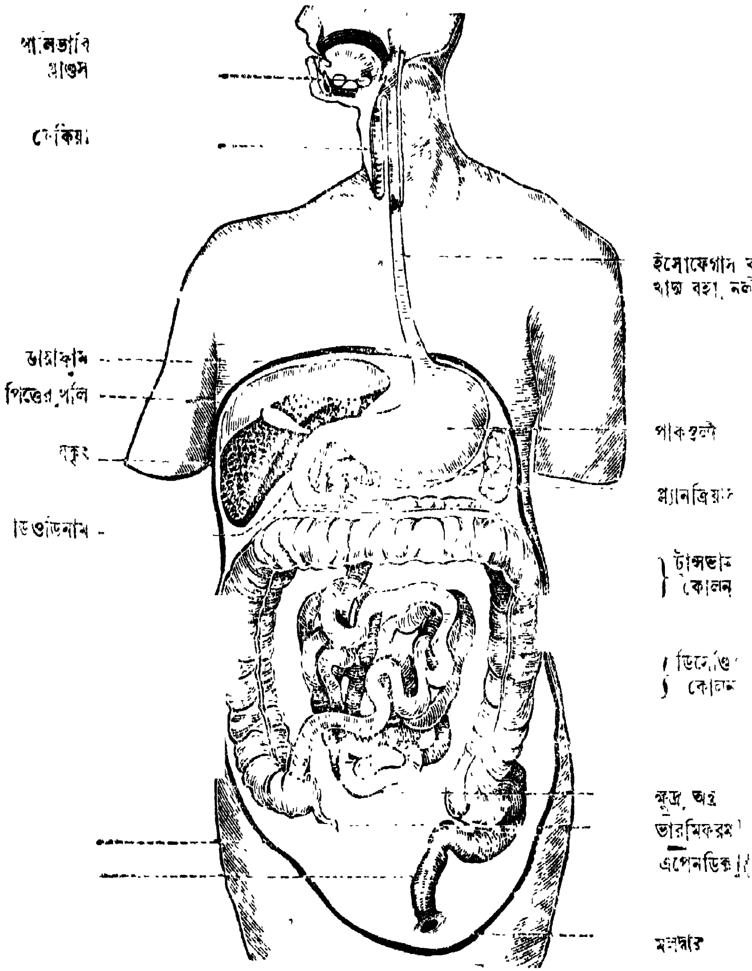
রক্ত—যে লোহিত বর্ণ তরল পদার্থ শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হইয়া শরীরকে পোষণ করে তাহাই রক্ত। মানব শরীরে সমস্ত শরীরের দ্বাদশাংশ হইতে চতুর্দ্দশাংশ পরিমাণ রক্ত থাকে। কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন যে শরীরের রক্তের পরিমাণ এত বেশী নহে, ইহাদিগের মতে শরীরে রক্তের পরিমাণ শরীরের ওজনের ২০ অংশেরও কিছু কম। রক্তের বর্ণ লোহিত বলিয়া বর্ণিত হইলেও ধামনিক ও শৈরিক রক্তের বর্ণের বিভিন্নতা আছে। ধামনিক রক্তে অম্লজান বাষ্প থাকায় ইহার বর্ণ সুন্দর লাল কিন্তু শৈরিক রক্তে অম্লজান বাষ্পের হ্রাস হওয়ায় ও অঙ্গারাম্ল বাষ্প থাকায় ইহা কৃষ্ণাভ লাল বর্ণ দেখায়। রক্ত দেখিতে তরল বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে তরল এবং কঠিন দুই প্রকার উপাদান আছে। রক্তের কঠিন অংশকে রক্ত কণিকা কহে। এই রক্ত কণিকাগুলির মধ্যে কতকগুলি শ্বেত এবং কতকগুলি লোহিত। রক্তের তরলাংশকে Plasma কহে, ইহার মধ্যে আবার Serum এবং Fibrinogen নামক দুইটী পদার্থ আছে।

রক্ত শরীরের একান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। ইহা শরীরের প্রত্যেক অংশকে পোষণ করে। শরীরের যে স্থানে অম্লজান বাষ্পের প্রয়োজন হয়, রক্ত সেই স্থানেই অজম্লান লইয়া যায়। ইহার দ্বারা শরীরের সর্ব্বাংশ সমভাবে উত্তপ্ত থাকে। ইহা শরীরকে অপরিমিতভাবে শুষ্ক হইতে না দিয়া যথোপযুক্ত পরিমাণে আর্দ্র রাখে এবং শরীর হইতে বিষাক্ত ক্লেদ এবং অপ্রয়োজনীয় পদার্থ নির্গত করিয়া দেয়।

উদর গহ্বর—শরীর কাণ্ডের মধ্যমাংসকে উদর গহ্বর বলা হয়, উদর গহ্বরের উর্দ্ধে ডায়াফ্রাম্ নামক মাংসপেশী, পশ্চাৎ ভাগে লাম্বার ভার্টিব্রা সম্মুখে মাংসল উদর প্রাচীর এবং নিম্নভাগে বস্তি গহ্বর বা পেলভিস্ অবস্থিত। উদর গহ্বরে পাকস্থলী, অন্ত্র সমূহ, প্লীহা, যকৃৎ, কিড্নি বা মূত্রযন্ত্র প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট থাকে।

পাকস্থলী ইহা উদর গহ্বরের উর্দ্ধ ও বামভাগে পঞ্জরাস্থির অব্যবহিত নিম্নেই অবস্থিত। ভুক্ত পদার্থ এইস্থানে কিয়ৎক্ষণ পরিপাক হইয়া অন্ত্র মধ্যে চালিত হয়।

অন্ত্র সমূহ আয়তন অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত প্রথমাংশকে ক্ষুদ্র অন্ত্র বা Small Intestines এবং শেষাংশকে বৃহদন্ত্র বা Large Intestines কহে।


গ্লাণ্ডস
ডায়াফ্রাম
পিত্তের থলি
ইসোফেগাস বা
খাদ্য বহা নলী
পাকস্থলী
কোলন
ক্ষুদ্র অন্ত্র
এপেনডিক্স
মলদ্বার

পরিপাক যন্ত্র

ভুক্ত পদার্থ পাকস্থলী হইতে ক্ষুদ্রান্ত্রে আইসে এবং তথা হইতে বৃহদন্ত্রে যায় ও অবিলম্বে ভুক্ত পদার্থ বৃহদন্ত্রের নিম্নছিদ্র গুহ্যদেশ দ্বারা মলরূপে বহির্গত হইয়া থাকে।

প্লীহা—ইহা পাকস্থলীর পশ্চাৎ এবং বামভাগে অবস্থিত, সুস্থ অবস্থায় ইহা পঞ্জরাস্থির অব্যবহিত নিম্নে থাকে এবং উদর প্রাচীরের বহির্দেশ হইতে ইহার অনুভূতি হয় না।

যকৃৎ—ইহা শরীরের মধ্যে সকলাপেক্ষা বৃহৎ যন্ত্র। ইহা উদর গহ্বরের উপরিভাগ এবং দক্ষিণদিকে অবস্থিত। ইহার অধিকাংশই দক্ষিণ এবং নিম্নভাগের পঞ্জরাস্থিগুলির দ্বারা আবৃত থাকে। যকৃৎ হইতে পিত্ত নিঃসরণ হয় ঐ পিত্ত যকৃৎ হইতে একটী নল দিয়া পিত্তাধারের নলের সহিত মিলিত হয় ও ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশে (Duodenum এ) শেষ হয়। তথায় ভুক্ত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া পরিপাকের সাহায্য করে।

কিডনীদ্বয়—উদরগহ্বরের পশ্চাৎ ভাগে মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। এই যন্ত্রমধ্যে মূত্র উৎপন্ন হয় এবং ইউরেটর নামক দুইটী নল দিয়া বস্তি গহ্বরস্থ মূত্রাশয় বা ব্লাডারে আসিয়া পড়ে।

মূত্রদ্বারা ব্লাডার বা মূত্রাশয় পরিপূর্ণ হইলেই সময় সময়ে সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরের জননেন্দ্রিয় দ্বারা মূত্র নিঃসারিত করে।

(ক্রমশঃ)

পরিপাক ও পুষ্টি।

DIGESTION AND NUTRITION.

গত আষাঢ় মাসের স্বাস্থ্য-সমাচারে আমরা "খাদ্যের সহিত শরীরের সম্বন্ধ" আলোচনা করিয়াছি। শরীর রক্ষার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন এবং বিভিন্ন জাতীয় খাদ্যের আবশ্যক ও বিবৃত করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে খাদ্য দ্রব্যাদি পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া কি প্রকারে পুষ্টি সাধন করে এবং এই ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইলে কি কি রোগ জন্মায় এবং তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আমাদের খাদ্য দ্রব্যাদি সাধারণতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

১। প্রোটিন (Protein) আমিষ জাতীয়।

২। চর্ব্বি (Fat, oil) স্নেহ জাতীয়।

৩। শ্বেতসার, শর্করা (Carbohydrate) শালি জাতীয়।

৪। লবণ জাতীয় (Salts)

৫। জল (Water)

এই সকল দ্রব্যাদি পাকস্থলী (Stomach) এবং অন্ত্রসমূহের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রস এবং জারক পদার্থ (Ferment) রস দ্বারা স্বাভাবিক বিশ্লেষণ হইয়া পরিপাক হয়। খাদ্য এইরূপে জীর্ণ হইয়া রক্তদ্বারা শরীরের সর্ব্বস্থানে পরিচালিত হয় এবং যে অংশের যত টুকু অভাব তাহা পূরণ করে।

শরীরের অভাব কি?

আমরা যে কোন কার্য্য করি না কেন, তাহাতেই আমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। চলা, ফেরা, উঠা, বসা, দৌড়ান ব্যায়াম ইত্যাদি সকল কার্য্যে দেহস্থিত মাংসপেশী সকলের নিয়ত আকুঞ্চন ও প্রসারণ হইয়া ক্ষয় হইতেছে, পাঠাভ্যাস, চিন্তা, প্রভৃতি মানসিক কার্য্যের দ্বারাও মস্তিষ্কাদি শারীরিক যন্ত্রের ক্ষয় হইয়া থাকে।

আমরা প্রত্যক্ষভাবে কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্য না করিয়া স্থির ও নিশ্চল হইয়া থাকিলেও আমাদের শরীরস্থ হৃৎপিণ্ড ফুসফুস্ ও অন্যান্য যন্ত্রাদি অবিরাম কার্য্য করিতে থাকিবে এবং তজ্জন্য শরীরের ক্ষয় কিয়ৎপরিমাণে অবশ্যম্ভাবী।

শরীরের ক্ষয় পূরণ হইলেই খাদ্যের কার্য্য শেষ হইল না, সদ্যোজাত শিশু দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কালে একজন মনুষ্যে পরিণত হয়। অতএব খাদ্য যে কেবল শরীরের ক্ষয় নিবারণ করে তাহা নহে, অন্ততঃ ২৫।৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শরীরের বৃদ্ধি প্রাপ্তির সহায়তা করে। শিশুকে বালক, বালককে যুবক এবং যুবককে পূর্ণ মনুষ্যে পরিণত করে। শিশু, বালক ও যুবকের যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন; খাদ্যের অভাব হইলে তাহাদের শরীর যথোচিত বর্দ্ধিত হয় না।

খাদ্যের কার্য্য।—খাদ্য দ্বারা শরীরের এই কয় প্রকার কার্য্য সম্পন্ন হয়।

১। শারীরিক ক্ষয় নিবারণ।

২। দেহের বৃদ্ধি সাধন।

৩। তাপ জনন।

৪। বল উৎপাদন।

যে কয়প্রকার খাদ্য উল্লিখিত হইয়াছে তাহারা সকলেই এই চারি প্রকার কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযোগী নহে। কোন খাদ্য শরীরের ক্ষয় নিবারণ ও বৃদ্ধি সাধনের উপযোগী, কোনটী বা তাপ উৎপাদনের সহায়তা করে। কেহ বা রসের উপাদানে পরিণত হয়

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের কি প্রকারে পরিপাক হয় নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল :—

আমিষ জাতীয় খাদ্য :—মুখগহ্বরের মধ্যে আমিষ জাতীয় খাদ্যের কোন প্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় না। আমিষ জাতীয় খাদ্য পাকস্থলী মধ্যে Gastric juice নামক রসের সংস্পর্শে আসে এবং তথায় আংশিকভাবে জীর্ণ হয়। Gastric juice এ Pepsin নামক Enzyme (জারক পদার্থ) আছে এবং ইহার সাহায্যে মাংস প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য Peptone নামক দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত হয়। খাদ্যদ্রব্যাদি পাকস্থলী হইতে অন্ত্রমধ্যে আসিলে তত্রস্থ রসের সহিত

মিলিত হয়; এই রসে Pepsin এর ন্যায় Trypsin নামক জারক পদার্থ আছে। যে সকল আমিষ জাতীয় খাদ্য Pepsin দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় নাই তাহার সহজেই Trypsin এর আক্রমণে Peptones, Amino-acids ও Polypeptides নামক দ্রবণীয় পদার্থ সমূহে পরিণত হয়।

এই দ্রবণীয় পদার্থ সমূহ অনায়াসেই রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত হয়। মাংসের ন্যায় পদার্থের রক্তের সহিত মিলন অসম্ভব অথচ শরীর পুষ্টির জন্য এই মাংস আবশ্যক। পরিপাক ক্রিয়ার উদ্দেশ্য এই যে মাংসের ন্যায় অদ্রবণীয় পদার্থও সহজ দ্রবণীয় পদার্থ সমূহে পরিণত হইয়া রক্তের সহিত মিলিত হইতে পারে।

মাংসের বিশ্লেষণে যেরূপ Amino-acids, Polypeptides ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শরীর মধ্যে এই সকল দ্রব্যের সংমিশ্রণে মাংস পুনঃরুৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদের শরীরের সমস্ত মাংসই এইরূপে অন্য জন্তুর মাংস বা তদ্রূপ গুণ বিশিষ্ট আমিষ জাতীয় খাদ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

খাদ্য দ্রব্যাদি হইতে যে পরিমাণ Amino acids রক্তের সহিত মিলিত হয় তাহার সমস্তই আমাদের শরীরের কার্য্যে লাগে না। উদ্বৃত্ত অংশ লিভারের দ্বারা Urea রূপে পরিণত হইয়া প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

অত্যধিক আমিষ জাতীয় খাদ্য আহার করিলে প্রস্রাবে Urea ও Uric এসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এইরূপে মূত্রগ্রন্থির কার্য্যও অযথা বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে সহজেই মূত্রগ্রন্থির পীড়া হওয়া সম্ভব। কাহারও কাহারও Uric acid প্রস্রাবের সহিত বহির্গত না হইয়া শরীর মধ্যে জমিতে থাকে এবং এইরূপে বাত ব্যাধির সূত্রপাত হয়।

শালি জাতীয় খাদ্য :—শালি জাতীয় খাদ্য নানাপ্রকার। শ্বেতসার প্রভৃতি শালি জাতীয় পদার্থ জলে অদ্রবণীয় এবং শর্করা প্রভৃতি সহজেই দ্রবণীয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পরিপাক ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে এই যে অদ্রবণীয় খাদ্যকে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার উপযুক্ত দ্রবণীয় দ্রব্যে পরিণত করা। সমস্ত শালি জাতীয় খাদ্যই পরিপাক ক্রিয়ার দ্বারা Glucose নামক শর্করায় পরিণত হয় এবং এই অবস্থায়

রক্তের সহিত মিলিত হয়। মুখলালাস্থিত Ptyalin এবং অন্ত্রস্থিত Amylopsin ও Invertin নামক জারক পদার্থ দ্বারা শালি জাতীয় খাদ্য সমূহ Glucose নামক শর্করায় পরিণত হয়। শালি জাতীয় খাদ্য হইতেই আমরা কার্য্য করিবার শক্তি ও শরীরের উত্তাপ পাইয়া থাকি। শরীরে Glucose উদ্বৃত্ত হইলে তাহা যকৃতের মধ্যে Glycogen রূপে ও শরীরের অন্যান্য স্থানে মেদরূপে পরিণত হইয়া অবস্থান করে। অত্যধিক শালি জাতীয় দ্রব্যাদি আহার করিলে প্রস্রাবের সহিত শর্করা (Glucose) নির্গত হয় এবং শরীরের মেদ বৃদ্ধি ঘটিতে পারে।

স্নেহ জাতীয় খাদ্যঃ—স্নেহ জাতীয় খাদ্য অন্ত্রমধ্যে Steapsin নামক জারক পদার্থের দ্বারা বিশ্লেষিত হয়। এই বিশ্লেষণ কেবল শোষণ (absorption) এর সহায়তা করে। রক্তের সহিত স্নেহপদার্থ অবিকৃত অবস্থাতেই মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্নেহরূপেই সঞ্চিত হয়। স্নেহ জাতীয় খাদ্য হইতে শরীরের তাপ উৎপন্ন হয়। এবং ইহার অত্যধিক ব্যবহারে শরীরের মেদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

জল ও লবণ জাতীয় খাদ্যঃ—এই সকল দ্রব্যাদির কোনরূপ পরিপাকের আবশ্যক নাই। জল ও লবণ দুইই শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। খাদ্যে লবণ ভাগ কম থাকিলে স্কার্ভী প্রভৃতি রোগ হয়। অত্যধিক পরিমাণ লবণ শোথ বৃদ্ধির সহায়তা করে।

খাদ্যদ্রব্য শরীর মধ্যে পরিপাক পাইবার পর রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরের কার্য্য সকল সম্পন্ন করে। যদি এই সকল দ্রব্যাদি রক্তমধ্যে অত্যধিক পরিমাণে প্রবেশ করে অর্থাৎ যদি পুষ্টিকর দ্রব্যাদি আবশ্যক অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে শরীরে রোগের উৎপত্তি হয়। এরূপ স্থানে উত্তমরূপ পরিপাক হইলেও শরীরের পুষ্টির সাধন ঠিক হয় না। ইহা আমরা সাধারণ কয়েকটা রোগের উদাহরণ দিয়া বুঝাইব।

ডায়াবিটিস বা মধুমূত্রঃ—এই রোগ সাধারণতঃ অতিরিক্ত ভোজনের ফল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শরীরের তাপ ও শক্তি, শালি ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য হইতে উদ্ভূত হয়। যাঁহারা অল্প কায়িক পরিশ্রম করেন তাঁহাদের শরীর

রক্ষার জন্য এই সকল খাদ্যের আবশ্যকও অল্প। কেবল মাত্র রসনার তৃপ্তি সাধনের জন্য এই সকল দ্রব্যাদি অধিক পরিমাণে আহার করিলে বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী। প্রথম অবস্থায় মধুমূত্র রোগীর পরিপাক শক্তি যথেষ্ট থাকে এবং ইহার বলে অত্যধিক শালি জাতীয় খাদ্য ভোজন করিলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শরীরের অভাব অপেক্ষা এই শর্করার পরিমাণ অধিক হওয়ায় ইহার কিয়দংশ মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এইরূপে মধুমূত্র রোগের সূত্রপাত হইয়া থাকে।

খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ কমাইয়া কায়িক পরিশ্রমের মাত্রা বৃদ্ধি করিলে প্রথম অবস্থায় ডায়াবিটিস অচিরে আরোগ্য হয়।

বাতব্যাধি বা গাউট।

২। বাতব্যাধি (Gout)—বাত রোগাদিতেও পরিপাক ক্রিয়া বেশ সম্পাদিত হয় কিন্তু প্রোটিড জাতীয় পুষ্টিকর খাদ্যের আধিক্য জনিত তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয় না। প্রোটিডেরা তাহাদের বিশ্লেষণের চরম অবস্থা ইউরিয়া এবং Uric acid এ পরিণত হয় এবং Uric acid শরীরের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া বাতরোগ আনয়ন করে।

মেদ বৃদ্ধি।

৩। মেদবৃদ্ধি—খাদ্য দ্রব্যস্থিত তৈল জাতীয় অংশ অব্যবহৃত থাকিলে শরীরে মেদরূপে সঞ্চিত হয়। কায়িক পরিশ্রমের অভাব এবং গুরুভোজনের ফলে উপরোক্ত তিন প্রকার ব্যাধি অর্থাৎ বহুমূত্র, বাত এবং মেদবৃদ্ধি আমাদের দেশে অবস্থাপন্ন লোকের অধিক দেখা যায়।

খাদ্যের পরিমাণ নিরূপণ।

মনুষ্য স্বীয় বিদ্যা ও বুদ্ধির দ্বারা শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য নানা প্রকার খাদ্যের পরিমাণের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। আমাদের ভিন্ন অবস্থায় (অর্থাৎ পরিশ্রমের সময় এবং স্থির অবস্থায়) কি প্রকারে ও পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য আবশ্যক হয় তাহাও লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু আমাদের শরীর জীবন হীন কল বা ইঞ্জিন নহে। হিসাবমত কয়লা ও জল দিলেই কল হইতে কার্য্য পাওয়া যায়। অপর পক্ষে মনুষ্যের মধ্যে কেহ মিতাচারী

কেহ বা অন্যায়রূপে শরীরকে নষ্ট করিতেছে। কেহ খাদ্যদ্রব্য হইতে পূর্ণমাত্রায় সারাংশ বাহির করিয়া লইতে সক্ষম এবং কেহ বা ঐই অংশ আংশিক গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং আমাদের আহারের পরিমাণ প্রত্যেকের নিজ নিজ আবশ্যকের উপর লক্ষ্য রাখিয়া স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক। কেবল হিসাব বা পদ্ধতি বা গ্রন্থাদির বর্ণনার দোহাই দিলে চলিবে না।

খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইলে শরীরের পুষ্টির ব্যাঘাত হয়। খাদ্যের অভাবে শরীরস্থ সমস্ত যন্ত্রেরই যে সমান ক্ষতি হয় তাহা নহে, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস্ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রগুলির কার্য্যের কোনই বৈলক্ষণ্য প্রথমে উপলব্ধি করা যায় না। শরীরের স্বাভাবিক তাপও অনেকদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। স্বল্পাহারের ফলে প্রথমে—

১। চর্ব্বি ও যকৃৎ শর্করার সঞ্চয় ব্যয়িত হয়।

২। সকল প্রকার বর্দ্ধন বন্ধ হয়।

৩। মাংসপেশী সমূহের কার্য্যকারী ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৪। শরীরস্থ যন্ত্র নিঃসৃত রস সকল কমিয়া যায়।

৫। শরীরের ওজন কমিয়া যায়। অল্প আবশ্যকীয় পেশী সমূহ প্রথমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় পরে অত্যাবশকীয় যন্ত্র সমূহ অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড ফুসফুস্ এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী ধ্বংস পায়।

অত্যধিক আহারের জন্য প্রথমতঃ পাকাশয়ের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। অম্ল, অজীর্ণ, উদ্গার, বমন, পেটের অসুখ ইত্যাদি নানাপ্রকার পীড়া ঘটিয়া থাকে। অত্যধিক আহার্য্যদ্রব্য পরিপাক পাইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে নিম্নলিখিত ফল হয়।

(১) যকৃতে শর্করা ও শরীরের চর্ব্বি ভাগ বৃদ্ধি পায়।

অত্যধিক আহারে মাংসপেশী প্রভৃতির বৃদ্ধি হয় না। মাংসপেশী, ফুসফুস্ ইত্যাদিকে পরিপুষ্ট ও কার্য্যক্ষম করিতে হইলে ব্যায়ামের আবশ্যক। যতই কেন পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হউক না ব্যায়াম ব্যতীরেকে এই সকল যন্ত্রের পুষ্টির সম্ভাবনা নাই অতিরিক্ত আহারে শরীরের কেবল চর্ব্বি বৃদ্ধি হয়। তাহাতে শরীরে কিছুই বলবৃদ্ধি হয় না।

(২) শরীরস্থ আহার্য্য দ্রব্যের উদ্বৃত্ত অংশের অন্যভাগ শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়।

মূত্র, ঘর্ম্ম, প্রশ্বাসবায়ু ইত্যাদির সহিত শরীর হইতে ক্লেদ নির্গত হইয়া যায়। অত্যধিক আহারের ফলে মূত্রগ্রন্থি, ত্বক, ফুসফুস্ ইত্যাদি যন্ত্রের কার্য্য অযথা বাড়িয়া যায় এবং ইহারা অল্প কারণেই বিকল হইয়া পড়ে। অল্পকারণেই গুরু ভোজনকারীর সর্দ্দী, পেটের অসুখ ইত্যাদি হয়, প্রস্রাবের সহিত শর্করা ও আল্‌বুমেন নির্গত হইতে পারে এবং চর্ম্ম সর্ব্বদাই ঘর্ম্মে আর্দ্র এবং তৈলাক্ত থাকার জন্য চর্ম্মরোগ সহজেই উৎপন্ন হয়।

উদ্বৃত্ত আহার্য্য দ্রব্য যাহাতে সহজেই শরীর হইতে নির্গত হইয়া যাইতে পারে সেই জন্য তাহাদের কিছু রাসায়নিক পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে আমিষ জাতীয় খাদ্য urea ও ammonia রূপে, শালি জাতীয় খাদ্য শর্করা, জল ও Carbon-dioxide বাষ্প রূপে এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্য জল ও Carbon-dioxide রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। এই রাসায়নিক ক্রিয়াকেই আমরা মৃদুদহন ক্রিয়া বলিয়া অভিহিত করিয়া আসিয়াছি। এখন দেখা যাইতেছে যে অধিক আহারের ফলে এই দহন ক্রিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শরীরে অধিক তাপ উৎপন্ন হয়।

মনুষ্য শরীরের একটী বিশেষত্ব এই যে শরীরের তাপ সর্ব্বদাই সমান থাকিবার চেষ্টা করে। গ্রীষ্মকালেই হউক আর শীতকালেই হউক' তুষার আবৃত দেশেই হউক কিম্বা মরুভূমিতেই হউক Thermometer দিলে দেখা যাইবে যে মনুষ্য শরীরের তাপ ৯৮·৪ ডিগ্রি রহিয়াছে। বাহিরের তাপ অধিক হইলে চর্ম্মের রক্তবাহী শিরা সমূহ প্রসারিত হয় এবং চর্ম্মে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রক্ত হইতে এইরূপে কিয়ৎপরিমাণ তাপ নির্গত হইয়া যায়। এই সময় অধিক ঘর্ম্ম হইতে থাকে এবং তাহাতেও শরীরের অনেক তাপ কমিয়া যায়। এইরূপে বাহিরের তাপ বৃদ্ধি হইলেও শরীরের তাপ ঠিক থাকে। গ্রীষ্মকালে আমাদের শীতল জল পানের ইচ্ছাও প্রবল হয়। শীতল জল পান করিলে শরীরের তাপ অনেকটা কমিয়া যায় এবং জলে ঘর্ম্ম নিঃসরণের সহায়তা করে।

বাহিরের তাপ বৃদ্ধি হইলে শরীর যেরূপ নিজের তাপ কমাইবার চেষ্টা করে সেইরূপ অন্তরস্থ তাপ বৃদ্ধি হইলেও শরীর ঐরূপ চেষ্টা করিয়া থাকে।

গুরু ভোজনের পর শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হয় এবং এই জন্যই আমাদের নিমন্ত্রণ খাইবার পর শীতল জলপানেচ্ছা প্রবল হয়। যাহারা গুরুভোজনে অভ্যস্ত তাঁহাদের শরীরের তাপের সমতার জন্য অধিক ঘর্ম্ম হইয়া থাকে এবং চর্ম্মের উপর স্থানে স্থানে রক্তবাহী শিরা সকল স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হয়। যাঁহারা মদ্য ও মাংস যথেচ্ছা ব্যবহার করেন তাঁহাদের নাসিকার অগ্রভাগ, গণ্ডদেশ ও কর্ণে সরু সরু রক্তের শিরা দেখা যায়। রক্তিম গণ্ডস্থল স্বাস্থ্যের নিদর্শন না হইয়া ভূরি ভোজনের পরিচায়ক মাত্র। যে সকল শিশুকে অধিক খাওয়ান হয় তাহাদের মস্তক ও হাত পা বেশী ঘামিয়া থাকে।

অধিক ভোজনের জন্য যে সকল পীড়া হইয়া থাকে তাহা নিবারণের জন্য দুই প্রকার উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে; (১) খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া (২) কায়িক পরিশ্রম ও ব্যায়াম করা।

(১) প্রথমোক্ত উপায় অবলম্বনে শরীরে আবশ্যকের অধিক পুষ্টিকর দ্রব্য প্রবেশ করিতে পায় না এবং শারীরিক যন্ত্রাদিকেও অযথা পরিশ্রম করিতে হয় না। (২) ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম করিলে শরীরের ক্ষয় ও অভাব বৃদ্ধি পায় এবং শরীরও অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে পারে। ব্যায়ামের ফলে অধিক আহারের জন্য শরীরের ক্ষতি না হইয়া মাংসপেশী সমূহের পুষ্টিই হইয়া থাকে। পরিপুষ্ট মাংসপেশী অপরিপুষ্ট পেশী অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে খাদ্য দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু ব্যায়াম করিলেই যে যথেচ্ছা খাওয়া যাইতে পারে এ ধারণা ভ্রমাত্মক।

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের ন্যূনাধিক্যে শরীরে কি কি পরিবর্ত্তন হয়।

আমিষ জাতীয় খাদ্যের অভাব জন্য—শরীরের স্বাভাবিক বর্দ্ধন প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয়। শরীরের আবশ্যকীয় পেশী সকল আমিষ জাতীয় উপাদানে নির্ম্মিত

ইহার অভাবে হাড় সকল ভগ্নপ্রবণ, মাংসপেশী সকল [illegible] থল্‌থলে এবং অন্যান্য যন্ত্রাদি ক্ষীণবল হয়।

আমিষ জাতীয় খাদ্যের আধিক্য—আমিষ জাতীয় দ্রব্যাদি রক্তের সহিত মিলিত হ। মূত্রগন্থি দ্বারা শরীর হইতে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, এ্যামোনিয়া যৌগিক পদার্থ এবং এলবুমেন রূপে পরিত্যক্ত হয়।

আমিষ জাতীয় খাদ্য শর্করা ও চর্বির ন্যায় শরীর মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হয় না। যদি সত্বঃ ব্যবহারের জন্য আবশ্যক না হয় তাহা হইলে শরীর হইতে ইহা পরিত্যক্ত হয়।

মূত্রের নাইট্রোজেনের মাত্রা নিরূপণ করিয়া আমরা আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রাচুর্য্য বা অভাব স্থিরীকৃত করিতে পারি।

সাধারণতঃ মূত্রে ইউরিক এসিডের আধিক্য, গাঢ়বর্ণত্ব, দুর্গন্ধ ও সহজেই পচনশীলতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রাচুর্য্য ঠিক করা যায়। এতদ্ভিন্ন অন্ত্রমধ্যে আমিষ দ্রব্যের পচনেরও প্রমাণ মলপরীক্ষা হইতে পাওয়া যায়।

শালি জাতীয় অর্থাৎ শ্বেতসার এবং চিনি ইত্যাদির আধিক্য জন্য শীঘ্র শীঘ্র ওজন বৃদ্ধি হইয়া থাকে, [illegible], অধিক ঘর্ম্ম হয় এবং ত্বকের উপরস্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তের শিরা সকল [illegible]। [illegible] প্রস্রাবে শর্করা দেখা যায়।

স্নেহ জাতীয় অর্থাৎ ঘৃত, চর্ব্বি ইত্যাদির আধিক্য জন্য শরীর শীঘ্রই [illegible], চক্ষু মস্তন ভাব ধারণ করে। [illegible] ঘর্ম্ম দুর্গন্ধযুক্ত হ।

চর্ব্বি জাতীয় খাদ্য শরীর মধ্যে [illegible] পরিমাণে [illegible] প্রস্রাবে Ammonium Sulfএর আধিক্য দেখা যায়। এই প্রকারে শরীর হইতে প্রচুর নাইট্রোজেন বাহির হইয়া যায়। খাদ্যে চর্ব্বির আধিক্য হইলে ইহার কিয়দংশপরিমাণ শরীরস্থ ক্ষারের সহিত মিশ্রিত হইয়া সাবানে পরিণত হয় এবং মলের সহিত বাহির হইয়া যায়।

স্নেহজাতীয় খাদ্যের অভাবে শারীরিক ক্রিয়ার নানারূপ ব্যাতিক্রম হয়। মস্তিষ্ক ও স্নায়ু মণ্ডলের পুষ্টির জন্য স্নেহজাতীয় খাদ্যের বিশেষ আবশ্যক এবং ইহার

অভাবে এই সকল যন্ত্র পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। আমাদের দেশে যাঁহারা অধিক মস্তিষ্ক পরিচালনা করেন তাঁহাদিগকে মাছের মুড়ো খাইতে দিবার ব্যবস্থা আছে। মাছের মুড়োয় স্নেহজাতীয় পদার্থের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। স্নেহজাতীয় খাদ্যের অভাবে শিশুদিগের বৃদ্ধি সম্যকরূপ হয় না এবং অনেক সময় তাহাদের রিকেট্‌স্ নামক ব্যাধি হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরের লাবণ্যও স্নেহজাতীয় খাদ্যের উপর নির্ভর করে। শিশুরা মাতৃদুগ্ধ হইতেই স্নেহজাতীয় খাদ্য পাইয়া থাকে। মাতৃদুগ্ধে লেসিথিন নামক ফস্‌ফরাস্ সংযুক্ত একপ্রকার স্নেহময় পদার্থ আছে। উহা শিশুর পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয়। গোদুগ্ধে এই পদার্থ অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

লবণ জাতীয় খাদ্যের অভাবেও শারীরিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য হইতে পারে। সাধারণতঃ আমরা যে সকল খাদ্যদ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাদের কোনটাতেই লবণ জাতীয় পদার্থের অভাব নাই। কিন্তু পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে অনেক সময় লবণ জাতীয় পদার্থ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না এবং তাহাতেই শরীরে লবণের অভাব উপস্থিত হয়।

লবণ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে লৌহ Calcium, Sodium, ও Potassiumই প্রধান। ইহাদের অভাবে শরীরে রক্তাল্পতা উপস্থিত হয়। স্নেহ ও আমিষ জাতীয় খাদ্য হইতে অনেক সময় শরীরমধ্যে অম্লজাতীয় বিষাক্ত পদার্থ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরের রক্তে অবস্থিত Calcium, Sodium প্রভৃতি ঐ বিষাক্ত অম্লের সহিত সংযুক্ত হইয়া উহাদিগকে নির্দোষ করিয়া দেয়। Calcium, Sodium ইত্যাদির অভাব হইলে এই বিষাক্ত অম্ল পদার্থ নানাপ্রকার রোগ আনয়ন করে।

Calciumএর অভাবে অস্থিসকল দৃঢ় এবং কার্য্যক্ষম হয় না। কোন কোন শিশুর মস্তকের অস্থি অনেক দিন পর্য্যন্ত নরম অবস্থায় থাকে এবং দন্তোদ্গমেরও অনেক বিলম্ব হয়। Calciumএর অভাবই এই সকল উপদ্রবের কারণ।

কিরূপে যক্ষ্মা নিবারণ করা যায়।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্, বি, লিখিত—

সমাজ হিতৈষী বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই লক্ষ্য করিয়াছেন যে আজ কা'ল এই দুশ্চিকিৎস্য যক্ষ্মা বা ক্ষয় রোগ এ দেশে ক্রমে ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করিয়া ভীষণ লোকক্ষয় করিতেছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই রোগের আক্রমণের কথা অতি সামান্যই শুনা যাইত। কিন্তু আজ কাল প্রতি গৃহস্থেই কেহ না কেহ ইহাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

উন্নতিশীল অনুসন্ধিৎসু ইউরোপীয়গণ এই ব্যাধির সংক্রামণ নিবারণ বিষয়ে এতদূর সফল হইয়াছেন যে বর্ত্তমান কালে সেদেশে এই ক্ষয় রোগ জনিত মৃত্যু-সংখ্যা অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের মৃত্যু সংখ্যার তুলনায় চতুর্থাংশে পরিণত হইয়াছে। আমরাও এই প্রকারে চেষ্টা করিলে এদেশেও ঐ রোগের বিস্তৃতি হ্রাস করিতে পারিব সন্দেহ নাই। সেই উদ্দেশ্যে নিম্নে কতকগুলি সংক্ষিপ্ত নিয়ম প্রদত্ত হইল। রোগী ও তাহার আত্মীয়গণের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

রোগের কারণ।—"ক্ষয় কীটাণু" (Tubercle bacilli) নামক এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম জীবাণু মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করিয়া এই ক্ষয় রোগ উৎপাদান করে, ইহারা দেহে প্রবেশ করিবার পরই অতি শীঘ্র সংখ্যায় বাড়িয়া উঠে ও উহার রসে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়। ইহার ফলে দেহ ক্ষয় হইতে থাকে ও অবশেষে রোগীর মৃত্যু ঘটে

এই কীটাণু দ্বারা আক্রান্ত দেহের কোন রস যতক্ষণ বাহিরের বাতাস আশ্রয় করিতে না পারে ততক্ষণ এই কীটাণুগুলি ঐ রোগীর দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রামিত হইতে পারে না। বাহিরের বাতাসের সঙ্গে সংযুক্ত হইবার কিছুকাল পরেই কীটাণুগুলি দলে দলে রোগ দুষ্ট দেহ হইতে "থুতু" "পূঁজ" "কাশী বা অন্য কোন স্রাবের সঙ্গে নির্গত হইয়া সুস্থ দেহ আশ্রয় করিবার চেষ্টা করে। শরীরের যাবতীয় যন্ত্রই এই কীটাণু দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু শরীরের অন্যান্য যন্ত্রাদির

তুলনায় শ্বাসযন্ত্র শতকরা ৯৯ স্থলে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়; তজ্জন্য এ স্থলে কেবল মাত্র শ্বাস যন্ত্রের আক্রমণ অর্থাৎ "ক্ষয় কাশ" সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইতেছে।

১ম। সকল স্থলেই দেখা যায় যে "ক্ষয় কাশী" হইতেই এই রোগ অন্য ব্যক্তিকে আক্রমণ করে। দূষিত জল, বায়ু বা খাদ্য হইতে এ রোগের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু এই সকল কারণে দেহ নিস্তেজ হইলে উক্ত কীটাণু সহজেই আক্রমণ করিতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

২য়। চিকিৎকেরা সম্প্রতি প্রমাণ করিয়াছেন যে এই **রোগ বংশ-জাত নহে।** তবে সময়ে সময়ে যে দেখা যায় পিতার বা মাতার এই রোগ হইলে সন্তানদিগেরও এই রোগ হইয়াছে তাহার কারণ **পিতৃ দেহজ ক্ষয় কীটাণু** রোগী ও আত্মীয়বর্গের অসাবধানতা হেতু পুত্র দেহে প্রবেশ করে।

৩য়। মাংস বা দুগ্ধে "**ক্ষয় কীটাণু**" থাকিতে পারে; কিন্তু এ দেশের লোক যে পরিমাণে সুসিদ্ধ করিয়া মাংসাহার বা দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন তাহাতে ঐ সকল কীটাণু নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং মাংস বা দুগ্ধ হইতে এ দেশে উক্ত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

৪র্থ। "ক্ষয় রোগীর" **পরিত্যক্ত থুতু** হইতেই এ দেশে প্রধানতঃ এই রোগ সংক্রামিত হয়।

৫ম। **ফেনাইল** আদি কীটাণু নাশক (Antiseptic) ঔষধাদি দ্বারা এই কীটাণু বিনষ্ট করা অত্যন্ত সহজ।

৬ষ্ঠ। ক্ষয় রোগী যে 'থুতু' ফেলে তাহা যতক্ষণ ভিজা থাকে ততক্ষণ তাহার ভিতরের কীটাণুগুলি বাতাস আশ্রয় করিতে পারে না। পরে যখন থুতু শুষ্ক হইয়া উঠে ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুতে বিভক্ত হইয়া পড়ে, তখনই ঐ ক্ষুদ্র অংশগুলি ধূলার সঙ্গে মিশিয়া বায়ুতে ভাসিতে থাকে এবং সহজে অন্য দেহ আক্রমণ করিবার অবসর পায়।

৭ম। অতএব বুঝা গেল, দেওয়াল মাঝে, বা অন্য যে কোন স্থানে পরিত্যক্ত থুতু সহজে শুষ্ক হওয়ার সম্ভব, ক্ষয় রোগী সে সকল স্থানে থুতু না ফেলিয়া কোন

পাত্রে জল রাখিয়া কেবল মাত্র তাহাতেই থুতু ফেলিবেন। ঐ পাত্র পরিষ্কার করিবার সময় ফেনাইল আদি জীবাণু নাশক ঔষধ সঙ্গে মিশাইয়া নর্দ্দমায় ফেলা উচিত। এরূপ করিলে থুতু ভবিষ্যতে শুষ্ক হইয়া অন্যের পক্ষে মারাত্মক হইবার ভয় থাকিবে না।

৮ম। এই কীটাণুগুলি নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে রোগীর দেহ হইতে বাহিরে আসিতে পারে না সুতরাং ক্ষয় রোগীর নিকটে শয়ন করা বা নিদ্রা যাওয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ।

৯ম। তবে এক বিষয়ে বিশেষ সাবধানের প্রয়োজন। রোগী যখন কাশে তখন ঐ কাশ উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে কতক পরিমাণে থুতু রোগীর নিকটেই বিছানায় বা মেঝেতে পড়ে। থুতুর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার অত্যন্ত সম্ভাবনা। সেই জন্য রোগী যেন প্রত্যেকবার কাশিবার সময় একখণ্ড পরিষ্কার বস্ত্র বা রুমাল মুখের উপর রাখেন। এরূপ করিলে উহাতে থুতুর সমস্ত অংশ থাকিয়া যাইবে। ঐ রুমাল কোন কীট নাশক (Antiseptic) ঔষধে মাঝে মাঝে ধুইয়া লইলেই দোষ কাটিয়া যাইবে।

১০। উপরিলিখিত নিয়মগুলি অবহেলা করিলে রোগীর উভয় সঙ্কট। একদিকে, যে আত্মীয়েরা তাঁহার সেবা করিয়া প্রাণপাত করিতেছেন এই অসাবধানতার ফলে তাঁহাদিগকে সহজেই রোগাক্রান্ত করিয়া বিপন্ন করেন ও অন্য দিকে স্বয়ং এই শুষ্ক থুতু হইতেই পুনরায় আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার ফল হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়া ধনে প্রাণে বিনষ্ট হন।

অবশেষে পাঠকদিগের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা যেন বন্ধুবান্ধবদিগকে এই সহজ সাধ্য নিয়মগুলি পালন করিতে অনুরোধ করেন। এবং সকলেই নিজ নিজ গৃহে থুতু ফেলিবার বিশেষ পাত্রের ব্যবস্থা করেন। আমাদের পিতৃ পুরুষেরা এ সকল বিষয়ে কত সাবধান ছিলেন তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র। সদাশয় সরকার বাহাদুর এই সদুদ্দেশ্যে সরকারী প্রত্যেক আপিষে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন, ট্রাম কোম্পানী প্রত্যেক আরোহীকে সাবধান করিয়া দিতেছেন কিন্তু আমরা ঘরে ঘরে এই নিয়মগুলি পালন না করিলে সকল চেষ্টা বিফল হইবে।

শাস্ত্রীয় স্বাস্থ্য কথা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবতারণ বিদ্যারত্ন লিখিত—

[স্বাস্থ্য-সমাচার প্রকাশের পর হইতেই আমাদের পাঠকবর্গ ও জনসাধারণের অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রাদিতে ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে সকল বিধি ব্যবস্থা আছে তাহা জানিবার জন্য উৎসুক্য দেখিয়া আমরা এই "শাস্ত্রীয় স্বাস্থ্য কথা" সরল সুখপাঠ্য পদ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া ধারাবাহিকক্রমে প্রকাশ করিব। প্রত্যেক ছন্দের পর তাহা যে মূল হইতে অনুবাদিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।]

প্রাতঃকৃত।

সূর্য্য উঠিবার আগে শয্যা ত্যাগ করি।
দেবর্ষি দেবতা মূর্ত্তি হৃদয়েতে স্মরি॥
প্রার্থনা করিবে পরে ঈশ্বর নিকটে।
তব কার্য্যে যেন কভু না পড়ি সঙ্কটে॥
সকলের মূল ঈশ করি নমস্কার।
পরে মল মূত্রত্যাগ শৌচের ব্যাপার॥
গুহ্য হস্ত পদ জলে সুধৌত করিবে।
মৃদালেপ দিয়া তাহা পুনঃ প্রক্ষালিবে॥

চরক ও স্মৃতি।

দন্তধাবন।

এই মত শৌচকার্য্য সমাপন করি।
দন্তের মার্জ্জন কর অতি ধৈর্য্য ধরি॥
কটু তিক্ত কাষ্ঠে কিম্বা কষায় কাষ্ঠেতে।
যেন রক্ত নাহি পড়ে দন্ত মার্জ্জনেতে॥

চরক ও স্মৃতি।

জিহ্বা শোধন।

এইরূপে করিবেক দন্তের মার্জ্জন।
পশ্চাতে করিবে সবে জিহ্বার শোধন॥
সোণার রূপার কিম্বা তাম্রের ফলকে।
পিত্তল ফলকে কিম্বা বংশপৃষ্ঠ ত্বকে॥
নির্ম্মল হইবে জিহ্বা এই অনুষ্ঠানে।
সমর্থ হইবে সর্ব্ব রস আস্বাদনে॥
মুখেতে দুর্গন্ধ কভু স্থান নাহি পায়।
অন্নে রুচি জন্মে আর বৈরস্য পালায়॥
নির্ম্মল জলেতে করি মুখ প্রক্ষালন।
শুচিমনে শুদ্ধাসনে বসিবে তখন॥

চরক ও স্মৃতি।

অঞ্জন দান।

সৌবীর অঞ্জন দিবে নয়নে যতনে।
পাঁচ সাত দিন বাদে এই শাস্ত্র ভণে॥

এরূপ করিলে বাড়ে নয়নের শক্তি।
নেত্রগত যত রোগ সবে পায় মুক্তি॥

চরক ও স্মৃতি।

ক্ষৌরকার্য্য।*

রবি শনি কুজ জন্ম ঋক্ষ ভিন্ন কাল।
ক্ষুর কর্ম্মে কভু নাহি ঘটায় জঞ্জাল॥
জন্মমাসে নখ লোম না কর কর্ত্তন।
সোম বুধবারে কিন্তু করিবে ছেদন॥
ক্ষৌর কার্য্যে শরীরের অতি শোভা হয়।
দেহ শুক্র পরমায়ু সব বৃদ্ধি পায়॥
শরীরের মলক্ষয়ে শুদ্ধ হয় মন।
এই হেতু ক্ষৌর কর্ম্মে করিবে যতন॥

চরক ও স্মৃতি।

তৈল গণ্ডুষ ধারণ।

পরে মুখে কেলে তৈল গণ্ডুষ ধারণ।
কণ্ঠশোষ দন্তশূল করে পলায়ন॥
দন্তহর্ষ রোগ তার কভু নাহি ঘটে।
শীতকালে কখনও ঠোঁট নাহি ফাটে॥
চলদন্ত স্থির হয় কান্তি যুক্ত মুখ।
মুখে তৈল ধারণের এই সব সুখ॥

চরক।

মস্তকে তৈলদান।†

রীতিমত মস্তকেতে তৈলের অর্পণে।
স্নিগ্ধ কোমল কেশ হয় তৈলগুণে।
আর কৃষ্ণবর্ণ হয় শিরঃশূল ক্ষয়।
সুখনিদ্রা হয় ইহা আয়ুর্ব্বেদে কয়॥
অকালে না পাকে কেশ হয় দৃঢ়মূল।
মস্তক বলিষ্ঠ হয় ইহা নহে ভুল॥
নির্ম্মল ইন্দ্রিয় হয় ত্বক্ সুকোমল।
মস্তকেতে দিলে তৈল এই হয় ফল॥

চরক ও স্মৃতি

কর্ণে তৈলদান।

কর্ণ কুহরেতে তৈল দিবে প্রতিদিন।
না হবে কর্ণের রোগ বাতজ কঠিন॥
হনুর স্তম্ভনাঃ আর গ্রীবার স্তম্ভন।
কর্ণে তৈল দিলে পর না হয় কখন॥
বাড়ায় শ্রবণ শক্তি বধির না হয়।
এইহেতু কর্ণে তৈল দিতে শাস্ত্রে কয়॥

চরক ও স্মৃতি।

* ক্ষুরের দ্বারা নানাপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি ও চর্ম্মরোগ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে সেজন্য ক্ষুর শোধন করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য বা নিজ নিজ ক্ষুর রাখা উচিত।

† সুগন্ধি তৈল সকল সৌখিন স্থলে ব্যবহার্য্য হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত সুগন্ধি তৈলের পরিবর্ত্তে সুগন্ধি প্যারাফিন মাখিলে কোন উপকার হয় না।

চেয়াল ধরা।

নাভিতে তৈলদান।

নাভি শিরামূলবন্ধ কহে শাস্ত্রকার।
নাভিতে বিশেষরূপে তৈলে উপকার॥
নাভি স্নিগ্ধ থাকিলেই শিরা স্নিগ্ধ হয়।
এইহেতু দিবে তৈল নাভিতে নিশ্চয়॥

সর্ব্বাঙ্গে তৈলম্রক্ষণ।

অতঃপর সর্ব্বাঙ্গেতে তৈলের মর্দ্দনে।
ফল যাহা হয় তাহা শুনহ শ্রবণে॥
স্নেহ যোগে চর্ম্ম আর মৃত্তিকা বাসন।
যেরূপ সুস্নিগ্ধ দৃঢ় হয় সুদর্শন॥
সেরূপ শরীর হয় তৈলের মর্দ্দনে।
ক্লেশসহ দৃঢ় সুশ্রী এই শাস্ত্রে ভণে॥
ত্বক্ সুকোমল হয় জরা নাহি আসে।
কণ্ডূয়ন আদি রোগ পালায় তরাসে॥
ত্বগেন্দ্রিয় শক্তি বাড়ে বায়ুর দমন।
অভিঘাতে অল্প দুঃখ রহে অল্পক্ষণ॥
পরিশ্রমে নাহি হয় শরীর দুর্ব্বল।
দেহে তৈল মর্দ্দনের এই হয় ফল॥

চরক ও স্মৃতি।

পদে তৈলমর্দ্দন।

পরে পদদ্বয়ে কর তৈল বিমর্দ্দন।
খরতা কৃশতা রৌক্ষ্য নাশের কারণ॥
স্পর্শ শক্তি ক্ষয় নাহি হয় কদাচন।
গৃধ্রসী না হয় শিরা স্নায়ু সঙ্কোচন॥
পদ বল বাড়ে আর হয় সুকোমল।
স্ফুটন বিহীন হয় চরণ যুগল॥

উদ্বর্ত্তন ও স্নানাদি।

তৈল মর্দ্দনের পর উদ্বর্ত্তন যোগ।
ইহাতে না হয় দেহে বহুবিধ রোগ॥
গাত্রের দৌর্গন্ধ্য আর পলায় গৌরব।
অন্নে রুচি হয় বাড়ে দেহের সৌষ্ঠব॥
তন্দ্রা কণ্ডূ মল হীন হয় কলেবর।
ঘর্ম্মের অভাবে দেহ হয় সুখকর॥
শীতল বিমল জলে করিবেক স্নান।
বাড়িবেক পরমায়ু স্বস্থ হবে প্রাণ॥
পবিত্র সাধন স্নান শুক্রেরি বৰ্দ্ধক।
আয়ুষ্কর আর দেহ বলের জনক॥
শ্রম স্বেদ মল নাশ করে নিরন্তর।
ওজো বৃদ্ধি কর আর দেহ পুষ্টিকর॥
দেহের সকল জল নির্ম্মল বসনে।
স্বাস্থ্যের কারণে সবে মুছিবে যতনে।
পরিধান করিবেক শুচি আচ্ছাদন।
যাহাতে আনন্দ বাড়ে শুদ্ধ হয় মন॥
পবিত্র বসন করে অলক্ষ্মী দমন।
শুভ্রবস্ত্রে করে সদা সভ্যতা সাধন॥
কেশ প্রসাধন পরে নিশ্চয় করিবে।
ইহাতে মস্তকে মল কীটাদি না রবে॥
ঘৃতে বা দর্পণে কৈলে আকৃতি দর্শন।
সতত বাড়য়ে পুণ্য কান্তি আয়ু ধন॥

চরক ও স্মৃতি।

চন্দন ও মাল্য।*

সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপিবে যতনে।
তাহার সৌরভে সুখ বাড়িবেক মনে॥
দেহ সুশীতল হবে পুষ্ট হবে অঙ্গ।
দেহে কত শত হবে সুখের তরঙ্গ॥
সুগন্ধি পুষ্পের মালা গলেতে পরিবে।
মনের আনন্দ তাহে কতই বাড়িবে॥
দেহ শোভমান হবে মাল্যের ধারণে।
সার ফল পাবে যাহা আছয়ে চন্দনে॥

স্মৃতি ও চরক।

রত্ন ধারণ।

সমর্থ হইলে সবে রত্ন আভরণ।
ধারণ করিবে দেহে মঙ্গল কারণ॥
দুষ্ট গ্রহ তুষ্ট হয় রতনের গুণে।
চিত্ত প্রফুল্লিত হয় রত্ন দরশনে॥
রত্ন ধারণেতে হয় শোভার বর্দ্ধন।
সর্প পিশাচাদি ভয় না হয় কখন॥
শুক্রোধাতু বাড়ে হয় শরীর কোমল।
পাপ নাহি রয় দেহে ঘটয়ে মঙ্গল॥

চরক ও স্মৃতি।

বিবিধ বিষয়।

পরে পিতৃদেব, ঋষি আদি আরাধন।
যার যেবা আছে বিধি শাস্ত্রের লিখন॥
অর্থচিন্তা আদি যত আছে পূর্ব্বাপর।
করিবেক সাবধানে হইয়া তৎপর॥

চরক ও স্মৃতি।

ভোজন ক্রিয়া।

জলে মুখ হস্ত পদ করি প্রক্ষালন।
আসনে বসিবে পরে করিতে ভোজন
ঊর্দ্ধে জানু করি কিম্বা পদ প্রসারিয়া।
ভোজন না করিবেক অশ্রদ্ধা করিয়া॥
হইয়া সংযত পদ স্থির তুষ্টমনে।
পরশিয়া খাবে অন্ন অতি সযতনে॥
পূর্ব্ব মুখ ভোজনেতে বিহিত শাস্ত্রেতে
পশ্চিমদিকের নিন্দা নাহিক তাহাতে
জনক জননী যার আছয়ে জীবিত।
দক্ষিণ মুখেতে তার ভোজন অহিত॥
তাম্রময় পাত্রে কিম্বা ভগ্ন কাংস্য পাত্রে
ভোজন না করিবেক অন্য অপবিত্রে॥
কেশ কীট নখ আদি ঘৃণ্য দ্রব্য হীন।
পর্য্যুষিত নহে যাহা দুর্গন্ধ বিহীন॥
রোগহীন শুদ্ধ চিত্ত লোকের পাচিত।
অন্ন হিতকর হয় এই শাস্ত্রমত॥
যাহাতে বাড়য়ে আয়ু আর সুখ বল।
যার গুণে ধর্ম্মে হয় উৎসাহ প্রবল॥
সুরস সুস্নিগ্ধ যাহা লালসা বর্দ্ধক।
স্বাস্থ্য রক্ষী আর যাহা আরোগ্য জনক
নির্ব্বিকার তৃপ্তিফল বহুক্ষণ যার।
মনোরম পথ্য তাহা কহে শাস্ত্রকার॥

---

*চন্দন ও মালার পরিবর্ত্তে এসেন্স ও আতর ব্যবহার হইতেছে।

এইরূপ ভোজনেতে প্রবৃত্তি জন্মিলে।
দেহ মন সুস্থ রহে ভোজনের ফলে॥
এইরূপ অন্নে হয় জীবনের হিত।
ঈদৃশন্ন ভোজনেতে না ঘটে অহিত॥
ভোজনান্তে মুখ হস্ত পদ প্রক্ষালিবে।
শুভ্রবস্ত্রে মুছি জল আসনে বসিবে॥
মুখ শুদ্ধি করিবেক পশ্চাতে তাহাতে।
মুখ ও ভোজন হিত আছয়ে যাহাতে॥

চরক ও স্মৃতি।

পাদুকা ধারণ।

পদ রক্ষা হেতু পদে পাদুকা ধরিবে।
কণ্টকাদি কভু নাহি পদেতে ফুটিবে॥
পদ সুকোমল হবে সুখেতে গমন।
পদ শক্তি বাড়ে তাহে প্রফুল্লিত মন॥

চরক ও স্মৃতি।

ছত্র ধারণ।

রৌদ্র বৃষ্টি নিবারিতে ছত্র দিবে শিরে।
আর কোন বস্তু যাতে শিরে নাহি পড়ে॥
ঊর্দ্ধদেহে হিত হয় করিলে ধারণ।
শিরে কষ্টকর রোগ না ঘটে কখন॥

চরক ও স্মৃতি।

লঘু গুরু ও মাত্রা বিজ্ঞান।

উচিত মাত্রায় সদা ভোজন করিবে।
তাহাতে স্বাস্থ্যের হানি কভু না ঘটিবে॥
যাহার যেমন আছে জঠরাগ্নি বল।
সেইরূপ হবে তার মাত্রা অবিকল॥
বিনা ক্লেশে যথাকালে জীর্ণ যাহা হয়।
তাহাই উচিত মাত্রা জানিবে নিশ্চয়॥
লঘুদ্রব্য বলি কেহ খাইলে অধিক।
বিলম্বেতে জীর্ণ হয় রোগ শারীরিক॥
দ্রব্য বিশেষের যোগে লঘু গুরু হয়।
গুরু দ্রব্য লঘু হয় শাস্ত্রে হেন কয়॥
পাকের কৌশলে গুরুদ্রব্য লঘু হয়।
পুনর্ব্বার লঘুদ্রব্য গুরু পাক কয়॥
পাকদ্রব্য উষ্ণ হ'লে লঘু হয় জানি।
শীতল হইলে গুরু শাস্ত্রের বাখানি॥
ভোজনের কাল মাত্রা আর অগ্নি বল।
বিচার করিয়া গেলে বাড়ে দেহ বল॥
কিবা লঘু কিবা গুরু সুজীর্ণ না হলে।
তাহা ঠিক মাত্রা নহে জানিবে সকলে॥
মাত্রা স্থির করি পুনঃ ভোজন করিবে।
দেহেন্দ্রিয় মনোবল সতত বাড়িবে॥
অযথা মাত্রায় লোভে ভোজন করায়।
লঘু গুরু উভয়েই অসুখ জন্মায়॥
রোগী যদি যোগামাত্রা না করে ভোজন
নীরোগ তাহার দেহ না হয় কখন॥

নীরোগ বলিষ্ঠ যদি না বুঝিয়া খায়।
অচিরাৎ স্বাস্থ্য তার দূরেতে পলায়॥
অতি গুরুদ্রব্য অৰ্দ্ধ মাত্রায় ভোজন।
গুরুদ্রব্য বার আনা এই নিরূপণ॥
লঘুদ্রব্য পূর্ণমাত্রা খাইবে সকলে।
রোগের কারণ হয় অতি বেশী খেলে॥
মাত্রাধিক্যে গুরুদ্রব্য রোগদ যেমন।
সেইরূপ লঘুদ্রব্য নহে কদাচন॥
ছাতু চিড়ে পিঠে পুলি যত গুরুপাক।
প্রথম ক্ষুধায় খেলে হয় পরিপাক॥
একবার অন্য কিছু খাইবার পর।
পিটে পুলি আদি গুরু না খাও অপর॥
আয়ু বল বর্ণ সুখ ঐশ্বর্য্যে যার মন।
তিনি এই বিধি সদা রাখিবে স্মরণ॥
অতিশ্রম ব্যায়ামাদি কার্য্যে যারা রত।
তাদের অধিকমাত্রা ভোজনে বিহিত॥
কিন্তু যতক্ষণ শ্রম দূর নাহি হয়।
ততক্ষণ রীতিমত খাওয়া ঠিক নয়॥
খাইলে হইবে রোগ অতি ভয়ঙ্কর।
লিখিব কর্ত্তব্য যাহা আছে অতঃপর॥

চরক।

নিরন্তর অসেব্য।

শুষ্ক মাংস শুষ্ক শাক ভোজনে নিয়ত।
হিত নাহি হয় জানি এই শাস্ত্র মত॥
কড়ায়ের দাল দধি মৎস্য নিরন্তর।
খাইলে হইবে রোগ অতি কষ্টকর॥
রোগে কিম্বা হিংস্র জন্তু দংশনেতে ক্ষীণ।
পশুমাংস কদাচ না খাইবে প্রবীণ॥

নিরন্তর সেব্য।

মেটেধান শালিধান ডাল মুগ আর।
সৈন্ধব আমলকী যব খাবে নির্ব্বিকার॥
খাইবে বৃষ্টির জল অতি সুনির্ম্মল।
তাহার পানেতে পাবে সমুচিত ফল॥
জাঙ্গল পশুর মাংস আর মধু যত।
ভোজন করিবে সুখে হয়ে শ্রদ্ধাযুত॥
স্বচ্ছন্দ যাহার দেহ বৎস সুস্থকায়।
সে গাভীর দুগ্ধ ঘৃত আরোগ্য জন্মায়॥

(ক্রমশঃ)

খোষ ও তাহার চিকিৎসা।

ডাঃ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু, বি,এস,সি ; এম্,বি, লিখিত—

এদেশে যতপ্রকার চর্ম্মরোগ দেখা যায় তন্মধ্যে খোষেরই প্রাদুর্ভাব অধিক। বাল্যকালে এই রোগে কষ্ট পান নাই এরূপ লোক অতি অল্পই আছেন। খোষ মারাত্মক না হইলেও অতিশয় কষ্টকর ব্যাধি। খোষ রোগীর নিকট হইতে সকলেই দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন। বাড়ীর একজনের খোষ হইলে সকলেরই আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

খোষ ছোঁয়াচে রোগ ঃ—এই রোগে চর্ম্মের উপর গুটিকা কিম্বা ফোস্কা নির্গত হয় এবং অত্যন্ত চুলকায়। বর্ষা ও শীতকালেই খোষের উপদ্রব অধিক। বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা বালক বালিকারাই খোষে অধিক কষ্ট পাইয়া থাকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে এই রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে ; এই জন্য ধনী অপেক্ষা গরীবের মধ্যেই খোষ অধিক দেখা যায়।

খোষ একপ্রকার কীট, আক্রমণের ফল :—এই কীট মাকড়সা জাতীয় এবং অষ্টপদ বিশিষ্ট। ইহার নাম Acarus Scabei। ইহারা অতিশয় ক্ষুদ্র এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ১/৪০ হইতে ১/৬০ ইঞ্চি। যন্ত্রসহকারে নিরীক্ষণ করিলে ইহাদিগকে অনুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকেও দেখিতে পাওয়া যায়।

কেবল স্ত্রীকীটেই খোষ উৎপন্ন করে। ইহারা চর্ম্মের নীচে গর্ত্ত করিয়া ডিম পাড়ে এবং তাহাতেই ক্ষত হয়। খোষকীট প্রায় ২ মাস জীবিত থাকে এবং এই সময়ের মধ্যে প্রায় ৫০টী ডিম পাড়ে। এই কীট যে স্থানে চর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করে তথায় একটী ফোস্কা হয়। বিশেষ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে একটী সরু রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ রেখা এই ফোস্কার ধার হইতে চর্ম্মের উপর কিছুদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। কীট কোন দিকে গর্ত্ত করিয়াছে এই রেখা দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই রেখার প্রান্তভাগে খোষকীট অবস্থিতি করে। সরু ছুঁচ এই রেখার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে ছুঁচের মুখে খোষকীট নির্গত হইয়া আসে। ইহা দেখিতে অতিশয় ক্ষুদ্র, গোলাকার ও শ্বেতবর্ণ।

খোসরোগীর কিম্বা তাহার ব্যবহৃত বস্ত্রাদির সংস্পর্শে খোষ শরীরের একস্থান হইতে অন্যস্থানে পরিব্যাপ্ত হয়। খোষ চুলকাইলে অনেক সময় কীট নখমধ্যে লাগিয়া যায় এবং পরে অন্যস্থান চুলকাইলে তথায় ক্ষত উৎপন্ন করে।

খোষ রোগীর সংস্পর্শে আসিলে ৪।৫ দিনের মধ্যেই বালক বালিকাদের খোষ হইতে দেখা যায়। দুর্ব্বল ও রুগ্ন বালক বালিকা অপেক্ষা সুস্থ ও সবলেরাই শীঘ্র আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে "রোগের শেষ খোষ" অর্থাৎ নিতান্ত অসুস্থ ব্যক্তির খোষ না হয়; খোষ হইলে বুঝিতে হইবে যে শীঘ্রই রোগ উপশম হইবে।

স্তন্যপায়ী শিশুদের পাছায় এবং উরুতে প্রথমে খোষ দেখা দেয় কারণ ক্রোড়ে লইবার সময় এই সমস্ত স্থানই অন্য লোকের সংস্পর্শে আইসে। অধিক বয়স্ক বালক বালিকাদের হাতের কব্জী ও আঙ্গুলের ফাঁকের মধ্যে খোষের প্রথম প্রাদুর্ভাব হয় পরে ইহা হস্ত ও কনুইএর সম্মুখ ভাগে, বগলে ও পেটে সংক্রামিত হয়। যে যে স্থানের চামড়া পাতলা সেই সেই স্থানেই খোষের প্রকোপ অধিক। অল্পবয়স্ক শিশুর ব্যতীত মুখে ও মাথায় প্রায়ই খোষ হয় না।

খোষের ফোস্কা প্রথমতঃ স্বচ্ছ জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে পরে ইহা পুঁজে পরিণত হয়। অনেক সময় এত অধিক পুঁজ জমে যে সহসা দেখিলে খোষকে ফোড়া বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। ফোড়ার সহিত খোষের পার্থক্য এই যে খোষে পুঁজ কখনও চর্ম্মের নিচের স্তর পর্য্যন্ত পৌছাইতে পারে না। চুলকাইলে বা পরিধেয় বস্ত্রাদির ঘর্ষণে ফোস্কা ছিঁড়িয়া গিয়া ক্ষতে পরিণত হয়। প্রথম হইতেই খোষ অত্যন্ত চুলকাইতে থাকে এবং এই চুলকানির জন্য চতুপার্শ্বস্থ চর্ম্ম লাল হইয়া উঠে এবং অতিশয় বেদনাযুক্ত হয়। শিশুদিগের খোষ হইলে তাহারা খিট্‌খিটে হয় ও অল্পতেই কাঁদিয়া থাকে। খোষের জন্য অনেক সময় জ্বর হইয়া থাকে। খোষ সামান্য ব্যাধি হইলেও তাচ্ছিল্য করা উচিত নহে কারণ অনেক দিন অবধি খোষে কষ্ট পাইলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে পারে।

খোষের প্রতিষেধ ও চিকিৎসা ঃ—নিয়মিত চিকিৎসা হইলে খোষ অতি শীঘ্রই আরোগ্য হয়। খোষের চিকিৎসায় প্রথমেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন নূতন খোষ না হইতে পারে।

প্রত্যহ রোগীর বস্ত্রাদি ও বিছানার চাদর জলে ফুটাইয়া লইলে বস্ত্র সংলিপ্ত সমস্ত খোস কীটই নষ্ট হইয়া যাইবে এবং রোগ বৃদ্ধির আর সম্ভাবনা থাকিবে না। বিছানার তোষক বালিস প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই মোটা চাদর দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে বালিসের ওয়াড় ইত্যাদি আর জলে ফুটাইতে হইবে না কেবল চাদরখানি ফুটাইয়া লইলেই যথেষ্ট হইবে। ২ খানি এরূপ চাদর রাখিলে বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। বস্ত্রাদি প্রত্যহ জলে সিদ্ধ করিয়া লওয়া অনেকের পক্ষে কষ্টকর বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই সামান্য কষ্ট স্বীকার করিলে রোগ শীঘ্রই আরোগ্য হইবে এবং বাড়ির অপর কাহারও অসুখের সম্ভাবনা থাকিবে না।

খোষের জন্য গন্ধকের মলমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ১ ভাগ গন্ধক ও ৩ হইতে ৭ ভাগ পর্য্যন্ত ভেসেলিন মিশ্রিত করিয়া এই মলম প্রস্তত হয়। শিশুদিগের পক্ষে ভেসেলিনের পরিমাণ আরও অধিক হওয়া কর্ত্তব্য। ভেসেলিনের পরিবর্ত্তে নারিকেল তৈলও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

প্রথমে রোগীর ক্ষত গরম জল ও "লিকুইড টার সোপ" দ্বারা উত্তমরূপে পরিস্কৃত করিতে হইবে*। ক্ষতস্থানে অতিশয় বেদনা থাকিলে গরম জলে ২০ মিনিট কাল ক্ষতস্থান ডুবাইয়া রাখিলে যথেষ্ট হইবে। পরে ক্ষতস্থানে উত্তমরূপে মলম ঘসিয়া দিতে হইবে। শরীরের অন্যান্য স্থানেও মলম লাগান কর্ত্তব্য। দিনে দুইবার করিয়া এইরূপ তিন দিন উপর্য্যুপরি মলম লাগাইতে হইবে। এই কয়দিন রোগী স্নান করিতে পাইবে না। চতুর্থ দিনে রোগী উক্ত সাবান সহযোগে উত্তমরূপে স্নান করিয়া ফেলিবে এবং ব্যবহৃত সমস্ত বস্ত্রাদিই পরিত্যাগ করিবে। এই উপায় অবলম্বন করিলে দেখা যাইবে যে ৩ দিনের মধ্যেই সমস্ত খোস আরোগ্য হইয়াছে। শিশুরা যাহাতে চুলকাইতে না পারে তজ্জন্য হস্তদ্বয় ব্যাণ্ডেজ দ্বারা ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

* সাধারণতঃ যে সকল সাবান ব্যবহৃত হয় তাহারা সোডা ক্ষার যোগে প্রস্তুত এবং ইহাদের দ্বারা চর্ম্মের ক্ষতি হয়। কিন্তু "লিকুইড টার সোপ" পটাশ ক্ষার সহযোগে প্রস্তুত বলিয়া চর্ম্মের খাদ্যের কার্য্য করে এবং কোন প্রকার ক্ষতি না করিয়া চর্ম্মকে পরিস্কৃত করে। আরও ইহার সহিত "Izal" "আইজাল" নামক জীবাণু নাশক দ্রব্য মিশ্রিত থাকার জন্য সমস্ত কীট ইত্যাদিকে নষ্ট করে।

বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে উপরিউক্ত চিকিৎসা সুবিধাজনক নহে। তিন দিন কার্য্যকর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া গন্ধকের মলম মাখিয়া বসিয়া থাকা অতিশয় বিরক্তিকর। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে মলম লাগাইয়া প্রাতঃকালে সাবানের দ্বারা ধুইয়া ফেলিলে এ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

নিম্নলিখিত ঔষধ সহজেই গৃহে প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা খোষের পক্ষে অতিশয় উপকারী। একটী মৃত্তিকা পাত্রে সমান ভাগ গন্ধক ও চূণ জলের সহিত আধঘণ্টা কাল ফুটাইতে হইবে। পরে ইহা ঠাণ্ডা হইতে দিলে চূণ ও গন্ধক থিতাইয়া নিচে জমিবে। এখন উপরের জলীয় ভাগ ছাঁকিয়া লইলেই ঔষধ প্রস্তুত হইল। তুলি দ্বারা ইহা লাগাইতে হইবে।

যাঁহারা গন্ধকের গন্ধে আপত্তি করেন তাঁহারা নারিকেল তৈল, কর্পূর ও অল্প পরিমাণ চূণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া লাগাইতে পারেন। এই ঔষধও অতিশয় ফলদায়ক।

নারিকেল তৈলর সহিত কুইনাইন মিশ্রিত করিয়া অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতেও উত্তম ফল পাওয়া যায়।

২।১টী খোস হইলে টিঞ্চার আইওডিন লাগাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহাতে অল্প জ্বালা করিতে পারে।

পুনঃ পুনঃ খোষ হইলে চিরেতা ও নিমের আরক খাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। অনেক সময় দুরারোগ্য খোষ "থাইরয়েড্ গ্লাণ্ড" খাইয়া আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। এই শেষোক্ত ঔষধ কোন বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ভিন্ন ব্যবহার করা উচিত নহে।

খোষ হইতে কখনও কখনও একজেমা হইতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় Zinc oxide বা একজেমার অন্য কোন ঔষধ দিলে উপকার হয়।

খোষের সহিত শরীরের অন্যান্য স্থানে চুলকনা হইলে—চালমুগরা তৈল ২ চন্দন তৈল ১ ও বাদাম তৈল ১৩ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে, চুলকানি এবং খোষ শীঘ্রই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু এই প্রকার রোগে ব্যবহার করিলে চালমুগরা তৈলের দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হয় না।

বিবিধ সংগ্রহ।

ম্যালেরিয়ার অনুসন্ধান ঃ—দিল্লী ও তাহার সন্নিহিত প্রদেশ সমূহে ম্যালেরিয়ার অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে কি না, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য কসৌলীর রিসার্চ্চ ইনিষ্টিটিউটের কাপ্তেন হাসন ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন।

—o—

স্বাস্থ্য বৈঠক—ভারত গবর্মেণ্টের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের অমাত্য সার হার্কোট বটলার "সমগ্র" ভারত-স্বাস্থ্য-বৈঠকের সৃষ্টি করিয়াছেন। গত বর্ষে বোম্বাই নগরে বৈঠক হইয়াছিল। এবর্ষে শীতের প্রারম্ভে মান্দ্রাজে এই বৈঠক বসিবে।

দুগ্ধ ও যক্ষ্মা রোগ—মনুষ্যের ন্যায় গাভীরও যক্ষ্মা রোগ হয়। যাহারা যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধ পান করে, তাহাদের অনেকের শরীরে, দুগ্ধ হইতেই ঐ রোগ সংক্রামিত হয়। বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে ইহা বিশেষ বিপদের কারণ। বড় বড় সহরে যেখানে ভাল জিনিষ পাওয়া কঠিন, সেখানে দুগ্ধকে অন্ততঃ অতি উত্তমরূপে ফুটাইয়া লওয়া উচিত।

স্বাস্থ্য ও সাহিত্য—প্রবীণ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার চুঁচুড়ার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে স্বাস্থ্যের অভাবই সাহিত্যের অবনতির একটী বিশেষ কারণ। "মনে প্রফুল্লতা, হৃদয়ে আনন্দ না থাকিলে, সাহিত্য জন্মে না, বাড়ে না, থাকিতে পারে না। দেহ সুস্থ না হইলে, মনে প্রফুল্লতা, হৃদয়ে আনন্দ থাকে না। সুতরাং দেহ সুস্থ না হইলে সাহিত্য হয় না, দাঁড়ায় না, থাকেনা"

নূতন বীজাণু ঃ—প্রসিদ্ধ বীজাণুবিদ্ অধ্যাপক মেটস্নিকফ্, সম্প্রতি কুকুরের অন্ত্রমধ্যে একপ্রকার উদ্ভিজ্জাণু আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার নাম গ্লাইকোব্যাক্টার (Glyco-bacter) এই উদ্ভিজ্জাণু শ্বেতসার জাতীয় পদার্থকে শর্করায় পরিণত করে। মেটস্নিকফের মতে এই উদ্ভিজ্জাণু দধিবীজাণুর সহিত নিয়মিত খাইলে মনুষ্যকে আর জরাগ্রস্ত হইতে হইবে না। গ্লাইকো ব্যাকটার অন্ত্র মধ্যে শর্করা উৎপাদন করিয়া দধিবীজের কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করে।

সংক্রামক ব্যাধি ঃ—অনেকের ধারণা, বিড়াল কুকুর প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগণের দ্বারা এক পরিবার হইতে অন্য পরিবারে রোগ সংক্রামিত হয়। "ডিপ্থিরিয়া" নামক ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধি বিড়ালের দ্বারা সংক্রামিত হইতে পারে। পল্লীতে সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইলে, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুদিগকে চারিদিকে বিচরণ করিতে দেওয়া বিপজ্জনক। কোন পরিবারে একটী শিশু হঠাৎ মারাত্মক ডিপ্থিরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। এইরূপ কতকগুলি স্থানে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, শিশুর খেলার সঙ্গী কুকুর বিড়াল হইতেই এই রোগ সংক্রামিত হইয়াছে।

তামাকের প্রসার বৃদ্ধি ঃ—বিলাতের "টাইমস্" পত্রে প্রকাশ "বৃটিস্ দ্বীপ পুঞ্জে" "তামাকের ব্যবহার ক্রমশঃই বাড়িতেছে। ১৯১১ সালে মোট ৯৪,৫৯৮,৭৫০ পাউণ্ড ওজনের তামাক ব্যবহৃত হইয়াছে। এই তামাকের মূল্য মোট ১৯,১৬৪, ৮৬৭ পাউণ্ড। "বৃটিস দ্বীপপুঞ্জের" জন সংখ্যা ৪৫,৩১১,০৭৮। হিসাবে প্রত্যেক অধিবাসী গড়ে ২ পাউণ্ডের কিছু বেশী ওজনের তামাক ব্যবহার করিয়াছে। ইহাতে প্রত্যেকের গড়ে বার শিলিং সাড়ে দশ পেন্স খরচ হইয়াছে। শরীরের বিশেষ অপকারক সখের জন্য কত অর্থের অপব্যয় হইতেছে।

উপবাস ঃ—আজকাল আমেরিকায় কতকগুলি লোক পারিশ্রমিক লইয়া উপবাস করিয়া থাকেন। চিকিৎসাবিদ-পণ্ডিতগণ এই সকল লোক নিযুক্ত করিয়া উপবাসের ফলাফল সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরীক্ষা করিতেছেন। সম্প্রতি এইরূপ একব্যক্তি আমেরিকায় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের তত্ত্বাবধানে ৩১ দিন কেবলমাত্র জল পান করিয়া কাটাইয়াছেন। পণ্ডিতগণ প্রত্যহই তাহার রক্ত, মূত্র, ঘর্ম্ম, প্রশ্বাসবায়ু প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়াছেন। এই পরীক্ষার ফলাফল প্রচারিত হইলে, আমরা অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিব।

ম্যালেরিয়া ঃ—গত মাসে দার্জ্জিলিং টাউন হলে গভর্ণমেণ্টের ম্যালেরিয়া অনুসন্ধান সমিতির ডেপুটি স্যানিটারি কমিশনার ফ্রাই সাহেব ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ম্যালেরিয়া বিনাশের জন্য সমস্ত এনোফিলিসই ধ্বংস করিবার আবশ্যক নাই; এনোফিলিস মশকের সংখ্যা কমাইলেই যথেষ্ট হইবে। কারণ মশক সংখ্যা অল্প হইলে, যে হারে নূতন রোগীর সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে তদপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র পুরাতন রোগীগণ আরোগ্য লাভ করিবেন এবং এইরূপে ক্রমশঃ ম্যালেরিয়া আপনি লোপ পাইবে। মশকগণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি হইতেই ম্যালেরিয়া বিষ পাইয়া থাকে তজ্জন্য পুরাতন রোগীর সংখ্যা অল্প হইলে নূতন ব্যক্তিরও আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প হইবে।

মেজর ফ্রাই বলেন যে মশক ধ্বংস করা ব্যতীত রোগী যাহাতে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে সে চেষ্টা করাও বিশেষ আবশ্যক। কুইনাইন ম্যালেরিয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। তিনি বলেন যে যদিও কুইনাইন খাইলে কাহারও কাহারও মাথাধরা ইত্যাদি উপদ্রব ঘটিতে পারে তথাপি রোগ ভোগ করা অপেক্ষা কিছুকালের জন্য মাথাধরার যন্ত্রণা সহ্য করা ভাল। ফ্রাই সাহেবের মতে কোন কোন স্থলে কেবলমাত্র কুইনাইন ব্যবহারেই ম্যালেরিয়া লোপ পাইবে এবং কোথাও বা মশক ধ্বংস করিলেই যথেষ্ট হইবে। পরিশেষে ফ্রাই সাহেব আশা দিয়াছেন যে বঙ্গদেশ হইতে ম্যালেরিয়া নির্ম্মূল হইবে।

সর্দ্দি নিবারণের উপায়ঃ—সর্দ্দি "ছোঁয়াচে" রোগ। জীবাণু হইতেই এই রোগের উৎপত্তি হয়। নাসিকা কিংবা মুখ হইতেই এই সকল জীবাণু বহির্গত হইয়া অন্য শরীরে প্রবেশ করে। ঠাণ্ডা বাতাস, ভিজে পায়ে থাকা বা হঠাৎ ঋতু-পরিবর্ত্তনেতে ঘাড় গলা প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে ব্যাথা হইতে পারে বটে, কিন্তু সর্দ্দি জন্মে না। ইহা আমাদের শরীরকে এইরূপ দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, যাহাতে জীবাণুগুলি সহজেই সর্দ্দি জন্মাইতে পারে। এই জন্য যে সকল ব্যক্তি উত্তরমেরু আবিষ্কার করিতে যান তাঁহারা যে পর্য্যন্ত না সর্দ্দিগ্রস্ত লোকের সংমিশ্রণে আসেন সে পর্য্যন্ত তাঁহারা সর্দ্দি রোগে আক্রান্ত হন না। যে সমস্ত লোকের সর্দ্দি হয় তাহাদিগের নিকটে থাকা উচিত নয় কিংবা তাহারা যে রুমাল, তোয়ালে, বাটি বা গেলাস ব্যবহার করে তাহাও ব্যবহার করা উচিত নয়। সর্দ্দি হইলে নিজের রুমাল ভিন্ন অন্য কোনও স্থানে হাঁচা বা কাশা উচিত নয়। কখনও মেজেতে বা ঘরের কোণেতে থুথু ফেলা উচিত নয়। ইহার দ্বারা সর্দ্দি যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ অপর লোকে সংক্রামিত হইতে পারে। সর্দ্দি হইলে কখনও ইহা অগ্রাহ্য করা উচিত নয়, ইহা হইতে অন্যান্য ভয়ঙ্কর রোগ জন্মিতে পারে। প্রথমে যদি একটু জ্বর বোধ হয় তাহা হইলে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লওয়াই শ্রেয়ঃ। তখন একটা জোলাপ লওয়া বা অন্যান্য পরিবারিক ঔষধাবলীও ব্যবহার করা উচিত। ইহাতে যদি রোগের উপশম না হয় তাহা হইলে ডাক্তার দেখান কর্ত্তব্য।

যদি শরীরকে সুস্থ অবস্থায় রাখা যায় তাহা হইলে সর্দ্দির জীবাণু কিছুই করিতে পারে না। নির্ম্মল বায়ু সেবন করিবে। কখনও ধূলা খাইবে না, নিয়মমত ব্যায়াম করিবে। পুষ্টিকর খাদ্য খাইবে। জিনিষ পত্রে পরিপূর্ণ আবদ্ধ ঘরে অধিকক্ষণ থাকিবে না। মুখ, দন্ত, নাসিকা ও গলার ভিতর দিয়াই সর্দ্দির জীবাণু শরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। অতএব এই সকল স্থান সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার রাখিবে।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্"

প্রথম বর্ষ। } ভাদ্র ১৩১৯ সাল { পঞ্চম সংখ্যা।

অঙ্গ চালনা।

শ্রীঅমূল্য চরণ ঘোষ লিখিত—

ব্যায়াম সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা।

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে দৈহিক বলচর্চ্চার জন্য কোন আয়োজন অথবা কোন বিশেষ উপকরণের আবশ্যক হয় না। কিন্তু সাধারণ লোকের ব্যায়াম সম্বন্ধে প্রায়ই অনেক ভ্রমাত্মক ধারণা থাকে এবং এই ভুল ধারণাগুলি সমূলে উচ্ছিন্ন না হইলে দেশের লোকের শারীরিক উৎকর্ষ সাধনের আশা সুদূর পরাহত।

আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উক্ত অন্তরায় গুলির যথাসাধ্য অবতারণা ও আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

লোকের ধারণা ব্যায়ামের জন্য বিশেষ সরঞ্জামের আবশ্যক যথা— Sandow's Grip Dumb-bells, Devoloper, Sandell Grey এবং আরও

অনেক জিনিষ যাহা ইংরাজ অভ্যুদয়ের আগে অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব ছিল। তাহাদের বদ্ধমূল সংস্কার যে টাকার অযথা সংকার করিয়া ব্যয়সাধ্য যন্ত্রাদি কিনিতে হইবে নতুবা দেহে বলাধান হওয়া অসম্ভব। ব্যায়াম প্রণালীর উপপত্তি (Theory) সম্বন্ধে অজ্ঞতাই সাধারণের এই ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিস্থল।

ব্যায়ামে যন্ত্রাদির যে কোন হিতকারিতা নাই একথা আমরা বলিতেছি না।

ব্যায়ামে উৎসাহ।

যিনি যথাযথ ভাবে যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া শারীরিক উন্নতি সাধন করিয়াছেন তিনি অবশ্যই বলিবেন যে চিত্ত সংযমন ব্যতীত যান্ত্রিক ব্যায়াম ধারাবাহিক রূপে চালান বড়ই কঠিন এবং ক্রমশঃ অতীব বিরক্তিকর হইয়া উঠে। আমাদের বোধ হয় যে এই কারণেই লোকের ব্যায়ামে প্রথম আগ্রহ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসে। এদেশে ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণের অভাব নাই। দিন কতক হুজুক উঠিল ডাম্বেল ভাঁজ, লাঠি খেল, বার এক্সারসাইজ কর—এবং এই হুজুকের আকর্ষণে বালক ও যুবকদিগের উৎসাহের দীপ্তি ক্ষণকাল উজ্জ্বল রহিল। বৎসর গত হইতে না হইতেই সে উদ্দীপনা লুপ্ত হইল নব প্রতিষ্ঠিত ব্যায়ামের আখড়াগুলি একে একে কালগর্ভে বিলীন ও লৌহ নির্ম্মিত ডাম্বেলগুলি অনাদৃত হইয়া ঘরের এককোনে পড়িয়া মলরঞ্জিত হইতে লাগিল। ইহাই বঙ্গ সন্তানদিগের নবাঙ্কুরিত উদ্যমের শোচনীয় পরিণাম।

ইহার কারণ, শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সমস্তই ঐকান্তিক অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। বিদ্যা যেরূপ অনুশীলনের ফল দৈহিক উন্নতি ও তদ্রূপ। এই কথাটী সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইলেই ব্যায়াম সার্থক।

খালি ডাম্বেল হাতে লইয়া হাত নাড়লেই হয় না। যতক্ষণ আমি ডাম্বেল

ব্যায়ামের উপপত্তি। (Theory)

চালনা করিতেছি ততক্ষণ আমার পেশী সমূহ দৃঢ়ভাবে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে এবং যুগপৎ দৃঢ়তা লাভ করিতেছে এই সংস্কার মনে বদ্ধমূল হইলেই শিথিল মুষ্টি স্বতই দৃঢ় হইবে সুতরাং অল্প ব্যায়ামে অধিক ফললাভের সম্ভাবনা। গ্রিপ ডাম্বেলের আবিষ্কর্ত্তা দেখিলেন যে সাধারণ ডাম্বেলে ব্যায়াম করিতে গেলে মুষ্টির দৃঢ়তা সমভাবে থাকে না এবং

কিয়ৎকাল পরেই শিথিল হইয়া যায় সুতরাং ব্যায়ামের ফল আশানুযায়ী হয় না। তাঁহার মনে হইল ডাম্বেলটীকে লম্বালম্বিভাবে কাটিয়া মধ্যস্থলে কয়েকটী স্প্রিং লাগাইলে ব্যায়ামকারীর স্বতই ডাম্বেলটীকে চাপিয়া রাখিতে ইচ্ছা হইবে সুতরাং ব্যায়ামের দিকে মনঃসংযমন বেশী হইবে এবং এইরূপে একাগ্রতা বৃদ্ধি হইলেই শীঘ্র ফললাভ হইবে। তাঁহার এই সামান্য আবিষ্কারটীর সুফলও ফলিল কারণ অল্প দিনের মধ্যেই স্যাণ্ডোর গ্রিপ ডাম্বেল অধিকাংশ ব্যায়ামকারী আদর্শরূপে গ্রহণ করিলেন। বিশেষ উদাহরণের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত বিশদীকৃত করা যাইতে পারে। যথা—কামার হাতুড়ি পিটে। এই ব্যায়ামে তাহার শরীর সাধারণ লোক অপেক্ষা পরিপুষ্ট। আর এক ব্যক্তি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিয়া থাকে এবং তাহার দেহ কামার অপেক্ষা অধিক পেশল ও বলিষ্ঠ। অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল যে ব্যায়ামকারী প্রতিদিন নিয়মিতভাবে একদণ্ডকাল ব্যায়াম করে। পক্ষান্তরে কামার সূর্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন হাতুড়ি পিটিয়া থাকে। তাহা হইলে কামারের দৈহিক পুষ্টির ন্যূনতা কেন? হেতু এই যে তাহার মন নিজের কাজের পারিপাট্যের দিকে, সে ব্যায়াম করিব বলিয়া হাতুড়ি পিটে না সুতরাং ব্যায়ামের দিকে মন আকৃষ্ট না হইয়া কাজের উপরেই কেন্দ্রীভূত হয়। কিন্তু ব্যায়ামকারীর দেহে বল সঞ্চয় করিবার উদ্দেশ্যই সাধনা এবং সেই সাধনার একনিষ্ঠতার জন্যই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি।

ব্যায়ামের পরিমাণ।

সাধারণতঃ লোকে মনে করে যে ব্যায়ামের গুরুত্বের অনুপাতে শরীর পুষ্ট হয়। ইহা কতকাংশে সত্য, সাবধানে ব্যায়ামের ক্রমিক বৃদ্ধি করিলে সুফল লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু ইহার একটা সীমা আছে, সেই সীমা লঙ্ঘনের ফলে দেহক্ষয় অনিবার্য্য। ব্যায়ামের স্থিতি কাল ক্রমশঃ বাড়াইতে বাড়াইতে এমন একটা অবস্থা আসে যে সে সময় আর বৃদ্ধি করিলে স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। ব্যায়ামের সময় শরীরের মাংসপেশীর তন্তু সমূহ ক্ষয়িত হইতে থাকে, এবং বিরাম কালে ঐ ক্ষয়ের আবার পূরণ হয়। শরীর তত্ত্বের একটী প্রধান নিয়ম এই যে ক্ষয় হইলেই তাহার পূরণ অভাব অপেক্ষা কিছু অধিক হইয়া থাকে। সুতরাং পূরণ কিছু উদ্বৃত্ত হয় অর্থাৎ শরীর পুষ্ট হয়। কিন্তু যদি ব্যায়ামের মাত্রা অধিক হয় তাহা হইলে পূরণের দ্বারা

সমীকৃত না হইয়া ক্ষয় কিছু বেশী থাকিতে পারে অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে শরীর ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা। গুরু ব্যায়ামের ফলে Foot-ball players এবং Trapeze acrobatsদের মধ্যে অনেকেরই দেহ যথোচিত পুষ্টিলাভ করিবার অবসর পায় না এবং ইহাদের মধ্যে "ব্যূঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু-মহাভুজ" পুরুষ অত্যন্ত বিরল। উক্ত প্রত্যেক খেলাই অতীব শ্রমসাধ্য এবং অনেক সময় শরীরের গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে।

ব্যায়ামকালে শরীরস্থ যাবতীয় পেশী যাহাতে সঞ্চালিত হইতে পারে সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত। কারণ তাহা হইলে প্রত্যেক পেশী স্বতন্ত্র ভাবে অনুশীলিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি আনয়ন করিবে। যাহারা কেবল মুগুর ভাঁজিয়া থাকেন তাহাদের শরীরের নিম্নভাগস্থ পেশী সমূহ একেবারেই পরিপুষ্ট হয় না। এইরূপ ব্যায়ামে সকল অঙ্গ সমভাবে পরিপুষ্ট না হইয়া সৌষ্ঠবের হানি করে।

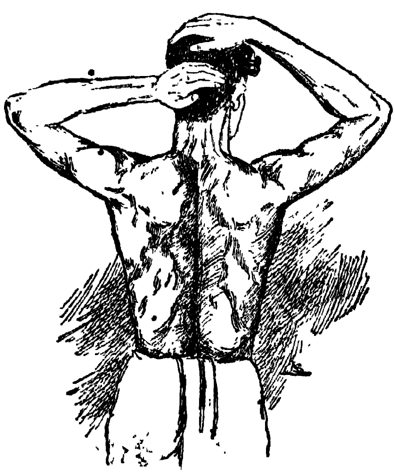
ইউজেন স্যাণ্ডো উদ্ভাবিত ডাম্বেল ব্যায়াম প্রণালী এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট। ইহার প্রণালী অনুসারে প্রত্যেক ব্যায়াম করিলে প্রত্যেক সময়ে বিভিন্ন পেশী মণ্ডল সঞ্চালিত হয়। দেশীয় কুস্তি ও বৈঠক অথবা দূরভ্রমণ সুস্থ ও সবল অধিকারীর পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট। ইহাদিগের কথা বারান্তরে আলোচিত হইবে।

যান্ত্রিক ব্যায়াম সম্বন্ধে যেরূপ উক্ত Theory সত্য শুধু অঙ্গ চালনা সম্বন্ধেও উহা তদ্রূপ। প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে কতরূপ বিভিন্ন সঞ্চালন হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। সামান্য চেষ্টা করিলে প্রত্যেক সঞ্চালন বিধিমতে অনুশীলিত করিয়া ব্যায়ামের তুল্য ফললাভ করা যাইতে পারে এবং এই ব্যায়ামের জন্য কোনও সরঞ্জাম অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের আবশ্যক হয় না। তৈলমর্দ্দন ও স্নানের সময় গাত্র মার্জ্জন এই দুই প্রক্রিয়াতে ইচ্ছা করিলে প্রায় সমস্ত পেশীগুলিই পরিচালিত করা যায়। দুঃখের বিষয় এদেশে চাকরের দ্বারা অনেকে তৈলাভ্যঙ্গ কার্য্য করাইয়া লন এবং স্নানে গা রগড়াইবার জন্যও চাকরের সাহায্য লইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য ইহা শ্রমবিমুখতা ও পরমুখপ্রেক্ষিতার প্রকৃত উদাহরণ, কারণ এই দুই কার্য্যের মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব নাই যাহাতে বিষম পরিশ্রম হয় অথবা

দৈনন্দিন কার্য্য ও ব্যায়াম।

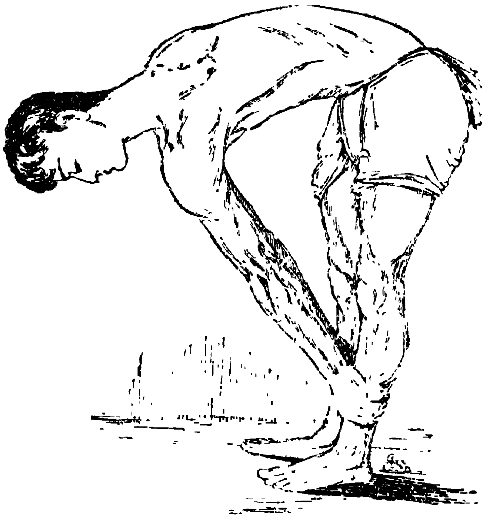
গায়ে বেদনা হয়। আমরা আরও কতিপয় দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, সাধারণ দৈনন্দিন কার্য্যে প্রত্যেক শারীরিক সঞ্চালনের কি করিয়া সদ্ব্যবহার করা যায়। নিম্নে অঙ্কিত চিত্রাবলীতে পাঠকগণ তাহার আভাস পাইবেন। ১ নং, ২ নং, ও ৩নং চিত্রে তৈল মর্দ্দন ও স্নানের সময়কার বিভিন্ন প্রকারের অঙ্গচালনা দেখান হইয়াছে। ৪নং ছবিতে বাটনা বাটা দেখান হইয়াছে।

পাঠকগণ পড়িয়া হাসিতে পারেন কিন্তু আমরা বলিতেছি ভোজনের সময়ও ইচ্ছা করিলে ব্যায়াম করা যাইতে পারে। যথা—আহার মুখে চর্ব্বণ করিবার সময় আমার চোয়ালের পেশী সমূহ চালিত হইতেছে, এই মনে করিয়া ভোজন করিলে ভোজনের প্রবৃত্তি হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখের পেশীমণ্ডলের ব্যায়ামও হইতে পারে। স্থূলতার জন্য যাহাদের চিবুকের মাংস লোলিত ও বলিযুক্ত হয় তাহাদের পক্ষে বাস্তবিকই এ ব্যায়াম উপকারী।



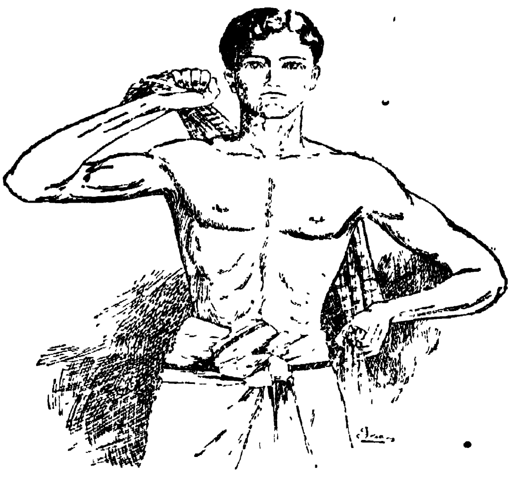
১ নং চিত্র—মস্তকে তৈল মর্দ্দন—

ঘাড়ের বাহুদ্বয়ের ও কিয়ৎপরিমাণে বক্ষস্থলের পেশীসমূহের সঞ্চালন হয়।



২ নং চিত্র—পদদ্বয়ে তৈল মর্দ্দন—

পৃষ্ঠদেশের, উদরের, পদদ্বয়ের ও হস্তের পেশীসমূহের সঞ্চালন হয়।



৩ নং চিত্র—গাত্র মার্জ্জনা—

বক্ষের, পৃষ্ঠের ও বাহুর পেশীসমূহের আকুঞ্চন ও প্রসারণ হয়।



৪ নং ছবি—বাটনা বাটা—
ইহাতে প্রায় শরীরস্থ সমস্ত পেশীই সঞ্চালিত হয়।

অনেকেই অনুযোগ করিয়া থাকেন যে দেশের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় মহিলাগণের ব্যায়ামের কোনই ব্যবস্থা নাই অথবা ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা হয় যে, ব্যবস্থা মহিলাগণের হস্তেই সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত আছে এবং ব্যায়াম করা অথবা না করা কেবল তাঁহাদের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিতেছে।

রমণী সমাজের এক প্রধান অঙ্গ, সুতরাং রমণীর শারীরিক ও তদানুসঙ্গিক মানসিক অবনতি ঘটিলে সমাজের পক্ষাঘাত অনতি দূরে। ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ও সামাজিক উন্নতি, উভয়ের জন্যই সকলের কায়মনোবাক্যে মহিলাগণের স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত। আরও স্ত্রী ক্ষীণা ও অসম্যক্ পরিপুষ্টা হইলে তাঁহার রোগপ্রবণতা স্বাভাবিক। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন চিররুগ্না স্ত্রী সংসারে কিরূপ যন্ত্রণা উদ্বেগ ও অর্থব্যয় আনয়ন করেন। সন্তান সন্ততিও অপুষ্ট অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া শীঘ্রই জননীর ধাতুগত বৈকল্যের জন্য রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে শিশুলীলা সম্বরণ করে। এই শোকাবহ পরিণাম দেখিয়া কে না বিচলিত হয়?

প্রশ্ন উঠিতে পারে তাঁহারা কিরূপে ব্যায়াম করিবেন, তাঁহাদের সময় কোথা? আমাদের উত্তর এই যে তাঁহারা পূর্ব্বপ্রকরণোক্ত দৈনন্দিন কার্য্য সমূহকে ইচ্ছা করিলেই

ব্যায়ামে পরিণত করিতে পারেন; সুতরাং ব্যায়ামের জন্য নির্দ্ধারিত সময়েরও প্রয়োজন হয় না। কেহই অবিদিত নহেন যে আমাদের দেশে গৃহকর্ম্ম অধিকাংশ পুরস্ত্রীগণের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহকর্ম্ম করিবার সময় তাঁহারা যদি অঙ্গচালনার দিকে সামান্য মনোযোগও দেন তাহা হইলেই যথেষ্ট। শারীরিক সৌন্দর্য্য ঈশ্বরদত্ত ভূষণ হইলেও উহার উৎকর্ষ মানব বিজ্ঞানের কতকটা সাধ্যায়ত্ত। Massage Streching exercises এবং Clisthenics প্রভৃতি পাশ্চাত্য লঘুব্যায়াম প্রণালী মহিলাগণের অঙ্গ সৌষ্ঠব বৃদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে এবং করিতেছে। মুখের লাবণ্য বিশেষ বৃদ্ধি না হইলেও এ প্রকার বিজ্ঞানসম্মত ব্যায়ামে শারীরিক সৌষ্ঠব অর্থাৎ Symmetry অনেকটা বাড়াইতে পারে এবং সেজন্য মুখের অশোভনতা বহু পরিমাণে আচ্ছাদিত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য আমাদের আলোচ্য দৈনন্দিন গৃহকর্ম্মে ব্যায়াম এবং উল্লিখিত পাশ্চাত্য ব্যায়াম উভয়েরই ফল এক এবং উপপত্তি অভিন্ন। তবে দেশভেদে আচারের বিভিন্নতা। আমাদের দেশের চিরন্তন প্রথা অনুসারে গৃহকর্ম্ম পুরস্ত্রীর দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয় আর পাশ্চাত্যে তাহা পরিচারক ও পরিচারিকা দিগেরই উপচিকীর্ষার উপর নির্ভর করে। এজন্য যুবতী মহিলাগণ Out door ব্যায়ামের যথেষ্ট সময় পান পক্ষান্তরে আমাদের কুলাঙ্গনা দিগের সময়ের অভাবের জন্য প্রাত্যহিক গৃহকর্ম্মগুলিই ব্যায়ামে পরিণত না করিলে উপায় নাই।

দরিদ্রের ঘরে মহিলাদিগের পরিশ্রম অত্যধিক একথা কঠোর সত্য। কিন্তু যখন তাঁহাদিগের পরিশ্রম করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই, তখন তাঁহারা ব্যায়াম করিতেছি ভাবিয়া গৃহের কাজে ব্যাপৃত হইলে পরিশ্রমের বিভীষিকা অনেক অন্তর্হিত হইবে এবং মানসিক অবসাদ বিদূরিত হইয়া স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রফুল্লতা আসিবে।

ধনিগৃহে ইহার বিপরীত। গৃহকার্য্যে পরিশ্রমের স্বল্পতা অথবা সম্পূর্ণ রাহিত্যবশতঃ কুলাঙ্গনাদিগের ব্যায়ামের যথেষ্ট অবসর থাকে। আভিজাত্যের বৃথা মানের জন্য রন্ধনাদি গৃহকার্য্যের উপর তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই বিজাতীয় ঘৃণা থাকে। আত্মাভিমান ও আত্মমর্য্যাদা এ উভয়ের পার্থক্য উপলব্ধি না হইলে মনের এ সঙ্কীর্ণতা দূর হইবার নহে।

যাঁহারা গৃহকার্য্যে শ্রমবিমুখ তাঁহারা নিজেদের সুদীর্ঘ অবসরটুকু সমস্তই পরচর্চ্চা, বটতলার পুস্তক পাঠ, দিবানিদ্রা অথবা কেশপ্রসাধনে ব্যয় না করিয়া কতক ছাদের উপর উন্মুক্ত বায়ুতে পদচারণা কতক বা গৃহসংলগ্ন উদ্যানে বৃক্ষে জল সেচনাদি কার্য্যে সময়ক্ষেপ করিলে শরীরের অনেক উন্নতি হয়। পরিতাপের বিষয় নিশ্চিন্তভাবে সুনিদ্রা এবং শ্রমাভাব এই দুই কারণে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শীঘ্র আয়তনে আশ্চর্য্যরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন এবং স্থূলতার চরম অবস্থায় উপনীত হইয়া চিরজীবনের মত জড়ত্ব প্রাপ্ত হন।

মহিলাগণ নিজ কন্যা সন্তানদিগকে বাল্যাবস্থা হইতেই শারীরিক উন্নতি বিধান বিষয়ে শিক্ষা দিলে পরিণত বয়সে তাহারা সুস্থ ও সবল পুত্র কন্যার জননী হইতে পারে এবং বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেও স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে পারে। যে গৃহকর্ত্রী আপনার সংসার সুস্থ, সবল, নিরাময় পুত্র কন্যাগণে পরিবৃত দেখিতে চাহেন তাঁহার নিজ স্বাস্থ্য ও সন্তানসন্ততির ভাবী জননী কন্যাগণের স্বাস্থ্য, উভয়েরই উন্নতির জন্য কায়মনো-বাক্যে চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

কোষ্ঠবদ্ধতা।

ডাক্তার শ্রীব্রজগোপাল চট্টোপাধ্যায়, এল, এম্, এস, লিখিত—

বোধহয় অনেকেই জানেন, যে কোষ্ঠ বদ্ধতা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হানিকারক। যাঁহাদিগের দৈনিক কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, তাঁহারা সহজে অনেক রোগের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। প্রায়ই দেখা যায় কোষ্ঠ বদ্ধতার নিমিত্ত অনেকে নিয়মিত রূপে নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু অনেক সময় ঔষধে বিশেষ কোন ফল হয় না। স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়ম গুলির ব্যতিক্রমে কিরূপে এই রোগ উৎপন্ন হয় এবং তন্নিবারণার্থ অযথা ঔষধ সেবন না করিয়া স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপালনে কিরূপে উহাকে দমন করিতে পারা যায় তৎসম্বন্ধে সকলের কিছু জানিয়া রাখা উচিত।

সকলেই জানেন আমরা যাহা কিছু আহার করি সমস্ত গলনালী দিয়া পাকস্থলীতে যায় এবং তথায় ভুক্তদ্রব্য হজম হয়, এই হজম ক্রিয়া মলনালীরও কতক অংশে হইয়া থাকে। ভুক্তদ্রব্য হজম হইবার সময় উহা একরকম কর্দ্দমের মত পদার্থ হইয়া যায়; উহার সারভাগ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রক্তমাংস ইত্যাদি রূপে পরিণত হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে, এবং বাকি অংশ মল মূত্রাদি রূপে শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়! মলনালী একটী রবারের নলের ন্যায় পেটের মধ্যে জড়াইয়া পাকাইয়া আছে, ইহা প্রায় ১৬।১৭ হাত লম্বা।

সাধারণতঃ মলনালীর অভ্যন্তরস্থ স্নায়বিক উত্তেজনায় এবং উহার মাংসপেশীর সংকোচ ক্রিয়াদ্বারা মলসঞ্চালনা হইয়া থাকে। মলত্যাগের সময় শরীরের অন্যান্য মাংসপেশীর সাহায্য দরকার হয়। যে স্নায়বিক উত্তেজনার কথা বলা হইল, যকৃৎ নিঃসৃত পিত্তরস ও মলনালী নিঃসৃত অন্যান্য রস দ্বারা ঐ কার্য্য সাধিত হয় এবং মলনালীও ঐ কার্য্যের সহায়তা করে। ভুক্তদ্রব্য সমস্তই সমানভাবে হজম হয় না কতক অংশ অর্দ্ধজীর্ণ বা অজীর্ণ অবস্থায় মলের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে; এবং তদ্দ্বারাই স্নায়বিক উত্তেজনা গুণে মল সঞ্চালনা হইয়া থাকে।

এখন বুঝিতে পারিবেন, শরীরে কোনরূপ রোগ না থাকিলেও কেবল খাদ্যদ্রব্যের দোষে কোষ্ঠ বদ্ধতা হইতে পারে, প্রকৃত পক্ষে খাদ্য দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখা কোষ্ঠবদ্ধতার একটী প্রধান কারণ। বলা বাহুল্য খাদ্য বিচার এই রোগের একটী মহৌষধ। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে এমন জিনিষ থাকা দরকার যাহা সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হইয়া যাইবেনা, অর্দ্ধজীর্ণাবস্থায় মলের সহিত মলনালীতে থাকিবে, তাহা না হইলে মল সঞ্চালনের সুবিধা হইবে না আজকাল ভদ্রসম্প্রদায়ের মধ্যে ও অল্প বয়স্ক যুবকদিগের মধ্যেও দেখা যায়, তাঁহারা যে সকল জিনিষ অতি সহজে জীর্ণ হইতে পারে সেই সমস্ত খাইতে ভালবাসেন। ঝোল পাইলে অনেকে ডাল খাইতে চাহেন না; এমন কি ডাল খাইতে হইলে, দানাগুলি সমস্ত বেশ করিয়া ছাঁকিয়া ফেলিয়া জলটুকু খাইয়া তৃপ্তিলাভ করেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন যে ডাল সহজে হজম হয় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাহা কিছু খাওয়া যায় সমস্তই সম্পূর্ণরূপে হজম হওয়ার প্রয়োজন নাই, শুধু তাহা নহে, সেরূপ না খাওয়াই উচিত

কারণ তাহা হইতে গেলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়ার একটী প্রধান প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত হইবে। আমাদিগের প্রধান খাদ্য ভাত, ডাল, তরকারী ও মৎস্য। ইহার মধ্যে ডাল ও তরকারী এই উভয়বিধ দ্রব্যই কতকঅংশে অজীর্ণ বা অর্দ্ধজীর্ণ অবস্থায় পাকস্থলী অতিক্রম করিয়া মলনালীতে যায় এবং মলের সহিত থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া গুণে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে। অতএব খাদ্যদ্রব্যের অব্যবস্থায় কোষ্ঠ বদ্ধতা হইলে এই উভয়বিধ খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে আহার করা উচিত। শাকসবজী প্রভৃতি সর্ব্ববিধ তরকারী এবং পাকা ফল মূল ইত্যাদি দৈনিক খাদ্যের মধ্যে ব্যবস্থা করিলে কোষ্ঠ বদ্ধতার বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বোতল বোতল ঔষধ সেবন না করিয়া কেবলমাত্র আহারের সুব্যবস্থা করিয়া এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

এই স্থানে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, যে কোন কাজেরই প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া ভাল নয়। খাদ্য দ্রব্যের এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যে তাহার মধ্যে কিছু কিছু অসম্পূর্ণ জীর্ণাবস্থায় মলনালীতে প্রবেশ করিয়া মলের সহিত থাকিয়া স্নায়বিক উত্তেজিকা ক্রিয়া দ্বারা মল সঞ্চালনের সহায়তা করিবে, কিন্তু তাই বলিয়া ঐরূপ দ্রব্যের আধিক্য না হইয়া যায় তাহা হইলে স্নায়বিক উত্তেজনার শক্তির অতিরিক্ত ক্রিয়া হইতে ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিবে।

নিয়মিত রূপে জল পান না করিলেও কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ উৎপন্ন হয়। ইহার কারণ জলের পরিমাণ কম হইলে মল কঠিন হইয়া যায় এবং মলনালীতে যথা রীতি রস নিঃসৃত হয় না। এই কারণে যদি শরীরের জলীয় অংশ অযথা ঘর্ম্মাকারে বা মূত্রাকারে নির্গত হইয়া যায় তাহা হইলে কোষ্ঠবদ্ধতা আইসে। অনেকের অল্প পরিশ্রমে অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়, তাঁহারা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করিলে এই রোগে আক্রান্ত হন। অতএব এই রোগে যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করা উচিত। প্রাতে বিছানা হইতে উঠিয়া, রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে এবং আহারের আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে পূর্ণ মাত্রায় জল পান বিধেয়। আহারের পূর্ব্বে গরম জল পান করিলে ভাল হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মলনালীর সঙ্কোচন ক্রিয়া দ্বারা মল সঞ্চালন হইয়া থাকে এবং মলনালী নিঃসৃত কতকগুলি রস ও স্নায়বিক উত্তেজনা

শক্তিতে ঐ কার্য্যের সহায়তা করে। যে কোন কারণে এই কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মিলে কোষ্ঠ বদ্ধতা উৎপন্ন হয়। মলনালীর নানারূপ পীড়া বশতঃ, কিম্বা কোন কঠিন দ্রব্য মলনালীতে আবদ্ধ হইলে ঐরূপ ব্যাঘাত জন্মায়, মলরাশি কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইলেও সঙ্কোচন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটায়। কোষ্ঠবদ্ধতার অপরাপর কারণ সমূহের মধ্যে দুই একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। যথা, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, নিয়মিত সময়ে মলত্যাগ না করা, অথবা জোলাপের ঔষধ ব্যবহার করা।

যেমন সমস্ত কার্য্যেরই নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে সেইরূপ মলত্যাগেরও নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা উচিত এবং মলত্যাগের বেগ হউক আর নাই হউক যথাসময়ে উহার জন্য চেষ্টা করা চাই। এ বিষয়টী অনেকেই বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিক লজ্জা বশতঃ একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন।

মানসিক বিকার হইতেও কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। একটী লোক মলত্যাগ করিতে পায়খানায় গিয়া সেখানে সাপ দেখিয়া পালাইয়া আসে, তাহার পর ৭ দিন তাহার কোষ্ঠ বদ্ধ ছিল।

ফলকথা কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারণের নিমিত্ত আহার্য্য দ্রব্য বিচার দ্বারা ব্যবহার করিয়া না দেখিয়া একেবারে ঔষধ সেবনের জন্য ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। এই সম্বন্ধে আর একটী বিষয়ের প্রতি সকলের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। শারীরিক পরিশ্রম (ব্যায়াম ইত্যাদি) স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এবং ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার বিশেষ সহায়তা করে। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ লোকেই এ বিষয়ে অমনোযোগী থাকেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১২।১৪ ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রম করিতে বোধ হয়, চৌদ্দ আনা লোককে বাধ্য হইতে হয়, কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম করিবার সময় অনেকেই পান না। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের স্বাস্থ্য-সমাচার পত্রিকার সুবিজ্ঞ ডাক্তার কার্ত্তিক চন্দ্র বসু এম, বি, মহাশয়ের লিখিত প্রাণায়াম নামক প্রবন্ধ এই পত্রিকার পাঠকগণ সকলেই পাঠ করিয়াছেন। প্রাণায়াম স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। অনেকের বিশ্বাস এই ক্রিয়াটী একটী ধর্ম্মোন্নতির সোপান, শরীর রক্ষার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই; কিন্তু ইহা একটী ভ্রম। ধর্ম্ম প্রাণ হিন্দুগণ স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত যে সকল নিয়ম পালনীয়, তৎসমুদয়ই ধর্ম্মের সহিত

সুদৃঢ়রূপে সংলিপ্ত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু হায়! আমাদের ধর্ম্ম কোথায়! আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আমরা ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছি এবং তৎসঙ্গে স্বাস্থ্যও হারাইয়াছি। গতস্য শোচনা নাস্তি। হে আর্য্য সন্তানগণ, আপনাদিগের নিকট সানুনয় প্রার্থনা এখনও ধর্ম্মে মতি দিন, পরলোকগত পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রথাবলম্বন করুন, সনাতন হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী যথাসাধ্য ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানের চেষ্টা করুন দেখিবেন অনেক রোগের হাত হইতে অনায়াসে অব্যাহতি পাইবেন; দেশের অকাল মৃত্যুর সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস হইবে। প্রাণায়ামের কথা বলিতে গিয়া ধর্ম্মের কথা আনিয়া ফেলিলাম আশাকরি পাঠক পাঠিকাগণ অসংলগ্ন কথা বোধ করিয়া বিরক্ত হইবেন না।

প্রাণায়াম একটী শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্য, ইহাতে শ্বাস যন্ত্রাদির এবং তৎসম্বন্ধীয় অপরাপর মাংসপেশীর বিশেষ ক্রিয়া হইয়া থাকে। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার যথেষ্ট সহায়তা করে।

পরিশেষে বক্তব্য, যাঁহারা কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে ভুগিতেছেন তাঁহাদিগকে এই কয়েকটী কথার বিষয় মনে রাখিতে হইবে। আহার, জলপান, শারীরিক পরিশ্রম, ব্যায়াম ইত্যাদি; স্বাভাবিক বেগ রোধ না কর, নির্দ্দিষ্ট সময়ে এ কার্য্য সম্পন্ন করা। এ সকলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল ঔষধ সেবন করিলে অভিলষিত ফল পাইবে না।

শাস্ত্রীয় স্বাস্থ্য কথা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবতারণ বিদ্যারত্ন লিখিত—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দণ্ড ধারণ।

হস্তে দণ্ড ধরি সবে করিবে গমন।
পদের স্খলনে ভূমে না হবে পতন॥
শত্রু কিম্বা হিংস্র জন্তুর ভয় নাহি রবে।
দেহ বল আর আয়ু সতত বাড়িবে॥

চরক।

শরীর পালন দৃষ্টান্ত।

যেমন নগর পতি অতি শুদ্ধ মনে।
পালয়ে নগর নিজ অতি সুযতনে॥
বহু প্রাণি সমাকুল বহু বিড়ম্বন।
ঘটিতে না দেয় অন্য অশুভ ঘটন॥
যাহাতে সর্ব্বদা সুখ বিরাজে নগরে।
বিচারিয়া সেইমত নিত্য চেষ্টা করে॥
দৈবাৎ যদ্যপি ঘটে দৈব বিড়ম্বন।
যথাশক্তি প্রতীকার করয়ে তখন॥
যাহাতে বিপত্তি আর না ঘটে নগরে।
সেইরূপ সুব্যবস্থা করেন সত্বরে॥
অলস ত্যজিয়া সদা নীতিজ্ঞান বলে।
প্রজাগণ পালে নিত্য কভু নাহি টলে।
দেশ কাল আর পাত্র করিয়া বিচার।
সমূলে করয়ে রাজা বিপত্তি সংহার॥
রাজার প্রচুর ধনে আর বহু শ্রমে।
নগরের সুখ বৃদ্ধি হয় দিনে দিনে॥
সেইমত নিজ দেহ পালিবে সতত।
কতবিধ সুখে সুখী হবে অবিরত॥
নীরোগ করিবে দেহ শাস্ত্র যুক্তি ধরি।
সদা সুখী হবে স্বাস্থ্য সুধা স্বাদ করি॥
আরোগ্য সুখের সম সুখ নাহি হয়।
অলস ত্যজিয়া তাহা পালিবে নিশ্চয়॥
সামান্য সুখের লাগি স্বাস্থ্য সুখসার।
কদাচ না হারাইবে এই সুবিচার॥

অধ্যয়ন বিধি।

সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে প্রত্যহ উঠিবে।
শৌচ আদি করে সবে বিশুদ্ধ হইবে॥
বিশুদ্ধ হইলে দেহ সুস্থ হয় মন।
মন সুস্থ হলে হয় সুখে অধ্যয়ন॥
এই হেতু প্রতিদিন চিত্ত স্থির করি।
পড়িতে বসিবে নিত্য স্মরিয়া শ্রীহরি॥

আর ভারতীর পদে করিয়া প্রণতি।
পাঠ আরম্ভিবে সুখে পাঠক সুমতি ॥
তথায় বসিয়া সুখে পড়িবে সকলে।
যথায় আলোক আর সুখ বায়ু মিলে ॥
অতি স্পষ্ট স্বরে সবে করিবে পঠন।
প্রত্যেক শব্দের অর্থ করিয়া চিন্তন॥
স্বর আর ব্যঞ্জনের উচ্চারণ বিধি।
শিখিবেক অতিযত্নে সবে নিরবধি ॥
যতক্ষণ ভালরূপে পড়া নাহি হয়।
ততক্ষণ দৃঢ়মনে পড়িবে নিশ্চয় ॥
আজিকার পড়া কাল করিব বলিয়া।
কভু না রাখিয়া দিবে অলস করিয়া ॥
জ্ঞানদাতা সুশিক্ষক আর গুরুজন।
প্রণমি কহিবে পরে বিনয় বচন ॥
পাঠ কালে হস্তপদ সংযত করিবে।
অসভ্য জনের মত কভু না বসিবে ॥
শিক্ষক দেখিবা মাত্র করিবে প্রণাম।
সাক্ষাতে থাকিয়া কভু না করিবে নাম

স্মৃত্যাদি

ঋতু বর্ণন।

উত্তর অয়ন।

বারমাসে সংবৎসর শাস্ত্রের কথন।
দুইমাসে ঋতু, তিন ঋতুতে অয়ন ॥
সূর্য্যের উত্তরা গতি উত্তর অয়ন।
তাহা পৌষ আদি ছয় মাসের গণন ॥
শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম ঋতু তিন তাহে।
পৌষ মাঘ দুইমাস শীত ঋতু কহে ॥
ফাল্গুন চৈত্রিক মাস ঋতুতে বসন্ত।
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠিক গ্রীষ্ম ঋতুর সিদ্ধান্ত ॥
এইকালে রুক্ষবায়ু প্রবাহিত হয়।
তাহে খর সূর্য্যতেজে ধরণী শুকায় ॥
রস লইবার তরে কর বাড়াইয়া।
আদান করয়ে রস ধরা পরশিয়া ॥
রসের আদান হয় যে হেতু একালে।
এজন্য আদান নাম কহয়ে সকলে ॥
তরু গুল্ম আদি সব শুকায় সতত।
আগ্নেয় এজন্য নাম ইঁহার সঙ্গত ॥
তীক্ষ্ণ রবি রুক্ষ বায়ু আর রৌক্ষ্য ভাব।
ঘটায় তিক্তক-কটু-কষায়-প্রভাব ॥
তিক্তরস বাড়ে শীতে বসন্তে কটুক।
গ্রীষ্মেতে কষায় বাড়ে নৃ-বল নাশক ॥
শীতে নর পূর্ণ বল ক্রমে ক্ষীণ হয়।
বসন্তে মধ্যম বল গ্রীষ্মে বল ক্ষয় ॥

চরক।

শিশির ঋতুস্বভাব।

আইল শিশির ঋতু দিব্যমূর্ত্তি ধরি।
দেখি দেহ-ধারী কাঁপে থরথর করি ॥
নাম সুশীতল কিন্তু প্রচণ্ড প্রতাপ।
আগমন মাত্রে নাশে দিবাকর তাপ ॥

হইয়া প্রতাপ হীন শীতে কম্পমান।
সবিতা ব্যাকুল চিত্তে অগ্নিকোণে যান ॥
নলিনী মলিন হয় প্রিয়জন দুখে।
তাই রহে জলে ডুবি মনের অসুখে ॥
শীত ভয়ে সঙ্কুচিত দিবার আকার।
শীতকালে দেহ শুষ্ক হয় সবাকার ॥
সন্ততির অতি দুখে হইয়া দুখিনী।
শোকেতে বিদীর্ণ হয় ধরণী জননী ॥
ধরণীর দুঃখ হেরি নক্ষত্র সকল।
শিশিরের ছলে ত্যজে নয়নের জল ॥
শীর্ণ দেহে স্থির রহে বন উপবন।
আর নিত্য বহে শীত সুরুক্ষ পবন ॥
হস্ত পদ আর ওষ্ঠ ফাটে মানবের।
শোভা হীন হয় নিত্য মানব দেহের ॥
উষ্ণদ্রব্য আর অগ্নি অতি প্রিয় হয়।
শিশির ঋতুর ভাব এই সুনিশ্চয় ॥

বিবিধ গ্রন্থ।

শীত চর্য্যা।

যথা কুম্ভের পয়ন প্রলেপ শীতলে।
তাপের সংরোধে মধ্যে অগ্নি দৃঢ় জ্বলে ॥
বাহ্য দেহ শৈত্য যোগে তেমতি শিশিরে।
বদ্ধতাপে তীব্র অগ্নি জ্বলয়ে জঠরে ॥
তাই যাহা খায় তাহা সুখে জীর্ণ হয়।
ভালরূপে না খাইলে শরীর শুকায় ॥
একে রুক্ষ বায়ু তাহে কায়াগ্নি প্রবল।
অনুচিত ভোজনেতে হীন হয় বল ॥
শৈত্যের সংযোগে বায়ু রুক্ষ হয় অতি।
রুক্ষ বায়ু যোগে হয় দুর্ব্বল প্রকৃতি ॥
দেহে তৈল যোগ স্নান আর উদ্বর্ত্তন।
গুড় চিনি আদি ইক্ষু বিকার ভোজন ॥
স্নেহ যুক্ত ব্যঞ্জনাদি আর পিঠা পুলি।
খেলে স্নিগ্ধহয় দেহ খণ্ডে দোষাবলি ॥
সদ্যোজাত গব্যঘৃত দুগ্ধান্ন ভোজন।
কিম্বা সদ্যোমাংস অন্ন সঘৃত ব্যঞ্জন ॥
কফকর বারিজাত কচ্ছপাদি যত।
বাতঘ্ন বলিয়া শীতে ভোজনে বিহিত ॥
বাতকোপ নাশি দ্রব্য সেবন করিবে।
বাত বিবর্দ্ধন খাদ্য যতনে ত্যজিবে ॥
ভোজনেতে উষ্ণ জল করিবেক পান।
আয়ুষ্কর হয় ইহা শাস্ত্রের বিধান ॥
আবরিবে গুরু উষ্ণ পটে কলেবর।
ভোজন না করিবেক রুক্ষ লঘুতর ॥
অগুরু চন্দনে দেহ করিবে চর্চ্চিত।
পূর্ব্ব বায়ু সেবনেতে থাকিবে বিরত ॥
গুরু উষ্ণ স্নিগ্ধ অন্ন আর পরিচ্ছদ।
উষ্ণগৃহ উষ্ণশয্যা সুখের সম্পদ ॥
স্নানে শৌচে আচমনে মৃদু উষ্ণ জল।
সতত করয়ে শীতে পরম মঙ্গল ॥
উষ্ণ বস্ত্র পরিধান উষ্ণ আচ্ছাদন।
আর সুকোমল উষ্ণ করিবে আসন ॥

চরক।

বসন্ত ঋতু স্বভাব।

ঋতুরাজ বসন্তের শুভ আগমনে।
কত শোভা হয় নিত্য কুসুম কাননে॥
প্রফুল্ল কমল কুল শোভে স্বচ্ছনীরে।
দক্ষিণ পবন সদা বহে ধীরে ধীরে॥
জলমধ্যে হংস হংসী খেলে কত রঙ্গে।
আর কত পাখী মিলে তাহাদের সঙ্গে॥
কুসুম সৌরভে মত্ত হয়ে অলিকুল।
পুষ্প অন্বেষণে ভ্রমে হইয়া আকুল॥
কোকিল কোকিলাগণ সুমধুর স্বরে।
বৃক্ষের শাখায় বসি কত গান করে॥
সুশীতল তরুতলে হরিণ হরিণী।
একত্রে করয়ে বাস দিবস রজনী॥
নূতন পল্লবে শোভে বন উপবন।
বসন্তের শোভা হেরি জুড়ায় নয়ন॥
শীত আর গ্রীষ্ম নাহি রহে অতিশয়।
এজন্য বসন্তকাল অতি প্রিয় হয়॥

বিবিধ গ্রন্থ।

বসন্ত ঋতু চর্য্যা।

কালের স্বভাবে আর ভোজনাদি দোষে।
হেমন্তে জন্মায় কফ সকল মানুষে॥
শৈত্যের কারণে কফ শান্ত ভাবে রহে।
রোগকর নহে তাই শীতে নর দেহে॥
বসন্তে রবির তাপে হইয়া তরল।
ঘটায় অনেক রোগ কফজ প্রবল॥
কফের প্রকোপে অগ্নি আগে নষ্ট হয়।
পরে শরীরেতে জন্মে রোগ সমুদয়॥
এজন্য বসন্তকালে বমন রেচন।
কফ বিনাশের জন্য হয় প্রয়োজন॥
মলহীন দেহে নাহি হয় রোগভয়।
যদি জন্মে রোগ তাহা সুখসাধ্য হয়॥
স্নিগ্ধ অম্ল আর মিষ্ট গুরু খাদ্য যত।
বসন্তে না খাবে বুধ ত্যজিবে নিশ্চিত॥
দিবা নিদ্রা আর দধি আদি কফকর।
বিশেষতঃ বসন্তেতে ত্যজিবেক নর॥
নিম্বপত্র হরিদ্রাদি মাখিলে শরীরে।
কফজ না হয় ব্যধি কফ দোষ হরে॥
ব্যায়াম করিবে, মুখে গণ্ডুষ ধরিবে।
অল্প উষ্ণ সলিলেতে সুখে শুচি হবে॥
অগুরু চন্দনে দেহ করিবে চর্চ্চিত।
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্যে হইবে শোভিত॥
সুযব গোধূম আর যাহা কফ হর।
বসন্তে ভুঞ্জিবে তাহা সুপণ্ডিত নর॥
নব কিশলয় পুষ্পে শোভিত কানন।
সেবিবেক আর সবে সুরভি পবন॥

চরক।

গ্রীষ্ম ঋতু স্বভাব।

সমাগত দেখি গ্রীষ্ম ভয়ঙ্কর কাল।
ভয়ে শুষ্ক হয় ধরা শোভয়ে কঙ্কাল॥
শন শন রবে বহে প্রলয় পবন।
ছিন্ন ভিন্ন হয় সব ভবন কানন॥

ধরা দুখে দহে নিত্য দিগঙ্গনাগন।
ধূলি-ধূসরিত দেহ মলিন বদন ॥
শুষ্ক হয় রবি করে উদ্ভিদ্ সকল।
আর নদ নদী সব কূপাদির জল ॥
জলের অভাবে সর্ব্বদিকে বিভিষিকা।
আশ্বাসয়ে সে বিপদে মাত্র মরীচিকা ॥
অতি পিপাসায় কষ্টে মরে প্রাণিগণ।
আর কত জন্তু করে জল অন্বেষণ ॥
আহার ত্যজিয়া কত জন্তু পালে পাল।
তরুতলে অতি কষ্টে জপে গ্রীষ্মকাল ॥
পত্রহীন তরু পরে বিহঙ্গম কুল।
রহে কষ্টে পিপাসায় হইয়া ব্যাকুল ॥
মেঘের গর্জ্জন আর বিদ্যুৎপতনে।
অতিশয় বাড়ে ভয় জীবগণ মনে ॥
ঘর্ম্মজল নরদেহে ঝরে নিরন্তর।
আর গ্রীষ্মে পিপাসায় ক্ষীণ হয় নর ॥
বন উপবন আর নরের ভবন।
ভস্মীভূত হয় কত না হয় গণন ॥

বিবিধ গন্থ।

গ্রীষ্ম ঋতু চর্য্যা।

শীতল বিমল জলে করিবেক স্নান।
দেহ মল তাপ গ্লানি পাবে অবসান ॥
পরিধান করিবেক সুলঘু বসন।
নাশিতে গ্রীষ্মের দুঃখ মাখিবে চন্দন ॥
আর নিত্য দিবে শিরে সুবাসিত জল।
নাশিবে সুপেয় পানে পিপাসার বল ॥
সুগন্ধি পুষ্পের মালা গলেতে পরিবে।
মাল্য ধারণেতে দেহ অতি সুস্থ হবে ॥
সুশীতল গৃহশয্যা আর আভরণ।
মুক্তাহার আর রত্ন-ময় আস্তরণ ॥
মুখ সমীরণ পল্লবিত তরুতল।
চন্দ্র রশ্মি আদি করি যাহা সুশীতল ॥
গ্রীষ্মেতে সেবিবে তাহা অতি সাবধানে।
বিপরীতে জন্মে রোগ বাধা নাহি মানে ॥
শালী অন্ন দুগ্ধ ঘৃত উচিত ভোজন।
আর মৃগ মাংস যব গোধূম সেবন ॥
সুতরল করি জলে শর্করা সহিত।
শক্তু ভোজনেতে আর হয় বহু হিত ॥
লবণাম্ল কটুরস আর উষ্ণবীর্য্য।
সেবিলে অহিত ঘটে ইহা অনিবার্য্য ॥
ব্যায়াম উচিত নয় গ্রীষ্মের সময়।
করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয় সুনিশ্চয় ॥

চরক।

ঋতু বর্ণন।

দক্ষিণ অয়ন।

সূর্য্যের দক্ষিণা গতি দক্ষিণ অয়ন।
তাহা আষাঢ়াদি ছয় মাসের গণন ॥
বর্ষা শরৎ হেমন্ত ঋতু তিন তাহে।
আষাঢ় শ্রাবণ মাস বর্ষা ঋতু কহে ॥
শরৎ ঋতু ভাদ্রাদি আশ্বিন পর্য্যন্ত।
কার্ত্তিকাদি দুই মাস ঋতুতে হেমন্ত ॥

এই ছয় মাসে অল্প রুক্ষ বায়ু বহে।
আর কাল ধর্ম্মে চন্দ্র বল স্থির রহে ॥
ধারাপাত মেঘমালা অরুক্ষ পবন।
অয়নের মার্গ আর কাল এ অয়ন ॥
এ পঞ্চ কারণে নিত্য সূর্য্য তেজ নাশে।
অব্যাহত বলে চন্দ্র সতত প্রকাশে ॥
চন্দ্র করে পুষ্ট হয় পদার্থ সকল।
আর ধারাপাতে ধরা হয় সুশীতল ॥
অম্ল ও লবণ রস আর যে মধুর।
ক্রমে জন্মায় জান এ তিন ঋতুর ॥
বর্ষায় জন্মায় অম্ল লবণ শরতে।
জন্মায় মধুর রস হেমন্ত ঋতুতে ॥
এ হেতু অরুক্ষভাব ক্রমে বৃদ্ধি পায়।
তাই ক্রমে নরদেহ বলবান হয় ॥
বর্ষাকালে হীনবল হয় সর্ব্বনর।
শরতে মধ্যম বল নর কলেবর ॥
হেমন্তেতে পূর্ণবল হয় সব নর।
এই রীতি চলিতেছে জান পূর্ব্বাপর ॥
জগৎ পোষয়ে চন্দ্র নিজ কর দিয়া।
তাই এ অয়নে কহে বিসর্গ বলিয়া ॥
সোমগুণে হয় পুষ্ট দেখিয়া একালে।
দক্ষিণ অয়ন সৌম্য কহয়ে সকলে ॥

বিবিধ গ্রন্থ।

(ক্রমশঃ)

আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা।

ডাক্তার শ্রীসত্যশরণ চক্রবর্ত্তী, এম, বি, লিখিত—

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রক্তস্রাবের চিকিৎসা।

রক্তস্রাব—রক্তবাহী নাড়ী হইতে রক্ত বহির্গত হওয়াকে রক্তস্রাব কহে। ধমনী শিরা এবং কৈশিক রক্তনালী এই তিন স্থান হইতেই রক্তস্রাব হইতে পারে। ধমনী হইতে রক্ত পড়িলে তাহাকে ধামনিক রক্তস্রাব বলা হয়; শিরা হইতে রক্তস্রাব হইলে তাহাকে শৈরিক, এবং কৈশিক রক্তনালী হইতে রক্ত নির্গত হইলে তাহাকে কৈশিক রক্তস্রাব বলা যায়।

ধামনিক রক্তস্রাব—ধমনী হইতে রক্তস্রাব হইলে ঐ রক্ত সুন্দর লাল বর্ণ দেখায় এবং সমভাবে নির্গত না হইয়া একবার প্রবল এবং একবার মৃদু ভাবে নির্গত হয়। কিন্তু যদি আহত ধমনী কোনও মাংসপেশীর নিম্নে থাকে তাহা হইলে রক্তস্রাব সমভাবে হইলেও ঐ রক্ত গাঢ় লাল বর্ণ দেখায়। ধমনী হইতে রক্ত পড়িলে ক্ষত স্থানের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের দিকে ঐ ধমনীর উপর চাপ দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয় ; কারণ হৃৎপিণ্ড হইতেই ধমনীতে রক্ত আসে।

শৈরিক রক্তস্রাব—শিরা হইতে যে রক্ত পড়ে তাহা কৃষ্ণাভ-রক্তবর্ণ এবং ঐ রক্ত সমভাবে নির্গত হইয়া থাকে। শিরা হইতে রক্তস্রাব বন্ধ করিতে হইলে ক্ষত স্থানের কিঞ্চিৎ নিম্নে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের বিপরীত দিকে ঐ শিরার উপর চাপ দিতে হয়। ধমনী হইতে রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য যত চাপ প্রয়োগ আবশ্যক হয় শিরা হইতে রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য তত চাপের প্রয়োজন হয় না।

কৈশিক রক্তনালী হইতে যে রক্ত নির্গত হয় তাহার বর্ণও গাঢ় লাল। এই রক্ত ক্ষতস্থান হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া সমভাবে চুয়াইয়া বাহির হয়। ঐ রক্তস্রাব বন্ধ করিতে হইলে ঠিক ক্ষতস্থানের উপর চাপ দিতে হয়।

হস্ত বা পদ হইতে রক্তস্রাব হইলে ঐ অঙ্গকে শরীরের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা উর্দ্ধে উত্তোলন করিবে তাহাতে রক্তস্রাব বন্ধ বা কম হইবে।

মস্তিষ্কের প্রধান ধমনীদ্বয় বক্ষঃগহ্বর হইতে নির্গত হইয়া কণ্ঠনালীর উভয় পার্শ্ব দিয়া মস্তকে প্রবেশ করে। কেহ গলায় ছুরি দিয়া আত্মহত্যা করিতে গিয়া যদি কণ্ঠনালীর বৃহৎ উপাস্থির পার্শ্বে এই ধমনী আহত হয় তবে অতি শীঘ্রই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ কোনও উপায়ে ঐ ধমনী হইতে রক্তস্রাব বন্ধ করিতে পারেন, তাহা হইলে পরে চিকিৎসক আসিয়া উপযুক্তরূপে সাহায্য করিলে ঐ ব্যক্তির জীবন রক্ষা হইতে পারে। ঐ ধমনী হইতে নিম্নলিখিত উপায়ে রক্ত বন্ধ করিতে পারা যায়। বক্ষের সম্মুখস্থ অস্থি হইতে কর্ণের পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত মাংসপেশী এবং কণ্ঠনালীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে বক্ষের সম্মুখস্থ অস্থির এক ইঞ্চি উর্দ্ধে অঙ্গুলীর দ্বারা মেরুদণ্ডের দিকে চাপ দিলে ঐ রক্তস্রাব বন্ধ হয়। চাপ দিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন কণ্ঠনালীর উপর চাপ না পড়ে। (চিত্র নং ১)

এইরূপ ভাবে চাপ দিয়া অধিকক্ষণ থাকিতে পারা যায় না, সেইজন্য লিণ্ট বা পরিষ্কার বস্ত্র খণ্ডের দ্বারা ক্ষতমুখ উত্তমরূপে পরিপূর্ণ করিয়া তাহার উপর চাপ দিয়া ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে অঙ্গুলীর চাপ সরাইয়া লইতে পারা যায়।



(চিত্র নং ১)

কমন্ কেরটীড্ ধমনীতে চাপ দিয়া রক্ত বন্ধ করা হইতেছে। দেখিতে হইবে যেন বায়ুনালীর উপর চাপ না পড়ে।

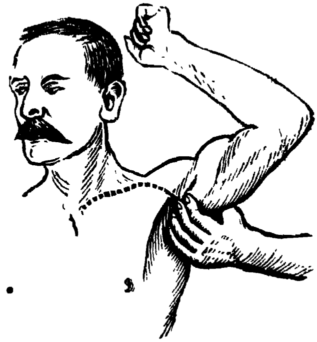
কপালের ধমনী হইতে রক্তস্রাব হইলে লিণ্ট, কাপড় বা কাগজ দ্বারা একটী কঠিন পটী তৈয়ারি করিয়া ক্ষতস্থানের উপর দিয়া চাপিয়া ধরিয়া থাকিবে। ইত্যবসরে একটী তিনকোনা ব্যাণ্ডেজ লম্বা করিয়া পাট করিবে ঐ ব্যাণ্ডেজের ঠিক মধ্যস্থল পূর্ব্বোক্ত পটীর উপর রাখিয়া মাথার চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া উহার শেষভাগ পটীর উপর আনিয়া চাপ দিয়া বাঁধিবে। এইরূপে বাঁধিলে যে স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতেছে সে স্থানে বেশী চাপ পড়ে এবং রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

বগলের মধ্যে বাহুর প্রধান ধমনী ছিন্ন হইলে ক্ষতমুখে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া ঐ ধমনীর উপর চাপ দিবে ও পাঁজরার সর্ব্বোচ্চ অস্থির উপর ঐ ধমনীকে চাপিয়া ধরিতে হইবে। (চিত্র নং ২) এই ধমনী Collar-bone (কণ্ঠা) এবং সর্ব্বোচ্চ পাঁজরার অস্থির মধ্যস্থানে অবস্থিত।



(চিত্র নং ২)

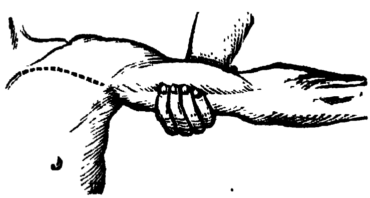
সাবক্লেভিয়ান ধমনীতে চাপ দিয়া রক্ত বন্ধ করিবার প্রণালী। যদি বগলের প্রধান ধমনী হইতে রক্তস্রাব হয়, এই উপায় দ্বারা বন্ধ করিতে হইবে।



(চিত্র নং ৩)

ব্রেকিয়েল্ ধমনী হইতে রক্তস্রাব হইলে এক্সিলারী ধমনীতে এইরূপে চাপ দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

বাহুর ধমনীর গতি স্থির করিতে হইলে কোট বা জ্যাকেটের হাতার লম্বা সেলাইএর লাইন ধরিলেই চলিতে পারে। (চিত্র নং ৪)

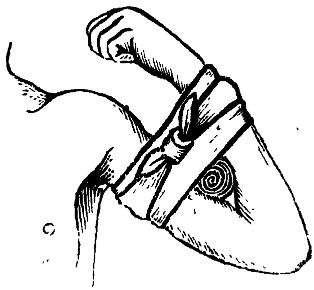


(চিত্র নং ৪)

কনুই সম্মুখের ধমনী বা রেডিএল্ বা আল্নার ধমনী হইতে রক্তস্রাব বন্ধ রাখিবার প্রণালী। কোট বা জ্যাকেটের সেলাইএর লম্বা লাইন দ্বারা স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

কনুইএর নিকট ধমনী সন্ধিস্থলের ঠিক সম্মুখে এবং মধ্যস্থলে বর্ত্তমান থাকে।

অগ্রবাহুর কোনও ধমনী হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইলে টুর্নিকেট বাঁধিয়া রক্তস্রাব বন্ধ করিবে কিন্তু যদি টুর্নিকেট আনিতে বিলম্ব হয় তাহা হইলে ততক্ষণ নিম্ন লিখিত উপায়ে রক্তস্রাব বন্ধ করিবে।



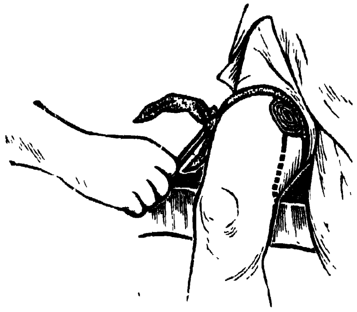
(চিত্র নং ৫)

হস্ত তালু হইতে রক্তস্রাব হইলে হাতে একটী বলের ন্যায় পটী ধরিতে দাও, কনুয়ের সম্মুখে একটী পটী রাখিয়া অগ্রবাহু বাহুর দিকে আনিয়া বাঁধিতে হইবে। মুষ্টিবদ্ধ হস্তও ব্যাণ্ডেজ দ্বারা বাঁধিতে হইবে। পরে উক্ত অঙ্গ দেহ কাণ্ড হইতে যত উপরে সম্ভব তুলিয়া রাখিতে হইবে।

কনুইএর ঠিক সম্মুখভাগে একটী পুরু পটী দিয়া বাহুর উপর অগ্রবাহু বাঁকাইয়া জোরে বাঁধিয়া দিবে। (চিত্র নং ৫)

নিম্নলিখিত ভাবে টুর্নিকেট বাঁধা যায়—

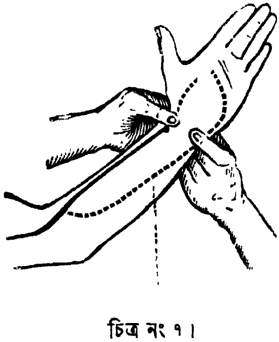
একখানি রুমাল বা তিন কোনা ব্যাণ্ডেজ লম্বা ও সরু করিয়া পাট করিয়া বাহুতে বাঁধিবে এবং ধমনীর ঠিক উপর পুরু করিয়া একটী প্যাড্ বা অন্য কোনও পদার্থ রাখিবে, পরে বাহুর বহির্ভাগে ব্যাণ্ডেজের নীচে একটী কাঠি ঢুকাইয়া পাক দিবে। এইরূপে ব্যাণ্ডেজটী চাপিয়া বাহুতে বসিয়া যাইবে এবং ব্যাণ্ডেজের চাপে রক্তস্রাব বন্ধ হইবে। হস্ত-তালুর কোনও ধমনী হইতে রক্তস্রাব হইলে বস্ত্র বা



চিত্র নং ৬।

ফেমোরেল ধমনীতে টুর্ণিকেট বাঁধিবার নিয়ম। ধমনীর উপর একটী কঠিন পটী রাখিয়া তিন কোনা ব্যাণ্ডেজ সরু করিয়া বাঁধিতে হইবে। ব্যাণ্ডেজের বাহিরে একটী কাটী ঢুকাইয়া পাকাইতে হইবে, যতক্ষণ রক্ত বন্ধ না হয়। এইরূপে রক্ত বন্ধ করিলে যতশীঘ্র সম্ভব ডাক্তার ডাকিবে। বাহুতে টুর্ণিকেট ঐরূপে বাঁধিতে হয়। ব্রকিয়েল ধমনীর উপর পটী ও ব্যাণ্ডেজ বাহুর বাহিরে ব্যাণ্ডেজের মধ্যে কাটি পাক দিয়া রক্ত বন্ধ করিতে হয়।

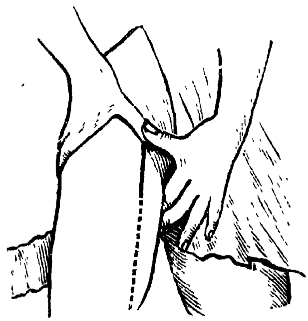
অন্য কোনও দ্রব্য গুটাইয়া একটী বল বা ঢেলা প্রস্তুত করিয়া হস্ত-তালুর উপর রাখিয়া হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়। এইরূপ মুষ্টিবদ্ধ হস্ত ব্যাণ্ডেজ দ্বারা বাঁধিয়া রাখ এবং মণিবন্ধের সম্মুখে যে স্থানে নাড়ী পরীক্ষা করা হয় তথায় এবং অপর



চিত্র নং ৭।

হস্ততালু হইতে যদি ফিন্‌কিরি দিয়া রক্তস্রাব হয় তাহা হইলে রেডিএল ও আল্‌নার ধমনীতে এইরূপ চাপ দিয়া রক্ত বন্ধ করিতে হয়।

পার্শ্বে ঠিক তাহার অনুরূপ স্থানে (চিত্র নং ৭) দুইটী প্যাড্ রাখিয়া জোরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রাখিবে। পরে অগ্রবাহু বাহুর উপর বাঁকাইয়া রাখিতে হইবে ও সমস্ত অঙ্গটী দেহকাণ্ড হইতে যত দূর সম্ভব তুলিয়া রাখিতে হইবে (চিত্র নং ৫)। অনেক সময়ে পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিলেই রক্ত বন্ধ হইবে যদি না হয় তাহা হইলে বাঁকান উত্তোলন প্রয়োজন বুঝিতে হইবে।

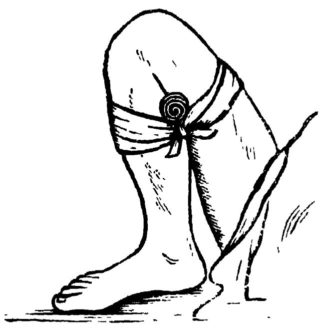


চিত্র নং ৮।

কম্‌(ফেমোরেল্ ধমনীতে চাপ দিয়া রক্ত বন্ধ করিবার নিয়ম। উরুর নিম্নে ধামনিক রক্তস্রাব এই উপায়ে বন্ধ করা যায়।

উরুর প্রধান ধমনীর স্থান নিম্নলিখিত রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। উদর গহ্বর হইতে নির্গত হইয়া কুঁচকীর মধ্যস্থান হইতে উরুর কিঞ্চিৎ ভিতর দিকে এই ধমনীর লাইন। কুঁচকীর মধ্যস্থান হইতে মালাই চাকী হাড়ের ভিতর দিক পর্য্যন্ত একটী লাইন টানিলেই ঐ ধমনীর স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। উরুর উপরকার দুইয়ের তিন ভাগ পর্য্যন্ত ধমনী ঠিক থাকে তাহার পর উরুর ভিতর দিয়া হাঁটুর পশ্চাতে যায়। গুল্‌ফ্ সন্ধিস্থলে ধমনীদ্বয় এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়; সন্ধির সম্মুখভাগে মধ্যস্থলে একটী ও ভিতরকার উঁচু হাড়ের পিছনে ও কিছু নীচে অপরটী অনুভব করা যায়। নিম্নাঙ্গ হইতে রক্তস্রাব এই কয় প্রকারে বন্ধ করা যাইতে পারে। অঙ্গুলি দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে চাপ দিয়া, (চিত্র নং ৮) উরুর ধমনীতে টুর্নিকেট বাঁধিয়াও যদি

হাঁটুর নীচে রক্তস্রাব হয় তাহা হইলে হাঁটুর মধ্যে পটী লাগাইয়া পা উরুর সহিত সম্বন্ধ করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়। (চিত্র নং ৯) যদি পায়ের তলা হইতে ধমনী কাটিয়া রক্ত পড়ে তাহা হইলে সম্মুখে গুলফ্‌-সন্ধির মধ্যস্থলে ও পশ্চাতে পায়ের ভিতরকার হাড়ের অব্যবহৃতি পশ্চাতে ও নীচে পটী লাগাইয়া জোরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিলে ও পা উঁচু



চিত্র নং ৯।

পপ্লিটিয়েল্‌ ধমনীতে চাপ দিবার প্রণালী। এইরূপে হাটুর নিম্নের অংশ হইতে ধামনিক রক্তস্রাব বন্ধ করা যাইতে পারে। এইরূপে বাঁধার পর উপুড় করিয়া পায়ের তলা উপরের দিকে রাখিলে পায়ের তলা হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

করিয়া রাখিলে রক্ত বন্ধ হয়। কখন কখন শিরা বিস্ফারিত হইয়া নিম্নাঙ্গে ক্ষত উৎপন্ন করে। ঈদৃশ কোন শিরা ছিঁড়িয়া রক্তস্রাব হইতে থাকিলে ঐ স্থানে একটী পটী এইরূপে লাগান উচিত; প্রথমে ক্ষুদ্র, তাহার পর উহা অপেক্ষা বড়, ও তাহার উপর আরও বড়—এইরূপ করিয়া ক্রমশ, বেশ পুরু একটী পটী লাগাইতে হইবে ও জোরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া পা উচ্চ করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। যতক্ষণ পটী ও ব্যাণ্ডেজ জোগাড় না হয় ততক্ষণ অঙ্গুলী দিয়া চাপিয়া রক্ত বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

ফুস্‌ফুস্‌ হইতে রক্তস্রাব হইলে নিম্নলিখিত রূপে চিকিৎসা করা উচিত।

সর্ব্বপ্রথমেই ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাইবে। রোগীকে বেশ আরামে শোয়াইবে এবং তাহাকে স্থির ভাবে রাখিবে। রোগীকে কোন প্রকারে নড়িতে দিবে না বা কোন প্রকারে কথা কহিতে দিবে না। রোগী যাহাতে উত্তেজিত হয় এরূপ সমস্ত বিষয় দূর করিতে হইবে। স্থিরভাবে ও দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিবে। যদি বরফ পাওয়া যায়, তবে বরফ নতুবা শীতল জলের পট্টী বুকে লাগাইবে, বরফের টুক্‌রা চুষিতে দিবে। মদ্য বা উত্তেজক ঔষধ গরম খাদ্য বা পানীয় একেবারে নিষিদ্ধ। রক্ত বমন হইলেও ফুস্‌ফুস্‌ হইতে রক্ত উঠার ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। যদি নাক দিয়া রক্ত পড়ে, তাহা হইলে উহা একেবারে বন্ধ করা ভাল নয়, কারণ অল্প মাত্রায় পড়িলে শরীরের অন্যস্থানের রক্তাধিক্য নিবারিত হয় ও এই প্রকার রক্তস্রাব একেবারে বন্ধ করিলে শরীরের ক্ষতিও হইতে পারে। তবে যদি বেশী রক্ত পড়ে ও উহা বহুক্ষণ ব্যাপী হয় তাহা হইলে ডাক্তার ডাকাইবে, কারণ ইহা বন্ধ করা কঠিন এবং এইরূপ অবস্থায় প্রাণনাশ হইতে পারে। চিকিৎসক আসিবার পূর্ব্বে বা অপেক্ষাকৃত অল্প রক্ত পড়িলে রোগীর গলার কাপড় বা কোমরের কাপড় আল্‌গা করিয়া দিবে ও রোগীর মাথা তুলিয়া কিঞ্চিৎ পশ্চাতে হেলাইয়া রাখিতে হইবে। মাথা সাম্‌নে ঝাঁকাইয়া কোন পাত্রের উপর রাখিতে দিবে না কিংবা মাথা হেঁট করিয়া বুকের উপর রাখিতে দিবে না। ঘাড়ে ঠাণ্ডা জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া লাগাইবে বা জলপটী দিবে কিংবা বরফ পাইলে বরফ লাগাইবে; নাকের মধ্যে ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। হাত উঁচু করিয়া ঈষৎ হেলান দিয়া রোগীকে বসাইয়া রাখা উচিত। যদি ইহাতে রক্ত বন্ধ না হয় ও সুবিধা মত পিচকারী পাওয়া যায় তাহা হইতে ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বে বরফ জলের পিচকাকী বা ফট্‌কিরী এক চামচ্‌ এক বাটী জলে গুলিয়া পিচকারী করা যাইতে পারে। যদি ইহাতেও রক্ত বন্ধ না হয় এবং চিকিৎসক আসিতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে নাকের মধ্যে লিণ্ট বা কাপড় ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া প্রবেশ করাইতে হইবে। যাহাই ব্যবহার করা হউক

না কেন, উহা কলমের বাঁট বা ঐরূপ কোনও জিনিষ দিয়া উত্তমরূপে ঠেলিয়া দিতে হইবে। রোগীর ঘরের জানালা খুলিয়া যাহাতে শীতল বায়ু সঞ্চালিত হয় ও রোগীর মুখে ও মস্তকে লাগে তাহার উপায় করিতে হইবে। রোগীকে নাক ঝাড়িতে দিবে না ও রক্তের চাপ নাক হইতে শীঘ্র পরিষ্কার করিতে দিবে না। কোনও উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না তবে যদি রোগী অবসন্ন এবং মূর্চ্ছা যাইবার চিহ্ন দেখায় তাহা হইলে অত্যন্ত সাবধানে অল্প উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

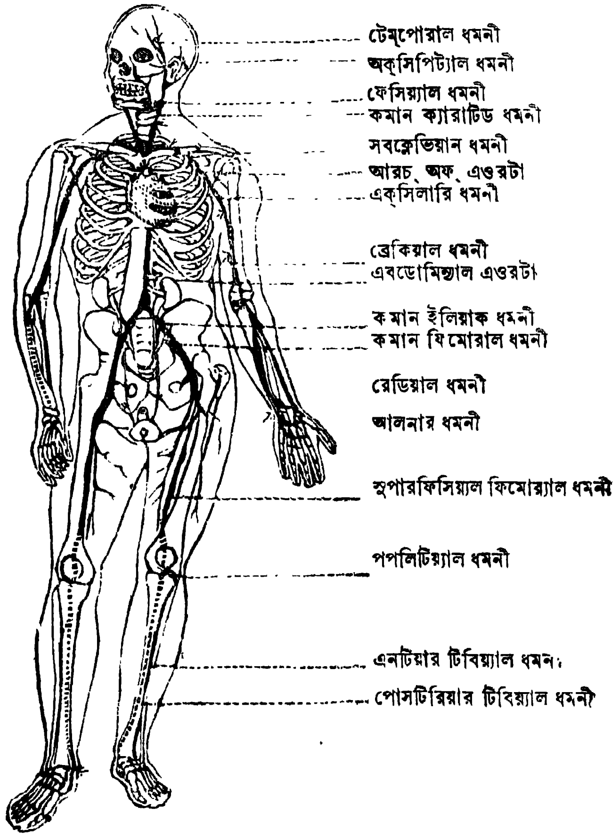
অনেক সময় রক্ত শরীরের বাহিরে বহির্গত হইতে দেখা যায় না, কিন্তু ইহা ধমনী বা শিরা হইতে নির্গত হইয়া শরীরের কোনও একটী গহ্বরে বা ফাঁপা যন্ত্রের মধ্যে জমিয়া থাকে।

শরীরের ভিতরের রক্তস্রাব—নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করা যাইতে পারে। রোগী অতি শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহার মুখ ও ঠোঁট রক্তহীন ও বিবর্ণ দেখায়, হস্ত পদাদি শীতল বোধ হয়, রোগী দাঁড়াইলে তাহার মাথা ঘোরে সে মূর্চ্ছা যাইবার মত হয়, রোগী দ্রুত এবং কষ্টের সহিত শ্বাস প্রশ্বাস লয়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হাইতোলে, ছট্‌ফট্ করে, হাত পা ছোড়ে ও বায়ুর অভাব অনুভব করে এবং অবশেষে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। রোগীর নাড়ী ক্রমশঃ খারাপ হইয়া মণিবন্ধে অনুভব করিতে পারা যায় না।

উপস্থিত মত চিকিৎসা—এইরূপ অবস্থায় রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইবে, শরীরের নিম্নদেশ ঈষৎ উঁচু করিয়া, মস্তক নীচু করিয়া রাখা দরকার অর্থাৎ রোগী যদি খাট বা তক্তপোষে শুইয়া থাকে তবে পায়ের দিকের পায়া দুইটী দুইখানি করিয়া ইঁটের উপর তুলিয়া দেওয়া উচিত এবং রোগীর মস্তকে বালিস্ দিতে নাই। যদি রোগী ভূমিতে বিছানায় শুইয়া থাকে তবে মস্তক হইতে বালিস্ খুলিয়া লইয়া তাহা পাছার নীচে দিবে এবং একটী মোটা বালিসের উপর পা দুটী তুলিয়া রাখা উচিত। গলার কাপড় আল্গা করিয়া দিবে ও জানালা খুলিয়া গৃহে বায়ু প্রবেশ করিতে দিবে, এবং রোগীকে বাতাস করিবে। মুখে শীতল জল ছিটাইবে, নাকের কাছে এমোনিয়া ধরিবে, বরফ চুষিতে দিবে বা শীতল জল পান করিতে দিবে।

হাত ও পা আঙ্গুল হইতে শরীর পর্য্যন্ত ব্যাণ্ডেজ করিবে। রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তেজক ঔষধ বন্ধ রাখিতে হইবে।

জিহ্বা এবং দাঁতের গোড়া বা গলা হইতে রক্ত পড়িতে থাকিলে বরফ চুষিতে বা মুখে ঠাণ্ডা জল রাখিতে দিবে। ইহাতে রক্ত বন্ধ না হইলে সহ্যমত খুব গরম



প্রধান প্রধান ধমনীর গতি নির্ণয় করিবার চিত্র।

ছোট ছোট চিহ্নযুক্ত স্থানে অঙ্গুলি দ্বারা অনুভব করিলে ধমনীর স্পন্দন টের পাওয়া যায় ও চাপ দিলে তথাকার ধমনীর মধ্য দিয়া রক্তের গতি বন্ধ হয়।

জল মুখে রাখিতে দিবে, যদি আবশ্যক হয় কেরটীড ধমনীতে চাপ দিবে। যদি জিহ্বার অগ্রভাগ হইতে অধিক রক্ত পড়ে, পরিষ্কার লিণ্ট দ্বারা উক্ত অংশটী তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চাপিয়া ধর। যদি দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত পড়ে তুলা বা পরিষ্কার লিণ্ট দ্বারা গর্ত্তটী বুজাইয়া দাও ও উহার উপর কর্ক স্থাপন করিয়া রোগীকে উহা কামড়াইয়া ধরিতে দাও তাহা হইলে রক্ত বন্ধ হইবে।

এইরূপ অবস্থায় আহত ব্যক্তিকে বিছানায় শোয়াইয়া চিকিৎসক ডাকিতে পাঠাইবে।

জননেন্দ্রিয় হইতে অধিক রক্তস্রাব।

স্ত্রীলোক হইলে তলপেটে শীতল জলপটী বা বরফ পাওয়া যাইলে বরফ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মইয়ের উপর হইতে পড়িয়া গিয়া পুরুষদিগের ইউরিথ্রা ছিন্ন হইলে জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব হইতে পারে। পেরিনিয়মে বরফ লাগাইয়া শীঘ্র চিকিৎসক ডাকিবে। এই অবস্থায় প্রাণ সংশয় জানিয়া কার্য্য করিতে হইবে। কিডনি ও ব্লাডার হইতে রক্ত পড়িলে রক্ত প্রস্রাব হয়। স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিলে আহত স্থানে কিডনি বা ব্লাডারের উপর Ice bag বা অভাবে শীতল জলপটী লাগাইয়া ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইবে।

দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ প্রসব হইলে প্রস্থতি প্রায় রক্তস্রাব হয় না। নাভিরজ্জু ছিঁড়িয়া যাওয়ায় শিশুর প্রাণ সংশয় হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় প্রসূতিকে শোয়াইবে ও শিশুর নাভিরজ্জু টিপিয়া ধরিয়া থাকিবে। এইরূপে রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া নাভিরজ্জু বাঁধিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

খাদ্য ও পথ্য

দুগ্ধ।

দুগ্ধকে আদর্শ খাদ্য বলা যাইতে পারে। ইহাতে খাদ্যের সকল জাতীয় উপাদানই অর্থাৎ আমিষ জাতীয়, স্নেহ জাতীয়, শালি জাতীয়, লবণ জাতীয় ও জল যথোচিত পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। আজকাল দুগ্ধের গুণাগুণ সকল দেশেই বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে।

দূষিত দুগ্ধ

দূষিত দুগ্ধের সহিত ভিন্ন ভিন্ন রোগ উৎপাদনকারী বীজাণু সমূহ মনুষ্য দেহে প্রবেশ করে ও রোগ উৎপাদন করে। সহজ সেব্য ও সহজে পরিপাক হয় বলিয়া দুগ্ধই শিশু ও রোগীর প্রধান খাদ্য। সেজন্য দুগ্ধ যাহাতে দূষিত না হয় সে বিষয়ে বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখা উচিত। শিশুদের বর্দ্ধন ও পুষ্টি কেবলমাত্র দুগ্ধের উপর নির্ভর করে, এজন্য দূষিত দুগ্ধ হইতে তাহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে। কলিকাতা সহরে যত এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুর মৃত্যু হয়, তন্মধ্যে শতকরা ২০ জন কেবল পরিপাকের ব্যতিক্রম জনিত রোগে মরিয়া থাকে। ইহা অবিশুদ্ধ দুগ্ধ ব্যবহারের ফল।

দুগ্ধে বীজাণু।

যত প্রকার খাদ্য আছে তন্মধ্যে দুগ্ধই নানা প্রকার বীজাণু বর্দ্ধনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। সে জন্য ইহাতে নানা প্রকার বীজাণু সহজেই জন্মিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি রোগ উৎপাদনকারী।

সুস্থ গাভী হইতে বিশেষ বৈজ্ঞানিক উপায়ে দোহন করিলে বীজাণু শূন্য দুগ্ধ পাওয়া যাইতে পারে। এই দুগ্ধকে বীজাণু শূন্য পাত্রে রাখিলে দুই বৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। সাধারণতঃ এইরূপ দুগ্ধ পাওয়া অসম্ভব। সুস্থ গাভীর দুগ্ধ ভিতরেই বীজাণু পূর্ণ কিম্বা বাহির হইবার সময়ে বীজাণু যুক্ত হইতে পারে। সহরে ক্রেতার নিকট দুগ্ধ পৌছিতে ৬ হইতে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় লাগে, এবং এই সময়ের মধ্যে বীজাণুর সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। বাজারের দুগ্ধ সকল সময়েই বহু পরিমাণ বীজাণু পূর্ণ থাকে। ইহাদের সংখ্যায় অনেক তারতম্য হয়।

বীজাণু শূন্য দুগ্ধ।

আমেরিকা যুক্ত রাজ্যের কলোম্বিয়া প্রদেশে নির্দ্ধারিত আছে যে প্রথম শ্রেণীর ১৭ ফোঁটা দুগ্ধে (in 1cc of "Certified milk)" ৫০০০এর অধিক বীজাণু থাকিবে না। বিশেষরূপ উপায় অবলম্বন করিলেও দুগ্ধে বীজাণুর সংখ্যা ইহা অপেক্ষা কম করা যায় না। ১৭ ফোঁটা (1cc) ৫০০০এর অধিক হইতে ১,০০,০০০ লক্ষ পর্য্যন্ত বীজাণু থাকিলে তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর দুগ্ধ (Inspected Milk) বলিয়া পরিগণিত হইবে।

আমেরিকার নিয়ম।

যে দুগ্ধ অনেকক্ষণ অনাবৃত অবস্থায় রাখা হইয়াছে তাহাতে বীজাণুর মাত্রা অধিক হয়।

বীজাণুর সংখ্যা গণনার দ্বারা দুগ্ধ ব্যবহারের উপযোগী কি অনুপযোগী সে বিষয়ের কোন কিনারা হয় না। সংখ্যা গণনা অপেক্ষা বীজাণু কোন জাতীয় তাহা জানাই অধিক আবশ্যক। দুগ্ধ জাত অধিকাংশ বীজাণুই নিরাপদ, তাহারা কেবল দুগ্ধের পুষ্টিকারীতা হানি করিয়া নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কিন্তু সময়ে সময়ে যক্ষ্মা, ডিপথিরিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, উদরাময় এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু থাকিয়া দুগ্ধকে বিপজ্জনক করিয়া তুলে।

সংখ্যা ও জাতি।

সাধারণ বীজাণুর কতকগুলি দুগ্ধের অম্লত্ব উৎপাদন করে, কতকগুলি দুগ্ধের পচনে সহায়তা করে এবং অপর কতকগুলি বর্ণের পরিবর্ত্তন করায়।

গো দুগ্ধের রাসায়ণিক পরীক্ষা।

টাট্‌কা দুগ্ধের বর্ণ ঈষৎ পীতাভ শ্বেত। কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া দিলে দুগ্ধ পৃথক হইয়া দুই স্তরে বিভক্ত হয়। উপরিস্থিত অপেক্ষাকৃত লঘুস্তর নিম্নস্তর অপেক্ষা পরিমাণে অল্প। প্রধানতঃ ইহা মাথন জাতীয় উপাদানে পূর্ণ থাকে। নিম্নস্তর শ্বেত কিম্বা ঈষৎ নীলাভ শ্বেত বর্ণের। ইহা পৃথক অবস্থায় মাটা তোলা দুগ্ধের অনুরূপ।

বর্ণ।

আপেক্ষিক গুরুত্বঃ—

দুগ্ধ জল অপেক্ষা ঈষৎ ভারী। এক ঘটী জলের ওজন যদি ১ সের হয়, তাহা হইলে সেই ঘটীর এক ঘটী দুগ্ধের ওজন ১ সের আধ ছটাক হইবে। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় বলিতে গেলে জলের ওজন ১০০০ হইলে দুগ্ধের ওজন ১০৩২ হইবে। সকল দুগ্ধ সমান ভারী নহে। সাধাণরতঃ উত্তম দুগ্ধের অপেক্ষিক গুরুত্ব ১০৩০ হইতে ১০৩৪ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়।

মাথন জল অপেক্ষা ঈষৎ লঘু। এজন্য যে দুগ্ধে যত মাথন অধিক সে দুগ্ধের অপেক্ষিত গুরুত্ব তত কম এবং যে দুগ্ধে মাথনের ভাগ কম তাহার গুরুত্ব অধিক। আবার মাথন ব্যতীত অন্য যে সকল পদার্থ দুগ্ধে আছে তাহাদের পরিমাণ অধিক হইলে অপেক্ষিক গুরুত্বও বাড়িয়া যায়। মাটা তুলিয়া লইলে দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। আবার দুগ্ধে জল মিশাইলে গুরুত্ব কমিয়া যায়।

গুরুত্বের তারতম্য।

ল্যাকটো-মিটার নামক যন্ত্র সাহায্যে দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণীত হয়। ইহা দেখিতে কতকটা থার্ম্মোমিটারের মত। এই যন্ত্রে কতকগুলি দাগ দেওয়া আছে। দুগ্ধে ছাড়িয়া দিলে ইহার কিয়দংশ ডুবিয়া যায়। দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব যত হইবে এই যন্ত্রও সেই নম্বর পর্য্যন্ত ডুবিবে। গোয়ালারা দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিয়াছে কিনা তাহা ইহার দ্বারা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু দুগ্ধের

ল্যাক্টো-মিটার।

মাটা তুলিয়া জল মিশ্রিত করিলে আপেক্ষিক গুরুত্ব ঠিক থাকিতে পারে। কাজেই এরূপ স্থলে এ যন্ত্রের দ্বারা দুগ্ধে জল আছে কিনা বুঝা কঠিন।

অনেক পল্লীগ্রামে পানের বোঁটা দুগ্ধে ফেলিয়া পরীক্ষা করা হয়। দুগ্ধ খাঁটি হইলে পানের বোঁটা ভাসিয়া থাকে, এবং অধিক পরিমাণ জল থাকিলে তাহা ডুবিয়া যায়।

গো দুগ্ধে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া যায়।

জল	...	...	...	৮৭.১০	
মাখন	...	...	...	৩.৯০	
দুগ্ধ শর্করা	...	...	...	৪.৭৫	
কেজিন	...	...	...	৩.০০	আমিষ জাতীয়।
আলবুমিন	...	...	..	০.৪০	
লবণ	...	...	...	০.৭৫	

উপরিলিখিত উপাদন সমূহ ব্যতীত দুগ্ধে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্ব্বনডাই-

দ্রবীভূত বাষ্প।

অক্সাইড প্রভৃতি কতকগুলি বাষ্প দ্রবভাবে থাকে। অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন বাষ্প দোহনের সময় দুগ্ধে আসিয়া থাকে।

মোটামুটি দুগ্ধে জল বর্জ্জিত অংশের ১।২০ লবণ জাতীয়, ১।৪ আমিষ জাতীয়, ৩।১০ স্নেহ-জাতীয় এবং ৪।১০ শর্করা জাতীয় উপাদান থাকে।

আমিষ জাতীয় উপাদান :—

শরীর গঠণের পক্ষে আমিষ জাতীয় উপাদান অত্যাবশ্যকীয়। বিভিন্ন প্রকার খাদ্যে বিভিন্ন প্রকারের আমিষ জাতীয় উপাদান বর্ত্তমান থাকে। ডিম্বে এগ-আল্‌বুমিন, মাংসে মাইওসিন এবং শস্যে লেগুমিন রূপে ইহা বর্ত্তমান আছে।

কেজিন্।

দুগ্ধের আমিষ জাতীয় প্রধান উপাদানের নাম কেজিন্। ইহাই ছানার প্রধান উপকরণ। ইহাতে ফস্ফরাস ও গন্ধক দুইই বর্ত্তমান থাকে। কেজিন্ ব্যতীত দুগ্ধে অল্প পরিমান ল্যাকটো-

আলবুমিন নামক আর এক প্রকার অমিষ জাতীয় উপাদান আছে। ইহার পরিমাণ গড়ে সমগ্র আমিষ জাতীয় উপাদানের ৭ ভাগের এক ভাগ। বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর দুগ্ধে আলবুমিন ও কেজিনের পরিমাণের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এক গাভীর বিভিন্ন সময়ের দুগ্ধেও এই পার্থক্য লক্ষিত হয়। দুগ্ধে গড়ে শতকরা ৩·৩ ভাগে আমিষ জাতীয় উপাদান থাকে।

ল্যাকটো-আলবুকিন।

স্নেহ ও শর্করা জাতীয় উপাদান ঃ—

ব্যবসায় হিসাবে দুগ্ধের মাখন জাতীয় উপাদানই প্রধান। দুগ্ধে ইহা বিন্দু বিন্দু আকারে ভাসমান থাকে। জল অপেক্ষা লঘু বলিয়া, কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে দুগ্ধের মাটা উপরে ভাসিয়া উঠে। মাখন ষ্টিয়ারিন, পামিটিন, ওলিইন প্রভৃতি কয়েক প্রকার স্নেহ জাতীয় উপাদানে গঠিত।

মাখন।

দুগ্ধে স্নেহজাতীয় উপাদানের পরিমাণের বিশেষ তারতম্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু কথনও শতকরা ৩ ভাগের কম কিম্বা অতি উত্তম দুগ্ধে ৫ ভাগের অধিক হয় না। দুগ্ধে গড়ে শতকরা ৪ ভাগ স্নেহজাতীয় উপাদান থাকে।

দুগ্ধের প্রধান শালি জাতীয় উপাদান দুগ্ধ শর্করা। ইহার জন্যই দুগ্ধের মিষ্টস্বাদ। দুগ্ধ শর্করার উপাদান ইক্ষু চিনির অনুরূপ। কিন্তু ইহা জলে শীঘ্র গলে না এবং সাধারণ চিনির মত মিষ্ট নয়। ইক্ষু চিনি দানা অবস্থায় পাওয়া যায় কিন্তু দুগ্ধশর্করা সাদা মিহি পাউডার রূপে বিক্রিত হয়। দুগ্ধশর্করা পাউডার, পিল এবং ট্যাবলেট প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য ঔষধালায়ে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। গোদুগ্ধে শতকরা ৪ হইতে ৬ ভাগ পর্য্যন্ত দুগ্ধশর্করা পাওয়া যায়।

দুগ্ধশর্করা।

খনিজ উপাদান ঃ—

দুগ্ধের খনিজ উপাদানের মধ্যে ফস্‌ফেট-অফ্‌-লাইম প্রধান। ইহার কিয়দংশ অতি সূক্ষ্মভাবে অদ্রবনীয় অবস্থায় থাকে এবং ইহাই দুগ্ধের ঈষৎ নীলাভ হইবার কারণ। দুগ্ধে শতকরা মাত্র ১ ভাগেরও কম খনিজ উপাদান থাকে।

জারক পদার্থ ঃ—

দুগ্ধে কতকগুলি জারক পদার্থ আছে। ইহাতে দুগ্ধ পরিপাকের সহায়তা হয়। দুগ্ধ ফুটাইবার সময় এই সকল জারক পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বীজাণু বর্জ্জিত কাঁচা:দুগ্ধের কিয়ৎপরিমাণ রোগ নাশক ক্ষমতা আছে।

দুগ্ধে শৈত্যের কার্য্য ঃ—

খুব ঠাণ্ডা করিলেও দুগ্ধের বীজাণু বিনষ্ট হয় না, কিন্তু তাহাদের বংশ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা স্থগিত থাকে। সময়ে সময়ে অতি ঠাণ্ডা করিয়া দুগ্ধ রক্ষা করা হয় কিন্তু এই উপায় উত্তম নহে। ইহাতে দুগ্ধের উপাদানগত কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হয়। ৩৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট হইতেই এই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। সুতরাং দুগ্ধ ইহা অপেক্ষা অধিকতর ঠাণ্ডা অবস্থায় রাখা উচিত নয়।

উক্ত উপায়ে রক্ষণের জন্য, দুগ্ধ দোহনের পরেই শীঘ্র ঠাণ্ডা করা উচিত। কারণ যে সকল বীজাণু গরমে অতি সত্বর সংখ্যা বৃদ্ধি করে, তাহার বৃদ্ধির সুবিধা পায় না।

দুগ্ধে উত্তাপের কার্য্য ঃ—

সল্পোষ্ণতা বীজাণু বর্দ্ধনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু অত্যুষ্ণতা বীজাণু বিনাশের কারণ।

অত্যধিক উত্তাপে সমস্ত বীজাণু নষ্ট হয় বটে কিন্তু ইহাতে দুগ্ধের উপাদানগত পরিবর্ত্তন ও সুগন্ধ নষ্ট হয়। দুগ্ধ উত্তমরূপে ফোটানই রক্ষণের প্রকৃষ্ট উপায়। দুগ্ধকে এরূপভাবে গরম করা উচিত যাহাতে উপাদানগত কোন পরিবর্ত্তন না হইয়া কেবল বীজাণু সমূহ বিনাশ পাইতে পারে। সাধারণতঃ দুইটী উপায়ে এরূপ করা যাইতে পারে। এই দুই উপায়ের নাম প্যাসটুরাইজেস্‌ন্ (Pasturisation) ও ষ্টেরিলাইজেসন্ (Sterilisation.)

প্যাসটুরাই-জেসন্।

দুগ্ধ প্যাসটুরাইজ করিবার উদ্দেশ্য উপাদানগত পরিবর্ত্তন না করিয়া যথাসাধ্য বীজাণুশূন্য করা। পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে প্যাসটুরাইজ করিবার সময় উত্তাপ ১৮৫ ডিগ্রী ফারেনহাইটের অধিক কিংবা ১৪০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের কম হওয়া উচিত নয়। প্যাসটুরাইজ করিবার জন্য দুগ্ধ বোতলে পুরিয়া তূলা দ্বারা

মুখ বন্ধ করিতে হইবে। পরে বোতলের গলা পর্য্যন্ত ১৪৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট* গরম জলে অর্দ্ধঘণ্টা কিংবা ১৬৭ ডিগ্রী গরম জলে ১৫ মিনিট কাল ডুবাইয়া পরে তাড়া-তাড়ি ৫০ ডিগ্রী কিম্বা তদপেক্ষা শীতল জলে ডুবাইয়া ঠাণ্ডা করা উচিত।

ষ্টেরিলাই-জেসন্।

ষ্টেরিলাইজড্ দুগ্ধ অর্থাৎ অধিক উত্তাপে বীজাণুশূন্য করা দুগ্ধ। সকল সময়ে দুগ্ধকে একবার ফুটাইয়াই ষ্টেরিলাইজ করিয়া লওয়া হয় না। উপর্য্যুপরি দুই তিন দিন ফুটান হয়। একবার ফুটাইয়া দুগ্ধকে ষ্টেরিলাইজ বা বীজাণুশূন্য করিতে হইলে ১৫ মিনিট হইতে ৩০ মিনিটকাল উত্তমরূপে ফুটান উচিত। সাধারণ ব্যবহারের জন্য দুগ্ধ উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইলেই যথেষ্ট। উষ্ণপ্রধান দেশে ষ্টেরিলাইজ দুগ্ধ প্যাসটুরাইজ দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক দিন মিষ্টস্বাদ যুক্ত থাকে। উপরোক্ত দুই প্রকার দুগ্ধই পরিষ্কার ও এয়ারটাইট বোতলে রক্ষা করা উচিত তাহা না হইলে ইহাতে বীজাণু জন্মাইয়া থাকে।

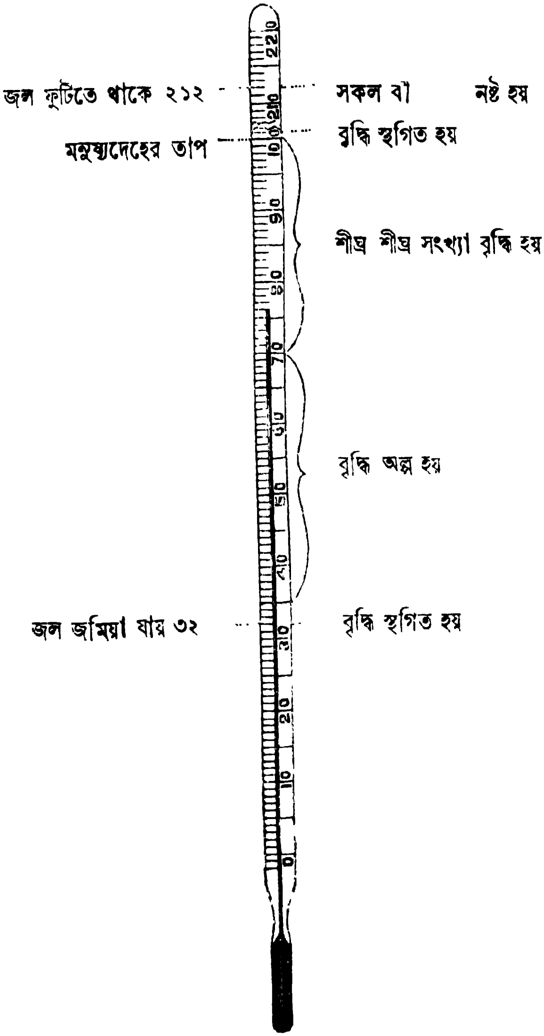
কত উত্তাপে দুগ্ধের কোন বীজাণু বিনষ্ট হয়।

ডিপথিরিয়া	(১৩৬ ডিগ্রী) ১০ মিনিট
টাইফয়েড	(১৩৩ „) „ „
নিউমোকক্কাশ	(১২৫ „) „ „
কোলাই কমিউনিস্	(১৪০ „) „ „
ল্যাক্‌টিক এসিড্	(১৩৩ „) „ „
ষ্টাফিলোকক্কাই	(১৩৫ হইতে ১৪৪ „) „ „

যক্ষ্মা বীজাণু।

উপরিলিখিত তালিকায় যক্ষ্মা বীজাণু কত উত্তাপে বিনষ্ট হয় তাহার উল্লেখ নাই। এখনও বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। কিন্তু ফুটন্ত জলের উত্তাপে ১ মিনিট কিম্বা ১০৭ ডিগ্রী উত্তাপে ১০ মিনিট কাল রাখিলে দুগ্ধস্থিত যক্ষ্মা বীজাণু সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ১৪০ ডিগ্রীর কম উত্তাপে এই সকল বীজাণু বিনষ্ট হয় না।

* সাধারণতঃ উত্তাপ পরীক্ষার জন্য আমরা যে সকল থার্ম্মোমিটার ব্যবহার করি, তাহাদিগকে ফারেণহাইট থার্ম্মোমিটার বলে।



জীবাণুর উপর উত্তাপের প্রভাব

ফারেনহাইট থার্ম্মোমিটার।

অঙ্কিত থার্ম্মোমিটারে ০ ডিগ্রি হইতে ২২০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত দাগ আছে। ৩২ ডিগ্রীতে জল জমিয়া বরফ হয় এবং ২১২ ডিগ্রীতে ফুটিয়া থাকে। আমরা জর পরীক্ষার জন্য যে থার্ম্মোমিটার ব্যবহার করি তাহাতে কেবল ৯৫ হইতে ১১০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত দাগ দেওয়া থাকে।

১৭০ ডিগ্রী উত্তাপে ১০ মিনিট রাখিয়া দিলে দুগ্ধের সমস্ত রোগ বীজাণু বিনষ্ট হইয়া যায়। দুগ্ধের অম্লত্ব উৎপাদনকারী ও পচনকারী বীজাণু সমূহ ১৫ মিনিটকাল ১১৪ ডিগ্রী উত্তাপে রাখিলেই বিনষ্ট হয়।

দুগ্ধের আমিষ জাতীয় উপাদানের উপর উত্তাপের কার্য্য ঃ—

উত্তাপদ্বারা দুগ্ধের ছানা বাঁধার ক্ষমতা কমিয়া যায়। ফুটাইলে ক্যালসিয়াম পৃথক হয় বলিয়াই এরূপ হইয়া থাকে। উত্তাপের ফলে দুগ্ধস্থিত ল্যাক্‌টো-আলবুমেন জমিয়া যায়। এই ল্যাক্‌টো আলবুমিন জমিয়াই দুগ্ধের সর হয়। অতি সামান্য উত্তাপেই দুগ্ধের ল্যাক্‌টো আলবুমিনের এই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয় এবং উত্তাপ বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অধিক উত্তাপে দুগ্ধের ফস্ফরাস ভাগ পৃথক হইয়া "গ্লিসারো ফস্ফোরিক এসিডে" পরিবর্ত্তিত হয়।

দুগ্ধের সর।

স্নেহ জাতীয় উপাদানের উপর উত্তাপের কার্য্য ঃ—

ফুটাইলে দুগ্ধস্থিত মাখনের অংশ বিন্দুভাবে পৃথক হইয়া যায়। এই কারণে ফুটান দুগ্ধের উপর বিন্দু বিন্দু স্নেহ পদার্থ ভাসিতে দেখা যায়।

দুগ্ধ শর্করার উপর উত্তাপের কার্য্য ঃ—

অধিক উত্তাপে দুগ্ধ শর্করার কতক অংশ পুড়িয়া যায়। ১৭০ ডিগ্রীর কম উত্তাপে এই পরিবর্ত্তন হয় না। ফুটান অধিক হইলে পরিবর্ত্তনও অধিক হয়। এই পরিবর্ত্তনের জন্য খুব ফুটান দুগ্ধে একপ্রকার গন্ধ ও আস্বাদ অনুভূত হয়।

খনিজ উপাদানের উপর উত্তাপের কার্য্য ঃ—

উত্তাপ দ্বারা দুগ্ধস্থিত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের কতক অংশ সাইট্রিক এসিডের সহিত ও কতক অংশ ফস্ফোরিক এসিডের সহিত মিলিত ভাবে পৃথক হইয়া পড়ে।

দুগ্ধের বিভিন্নতা ঃ—

দিন দুইবার দোহন করিলে প্রাতের অপেক্ষা সন্ধ্যার দুগ্ধে স্নেহ জাতীয় উপাদানের আধিক্য দৃষ্ট হয়। গাভীর অনেকক্ষণ ঠাণ্ডায় থাকা, জলে ভেজা কিংবা গরমে থাকা প্রভৃতি কারণে দুগ্ধের উপাদানের ও পরিমাণের তারতম্য হয়। বিভিন্ন জাতীয় গোদুগ্ধের উপাদানেরও বিভিন্নতা দেখা যায়।

সুস্থ গাভীর দুগ্ধে যে সকল উপাদান থাকে, রোগগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধে তাহা ব্যতীত অন্য দ্রব্যাদিও থাকিতে পারে। এই সকল দ্রব্য তাহাদের খাদ্য হইতে আসে। অনেক সময় দুগ্ধে গাভীর খাদ্য গাছপালা ও শস্যের গন্ধ অনুভূত হয়। গাভীকে অধিক পরিমাণ সুরাসার পান করাইলে তাহা দুগ্ধের সহিত নির্গত হয়। গন্ধপূর্ণ স্থানে অনেকক্ষণ রাখিয়া দিলে দুগ্ধেও গন্ধ অনুভূত হয়।

ডেঙ্গুজ্বর।

কলিকাতায় আজকাল ডেঙ্গুজ্বরের খুব প্রাদুর্ভাব। এই জ্বরের আক্রমণ হইতে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি অব্যাহতি পাইতেছেন। কলিকাতায় আরম্ভ হইয়া এই রোগ ক্রমশঃ বঙ্গের অন্যান্য স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

গত বৎসরেও অল্পমাত্রায় ডেঙ্গুজ্বর প্রকাশ পাইয়াছিল। এদেশে বহুকাল পূর্ব্বে আরও দুই একবার ইহা সংক্রামক রূপে দেখা দিয়াছে। ভারতবর্ষ ব্যতীত আমেরিকা দেশেও ডেঙ্গুজ্বর মধ্যে মধ্যে প্রকাশ পায়।

জ্বরের লক্ষণ।

ডেঙ্গু মারাত্মক ও বহুকালস্থায়ী না হইলেও অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি। এ জ্বরে সকলের একরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভূত হইয়া হঠাৎ জ্বর আসে। জ্বর ১০৪।৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিতে পারে।

মস্তকে সাতিশয় যন্ত্রণা বোধ হয় এবং হস্ত পদাদির সংযোগ স্থলে বেদনার জন্ত রোগীর পক্ষে উঠা বসা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অনেকের জ্বর আসিবার সময় কম্প হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ বমি করিয়া থাকেন। জ্বরের সময় মুখমণ্ডলে ও শরীরের অন্যান্য স্থানের চর্ম্ম কখন কখনও স্ফীত এবং রক্তবর্ণ হয়।

তিন চার দিন কষ্ট ভোগের পর জ্বর ছাড়িয়া যায়, এবং এই সময় কোন কোন রোগীর নাসিকা ও দাঁতের মাড়ি হইতে রক্ত নির্গত হয়। কাহারও পেটের পীড়া হইয়া থাকে। এই সময়ে রোগীর যন্ত্রনার অনেক লাঘব হয় এবং রোগী সারিয়া গিয়াছে বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। তিন হইতে সাত দিন পর্য্যন্ত অসুখ এইরূপ সুস্থাবস্থায় থাকে তৎপরে পুনরায় বেদনা অনুভূত হইয়া জ্বর আসে এবং হাতের তালু ও বাহুদ্বয়ে ইরপ্‌সন (Eruption) নির্গত হয়। পরে ক্রমে ঘাড়ে, মুখে ও সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। কাহারও এই সকল ইরপ্‌সন্ অত্যন্ত চুলকায়। দ্বিতীয়বারের জ্বর অধিকাংশ স্থলে দুই দিনের অধিক স্থায়ী হয় না। গায়ের দাগ মিলাইতে সাত আট দিন পর্য্যন্ত সময় লাগে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সকলের একরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কোন স্থলে এই দ্বিতীয়বারের জ্বর মোটেই হয় না। কাহারও বা ইরপ্‌সন একেবারেই হয় না। গাত্রের বেদনা ও মস্তকের যন্ত্রনা প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে। অনেকের সর্দ্দি ও বুকে বিশেষরূপ বেদনা অনুভূত হয়। এরূপ স্থলে ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হইতে পারে।

দ্বিতীয়বার জ্বরের সময় অনেকের গ্রন্থী সমূহ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়। দাঁতের মাড়িতেও ঘা হইতে দেখা যায়। ডেঙ্গুজ্বরে ছেলেদের প্রায়ই তড়কা হইয়া থাকে। উপর্য্যুপরি দুই তিনবার ডেঙ্গু হইয়াছে এরূপ রোগীও বিরল নহে। দুগ্ধপোষ্য শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেরই এই রোগ হইতে পারে।

কারণ।

আজিও ডেঙ্গুজ্বরের কারণ নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। কলিকাতার বিচক্ষণ ডাক্তারদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছে। অধিকাংশ

ডাক্তারের মত যে, ইহা বীজাণু ঘটিত রোগ, কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও এই বীজাণু আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই তজ্জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই বীজাণু অণুবীক্ষণেরও অগোচর। অনেকের মতে ডেঙ্গুর বীজাণু ম্যালেরিয়া বিষের ন্যায় মশকের সাহায্যে মনুষ্যের শরীরে প্রবেশ করে। এবারের ডেঙ্গু সংক্রামকরূপে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে কলিকাতা সহরে মশকের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছিল।

ডেঙ্গু ছোঁয়াচে রোগ কিনা সে সম্বন্ধে এখনও সন্দেহ আছে। কলিকাতার দুই একজন বিচক্ষণ ডাক্তারের মত যে, আজকাল যে ডেঙ্গুজ্বর দেখা যাইতেছে তাহা কেবলমাত্র ডেঙ্গু বীজাণু ঘটিত নহে ইহার সহিত অন্য বীজাণুরও সংমিশ্রণ আছে। যাহা হউক ডেঙ্গুর কারণ সম্বন্ধে এখনও কিছুই নিশ্চিত স্থিরীকৃত হয় নাই।

চিকিৎসা।

ডঙ্গুর চিকিৎসা মোটেই সন্তোষজনক নহে। ডেঙ্গু বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে, তাহা নষ্ট করিতে পারে এরূপ কোন ঔষধই আমাদের জানা নাই। কাজেই ডেঙ্গুর ভোগকাল সম্পূর্ণ না হইলে ঔষধের দ্বারা আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। তবে ঔষধের সাহায্যে যন্ত্রণার শান্তি হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন কুইনাইন বা "এসপিরিন" খাইলে প্রথমাবস্থাতেই ডেঙ্গু আরোগ্য হইতে পারে। "এসপিরিন" খাইলে অনেক সময় যন্ত্রণার লাঘব হয় বটে কিন্তু আরোগ্যের সম্ভাবনা অল্প। জ্বরের সময় অত্যান্ত মাথা ধরা ও গাত্র বেদনা থাকিলে 'নানালা' ব্যবহার করিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা দূর হয়। মাথায় জল মিশ্রিত অডিকলোন দিলে যন্ত্রণার অনেক লাঘব হয়। জ্বর ১০৩ ডিগ্রীর উপরে উঠিলে এবং শিশুদিগের তড়কা দেখা দিলে মাথায় বরফ দেওয়া কর্ত্তব্য। মস্তকের যন্ত্রণা অত্যাধিক হইলেও বরফ দেওয়া যাইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে "সিটলিজ পাউডার" কিংবা অন্য কোন মৃদু বিরেচক দেওয়া আবশ্যক। পেটের অসুখ হইলে "বিসমথ" কিংবা "চক্ মিক্সচার" দেওয়া যাইতে পারে। ডেঙ্গু জ্বরের সকল অবস্থাতেই "ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট্" বিশেষ উপকারী। প্রত্যেকবারে ১০ হইতে ২০ গ্রেণ করিয়া দিবসে তিনবার দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে দাঁতের মাড়ি ও নাসিকা হইতে রক্ত পড়িবার সম্ভাবনা কম হয় এবং

ইরপসনও অধিক হইতে পায় না। অত্যাধিক চুলকানি থাকিলে ইহা দেওয়া উচিত। কাহারও মতে নুনের জল দিয়া গা ধুইয়া ফেলিলে ডেঙ্গুর চুলকানি লাঘব হয়। ডেঙ্গুর পর গ্রন্থী স্ফীতি হইলে অল্প মাত্রায় "পোটাসিয়াম আইওডাইড" উপকারী। কোন্ এক স্থানে বেদনা থাকিয়া গেলে "টিংচার আইওডিন" দেওয়া কর্ত্তব্য। ডেঙ্গুর পর অনেকের কিছুদিন যাবৎ অরুচি থাকে। ক্ষুধামান্দ্যের জন্য চিরেতা কিম্বা "জেন্‌সিয়ান্‌" দিলে সুফল পাওয়া যায়। দুর্ব্বলতার জন্য "ইষ্টন-সিরাপ" কিম্বা লৌহ সংযুক্ত অন্য কোন ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। কোন কোন সময়ে রোগীর বায়ু পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইয়া পড়ে। ডেঙ্গু নিজে মারাত্মক ব্যাধি না হইলেও শরীর দুর্ব্বল করিয়া দিয়া অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধির পথ প্রশস্ত করে। এই জন্য দেখা যায়, যে বৎসর ডেঙ্গু হইয়াছে সে বৎসরে মৃত্যু সংখ্যাও অধিক।

কলিকাতার হেলথ্ অফিসারের (Health Officer) মত।

ডেঙ্গুজ্বরের নিদান এবং তাহার প্রতিবিধান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া হেলথ্ অফিসার ডাক্তার ফ্রেডারিক পিয়ার্স বলিয়াছেন যে, কলিকাতায় আজ কাল যে জ্বরের প্রাবল্য পরিদৃষ্ট হইতেছে, জনসাধারণ তাহাকে ডেঙ্গুজ্বর বলিয়া উল্লেখ করিলেও উহা প্রকৃত ডেঙ্গু কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। এই জ্বর সাধারণতঃ সংক্রামকভাবেই দেখা দেয়, এক একটা বাটীতে সকলেই এই জ্বরের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং কেহ বা ৩।৪ দিন ও কেহ বা ৭।৮ দিন পরে আরোগ্য লাভ করে। এ পর্যন্ত একটী অল্পবয়স্ক শিশু ব্যতীত কেহই এই জ্বরে মারা পড়ে নাই, সুতরাং ইহাকে মারাত্মক রোগ বলা সঙ্গত নহে। মশক ছারপোকা অথবা অন্য কোন কীট পতঙ্গের সাহায্যে এই জ্বরের বিষ এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রামিত হয় না, কিরূপে সংক্রামিত হয়, তাহা জানা যায় নাই। এরূপ অবস্থায় এই জ্বরের সংক্রামকতা নিবারণের জন্য, কেবল অনুমান বা সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ প্রতিকারে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তাহাতে রোগের প্রতিকার হউক আর না হউক অনর্থক অর্থের অপব্যয় এবং করদাতাদিগকে বিরক্ত করা হইবে।

ডেঙ্গু সম্বন্ধে উপরোক্ত মতের সহিত সকল ডাক্তারের মতের মিল নাই।

বিবিধ সংগ্রহ।

স্বাস্থ্য সংস্কার—বিলাতের লর্ড সভাতে লর্ডক্রু জানাইয়াছেন যে ভারতের স্বাস্থ্য সংস্কারের জন্য আপাততঃ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা হইবে; (১) ৯ জন স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উক্ত শ্রেণীর ডেপুটী কমিসনার নিযুক্ত হইবে। এই পদে ভারতবাসী নিযুক্ত হইতে পারিবে। (২) ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে এই জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে অর্থ সাহায্য করা হইবে। (৩) ম্যালেরিয়া দমনের উপায় সম্বন্ধে লোক শিক্ষার জন্য প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইবে।

বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিবরণীতে প্রকাশ—গত ১৯১১ সালে বঙ্গদেশে কলেরা রোগে ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৫ শত ৬০ জন, বসন্ত রোগে ৪ হাজার ৭ শত ৪১ জন, প্লেগে ৪৬ হাজার ৫ শত ৮৪ জন, জ্বরে ১০ লক্ষ ৮১ হাজার ৩ শত ৪৯ জন ও অন্যান্য রোগে ৫৯ হাজার ৩ শত ১৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

বঙ্গের জেলখানা—১৯১১ সালে পূর্ব্ববাঙ্গালা ও আসামের জেলখানায় মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ৩০.৭ এবং বাঙ্গালার মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ১৭.৯ হইয়াছিল। ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল বলিয়াছেন, পূর্ব্ববাঙ্গালা ও আসামের জেলে বাসস্থান অপেক্ষা কয়েদীর সংখ্যা অধিক হওয়াতেই মৃত্যু সংখ্যা বেশী হইয়াছে।

প্লেগের প্রতিষেধ—সংবাদ পত্রে প্রকাশ, ফরিদকোটে আইওডাইন সেবন করিয়া ও উহার প্রলেপ দিয়া এবং ইন্দুরের গর্ত্তে ধূম প্রবেশ করাইয়া ইন্দুর বংশ ধ্বংস করিয়া, প্লেগের প্রকোপ অনেক কমিয়াছে।

মুষিক বংশ ধ্বংস—গত এপ্রেল, মে এবং জুন মাসে কলিকাতায় ১ম, ২য়, ও ৩য় ডিষ্ট্রিক্টে মোট ১৭ হাজার ৮ শত ৮৯ টা মুষিক বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর ৬০০ টাকা বক্‌শীস খরচ হইয়াছে।

প্লেগে মৃত্যু—বিলাতের পার্লামেণ্টের কমন্স সভার এক প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ পাইয়াছে যে ১৯০১ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে মোট সাড়ে বাহাত্তর লক্ষ লোক প্লেগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

জন্ম রেজেষ্টারী—গত ১৯১১ সালে বঙ্গদেশে ২০ লক্ষ ৯৯ হাজার ৫ শত ৭২ জনের জন্ম রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। ১৯১০ সালে ২০ লক্ষ ৭ হাজার ২ শত ২২ জনের জন্ম রেজেষ্টারি হইয়াছিল।

মৃত্যু রেজেষ্টারী—গত ১৯১১ সালে বঙ্গদেশে ১৭ লক্ষ ১৫ হাজার ৪ শত ১৯ জনের মৃত্যু রেজেষ্টারী হয়। ১৯১০ সালে ১৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৬ শত ৪০ জনের মৃত্যু রেজেষ্টারী হইয়াছে।

—o—

ম্যালেরিয়ার নিদান—ডাক্তার ফ্রাই যশোহর, কটক, পুরী প্রভৃতি কয়েকটী ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থান পরিদর্শন করিয়া তাহার নিদান স্থির করিয়াছেন। তিনি বলেন বঙ্গদেশে মশককুলকে নির্ম্মূল করা যাইবে না। তবে অন্য কয়েকটী উপায় দ্বারা তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হইবে। (১) স্কুলে ম্যালেরিয়ার নিদান শিক্ষা, (২) কুইনানের যশোকীর্ত্তন, (৩) লোকদিগকে ম্যালেরিয়ার নিদান শিক্ষা দেওয়া, (৪) কুইনাইন বিতরণ, (৫) পচা জল নিকাশের উপায় শিক্ষা দেওয়া। অনেক জায়গায় এই উপায় অবলম্বন করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে।

—o—

মশক ধ্বংসের উপায়—কলিকাতা মিউজিয়মের মৎস্য বিভাগের শ্রীযুক্ত বি, এল, চৌধুরী মহাশয় কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাবে সম্প্রতি একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

তিনি বলেন আমাদের দেশে যে "তেচোকো" মৎস্য পাওয়া যায় তাহা ম্যালেরিয়া মশক শাবক ধ্বংস করিতে বিশেষ পারদর্শী। এই মৎস্যকে পূর্ব্ববঙ্গে 'কাল পোনা' বলে। ইহা অতিশয় ক্ষুদ্র এবং প্রায় জলের উপরেই ভাসমান থাকে। স্বল্পগভীর জলেও ইহারা অনায়াসে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ইহাদিগকে ধরা সাতিশয় দুরূহ ব্যাপার। পুষ্করিণীর জল পানীয় রূপে ব্যবহৃত হইলে তাহাতে মশক শাবক ধ্বংসের জন্য কেরোসিন তৈল দেওয়া চলে না। এইরূপ স্থলে পুষ্করিণীতে "তেচোকো" মৎস্য ছাড়িয়া দিলে মশক ধ্বংসের বিশেষ সহায়তা হইতে পারিবে।

ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি—বাঁকুড়া, বৈতল সদালোচনী সভার সম্পাদক মহাশয় আমাদিগকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, স্বাস্থ্য-সমাচারের উপদেশানুযায়ী স্থানীয় চিকিৎসক মহাশয়ের বিশেষ উৎসাহে কর্ম্মী সভ্যগণকে লইয়া একটী ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি গঠিত হইয়াছে। সাধারণের পক্ষ হইতে মফস্বলের প্রত্যেক স্থানেই এইরূপ সমিতি গঠন করা উচিত।

তামাকের অপকারিতা—বিলাতের ল্যানসেট নামক ডাক্তারী পত্রিকায় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ফারাণ্ট একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন "কানে যাঁহারা কম শুনেন, তামাক ব্যবহার করিলে, তাঁহাদের বধিরতা বাড়িয়া উঠিবে।" "যাঁহারা দোক্তা ব্যবহার করেন, তাঁহাদেরও অবস্থা ঐরূপ হইবে।" "যাহারা কানে কম শুনেন, তাহাদের তামাক পরিত্যগ করা উচিত।"

রোগ ও মৃত্যু—পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গবেষনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, প্রতি দশ লক্ষে গড়ে ৯০০ লোক বার্দ্ধক্য বা জরায়, ১২০০ লোক গ্রন্থিস্ফীত রোগে, ১৮৪০০ লোক হামে, ২৭০০ লোক সন্ন্যাস রোগে, ৭০০০ লোক দুষ্ট ব্রণ রোগে, ৭৫০০ লোক যক্ষ্মারোগে, ৪৮০০ লোক স্কার্লেট জ্বরে, ২৫০০০ লোক কাশিতে, ৩০০০ লোক টাইফয়েড্ রোগে এবং ৭০০০ লোক সাধারণ বাতরোগে দেহত্যাগ করে।

কুষ্ঠাশ্রম—কাশীর স্বামী দিনানন্দের যত্নে গত ১৫ই শ্রাবণ ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার রাজঘাটস্থ পুরাতন হাঁসপাতালে "কাশী কুষ্ঠাশ্রম" স্থাপিত হইয়াছে।

———o———

দীর্ঘজীবির দেশ—বুলগেরিয়া তুরস্কের একটী প্রদেশ ছিল, কয়েক বৎসর হইল স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এই দেশকে দীর্ঘজীবির দেশ বলা হয়। সমস্ত দেশে মোট ৩০ লক্ষ লোকের বাস। এই ক্ষুদ্র দেশের ১০ জনের বয়স ১২৫ পার হইয়াছে। ৮৮ জনের বয়স ১২০ ও ১২৫এর মধ্যে। ২৩৪ জনের বয়স ১১০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। অল্পদিন হইল এই দেশে একজন ১৩৯ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস যে এই বুলগেরিয়ার লোকে খুব দধি খায় তাই তাহারা দীর্ঘজীবি।

———o———

সাদাসিধা আহার—কাপ্তেন ওলটারকারি নামক এক ব্যক্তি সম্প্রতি সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে সাদাসিধা আহারই মানব শরীর রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট এবং ইষ্টকর। মদ্য মাংস শরীরের পক্ষে উপকারী বা প্রয়োজনীয় নহে। তুর্ক সৈন্যগণ মদ্য মাংস স্পর্শ করে না, অথচ সমগ্র ইউরোপে ইহাদের তুল্য বলশালী সৈন্য কোথাও নাই। লোহিত সাগর এবং সুয়েজ খালের তীরবর্ত্তী অধিবাসীরাও মদ্য মাংসের বিপক্ষপাতী অথচ ইহারাও খুব পরিশ্রমী।

———•———

জাপানের স্বাস্থ্যনীতি—জাপানের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নলিখিত উপদেশগুলি স্থানীয় সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্বতন্ত্র কাগজে মুদ্রিত করিয়া পল্লীগ্রামে সহস্র সহস্র খণ্ড বিতরণ করিতেছেন।—

(১) গৃহের বাহিরে উন্মুক্ত স্থানে যতক্ষণ পারিবে অবস্থান করিবে। দীর্ঘকাল রৌদ্র সেবন করিবে এবং ব্যায়াম করিবে। তোমার নিঃশ্বাস যাহাতে গভীর ও নিয়মিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

(২) ডিম্ব, উদ্ভিদ, ফল এবং টাট্‌কা দুগ্ধ তোমার প্রধান খাদ্য ও পানীয় হইবে। টাট্‌কা দুগ্ধ যত অধিক পার পান করিবে। খাদ্যদ্রব্য রীতিমত চর্ব্বন করিবে এবং দিবারাত্রির মধ্যে একাধিকবার মাংস ভোজন করিবে না।

(৩) প্রত্যহ স্নান করিবে। এবং যদি সহ্য করিতে পার, সপ্তাহে একবার বা দুইবার ভ্যাপরা লইবে।

(৪) নিতান্ত মসৃণ বস্ত্র ব্যবহার করিবে না, কার্পাস বস্ত্রই প্রশস্ত। মাথায় টুপি যেন অধিক ভারী না হয় এবং জুতার ভিতরে পদদ্বয় যেন স্বচ্ছন্দে থাকে।

(৫) অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগরণ করিবে না এবং প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিবে।

(৬) গাঢ় অন্ধকারময় এবং শব্দহীন কক্ষে নিদ্রা যাইবে, কক্ষের বাতায়নগুলি খুলিয়া রাখিবে। পুরুষের পক্ষে অন্যূন সাড়ে ছয় ঘণ্টা ও স্ত্রীলোকের পক্ষে অন্যূন সওয়া আট ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া উচিত।

(৭) প্রতি সপ্তাহে একদিন সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম করিবে, সে দিন কোনরূপ লেখা পড়ার কার্য্য করিবে না।

(৮) ক্রোধ, হর্ষ প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনা পরিহার করিবে। ভবিষ্যতের চিন্তা করিয়া অথবা দৈব কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিবে না। মন্দ কথা বলিও না অথবা মন্দ কথায় কর্ণপাত করিও না। মন্দ বিষয়ের আলোচনা পরিত্যাগ করিবে।

(৯) অবিবাহিত থাকিও না। বিধবা অথবা বিপত্নীকগণ যত সত্বর সম্ভব পুনরায় বিবাহ করিবে।

(১০) সুরা বা তামাক দূরের কথা অতিরিক্ত মাত্রায় চা অথবা কাফি পর্য্যন্ত পান করিও না।

(১১) যে গৃহ অত্যন্ত উষ্ণ অথবা যে কক্ষে বায়ু যাতায়াত নাই, সেই কক্ষে বাস করিবে না।

(১২) মধ্যে মধ্যে দূরবর্ত্তী স্থানে ভ্রমণ করিতে যাইবে এবং যখন যেখানে উপস্থিত হইবে, তখনই মনে করিবে, যেন সেই স্থানেই তোমাকে জীবনের অবশিষ্ট-কাল বাস করিতে হইবে। এবং যখন যে স্থানেই যাও না কেন, সেই স্থানে কাহারও না কাহারও কিছু উপকার করিবে, স্থানীয় অধিবাসীদিগের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করিবে এবং সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবে।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্"।

প্রথম বর্ষ। } আশ্বিন ১৩১৯ সাল { ষষ্ঠ সংখ্যা

আহারের মাত্রা নিরূপণ।

গত শ্রাবণ মাসের "স্বাস্থ্য-সমাচারে" আমরা পরিপাক ও পুষ্টি নামক প্রবন্ধে বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য দ্রব্যাদির আধিক্য ও অল্পতা বশতঃ শরীরে কি কি পরিবর্ত্তন হয় তাহা বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে কি পরিমাণে বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য দ্রব্যাদি আহার করিলে আমরা সুস্থ ও সবল দেহে দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতে পারি তাহার আলোচনা করিব।

খাদ্যের মাত্রা নিরূপণ অতি দুরূহ ব্যাপার। ভিন্ন ভিন্ন কারণ ভেদে খাদ্য দ্রব্যাদির পরিমাণের তারতম্য হইতে দেখা যায় যথা—

খাদ্যের মাত্রার তারতম্য

১। দেশ ভেদে—শীত প্রধান দেশে শরীর হইতে অধিক মাত্রায় উত্তাপ বহির্গত হয় বলিয়া তাপ উৎপাদনকারী খাদ্য দ্রব্য বেশী খাইতে পারা যায়। ল্যাপল্যাণ্ড ও গ্রীণল্যাণ্ড দেশের অধিবাসীগণ তিমি মৎস্যের তৈল খাইয়া থাকে।

২। ঋতু ভেদে—পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ শীতকালে আমাদের খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই সময় আমরা স্নেহজাতীয় খাদ্য যথেষ্ট আহার করিয়া থাকি।

৩। পরিশ্রম ভেদে—যাহারা বেশী শারীরিক পরিশ্রম করে তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে শালিজাতীয় খাদ্য খাইতে হয়। আমাদের দেশের মুটেমজুর ও কৃষকেরা অধিক পরিমাণে ভাত খাইয়া থাকে।

৪। স্ত্রী পুরুষ ভেদে—স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা কিছু কম খাইয়া থাকে। কিন্তু বেশী পরিশ্রম করিলে, স্ত্রীলোকে পুরুষের সমান বা বেশীও খাইতে পারে।

৫। বয়স ভেদে—নিতান্ত শৈশবাবস্থায় একবৎসর পর্য্যন্ত শিশুর দুগ্ধই একমাত্র আহার। আট বৎসর পর্য্যন্ত দুগ্ধই প্রধান আহার ও তাহার সহিত শালিজাতীয় খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা শিশু ও যুবার আহারের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। কারণ শিশু ও যুবার শরীরের দৈনিক বৃদ্ধি আছে কিন্তু ৩০ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে শরীর আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। সকল বয়সেই (বিশেষতঃ প্রৌঢ়াবস্থায়) অধিক ভোজন প্রভৃত অনিষ্টের কারণ।

সাধারণতঃ সকলে সমান খায় না কেহ অল্প খাইয়া বেশ সুস্থ সবল ও কার্য্যক্ষম থাকেন কেহ বা অধিক পরিমাণে খাইয়া থাকেন। ইহা কেবল অভ্যাসের ফল মাত্র।

সাধারণ লোকের বিশেষতঃ আমাদের দেশের মেয়েদের বিশ্বাস যে, যত বেশী খাইবে ততই হৃষ্টপুষ্ট হইবে ও শরীর নীরোগ থাকিবে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল।

আহারের মাত্রা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

আজকাল কোন কোন উচ্চউপাধিধারী ডাক্তারদের মত যে, যত আমিষ জাতীয় খাদ্য দ্রব্য বেশী খাইবে ততই শরীরের গঠন ও পুষ্টি সুসম্পাদিত হইবে এজন্য আমাদের বাঙ্গালী ছাত্রেরা মাংস খাইতে পায় না বলিয়া দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। যদি এই জাতিকে উন্নত করিতে চাও তবে ছাত্র ও যুবকদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে মাংস খাইতে দাও। ইহাই একমাত্র ভবিষ্যৎ বাঙ্গালি জাতির উন্নতির উপায়।

খাদ্যের মাত্রা নিরূপণ করিবার উপায়

খাদ্যের মাত্রা কিরূপ হওয়া উচিত পণ্ডিতগণের মধ্যে তাহার মোটেই মতৈক্য নাই। এমন কি, কি উপায় অবলম্বন করিলে আহারের মাত্রা নিরূপণ করা যাইতে পারে সে বিষয়েই বিলক্ষণ মতভেদ রহিয়াছে।

প্রথম উপায়

পৃথিবীর কোন জাতি কোন দ্রব্য কি কি পরিমাণে আহার করে এবং তাহারা কিরূপ কার্য্যক্ষম ও তাহাদের শরীরের গঠন ও বল কিরূপ তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে আমাদের কি পরিমাণ খাদ্য দ্রব্যের আবশ্যক তাহা অনেকটা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র উপরি উক্ত উপায়ে খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ নিরূপণ করিলে আমরা অনেক সময় ভ্রমে পতিত হইব। কারণ আমাদের শরীরের বল ও বৃদ্ধি কেবলমাত্র খাদ্যের উপর নির্ভর করে না। কাবুলীর ন্যায় আহার করিলেই যে বাঙ্গালীর শরীরের গঠন ও বল কাবুলীর ন্যায় হইবে এইরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র। দেশভেদে, জাতিভেদে ও ব্যায়ামের অনুপাতে শরীরের গঠন ও বল বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগও কখনও কখনও দেশবাসীর শারীরিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হইতে পারে।

দ্বিতীয় উপায়

খাদ্যের পরিমাণ নিরূপণ করিবার আরও একটী উপায় আছে। আমাদের শরীর নিরন্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে; এই ক্ষয় পূরণের জন্যই খাদ্যের আবশ্যক। ক্ষয়ের পরিমাণ নিরূপণ করিতে পারিলে খাদ্যেরও পরিমাণ নিরূপণ করা যাইতে পারিবে। দেহ ক্ষয় জনিত পদার্থ সমূহ মূত্র, ঘর্ম্ম, প্রশ্বাস বায়ু, মল ইত্যাদির সহিত শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। নাইট্রোজেন ও কার্ব্বন দেহক্ষয় জনিত পদার্থ সমূহের প্রধান উপাদান। মূত্রাদি পরীক্ষা করিলে নাইট্রোজেন ও কার্ব্বনের পরিমাণ নিরূপণ করা যাইতে পারে। এস্থলে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে শরীর ক্ষয় জনিত নাইট্রোজেন ব্যতীত খাদ্য হইতে উদ্বৃত্ত নাইট্রোজেনও প্রস্রাব ও মলের সহিত নির্গত হয়। এই নাইট্রোজেন পৃথক্ ভাগে নির্ণীত করা যাইতে পারে।

দেহ ক্ষয় হইয়া শরীর হইতে যে নাইট্রোজেন নষ্ট হইয়া যায় আমিষ জাতীয় খাদ্য হইতে তাহার পূরণ হইয়া থাকে। শরীরে কার্য্য করিবার ক্ষমতা শালি-জাতীয় খাদ্য হইতে উদ্ভূত। এজন্য বুঝা যাইতেছে যে কেবলমাত্র আমিষ-জাতীয় খাদ্যে শরীর উপযুক্ত ভাবে কার্য্য করিতে পারে না। শরীরের নাইট্রোজেন সংযুক্ত উপাদানে ক্ষয় পূরণ করিতে যতটুকু আমিষ-জাতীয় খাদ্যের আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক আহার করা যুক্তি সঙ্গত নহে।

ক্ষয় জনিত নাইট্রোজেন নিরূপণ করিয়া যেরূপ আমিষ-জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারা যায় সেইরূপ শরীর হইতে নির্গত কার্ব্বন, জলীয়বাষ্প, শরীর হইতে উদ্ভূত উত্তাপ নিরূপণ করিয়া শালি-জাতীয় ও স্নেহ-জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যাইতে পারে। দৈনন্দিন কার্য্যের পরিমাণ করিলেও কতটা স্নেহ ও শালি জাতীয় খাদ্যের আবশ্যক তাহার একটা হিসাব হইতে পারে।

খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে পূর্ব্ব-পণ্ডিতগণের মত

Leibig এর মত

Leibig প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে আমিষ-জাতীয় খাদ্যই সর্ব্বপ্রধান; ইহা হইতেই আমাদের শরীরের সমস্ত শক্তি উৎপন্ন হয় অতএব খাদ্যে আমিষ জাতীয় দ্রব্যেরই প্রাধান্য থাকা উচিত। আজকাল কোন পণ্ডিতই এই মতের পক্ষপাতী নহেন। এখনকার মত যে শালিজাতীয় খাদ্য হইতে শরীরের কার্য্যকরী শক্তি উৎপন্ন হয়—আমিষ জাতীয় খাদ্য হইতে নহে।

Carl Voit এর মত

Carl Voit বলেন যে পৃথিবীর যাবতীয় কর্ম্মী ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আমিষ জাতীয় খাদ্য আহার করিয়া থাকেন। উক্ত খাদ্যের প্রভাবেই তাঁহাদের কার্য্যকরী ক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ ব্যক্তিবর্গ হইতে উন্নত এবং ইহাই তাঁহাদের জীবনে সাফল্য লাভের হেতু।

Voit এর মতে পরিমিত পরিশ্রমী পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রত্যহ নিম্নলিখিত পরিমাণে খাওয়া উচিত।

মাংস	...	...	...	দুই পোয়া।
ডিম্ব	...	...	...	দুইটা।

মাখন	এক ছটাক।
দুগ্ধ	আড়াই পোয়া।
আলু	দেড় পোয়া।
ময়দা	এক পোয়া।
চিনি	অর্দ্ধ ছটাক।

সামান্য চিন্তা করিয়া দেখিলেই Voitএর যুক্তির অসারতা উপলব্ধি হইবে।

Voitএর যুক্তির অসারতা

তিনি বলেন যে উত্তম খাদ্যই উন্নতি লাভের কারণ; কিন্তু লোকে অবস্থাপন্ন হইলেই মাংস প্রভৃতি মূল্যবান আহার্য্য সামগ্রী ব্যবহার করিয়া থাকে; অতএব খাদ্যই উন্নতির কারণ কিংবা উন্নতিই উত্তম খাদ্য ব্যবহারের হেতু নির্ণীত হওয়া দুরূহ ব্যাপার।

আমেরিকার Yale Universityর অধ্যাপক Chittenden সাহেব খাদ্য সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণা করেন। তিনি কলেজের অধ্যাপক, ছাত্র, মল্ল ও সৈনিক প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আমিষ জাতীয় খাদ্য দিয়া বহুকাল অবধি পরীক্ষা করেন।

আমেরিকার অধ্যাপক Chittendenএর মত।

Chittenden এই সকল ব্যক্তির আমিষ জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ অনেক কমাইয়া দেন। ইহারা সকলেই Voit নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে আমিষ ব্যবহার করিত; Chittenden পূর্ব্বের পরিমাণ কমাইয়া ৩ ভাগের ১ ভাগ করেন। বহুদিন যাবৎ এই সকল ব্যক্তিরা পরীক্ষাধীন ছিল। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে ইহারা সকলেই শারীরিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই বল বৃদ্ধি হইতে দেখা গিয়াছিল; সৈনিকগণের ওজনও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

Folinএর মত

Folin সাহেব মূত্রাদি পরীক্ষার দ্বারা শরীরের কতটা নাইট্রোজেন ক্ষয় হয় নিরূপণ করিয়া খাদ্যে কতটা আমিষ থাকা উচিত ঠিক করিয়াছেন। Folin ও Chittendenএর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ প্রায় সমান।

জাপানী অধ্যাপক Kintaro Oshimaর মত

বিখ্যাত জাপানী অধ্যাপক Kintaro Oshima পরীক্ষাদ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার সহিত Chittendenএর মতের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়।

জাপানীরা যে পরিমাণ আমিষ জাতীয় খাদ্য ব্যবহার করে তাহা Voit নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অল্প, অথচ এইরূপ খাদ্য ব্যবহার করা সত্ত্বেও জাপানীদিগের শারীরিক বা মানসিক কোন প্রকার অবনতি লক্ষিত হয় না। "ভেতো" জাপানীদের বলবীর্য্য ও বুদ্ধি সম্বন্ধে বলা নিষ্প্রয়োজন।

কলিকাতার মেডিকেল কলেজের শরীরতত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক ম্যাকে সাহেব বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ও খাদ্য সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষা করেন। তিনি বহুসংখ্যক কলেজের ছাত্র ও চাকর প্রভৃতির রক্ত, প্রস্রাব, শরীরের দৈর্ঘ্য, ওজন ও বল ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে বাঙ্গালীর শারীরিক পুষ্টি ইউরোপিয়ান অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তিনি বলেন যে ইউরেসিয়ান ছাত্রেরা পাঠ্যাবস্থায় বাঙ্গালী ছাত্র অপেক্ষা অনেক অধিক শারীরিক উৎকর্ষ লাভ করে। বাঙ্গালী কুলি মজুরের ইউরোপিয়ান কুলি মজুর অপেক্ষা কার্য্য করিবার শক্তি অনেক কম। ম্যাকে সাহেব বাঙ্গালীর খাদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে বাঙ্গালীর দৈনিক খাদ্যে আমিষ জাতীয় উপাদান অতিশয় অল্প। বাঙ্গালীর খাদ্যে আমিষ জাতীয় উপাদান Chittenden নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের প্রায় অনুরূপ।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক Mc Cayএর মত

ম্যাকে সাহেব Chittendenএর মতের অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন যে বাঙ্গালীর অল্প আমিষ আহারই শারীরিক অবনতির একমাত্র কারণ।

Mc.Cayএর যুক্তি ভ্রমশূন্য নহে

ম্যাকে সাহেবের যুক্তি ভ্রমপ্রমাদ শূন্য নহে। বাঙ্গালীর শারীরিক অবনতির অনেক কারণ আছে। দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া প্রায় সকল বাঙ্গালীকেই অল্প বিস্তর দুর্ব্বল করিয়াছে। বাঙ্গালী নিজের শারীরিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে মোটেই যত্নশীল নহে। বাঙ্গালী ছাত্র

অপেক্ষা ইউরেসিয়ান ছাত্রা ব্যায়ামে অধিক সময় ক্ষেপণ করে। দরিদ্রতার জন্য অধিকাংশ বাঙ্গালীই পেট পুরিয়া খাইতে পায় না। কেবল আমিষ-জাতীয় কেন বাঙ্গালী যথেষ্ট পরিমাণে শালি ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যও পায় না। ইউরেসিয়ান ছাত্রেরা গভর্ণমেণ্ট নির্ম্মিত প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় বাস করে, বাঙ্গালী ছাত্রের বায়ু চলাচল বিহীন অন্ধকার ও দুর্গন্ধময় মেসের অবস্থা অবর্ণনীয়; এ উভয়ের তুলনা হইতে পারে না। মোট কথা ম্যাকে সাহেবের যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া Chittenden এর মত ভ্রান্ত বলা যায় না!

শালি ও স্নেহ-জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে অভিমত। পণ্ডিতগণের মধ্যে আমিষ-জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে যেরূপ মতভেদ লক্ষিত হয়; শালি ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য সম্বন্ধে সেরূপ মত ভেদ নাই।

উপরিউক্ত সর্ব্বপ্রকার মতের আলোচনা করিয়া আমরা একজন সহজ পরিশ্রমী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কি পরিমাণ খাদ্য দ্রব্যের আবশ্যক হইতে পারে নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম।

কি পরিমাণ খাওয়া উচিত

চাউল	এক পোয়া।
ডাল	এক ছটাক।
মাছ	এক ছটাক।
তরকারি (আলু, পটল শাক ইত্যাদি) ...	এক পোয়া।
দুগ্ধ	দুই পোয়া।
ঘি	অর্দ্ধ ছটাক।
মিষ্টান্ন	এক ছটাক।

উপরোক্ত তালিকার এক পোয়া চাউলের পরিবর্ত্তে দুই ছটাক চাউল ও দুই ছটাক ময়দা কিম্বা আটা ধরা যাইতে পারে। মাছের পরিবর্ত্তে মাংস খাওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা মাছ কিম্বা দুগ্ধ খাইতে পান না তাঁহাদের ডাল ও ভাত আরও অধিক পরিমাণ খাওয়া উচিত।

একবারে নিক্তির ওজনে উপরিউক্ত তালিকা মত খাইতে হইবে একথা আমরা

বলি না। শিশু, বালক ও বর্দ্ধনশীল যুবকদিগের অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ আমিষ জাতীয় খাদ্যের আবশ্যক। অধিক পরিশ্রম করিলে শালি জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। উপরোক্ত বৈজ্ঞানিকগণের নির্দ্দিষ্ট খাদ্যের পরিমাণ স্মরণ রাখিয়া প্রত্যেকেরই নিজ নিজ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও রুচি মত আহারের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। আহার সম্বন্ধে কোন একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম সকলের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে না।

সকলের পক্ষে এক নিয়ম খাটে না

ছানা, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম্ব ইত্যাদি খাদ্য আমিষ জাতীয়। ময়দা, আটা, চাল প্রভৃতি দ্রব্যেও কিয়ৎপরিমাণ আমিষ উপাদান আছে। কি প্রকার আমিষ খাদ্য ব্যবহার করা উচিত আমরা সে সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব।

বাঙ্গালীর চা-পান।

ডাক্তার শ্রীসুবোধচন্দ্র মিত্র, এল্, এম্, এস্, লিখিত—

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে "স্বাস্থ্য-সমাচারে" তামাক সম্বন্ধীয় আমার এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহা পাঠ করিয়া আমার কতিপয় সহৃদয় বন্ধু প্রীত হইয়া চা সম্বন্ধীয় একটা প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অনুরোধে প্রণোদিত হইয়া আজ ভাদ্র শুক্লসপ্তমীতে চা সম্বন্ধীয় কতিপয় কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম :—

চা একরূপ গাছের পাতা। আজ কাল আসামে ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে। উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞদের মতে এই চা-বৃক্ষ ক্যামেলিয়া (Camelia) শ্রেণীভুক্ত। বহু প্রাচীন কাল হইতে চীন দেশে চায়ের আবাদ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অনুসন্ধানদ্বারা জানা যায় যে চীনদেশ চায়ের আদি জন্মস্থান নহে যেহেতু চীনদেশে বন্য চা পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র আসামেই বন্য চা দেখিতে পাওয়া যায়। খুব পুরাকালে আসাম হইতেই চা চীনদেশে নীত হইয়া আবাদ হইতে থাকে—ইহাই

উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞদের মত। চা যে ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে নীত হইয়াছে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, এম্, বি, মহাশয় জাপান দেশে প্রচলিত যে এক অদ্ভুত গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"৫৪৩ খৃষ্টাব্দে বোধিধর্ম্ম নামক একজন বৌদ্ধসাধু ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে গমন করেন, এবং তিনিই প্রথমে তথায় উহার প্রচলন প্রবর্ত্তন করেন। বোধিধর্ম্ম সংসারবিরাগী ও অতিশয় কঠোর আচার নিরত সাধুপুরুষ ছিলেন ; এমন কি তিনি একেবারে বীতনিদ্র হইয়া তপস্যাচরণ করিতেন। একদিন তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে ক্ষোভ উপস্থিত হয় এবং পুনরায় যাহাতে চক্ষু নিমীলিত না হয়, তজ্জন্য চক্ষুর দুইটী পাতা শাণিত ছুরিকাদ্বারা ছেদন করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করেন এবং প্রবাদ এই যে, তাহা হইতেই চা-বৃক্ষ উৎপন্ন হয়"।

ইহার সারাংশ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে চা নীত হয় এবং দ্বিতীয়তঃ চা-তে অনিদ্রা আনয়ন করে। অবশ্য ভারতবর্ষে চা-র চাষও হইত না বা ইহার কোন আদরও ছিল না।

মধ্যযুগে (সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে) ওলোন্দাজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী (Dutch East India Company) কর্ত্তৃক চা ইউরোপে আনীত হয়। সেই সময় পাশ্চাত্যদেশে চা অতি উপাদেয় ও মূল্যবান্ সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হইল। পরে বর্ত্তমানকালে ইংরাজের আমলে চা ইহার আদিজন্মস্থান আসামে উৎপাদিত হইতেছে। আজকাল ইহা ভারতবর্ষের একটী প্রধান ফসল তবে এই ব্যবসা পোনর আনা তিন পাইএরও অধিক বিলাতিমূলধনে পরিচালিত। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীনের চায়ের আবাদ বেশ সুন্দররূপে চলিয়াছিল ; পরে এখন আসামের চা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

চা প্রধানতঃ দুই প্রকার—

(১) চীনে চা (Thea Chinensia).

(২) আসামী চা (Thea Assamica).

বাজারের শুষ্ক চা সাধারণতঃ দুই প্রকার—

(১) সবুজ চা (ইহা গাঁজান নহে)

(২) কাল চা (ইহা গাঁজান এবং তজ্জন্যই এই রং পরিবর্ত্তন)

সবুজ চা অতীব বিরল ; ভারতবর্ষে ইহা তৈয়ারি হয় না বলিলেই হয়।

রাসায়নিক বিশ্লেষণদ্বারা চায়ের নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাওয়া যায় :-

(১)	থিয়েন্ (কেফিন্)	...	শতকরা	২/৫
(২)	ট্যানিন্	...	,,	১/৮
(৩)	সদ্‌গন্ধযুক্ত তৈল জাতীয় পদার্থ		,,	১/২

এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় পদার্থ চায়ের পাতা বিশ্লেষণে পাওয়া যায় কিন্তু তাহা আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। উক্ত তিনটী পদার্থ চীনে চা অপেক্ষা ভারতীয় চা-তে বেশী মাত্রায় লক্ষিত হয়।

চা'কে গাঁজাইয়া কাল রঙ্গের করিলে তাহাতে যে ট্যানিন্ থাকে তাহা চা তৈয়ার কালে জলের সহিত সম্যক্‌রূপে মিশিতে পারে না। এই জন্যই বোধ হয় কাল চা'র বেশী আদর।

চা পাতা গরম জলে ৫ মিনিট কাল রাখিয়া পরে সেই পাতাগুলি শুষ্ক করিয়া ওজন করিলে দেখা যায় যে প্রায় সিকি ভাগ জলের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

এখন দেখা যাক চা পাতা ৫ মিনিট হইতে ৪০ মিনিট পর্য্যন্ত গরম জলে রাখিয়া পরে সেই জল পর পর পরীক্ষা করিয়া কোন কোন উপাদান শতকরা কত মাত্রায় পাওয়া যায় :—

		৫ মিনিট	১০ মিনিট	২০ মিনিট	৪০ মিনিট
কেফিন্	...	১·১০	১·৩০	১·১৬	০
ট্যানিন্	...	৬·৮	৮·৫	১১·৭	১৬·৩

(সদ্‌গন্ধযুক্ত তৈলজাতীয় পদার্থ, চা-পাতা গরম জলে দিবামাত্র সব জলে মিশিয়া যায়) ;

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে শুষ্ক চা পাতা যত বেশীক্ষণ গরম জলে রাখা যায় ততই তাহা হইতে কম পরিমাণে কেফিন জলে মিশিতে থাকে

অবশেষে ৪০ মিনিটের সময় দেখা গেল যে কেফিন্ একেবারে নিঃশেষিত হইয়াছে কিন্তু ট্যানিন্ ইহার ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ যত বেশীক্ষণ চা গরমজলে রাখা হয় ততই বেশী পরিমাণে ট্যানিন্ জলে মিশিতে থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কেফিন, ট্যানিন্ ও তৈলযাতীয় পদার্থ আমাদের আলোচনার বিষয়, চায়ের অন্যান্য উপাদান লইয়া আমরা তত মাথা ঘামাইতে যাইব না।

এখন দেখা যা'ক্ কেফিন্ ও ট্যানিন্ আমাদের শরীরে যাইয়া কি কি কার্য্য করে।

কেফিন্—ইহার কার্য্য সাধারণতঃ ত্রিবিধ, যথা—

(১) হৃৎপিণ্ড ও তৎসংলগ্ন ধমনী প্রভৃতির উপর ইহার কার্য্য।

(২) শ্বাস যন্ত্রের উপর ইহার কার্য্য।

(৩) মূত্র যন্ত্রের উপর ইহার কার্য্য।

কেফিন্ আমাদের শরীরাভ্যন্তরে পৌছাইয়াই হৃৎপিণ্ডকে উত্তেজিত করে; ধমনী সকল প্রথমে কিয়ৎক্ষণ সঙ্কুচিত থাকিয়া পরে স্ফীত হয় তজ্জন্য অধিক পরিমাণে রক্ত নানাস্থানে চলাচল করে। অধিক রক্ত মস্তিষ্কে যাওয়ায় মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়, ফলে অনিদ্রা আসিয়া পড়ে।

এই অনিদ্রার জন্যই ছাত্রমহলে চা'র এত আদর। পরীক্ষার পূর্ব্বে ছাত্রেরা চা পান করিয়া অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া অধ্যয়ন করেন। ইহাতে অনেক সময় কুফল ফলে। কারণ অবশেষে পরীক্ষার সময় অনেক ছাত্রই স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে (বুক ধড়ফড়, মস্তিষ্ক ঘূর্ণন, শিরঃশূল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম্পন, পাঠে অনিচ্ছা, স্মরণশক্তির হ্রাস প্রভৃতি) ভুগিয়া থাকেন। অত্যধিক চা-পানে উক্ত ব্যাধি সকল উৎপাদিত হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসক্রিয়াও তাড়াতাড়ি হইতে থাকে, অধিক অম্লযান বাষ্প (Oxygen gas) শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং সেই পরিমাণে অঙ্গারযান বাষ্প ও (Carbon dioxide gas) শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ইহাতে আমাদের শরীরের দহন ক্রিয়া ক্ষিপ্রভাবে সম্পাদিত হয়।

যেমন অধিক পরিমাণে রক্ত মস্তিষ্কেতে যাওয়ায় অনিদ্রা আসিয়া পড়ে সেইরূপ

ধমনীর স্ফীততা বশতঃ অধিক পরিমাণে রক্ত মূত্রকোষের ভিতর দিয়া যাওয়ায় অধিক মূত্র বাহির হয়।

ট্যানিন্—ইহা যে সব শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিময় স্থানের সংস্পর্শে আসে তাহা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। মুখবিবরে যাইবা মাত্র মুখ শুষ্ক বোধ হয়; পাকস্থলীতে পৌঁছাইয়া ইহা উক্ত যন্ত্রের অভ্যন্তর কিয়ৎপরিমাণে শুষ্ক করিয়া দেয় এবং তজ্জনিত পাকস্থলীর রসও পরিমাণে কমিয়া যায়। ইহা দ্বারা পেপ্‌সিন্ উক্ত রস হইতে পৃথক্ হওয়ায় পেপ্‌সিনের খাদ্য হজম করিবার ক্ষমতা মন্দীভূত হয়। ফলে ইহা অগ্নিমান্দ্য ও বদহজম (Dyspepsia) আনয়ন করে। ইহার সংস্রবে আসায় অন্ত্রের মধ্যস্থিত মল শুষ্ক হইয়া যায় এবং সেই জন্যই চা খোরেরা কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগে ভুগিয়া থাকেন।

তৈল জাতীয় পদার্থে তৈয়ারী চাতে কেবল সদ্‌গন্ধ প্রদান করে।

নিদান ব্যবসায়ীরা কেবল দুই একটী ব্যারামে বেশী মাত্রায় মূত্র বাহির করিবার জন্য এবং দুর্ব্বল রোগীর শরীরে কিছুক্ষণের নিমিত্ত বল আনিবার জন্য কেফিন্ আর উদরাময়ে কিম্বা কোন স্থানের রক্তস্রাব বন্ধ করিতে ট্যানিন্ প্রয়োগ করিয়া থাকেন; এতদ্ব্যতীত ইহাদের আর বেশী কোন ব্যবহার চিকিৎসা শাস্ত্রে দেখা যায় না।

কিন্তু সাধারণে চা পান করেন অন্য উদ্দেশ্যে—ইহা সম্পূর্ণ নেশা ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরিশ্রমের পর এক পেয়ালা গরম চা পান করিলে তদ্দ্বারা শরীরের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হইয়া পুনরায় কার্য্যে স্পৃহা জন্মে বটে কিন্তু এই সামান্য উপকারিতার জন্য আমরা চা পান করিয়া শরীরের কত অনিষ্ট করিতেছি। অধিকন্তু উক্ত উপকারিতা অপর দ্রব্যের দ্বারাও সম্পাদিত হইতে পারে। এক পেয়ালা গরম দুগ্ধ পানে পরিশ্রমের পর ক্লান্তি বেশ দূর হয় এবং পুনরায় কার্য্যে মন যায় অথচ দুগ্ধ পানে অশেষ গুণ। পাঠ্যাবস্থায় Materia Medicaয় কেফিন্ অধ্যয়ন কালে আমাদের শিক্ষক বলিয়াছিলেন—"Tea drinking is a fashion of the day : a cup of warm milk does immense good." বলা বাহুল্য উক্ত শিক্ষক একজন ইংরাজ এবং ইনি এখন ভারত বর্ষের একটী খ্যাতনামা চিকিৎসক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অত্যধিক চা পানে মস্তক ঘূর্ণন, হৃৎকম্পন, শিরঃশূল প্রভৃতি স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ উৎপন্ন হয়। আজকাল এদেশে, বিশেষ ছাত্রমহলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের প্রাদুর্ভাব বড় বেশী—চা যে ইহা আনয়নে বিশেষভাবে সহায়তা করে এ ধারণা অমূলক নহে। দ্বিতীয়তঃ এই দেশে বিশেষতঃ এই কলিকাতা সহরে কোষ্ঠ কাঠিন্য ও বদহজমের (Dyspepsia) অতিশয় প্রকোপ—চাও এই দুইটী ব্যাধি সৃষ্টি করিতে বিশেষ পটু।

কলিকাতার দোকানের তৈয়ারি চা অতিশয় কড়া, অতএব তাহাতে ট্যানিনের পরিমাণও বড় বেশী ; এজন্য ইহাতে অজীর্ণ ও কোষ্ঠ কাঠিন্য বিশেষরূপে আনয়ন করে। যাঁহাদের কোনরূপ হৃদরোগ কিম্বা হিষ্টিরিয়া বা অন্য কোন স্নায়বিক ব্যাধি আছে তাঁহাদের পক্ষে চা পান বিশেষ অপকারী।

পূর্ব্বেকার লোকের ধারণা ছিল যে চা আহারের কার্য্য করে অর্থাৎ চা পান করিলে আহার তত দরকার হয় না। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। চা ত আমাদের আহারের স্থান অধিকার করিতে পারেই না অধিকন্তু ইহাতে শরীরের দহন কার্য্য ক্ষিপ্র হওয়ায় শরীরের ক্ষয় বৃদ্ধি হয়। সারবান্ খাদ্য আহার করিলে চা তাহা শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতে সহায়তা করে কিন্তু খাদ্য সারবান্ না হইলে উহাতে অপকার দর্শায় অতএব আমরা 'ভেতো বাঙ্গালী" আমাদের পক্ষে চা বিশেষ অনিষ্টকারী।

অতএব এত অনিষ্ট সত্ত্বেও আমরা চা ব্যবহার করি কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ—চা যে সাহেবরা ব্যবহার করে। মধ্যযুগে মসলমানদের সংস্রবে আসায় আমরা ধূমপান করিতে শিক্ষা করি আবার এখন ইংরাজদের নিকট হইতে চা পান করিতে ও চুরুট টানিতে শিখিতেছি। আমরা ইংরাজদের দোষগুলি বেশ গ্রহণ করিতেছি কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন তাহাদের গুণগুলি অনুকরণে ব্যস্ত। কয়জন লোক তাহাদের একাগ্রতা, একতা, কার্য্যে তৎপরতা প্রভৃতি সদ্গুণ লাভ করিতে চেষ্টা করে! কোন বাঙ্গালী ইংরাজের মত বিদেশে ব্যবসা করিয়া স্বদেশের দৈন্য মোচন করিতে যত্নবান্!

আবার যাহা অনুকরণ করি তাহাও ঠিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বেলা ১২টার সময় প্রাতঃস্নানের মত। সাহেবেরা সেরি, স্যাম্পেন, ক্লারেট্ পান করেন, আর এদেশের

লোক পান করেন দাস্তেশ্বরী, সাহেবেরা হাবানা ও অন্যান্য মূল্যবান্ চুরুট ব্যবহার করেন আর বাঙ্গালী বাবুরা টানেন বিড়ি বা হাওয়াগাড়ি সিগারেট্ কি খুব উর্দ্ধ কলুটোলার চুরুট।

সাহেবেরা যে চা পান করেন তাহা পানীয় হিসাবে একটী উপাদেয় খাদ্য। ইহা প্রস্তুত করাও তত সহজ নহে। আর বাঙ্গালীর চা পান ধৃষ্টতা মাত্র।

উত্তম চা প্রস্তুত করিতে হইলে যে গরম জল দরকার তাহা অধিকক্ষণ ফুটান উচিত নহে। অধিকক্ষণ জল ফুটাইলে তাহা হইতে সমস্ত বায়ু উড়িয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ বেশী soft* কিম্বা বেশী hard* জল চায়ের পক্ষে ভাল নহে। মধ্যম রকমের জলই প্রশস্ত।

চার পাতাগুলি উক্তরূপ গরম জলে ৫ মিনিটের বেশী রাখা উচিত নহে কারণ সদ্‌গন্ধযুক্ত তৈলজাতীয় পদার্থ, চা পাতা গরম জলে দিবামাত্রই জলে মিশিয়া যায় এবং কেফিনও অনেকটা বাহির হইয়া জলে মিশ্রিত হয়। চা অধিকক্ষণ গরম জলে রাখিলে কেবল বেশী পরিমাণে ট্যানিন্ ও অন্যান্য কটু দ্রব্য জলে মিশিয়া যায়; ট্যানিন্ ও ঐ সব কটু দ্রব্য শরীরের পক্ষে বিশেষ অপকারী। অনেকে, (বিশেষ কলিকাতার দোকানদার) চা পাতা জলে সিদ্ধ করেন, তাহা একেবারেই কর্ত্তব্য নহে।

এই স্থানে বলা দরকার যে চাতে দুগ্ধ মিশাইলে ট্যানিনের কিয়দংশ পৃথক্ অবস্থায় পেয়ালার নিম্নে পড়িয়া যায়।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে চা তৈয়ার করা বাঙ্গালীর সাধ্যাতীত। যাঁহারা নিজের বাড়ীতে চা তৈয়ার করিয়া পান করেন তাঁহারা উক্ত নিয়মগুলি পালন করেন না। তাঁহারা সাধারণতঃ জল অনেকক্ষণ ফুটাইয়া থাকেন। তবু তাঁহাদের এ অভ্যাস তত নিন্দনীয় নহে যেহেতু তাঁহারা ৫ মিনিটের বেশী গরম জলে চা পাতা রাখেন না। অবশ্য ইঁহারা যে চা পান জনিত অপকারিতার হাত এড়াইতে পারেন এ কথা

* যে জলে একটু সাবান মিশাইলেই ফেণা হয় তাহাকে Soft (নরম) জল বলে এবং ইহার বিপরীত hard (শক্ত) জল।

বলিতেছি না। কিন্তু যাঁহারা কলিকাতার দোকানের তৈয়ারি চা পান করেন তাঁহারা এক রকম বিষ পান করেন।

কলিকাতার দোকানদারদের প্রতারণার বিষয় বোধ হয় অনেকেই জানেন না। প্রাতঃকালে লৌহের উনানে নিকৃষ্ট চা ও জল একসঙ্গে গরম করিতে দেওয়া হয়। সেই চা জলে সিদ্ধ হইতে থাকে এবং খরিদ্দার বাবুরা আসিলে উক্ত গরম জল খানিকটা উঠাইয়া একটু চিনি ও জমাট দুগ্ধ (Condensed milk) মিশাইয়া পান করিতে দেওয়া হয়। তাহার পর যতই খরিদ্দার আসিতে থাকে ততই দোকান-দার মহাশয় উক্ত গরম জলের পাত্রে জল ঢালিতে থাকেন। এইরূপে প্রাতঃকালের সেই মুষ্টিমেয় চার দ্বারা সমস্ত দিনের খরিদ্দার দিগকে সরবরাহ করা হয়। নিকৃষ্ট জাতীয় চাতে ত সদ্‌গন্ধযুক্ত তৈলজাতীয় পদার্থ নাই বলিলেই চলে; যাহা একটু থাকে তাহা কেবল প্রথম খরিদ্দারের অদৃষ্টেই ঘটে, যাঁহারা পরে আসেন তাঁহারা কেবল ট্যানিন গোলা জল পান করিয়া ঢেকুর তুলিতে তুলিতে বাড়ী যান এবং ইহার ফলে পরিশেষে কোষ্ঠ কাঠিন্য, বদ হজম, (Dyspepsia) রোগে আক্রান্ত হইয়া চিরকাল কষ্ট ভোগ করেন।

এই শ্রেণীর দোকানদারেরা তবু একটু ধর্ম্ম দিকে চাহিয়া কার্য্য করেন; কেহ কেহ কিন্তু একেবারে দিনে ডাকাতি করিয়া থাকেন। শুনা যায় যে বাজারে এক প্রকার নকল চা বিক্রয় হয়। ইহা সাধারণতঃ শুষ্ক কপির পাতা, দেখিতে ঠিক শুষ্ক চা। দ্বিতীয় শ্রেণীর দোকানদারেরা এই কপিপত্র প্রস্তুত চা গরম জলের সহযোগে তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করেন আর বাঙ্গালী বাবুরা তৃপ্তি সহকারে এই কপিপাতার ঝোল পান করিয়া চা খাওয়ার সাধ মিটান।

দোকানে যে পেয়ালা (Cup) করিয়া বাবুদের চা সরবরাহ করা হয় তাহার বিষয় কিছু সমালোচনা দরকার। সকাল হইতে রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত ১ কিম্বা ২ ডজন পেয়ালা দ্বারা অন্যূন ২০০।৩০০ খরিদ্দারকে চা পান করিতে দেওয়া হয়, প্রত্যেক খরিদ্দার পান করার পর পেয়ালাটী কেবল একবার এক বালতি জলে ডুবাইয়া লওয়া হয় মাত্র। আবার সেই বালতির জলও যে মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন

করা হয় সে বিষয়ও সন্দেহ। এই প্রথা ভাল কি মন্দ তাহা মীমাংসা করিবার ভার উক্ত খরিদ্দার মহাশয়দের উপরই রহিল।

নিম্ন শ্রেণীর কেরাণী বাবুদের মধ্যেই দোকানের তৈয়ারি চার আদর বেশী। বৈকালে অফিসে অনেকে দোকানের ঘৃত খারাপ বলিয়া দোকানের তৈয়ারি কচুড়ি শিঙ্গাড়া আহার করেন না কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে দোকানের চা ২।১ পেয়ালা পান করিয়া থাকেন। কেরাণী বাবুরা সাধারণতঃ ২০।৩০ টাকা মাহিনা পান কিন্তু দিনে তাঁহাদের সিগারেট, চাতে প্রায় ৵০ দুই আনা ব্যয় হইয়া যায়। উক্ত ৵০ আনা দিয়া তাঁহারা যদি কোন ভাল দ্রব্য ক্রয় করিয়া বৈকালে একটু জলযোগের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে শরীরের উন্নতিও হয় এবং ঐ সঙ্গে দুইটী নেশার হাত হইতে অব্যাহিতি লাভ করেন।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে অনেক চা পায়ী ধূমপায়ীদের উপর খড়্গ হস্ত, কেননা ইঁহারা তাম্রকূটের বশীভূত। পূর্ব্বোক্তেরা চা-কে নেশার মধ্যে স্থান দেন না। ধূমপায়ী যে দোষে দোষী চা পানকারীও সেই দোষে দোষী। দুই সম্প্রদায়ই যে নেশার অধীন ইহা স্থূল সত্য। "যারেই বলে ভাজা চাল তারেই বলে মুড়ি।" বাঙ্গালা দেশে আজ কাল চা বড় বেশী সমাদৃত হইতেছে। সুদূর পল্লীগ্রামেও ইহার প্রচলন বাড়িতেছে দেখিয়া আমরা যথার্থ মর্ম্মাহত হইতেছি। অনেক বাড়ীতে পুরুষ, স্ত্রী এমন কি ঝি চাকরেরও প্রাতঃকালে চা পানের বন্দোবস্ত আছে। আমরা দীন দুঃখী বাঙ্গালী আমরা যে দিন দিন এত বাজে খরচ বাড়াইতেছি এবং তৎসঙ্গে শরীরেরও অনিষ্ট করিতেছি ইহা কেবল আমাদের অপরিণামদর্শিতার ফল।

ধূমপানের প্রতিকূলে যেমন কলিকাতায় Anti-smoking Union নামে একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে সেইরূপ Anti-Tea drinking Union নামে একটী সমিতি হওয়াও একান্ত দরকার।

আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা।

ডাক্তার সত্যশরণ চক্রবর্ত্তী, এম, বি, লিখিত—

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্বাসাবরোধের চিকিৎসা।

শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, রক্ত সঞ্চালন দ্বারা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রয়োজনানুসারে কেমন করিয়া রক্ত আনীত হয়, কি প্রকারে ভুক্ত খাদ্যের সারাংশ ও অম্লজান বাষ্প দ্বারা রক্তের বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। পালমোনারী ধমনীতে শৈরিক রক্ত ফুস্‌ফুস্ মধ্যে আঙ্গারিকাম্ল বাষ্প ত্যাগ করে ও নিশ্বাস বায়ুর অম্লজান লাভ করিয়া ধামনিক রক্তে পরিবর্ত্তিত হয়। ধামনিক রক্তে অম্লজান বাষ্প ও অন্যান্য পুষ্টিকর পদার্থ থাকে। এই বিশুদ্ধ রক্ত বা ইহা হইতে উৎপন্ন লিম্ফ দ্বারা শরীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদানগুলি পুষ্ট হয় ও আঙ্গারিকাম্ল বাষ্প প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থও এই লিম্ফ দ্বারাই শৈরিক রক্তে আনীত হয়। যথোপযুক্তরূপে উক্ত ক্রিয়াগুলি নিষ্পন্ন না হইলে প্রাণ ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। মানুষের প্রতি মিনিটে ১৪।১৮ বার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিশেষরূপে অভ্যাস করিলে শ্বাস বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ থাকিতে পারা গেলেও অনভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে পাঁচ মিনিট কাল শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিলে প্রায়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। কোন কারণে বায়ুনালীর মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারিলে, বা অম্লজানশূন্য কোন বাষ্পে শ্বাস গ্রহণ করিলে বা রক্ত বায়ু হইতে অম্লজান বাষ্প গ্রহণে অসমর্থ হইলে Asphyxia বা শ্বাসাবরোধ লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

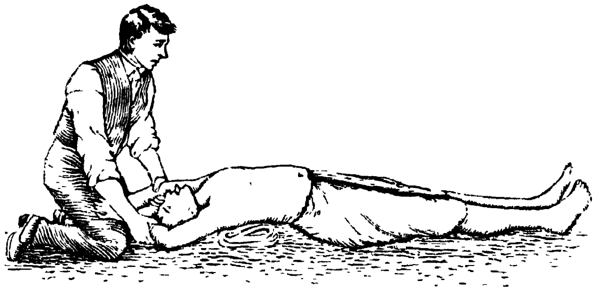
শ্বাসরোধের লক্ষণগুলিকে তিন অবস্থায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত জোর ও কষ্টের সহিত নিশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়। ওষ্ঠদ্বয় নীলাভ, চক্ষু যেন কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে, মুখ কষ্ট ও ভীতিপূর্ণ দেখায়। মস্তকে অত্যধিক শৈরিক রক্ত থাকা হেতুই এইরূপ হইয়া থাকে। তৎপরবর্ত্তী অবস্থায় ফিট হইতে দেখা যায়। সজোরে শ্বাস প্রশ্বাসের সময় যে সমস্ত মাংসপেশী সঙ্কুচিত হইতে দেখা যায় প্রথমে ঐ গুলিতে ও তদনন্তর অপর মাংস পেশীতে

আক্ষেপ বা ফিট আরম্ভ হয়। এই অবস্থা প্রায় এক মিনিটের অধিক স্থায়ী হয় না। ইহার পরবর্ত্তী বা অবসন্নতার অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ হইয়া আসে; মাংসপেশী সকল শিথিল হয়; চক্ষে অঙ্গুলি দিলে পাতা পড়ে না; তারা বিস্ফারিত হয়; রোগী সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয় ও তাহাকে বহুক্ষণ অন্তর দীর্ঘশ্বাস লইতে দেখা যায়। ক্রমশঃ শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়, তার পর কয়েক সেকেণ্ড পর্য্যন্ত হৃৎপিণ্ডের গতি ও মণিবন্ধে নাড়ীর গতি সামান্য অনুভব করিতে পারা যায়। এই অবস্থা তিন মিনিট হইতে অধিকক্ষণও স্থায়ী হইতে পারে। মস্তিষ্কমধ্যে বহুক্ষণস্থায়ী শৈরিক রক্তের আধিক্য হেতুই উক্ত লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হয়। যে স্নায়ুকোষসমষ্টি শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার নিয়ন্তা তাহার অবসন্নতাই উক্ত লক্ষণগুলির মূল কারণ। আকস্মিক বিপদের চিকিৎসায় অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া প্রায় অবরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে বা একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এরূপ স্থলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস লওয়ান যাইতে পারে। যে সকল অবস্থায় শ্বাসাবরোধ ঘটিতে পারে ও ঐরূপ ঘটিলে কিরূপে কার্য্য করিতে হইবে তাহাই এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণিত হইবে।

"কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস করান ও শ্বাসাবরোধ চিকিৎসা।

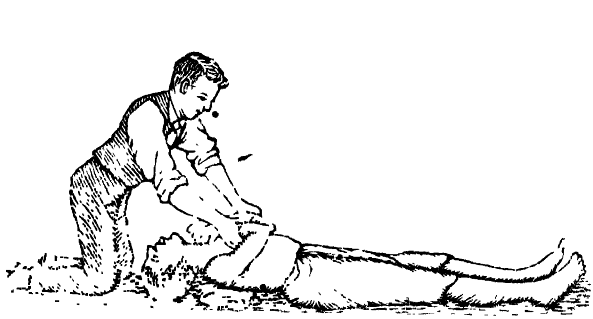
নানাবিধ উপায়ে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস করান যাইতে পারে। সচরাচর নিম্নলিখিত উপায়গুলি প্রচলিত দেখা যায়। (১) সিল্‌ভেষ্টার প্রণালী। (২) হাওয়ার্ড প্রণালী: ইহাকে "সরল প্রণালী" বা "ডাইরেক্ট মেথড্" ও বলা যায়। (৩) লাবার্ড প্রণালী। (৪) অধ্যাপক সেফারের প্রণালী।

সিলভেষ্টারের প্রণালী—নিম্নলিখিত কারণ জন্য ভাল বলিয়া বোধ হয়। (১) ইহা প্রয়োগ করা সহজ। (২) ইহাতে কাজ ভাল হয়। (৩) ইহাতে স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়ানুরূপ বক্ষগহ্বরের বৃদ্ধি ও হ্রাস কৃত্রিমভাবে সম্পন্ন হয় ও ইহা সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগকারীর আয়ত্তাধীন। (৪) নাড়াচাড়া দ্বারা রোগী আহত হইবার সম্ভাবনা অল্প। (৫) বক্ষ গহ্বরের উভয় পার্শ্বই সমভাবে বিস্ফারিত হয় ও তজ্জন্য অধিক বায়ু গৃহীত হয়। (৬) ইহা মনে রাখা সহজ ও একজন দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে।



শ্বাস বায়ু প্রবেশ করান।

সিলভেষ্টার প্রণালীতে বক্ষপঞ্জরের বিস্তার হেতু নিশ্বাস গ্রহণ করান হইতেছে। দেখিতে হইবে যে জিহ্বা শ্বাসনালীর দিকে উল্টাইয়া না পড়ে ও বায়ু প্রবেশের পথ বন্ধ না করে। যদি কেহ জিহ্বা টানিয়া ধরে ত ভালই নতুবা জিহ্বা দাড়ির সহিত বাঁধিয়া দিতে হইবে যে প্রকারেই হউক বায়ু প্রবেশ পথ যেন জিহ্বা দ্বারা অবরুদ্ধ না হয়।



প্রশ্বাস বায়ুর বহিষ্করণ।

সিলভেষ্টার প্রণালীমতে বক্ষপঞ্জর সঙ্কোচন করান হইতেছে। ইহা দ্বারা প্রশ্বাসবায়ু বহির্গত হয়। হাত দুটী বক্ষপ্রাচীরে চাপিয়া ধরিতে হয় ও সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর উপর চাপ দিতে হইবে এবং দেখিতে হইবে যেন বায়ু নির্গমের পথ অবরুদ্ধ না থাকে।

প্রক্রিয়া ঃ—

প্রথমতঃ রোগীকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইবে ও গলদেশ, বক্ষ ও পেটের পোষাক আলগা করিয়া দিবে। পরে স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে উপর পিঠের নীচে বালিশ বা কাষ্ঠখণ্ড দিয়া বক্ষ উন্নত, গলা লম্বা এবং মস্তক কিঞ্চিৎ পশ্চাতে রাখিবে। কোন সাহায্যকারীকে জিহ্বা সম্মুখ দিকে টানিয়া রুমাল দ্বারা ধরিতে বলিবে। যদি সাহায্যকারীর অভাব হয় তাহা হইলে জিহ্বা সূত্র বা রবারের ফিতা দ্বারা দাড়ীর সহিত বাঁধিয়া দিবে। পরে রোগীর মস্তকের পশ্চাতে হাঁটু গাড়িয়া বসিবে ও রোগীর কুনুইএর নীচে দুই হাতের দ্বারা ধরিয়া যতদূর সম্ভব মস্তকের পশ্চাতে লইয়া যাইবে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা বক্ষ গহ্বর বিস্তৃত হয়। দুই বা তিন সেকেণ্ড পর্য্যন্ত হাত দুইটী এই ভাবেই রাখিতে হইবে পরে সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া হাত দুইটীর দ্বারায় বক্ষ প্রাচীরে চাপ দিবে এবং মণিবন্ধদ্বয় দ্বারা পাকস্থলির উপর ক্রশ্ করিয়া চাপ দিতে হইবে; ইহাও দুই সেকেণ্ডের অধিক স্থায়ী হইবে না। এই উপায়ে বক্ষগহ্বর হইতে বায়ু নির্গত করিতে পারা যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস পুনরায় সংস্থাপিত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত প্রকারে অতি সাবধানে মিনিটে ১৫ বার অঙ্গ সঞ্চালন করিতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে রোগী আপনা হইতে খাবী খাইবার মত করিবে। এইরূপ করিলে অঙ্গ সঞ্চালন বন্ধ করিয়া রোগীকে অতি সাবধানের সহিত কিয়ৎক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত। সময়ে সময়ে শ্বাস প্রশ্বাস পুনঃ সংস্থাপিত হইয়াও আবার বন্ধ হইয়া আসিতে পারে। এইরূপ হইলে পুনর্ব্বার শ্বাস প্রশ্বাসের সাহায্য আবশ্যক। যদি বক্ষগহ্বরের বৃদ্ধি ও হ্রাস সম্যক্ সম্পন্ন হয় তাহা হইলে গলনালী মধ্যে বায়ুর প্রবেশ ও নির্গমের শব্দ পরিষ্কার ভাবে শুনিতে পাওয়া যায়।

"হাওয়ার্ডের ডাইরেক্ট মেথড্"—এই প্রণালীতেও পূর্ব্ব প্রকারে রোগীকে শয়ন করাইয়া পোষাক আল্গা করিয়া দিতে হয়। রোগীর হাত ভাঙ্গিয়া থাকিলে এই প্রক্রিয়া প্রযোজ্য।

প্রক্রিয়া ঃ—

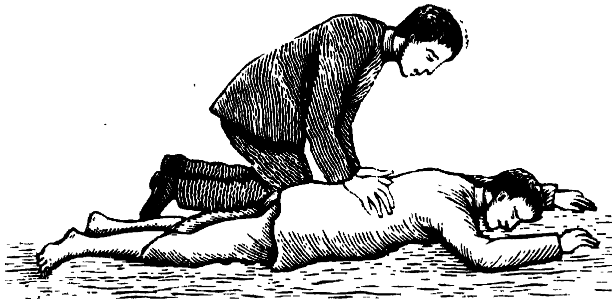
রোগীকে চিৎ করিয়া শয়ন করাও। রোগীর শরীরের নীচে পাকস্থলীর

পশ্চাতে পুরু করিয়া কাপড় কিম্বা বালিস দিবে ; এইরূপে পাকস্থলীর নিকটস্থ বক্ষ প্রাচীর দেহের অন্যান্য অংশ হইতে উন্নত হইবে। রোগীর হস্তদ্বয় মস্তকোপরি রাখ ; রোগীর উরুদেশের নিকট হাঁটু গাড়িয়া উপবেশন কর ; এবং তোমার কোমরের নিকট নিজের কুনুই দুইটী সংস্থাপিত কর। অতঃপর পাকস্থলীর উভয় পার্শ্বে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ঠেস দাও এবং অন্যান্য অঙ্গুলীগুলি বক্ষপ্রাচীরে রাখিয়া হাঁটুর উপর হইতে শরীরের সমস্ত ভার হস্তের উপর অর্পণ কর ; এবং এই সময়ে বক্ষপ্রাচীর সম্মুখ দিকে চাপিয়া দাও। এই চাপের গতি এইরূপ হওয়া উচিত যে তদ্দ্বারা বক্ষ-অভ্যন্তরস্থ বস্তু মুখ দিয়া নির্গত হয়। এক, দুই, তিন গণিতে যত সময় লাগে ততক্ষণ পর্যন্ত ধীরে ধীরে চাপ দাও। পরে হঠাৎ ধাক্কা দিয়া ছাড়িয়া দাও। এবং পুনরায় হাঁটু গাড়া অবস্থায় পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া আইস। এবারও এক, দুই, তিন গণিতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় হাঁটু গাড়িয়া থাকিতে হইবে। এইরূপ চারি বা পাঁচ বার হইতে ক্রমশঃ বাড়াইয়া মিনিটে পনরবার উক্তপ্রকার সঞ্চালন করিতে হইবে।

অধিক লোক থাকিলে উপরোক্ত দুই প্রকারেই কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস করান যাইতে পারে। যখন স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস পুনঃ সংস্থাপিত হইবে তখন রক্ত সঞ্চালনের সহায়তা ও উষ্ণ জিনিষ প্রয়োগ করা ভাল। গিলিবার ক্ষমতা হইলে অল্প উষ্ণ জল চা, কফি বা মদ্য অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। রোগীকে বিছানায় রাখিয়া যাহাতে তাহার নিদ্রা হয় তাহার উপায় করিতে হইবে। হাতে ও পায়ে মালিস, গরম কাপড়ের দেহাচ্ছাদন, উষ্ণ জলের বোতল বিছানার নিম্নে রাখা প্রভৃতি, অথবা, বড় পুলটিশ কিম্বা সেক দেওয়া, এই সকলে শ্বাস প্রশ্বাসের বিশেষ সাহায্য হয়।

যখন কোন কারণে পঞ্জরাস্থি ভগ্ন হয় তখন উক্ত প্রকারের মধ্যে কোনটীই প্রযোজ্য নহে। তখন লাবোর্ডি প্রণালীতে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস বিধি অবলম্বন করা উচিত। ইহা শিশুদের শ্বাসাবরোধে বিশেষ ফলপ্রদ। নিম্নলিখিত উপায়ে ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে :—

রোগীকে চিত করিয়া শয়ন করাইবে, মুখের ভিতর পরিষ্কার করিয়া দিবে,



প্রশ্বাস বায়ুর বহিষ্করণ। সেফারের প্রণালী।

সেফারের প্রণালীতে প্রশ্বাস বায়ু ফেলা। রোগীকে উপুর করিয়া শোয়াইতে হইবে ঘাড় ফিরাইয়া রাখিতে হইবে যেন বায়ু নির্গমের ব্যাঘাত না হয়। পরে মাটীর ও প্রা[illegible] কারীর হস্তের মধ্যে নীচের পাঁজরাগুলি চাপিয়া ধরিয়া বক্ষগহ্বর সঙ্কুচিত করিলেই বায়ু বহি[illegible] হইয়া যায়।



শ্বাস বায়ু প্রবেশ করান।

পরে ক্ষিপ্রতার সহিত স্বীয় দেহভার সরাইয়া লইলেই বক্ষগহ্বর বিস্তারিত হয়। হাত সরাইয়া লইতে হইবে না কেবল ভার কমাইলেই চলিবে এইরূপে নিঃশ্বাস গ্রহণ করান হয়।

জিহ্বা ধরিয়া টানিবে ও নীচের চোয়াল চাপিবে ; এই অবস্থায় দুই সেকেণ্ড বাহিরে রাখিয়া জিহ্বা মুখের মধ্যে যাইতে দিবে। এক মিনিটে এইরূপ পনর বার করিতে হইবে। শ্বাসাবরোধ থাকিলে এই চিকিৎসা ও পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারে শ্বাস প্রশ্বাস প্রণালীর মত সম্পন্ন হওয়া উচিত।

অধ্যাপক সেফারের প্রণালীতে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস করাইতে হইলে, কাপড় খুলিবার বা আল্গা করিবার প্রয়োজন নাই। রোগীকে উপুড় করিয়া শোয়াইতে হইবে, ঘাড় ফিরাইয়া মুখ ও নাক মাটী হইতে সরাইয়া রাখ, রোগীর জিহ্বা টানিয়া বাহির করিতে হইবে না। কারণ উহা আপনি বাহির হইয়া বা সম্মুখে আসিয়া পড়িবে। রোগীর দেহকাণ্ডের নিম্নে বালিস বা প্যাড কিছুই দিতে হইবে না।

রোগীর মাথার দিকে মুখ করিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড় ও হাতের তালুদ্বয় মেরুদণ্ডের উভয়পার্শ্বে কোমরের উপর রাখ, অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রায় মিলিতে দাও ও উভয় হস্তের অঙ্গুলি সকল ছড়াইয়া রোগীর উভয়পার্শ্বের পাঁজরার নীচের হাড় গুলির উপর রাখ, অতঃপর শরীরের ভার সম্মুখে ঝুঁকিয়া স্বীয় হস্তের উপর সোজাসুজি নীচের দিকে দাও, যাহাতে পৃষ্ঠের নিম্নভাগ ও কোমরের উপর চাপ পড়ে। এইরূপে উদর গহ্বর হাতের চাপ ও মাটীর মধ্যে পড়িয়া সঙ্কুচিত হয় ও বক্ষ গহ্বর হইতে বায়ু বাহির করিয়া দেয়। এইরূপে প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

তদনন্তর একটু ক্ষিপ্রতার সহিত দেহভার সরাইয়া লও ও পুনরায় হাঁটুর উপর যতদূর সম্ভব সোজা হইয়া ফিরিয়া আইস, কিন্তু হাত সরাইয়া লইও না এইরূপে শ্বাসগ্রহণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। যতক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া পুনঃ সংস্থাপিত না হয় বা ডাক্তার আসিয়া প্রাণত্যাগ হইয়াছে না বলেন ততক্ষণ প্রতি মিনিটে ১২ হইতে ১৫ বার এইরূপে স্বীয় দেহভার অর্পণ ও সরাইয়া লইয়া কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস করাইতে থাক।

স্বাভাবিক অবস্থায় শ্বাসগ্রহণের পর অত্যল্প বিরাম দৃষ্ট হয়। ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিবার পর অপেক্ষাকৃত অধিক সময় বিরাম দৃষ্ট হয়। কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের সময় ও উক্ত বিরামের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সংযত হইয়া স্বাভাবিক নিয়মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস করাইতে হয়।

ASPHYXIA.

শ্বাসাবরোধ ও তাহার চিকিৎসা।

শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মিলে যে অবস্থা হয় তাহাকে শ্বাসাবরোধ বলা যায়। শ্বাসাবরোধ ঘটিলে শরীরমধ্যে কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস অধিক পরিমাণে তৈয়ারী হয়; এই বিষাক্ত গ্যাস হইতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

শ্বাসাবরোধ কারণ :—

জলে ডুবিলে, বায়ু নালীর মধ্যে কোন পদার্থের প্রবেশ হেতু বায়ু প্রবেশের ব্যাঘাত হইলে, বক্ষপ্রাচীরে চাপ জনিত নিঃশ্বাস লইবার মাংসপেশী সঙ্কুচিত না হইলে, বায়ুনালী আবদ্ধ হইলে (যেমন নাক মুখ টিপিয়া শ্বাসাবরোধ করিলে, গলায় দড়ি লাগাইয়া বাহির হইতে চাপ দিলে) অথবা নিঃশ্বাস লওয়া যায় না এরূপ বিষাক্ত গ্যাসে নিঃশ্বাস লইলে (যেমন নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, ক্লোরিন, কার্ব্বনিক এসিড ও ক্লোরোফরম্ ও কয়লার গ্যাসদ্বারা) শ্বাসাবরোধ ঘটিয়া থাকে।

শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে থামিলেও হৃৎপিণ্ডের কার্য্য প্রায় চারি মিনিট পর্য্যন্ত চলিতে পারে। যে পর্য্যন্ত হৃৎপিণ্ডের কার্য্য চলে সেই পর্য্যন্ত বাঁচিবার আশা থাকে। কোন কোন সময়ে এমন কি হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইলেও অল্প সময়ের মধ্যে উপযুক্ত চিকিৎসা আরম্ভ হইলে রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে।

চিকিৎসা :—

যত শীঘ্র সম্ভব শ্বাসাবরোধ কারণ দূর কর; রক্ত শোধন জন্য ফুস্ফুস্ মধ্যে নির্ম্মল বায়ু কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বা অন্য কোন উপায় দ্বারা প্রবেশ করাও।

ডুবিয়া মৃতপ্রায় ব্যক্তির লক্ষণ :—

মুখ স্ফীত ও বিবর্ণ দেখা যায়, ওষ্ঠদ্বয় নীলাভ ও চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া যায়; মুখ বায়ুনালী ও ফুস্ফুসের মধ্য হইতে সফেন তরল পদার্থ বহির্গত হইতে দেখা যায়; পাকস্থলীর মধ্যে যথেষ্ট জল থাকে; হস্ত পদাদি স্ফীত ও বিবর্ণ হয় এবং শরীর শীতল বোধ হয়।

চিকিৎসা :—

এই অবস্থায় চিকিৎসা করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় মনে রাখা উচিত। (১) শ্বাসাবরোধ প্রধানতঃ নিমজ্জন হেতু হইলে বায়ুনালী জল ও কর্দ্দম পূর্ণ দৃষ্ট হয়। (২) শরীরে যথেষ্ট শক্ (Shock) অর্থাৎ অবসাদ লক্ষিত হয়। (৩) বহুক্ষণব্যাপী চেষ্টা জনিত শরীর অবসন্ন দেখায়। (৪) এবং শীতের জন্য শরীর বিকৃত দেখায়। নিমজ্জিত ব্যক্তির চিকিৎসার সর্ব্বাপেক্ষা শ্বাসাবরোধ দূর করিবার জন্য কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস করান যত শীঘ্র সম্ভব আরম্ভ করাই সর্ব্বথা বিধেয়।

নিমজ্জিত মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিবার উপায় :—

সর্ব্বপ্রথমে ডাক্তার ডাকিতে ও কম্বল ও শুষ্ক বস্ত্রাদি আনিতে পাঠাইবে। ইতিমধ্যে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রাথমিক সাহায্য দান করিতে হইবে।

প্রথমতঃ যাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া পুনঃ সংস্থাপিত হয় ও পরে যাহাতে উত্তম রূপে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া ও শরীর গরম হয় তাহাই করিতে হইবে। প্রথম হইতেই হৃৎপিণ্ড উত্তেজিত হইলে বিস্ফারিত হৃৎপিণ্ড অধিকতর বাধা পায় ও জীবন বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়ে; এই জন্য প্রথমে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সংস্থাপিত করিয়া পরে রক্ত সঞ্চালনের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস এইরূপে করান যাইতে পারে—প্রথমে বায়ুনালী সমূহ পরিষ্কার করিতে হইবে; এতদুদ্দেশে গলা ও বক্ষঃস্থলের কাপড় আল্‌গা করিয়া দিবে; মুখ পরীক্ষা করিয়া উহা হইতে জলীয় উদ্ভিদ, কদ্দম ও অন্যান্য ভক্ষ্য বস্তু প্রভৃতি পরিষ্কার করিবে; পরে জল বাহির করিবার জন্য নিমজ্জিত ব্যক্তিকে উপুড় করিয়া শোয়াইবে ও তাহার পাকস্থলী ও বক্ষের নিম্নে বালিশ বা কাপড় গুটী পাকাইয়া রাখিবে। তৎপরে রোগীর একটী হাত কপালের নিম্নে রাখিয়া মুখ মাটী হইতে উচ্চে স্থাপিত করিবে; তাহার পর রোগীর পৃষ্ঠদেশে ২।৩ বার ৪।৫ সেকেণ্ড চাপ দিবে অথবা রোগীকে উপুড় করিয়া শোয়াইয়া তাহার পেট ধীরে ধীরে উত্তোলন করিলে পাকস্থলী হইতে জল নির্গত হয়। শিশু চিকিৎসায় এইরূপ করা সহজ। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিকে চিকিৎসা করিতে হইলে তাহার দেহের ভার ও কি পরিমাণে অপর লোকের সাহায্য পাওয়া যাইবে তাহার উপর নির্ভর করে। যে প্রকারেই হউক না কেন জল বাহির করিবার জন্য

কেহ যেন কয়েক সেকেণ্ডের বেশী সময় নষ্ট না করেন। অতঃপর রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইতে হইবে ও দুই কাঁদুড়ীর মধ্যে এরূপভাবে কাপড় জড় করিয়া দিবে যেন তাহাতে মাথা ঝুলিয়া পড়ে, জিহ্বা টানিয়া ধরিবে ও ওষ্ঠ হইতে বাহিরে রাখিবার জন্য রবাবের ফিতা বা সুতার দ্বারা দাড়ির সহিত বাঁধিয়া দিবে। নাসিকা ও বায়ুনালী হইতে বায়ু প্রবেশের বাধা দূর করিবে এবং তৎপরে সিলভেষ্টার প্রণালীতে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস করাইবে। যতক্ষণ রোগী স্বয়ং শ্বাস প্রশ্বাসে সমর্থ না হয় ততক্ষণ কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস করাইতে হইবে। সাহায্য করিবার লোক উপস্থিত না থাকিলে নাসিকার মধ্যে নস্য কিংবা স্মেলিং সল্ট প্রয়োগ করিবে। গলায় পালক দ্বারা সুরসুড়ী দিলে এবং বুক ও মুখে মালিস করিলে বিশেষ উপকার হয়। যখন কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস করান হয় তখন উক্ত ক্রিয়ার বাধা না দিয়া সাহায্যকারীদিগকে নিমজ্জিত ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শুষ্ক করিতে হইবে, ভিজা বস্ত্র ত্যাগ ও উহার পরিবর্ত্তে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করাইতে হইবে। শ্বাস প্রশ্বাস আরম্ভ হইলেই যাহাতে রক্ত সঞ্চালন উত্তমরূপে হইতে পারে তাহার চেষ্টা ও রোগীকে গরমে রাখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে রোগীকে শুষ্ক কম্বলে আবৃত করিবে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি নীচু হইতে উপরের দিকে জোরে মালিশ করিবে। এইরূপ মালিশ কম্বলের নীচে ও শুষ্ক কাপড়ের উপরে করা যাইতে পারে। গরম ফ্লানেল, গরম জলের বোতল কিংবা গরম ইঁট, পাকস্থলীর উপরে, বগলে, উরুদ্বয়ের মধ্যে কিংবা পায়ের তলায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগী গিলিতে পারিলে অল্প মদ্য, ব্রাণ্ডি ও গরম জল কিংবা উষ্ণ কাফি দেওয়া কর্ত্তব্য। রোগীকে বিছানায় শোয়াইয়া ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করিবে। প্রতিক্রিয়া বা Reactionএর সময় শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখিলে তিসি বা রাইয়ের পুল্টিশ বুকে ও পিঠে দিবে। কিছুক্ষণ ধরিয়া রোগীর শ্বাস ক্রিয়ার পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক; কারণ সময়ে সময়ে উহা পুনরায় বিকৃত হইয়া পড়ে। বিকৃত হইবার উপক্রম হইলেই পুনরায় কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস করান কর্ত্তব্য। এইরূপে ডাক্তার আসা পর্য্যন্ত দেখিতে হইবে; অথবা যদি পূর্ণ এক ঘণ্টা কাল শ্বাস প্রশ্বাস বা নাড়ী না চলে তাহা হইলে জীবনের আর কোন আশা নাই বুঝিতে হইবে।

নিম্নলিখিত কয়েকটী উপদেশ মনে রাখিবে যথা—(১) পুনর্জীবিত করিবার উপায়-গুলি প্রয়োগে দেরী করিবে না। (২) পূর্ব্বেকার উপায়গুলি প্রয়োগে যতশীঘ্র সম্ভব কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস আরম্ভ করিবে ও জীবনের আশা থাকিতে ছাড়িবে না।

রোগীর চতুঃপার্শ্বে বিশেষতঃ যদি রোগী ঘরের মধ্যে থাকে তাহা হইলে লোক-সমাগম হইতে দিবে না। বেশী জোর জবরদস্তি করিবে না। চিৎ করিয়া রাখিতে হইলে জিহ্বা দৃঢ়ভাবে বাহিরে রাখিতে হইবে। রোগী যতক্ষণ না গিলিতে পারে ততক্ষণ কোন উত্তেজক ঔষধ দিবে না। কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস কালীন তাড়াতাড়ী বা অনিয়মের সহিত অঙ্গচালনা করিবে না। ঘর যেন বেশী গরম না হইয়া পড়ে। কিছুতেই রোগীকে দাঁড় করাইবে না বা পা ধরিয়া ঝুলাইবে না। ডাক্তারের বিনা অনুমতিতে গরম জলের টবে রোগীকে রাখিবে না। রোগী বাঁচিবে বলিয়া শীঘ্র আশা দেওয়া অন্যায়; নিশ্চয় না করিয়া জীবনের আশা দিবে না।

বায়ুনালী মধ্যে খাদ্যের অংশ বা অপর কোন বাহ্য বস্তু গিয়া পড়িলে যে শ্বাসাবরোধ হয় তাহাতে প্রথমে সাহায্যদান নিম্নলিখিত উপায়ে করিতে হইবে। প্রথমেই ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইবে এবং ইতিমধ্যে শ্বাসপথের বাধা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিবে। রোগীকে ধীরে চিৎ করিয়া শোয়াইবে এবং মস্তক একধারে ঘুরাইয়া রাখিবে, পরে আঙ্গুল দ্বারা বা চামচার বাটের সাহায্যে জিহ্বা চাপিয়া ধরিয়া সম্মুখে টানিয়া আনিবে। শিশু হইলে পা ধরিয়া মস্তক অবনত করিয়া পিঠে ঘা দিলে চলিতে পারে। যদি বাহ্যবস্তু নিষ্কাশনের পর শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ারকোন চিহ্ন দেখা না যায় তাহা হইলে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস অন্ততঃ এক ঘণ্টাকাল চালান উচিত।

ল্যারিঙ্কস্ বা স্বরনালীর ভিতরকার পর্দ্দায় শোথ হইলে শ্বাসাবরোধ ঘটিতে পারে—

শিশুগণ কেট্‌লী হইতে অত্যুষ্ণ জল পান করিতে গিয়া এই বিপদ আনয়ন করে। এদেশে শীত কম সুতরাং শিশুরা গরম জল পান করে না, কিন্তু শীত প্রধান দেশে এই ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে। শীঘ্র ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইয়া শিশুকে কম্বলে আবৃত করিবে। গরম ফ্ল্যানেল বা স্পঞ্জ শুষ্ক বা ভিজা অবস্থায় মুখে

স্থাপন করিবে, এক চামচ করিয়া ঘৃত বা তৈল দিবে। বরফের টুক্‌রা চুষিতে দিলে অনেক আরাম বোধ হয়।

গলায় ফাঁস বা অন্য উপায়ে চাপ জনিত শ্বাসাবরোধ হইলে যত শীঘ্র সম্ভব রোগীকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিবে—গলায় দড়ি থাকিলে উহা কাটিয়া ফেলিবে এবং বস্ত্র সকল আল্গা করিবে। যদি নড়িতেছে এমন অবস্থায় দেখা যায় তাহা হইলে শীঘ্র শরীরের ভার লাঘব জন্য দেহ উত্তোলন করিবে। দড়ি কাটিয়া দিবার পূর্ব্বেই ইহা করা দরকার। মুখের উপর পরিষ্কার বায়ুস্রোত লাগিতে দিবে, শীতল জল মুখে ও বুকে ছিটাইয়া দিবে ও কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস করাইবে।

শ্বাস প্রশ্বাসের অনুপযুক্ত বাষ্প জনিত শ্বাসাবরোধ যথা—কাঠকয়লা, কোক্‌কয়লা, চুণ, সিমেণ্ট, বা ড্রেন হইতে উৎপন্ন গ্যাস, কুয়ার, পাইখানার ও খনিরবাষ্প, আঙ্গারিক-অম্ল-বাষ্প প্রভৃতি দ্বারা শ্বাসাবরোধ হইতে পারে। শীতের সময় বা সূতিকাগৃহে অনেক সময় জানালা দরজা বন্ধ করিয়া কাঠ বা কয়লার আগুন করা হয়। ইহা হইতে কার্ব্বন মনক্সাইড নামক গ্যাস উৎপন্ন হইয়া গৃহস্থ লোককে বিষাক্ত করে। এই বিষে শীঘ্রই রোগী অচেতন ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে উক্ত গ্যাস শরীরের রক্তের সহিত মিলিত হয় ও শীঘ্র মৃত্যু আনয়ন করে। রোগীকে শীঘ্র পরিষ্কার স্থানে বায়ুর স্রোতে আনিবে। বস্ত্র আল্‌গা করিয়া দিবে, জিহ্বা সম্মুখে টানিয়া ধরিবে ও সেই অবস্থায় রাখিয়া কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস করাইবে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিতে মালিষ ও উষ্ণতা প্রয়োগ করিবে এবং মুখে ও মাথায় শীতল জল ছিটাইবে।

মৃত্যু হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা যায়ঃ—শ্বাস ক্রিয়া হয় না, বক্ষ প্রাচীর গতি শূন্য হয়, বায়ুর অন্তর্গতি ও বহির্গতি কিছুই শুনা যায় না, মুখ হইতে জলীয় বাষ্পের অভাব দৃষ্ট হয়। বক্ষপ্রাচীর নড়িতেছে কি না ঠিক করিতে হইলে একটী জলপূর্ণ পাত্র বক্ষের উপরি স্থাপিত করিয়া উহার জল নড়ে কি না লক্ষ্য করিবে। শ্বাস পরিত্যাগ কালে মুখের উপর স্বচ্ছ দর্পণ স্থাপন করিলে জলীয় বাষ্পের বিদ্যমানতা হেতু উহা মলিনতা প্রাপ্ত হয়। হৃৎপিণ্ডের

গতি নাই, নাড়ী নাই, এইরূপ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের উপর কান দিয়া শুনিলে কোন শব্দই শুনিতে পাওয়া যায় না। রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে কি না জানিবার জন্য একটা অঙ্গুলী সূত্র দ্বারা দৃঢ় করিয়া বাঁধিবে। যদি রক্ত সঞ্চালিত হইতে থাকে তাহা হইলে অঙ্গুলী ঈষৎ লাল ও যেস্থানে তাগা বাঁধা হইয়াছে সেই স্থান শ্বেতবর্ণ দেখাইবে। নয়নদ্বয় অর্দ্ধ নিমিলিত ও তারাগুলি প্রসারিত দেখা যায়, অক্ষিগোলক স্পর্শ করিলে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। দেহের উপরিভাগ শীতল হয় ও পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে।

(ক্রমশঃ)

য় স্বাস্থ্য কথা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবতারণ বিদ্যারত্ন লিখিত—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বর্ষা স্বভাব।

সৌম্যমূর্ত্তি বর্ষা ঋতু তাপ নিবারিতে।
উপনীত হইলেন দ্রুত গমনেতে॥
বর্ষার শুভাগমে নব জলধর।
আসি নভঃ আচ্ছাদিল করি অন্ধকার
শুষ্ক দগ্ধ প্রায় ধরা বর্ষায় হেরিয়া।
মনেতে করিল আশা জুড়াব বলিয়া॥
ধূলি ধুসরিত দেহ সব দিগঙ্গনা।
বর্ষা হেরি পাসরিল সকল যন্ত্রণা।
বর্ষার আজ্ঞা মাত্রে জলদ পটল।
ধরা তাপ নিবারিতে বরিষয়ে জল॥
সৌম্যরূপ বর্ষা হেরি পাইয়া আশ্বাস
ছাড়ে ধরা উষ্ণরূপ সুদীর্ঘ নিশ্বাস।
ধারাপাতে হয় ধরা সুস্থ কলেবর।
আর দিগঙ্গনা ধরে শোভা মনোহর।

সিন্ধু নদ নদী আদি যত জলাধার।
আনন্দে বর্দ্ধিত হয় সবার আকার॥
শুষ্ক দগ্ধ মৃতপ্রায় উদ্ভিদ্ সকল।
জলসেকে জীয়ে পুনঃ প্রাপ্ত হয় বল॥
নবীন নীরদে হেরি নর্ত্তক চতুর।
পুচ্ছ বিস্তারিয়া শিখী নাচয়ে মধুর॥
পাইয়া নূতন জল মণ্ডূক সকল।
লম্ফে ঝম্ফে ধরাতল দেয় রসাতল॥
পিপাসায় অতিক্ষীণ হইয়া যাচক।
জলদে যাচয়ে জল বিনয়ী চাতক॥
গগনে সর্ব্বদা রহে জলধর ঘটা।
ইন্দ্রধনু আর কভু বিদ্যুতের ছটা॥
করকাবর্ষণ আর মেঘের গর্জ্জন।
অরুদ্ধ বায়ুর গতি বজ্রের পতন॥
সর্ব্বদা পঙ্কিল হয় সব ক্ষিতিতল।
আর শ্যাম লতাভূণে শ্যামল সকল॥
বলাকা প্রভৃতি কত পক্ষী দলে দলে।
ভোজনাদি জন্য ভ্রমে অতি কুতূহলে॥
বর্ষার আনুকূল্যে দেবী বসুন্ধরা।
নানাবিধ শস্যরূপে হয় মনোহরা॥
সর্ব্ববিধ জলপূর্ণ এই ভূমণ্ডল।
ধৌত করি বহে বেগে নদ নদী জল॥

বিবিধ গ্রন্থ।

বর্ষা ঋতু চর্য্যা।

বর্ষাকালে রহে সদা মানব দুর্ব্বল।
সেই মত তাহাদের পাচক অনল॥
ভূবাষ্পের উদ্গমে মেঘের বর্ষণে।
আর সলিলের অম্ল পাকের কারণে॥
বর্ষায় কুপিত বাত পিত্ত কফ আর।
ক্ষীণ অগ্নি করে ক্ষীণ দেহ সবাকার॥
সেই হেতু বর্ষাকালে অতি সাবধানে।
বাত পিত্ত কফ শান্তি করিবে যতনে॥
যবশক্তু জলযোগে করিয়া তরল।
কদাচ না খাইবে মানব সকল॥
সনল নদীর জল সূর্য্যের কিরণ।
ত্যজিবেক বর্ষাকালে যত্নে নরগণ॥
দিবাভাগে নিদ্রা আর রাত্রিতে শিশির।
অতি যত্নে ত্যজিবেক হইয়া সুস্থির॥
বাত বর্ষা সমাকুল সুশীতল দিনে।
অগ্নির রক্ষণে আর বায়ুর দমনে॥
লবণাক্ত বহু স্নেহযুত খাদ্য দ্রব্য।
বর্ষাকালে মানবের খাওয়া কর্ত্তব্য॥
ঘৃত মরিচাদি সহ সুপক্ক ব্যঞ্জন।
বাতনাশী আর খাদ্য করিবে ভোজন॥
পুরাণ গোধূম যব ভোজনে বিহিত।
সেই মত শালি অন্নে হয় বহু হিত॥
বৃষ্টি জল কিম্বা কূপ সরসীর জল।
উত্তপ্ত করিয়া পরে করিবে শীতল॥
সেই জল বর্ষা কালে করিবেক পান।
স্বাস্থ্য রক্ষা জন্য ইহা শাস্ত্রের বিধান॥
মাখিবেক হরিদ্রাদি শরীরে বর্ষায়।
মার্জ্জন করিবে দেহ হবে শুদ্ধকায়॥

নিৰ্ম্মল সুক্ষ্মবাস পরিবে সকলে ।
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য ধরিবেক গলে ॥
চন্দন লেপনে দেহ চৰ্চ্চিত করিবে ।
বিশুষ্ক স্থানেতে সদা সকলে থাকিবে ॥

চরক ।

শরৎ স্বভাব ।

হইয়া প্রফুল্ল সবে শরৎ নবীন ।
দিক সুনিৰ্ম্মল আর নভো মেঘহীন ॥
কমল প্রফুল্ল আর কুমুদ কহ্লার ।
সরোবরাদির শোভা করয়ে বিস্তার ॥
সমুজ্জ্বল চন্দ্র আর নক্ষত্র সকল ।
রাত্রি সুশোভিত করে গগনমণ্ডল ॥
[illegible] জল বেগে শোভে নদনদী সব ।
কাননাদি শোভে ধরি রসাল পল্লব ॥
মার্গসব হয় প্রায় কৰ্দ্দম বিহীন ।
স্বচ্ছ জলে হংসসনে সুখে খেলে মীন ॥
হইয়া প্রমত্ত ভৃঙ্গ প্রফুল্ল কমলে ।
[illegible] মধুপান করে কুতূহলে ॥
সপ্তপর্ণ কুন্দপুষ্পে শোভে কাননেতে ।
[illegible] ॥
নিশাতে ফুটিত পুষ্প-[illegible] বিকাশি ।
উপহাস করে যেন চন্দ্র রূপরাশি ॥
কুসুম মঞ্জরী ধরি কাস সমুদয় ।
ধবলিত করে নিত্য প্রান্তর নিচয় ॥
শরতের গুণে হয় সলিল বিমল ।
আর তরু লতা তৃণে শ্যাম ক্ষিতিতল ॥

সহকার তরুপরে পুষ্পিত মালতী ।
নিতি নিতি কত শোভা ধরে লীলাবতী ॥
ভয়দ নাহিক রহে মেঘের গর্জ্জন ।
করকা বর্ষণ আর বজ্র নিপতন ॥
বিদ্যুৎ স্ফুরণ আর না শোভে গগনে ।
নিরাপদে সুখে সবে রহে প্রীতমনে ॥

বিবিধ গ্রন্থ ।

শরৎ ঋতু চর্য্যা ।

বর্ষাকালে মেঘোদয় বারি বরিষণে ।
শৈত্য হেতু পিত্ত স্থির রহে নরগণে ॥
বর্ষায় সঞ্চিত পিত্ত শরৎ কালেতে ।
দ্রবীভূত হয় সূর্য্য কর সংযোগেতে ॥
গলিত কুপিত পিত্ত করে নানা রোগ ।
প্রতীকার না করিলে বাড়ে দুঃখভোগ ॥
পিত্ত নাশি দ্রব্য সবে করিবে সেবন ।
আর বিচারিয়া লবে সবে বিরেচন ॥
পিত্ত প্রশমন হয় ইহাতে নিশ্চয় ।
কাল বিলম্বনে ধ্রুব বাড়ে রোগচয় ॥
শীতল তিক্তক লঘু মধুরান্নে আর ।
মিষ্টপেয় পানে হয় হিত সবাকার ॥
যাহার যেরূপ অগ্নি আছয়ে শরীরে ।
অন্নপান মাত্রা লবে সেইমত ক'রে ॥
রক্ত শালি যব আর গোধূম সেবনে ।
উপকার হয় বহু কহে বুধজনে ॥
শরতে সূর্য্যের কর আর ক্ষার দধি ।
ত্যজিলে নিশ্চয় সুখে রবে নিরবধি ॥

দিবা নিদ্রা অতি মন্দ এজন্য ত্যজিবে।
আর পূর্ব্ব বায়ু সবে কভু না সেবিবে॥
বায়ুর দমনে দেহ আবরিবে পটে।
পালিলে এ বিধি নর না পড়ে শঙ্কটে॥
আর রোগকর হয় শরতে শিশির।
এজন্য ত্যজিবে সবে করি মনস্থির॥
চন্দ্র সূর্য্য কর যাহে হয় নিপতিত।
সেই হংসোদক করে স্নান পানে হিত॥
শারদীয় পুষ্পমাল্য অতি মনোহর।
ধারণ করিবে সবে করিয়া আদর॥
সুনির্ম্মল চন্দ্রকান্তি সন্ধ্যার সময়।
সেবন করিবে সুখে নর সমুদয়॥
পরিধান করিবেক নির্ম্মল বসন।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ইহা না কর হেলন॥

চরক।

হেমন্ত স্বভাব।

হেমন্তের শুভাগম শরদবসানে।
হৈমন্তিক শোভা কিবা শোভে স্থানে স্থানে
কঠিন কর্দ্দম ক্ষিতি জল সুশীতল।
তুষারে সুসিক্ত হয় সকল ভূতল॥
শীত সমীরণ বহে অল্পরুক্ষ ভাব।
ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হয় শীতের প্রভাব॥
ক্রমে সূর্য্যতেজ মৃদু হেরিয়া নলিনী।
সহসা মলিনা হয় হইয়া দুঃখিনী॥
জবা শেফালিকা আর স্থলজ কমল।
পুষ্প বিস্তারিয়া করে মণ্ডিত ভূতল॥
মধুর গুঞ্জনে আর তুষিয়া ভ্রমর।
প্রতিপুষ্পে মধুপানে হয় অগ্রসর॥
ফলভরে নতশিরে শোভে শুষ্ক দেহে।
শালি কলমাদি আর কত ক্ষীণ রহে।
ক্ষীণ দেহ নদনদী আর জলাশয়।
নরদেহে হয় নিত্য কফের সঞ্চয়॥
পীতবর্ণ তৃণাদিতে বেষ্টিত ভূতল।
ক্রমে রুক্ষ দেহ হয় উদ্ভিদ্ সকল॥
শোভাহীন হয় আর সব সরোবর।
ক্রমে ক্রমে সূর্য্যকর বহু প্রীতিকর॥
স্নানে পানে আচমনে হিমজলে ভয়।
হেমন্ত স্বভাবে করে নর সমুদয়॥
সুতনু বিমল বস্ত্রে সদা হয় রোষ।
আর পাদুকার প্রতি সতত সন্তোষ॥
অনাবৃত দেহে লোক না রহে একালে।
ক্রমশঃ শীতল হয় ভূমি হিমজালে॥
চন্দন লেপনে কিংবা শীতল পবনে।
শ্রদ্ধা নাহি দেখা যায় প্রায় সর্ব্বজনে।
গলে নাহি পরে কেহ মুকুতার হার।
সুগন্ধি জলার্দ্র শুভ পুষ্পমাল্য আর॥
হেমন্ত স্বভাব এই জানহ নিশ্চয়।
প্রত্যক্ষ করিয়া ইহা শাস্ত্রকার কয়॥

বিবিধ গ্রন্থ

হেমন্ত ঋতু চর্য্যা।

হেমন্ত ঋতুর চর্য্যা শিশিরের মত।
কিন্তু ঈষদূন হয় হিমচর্য্যা যত॥

বাহ্যদেশে অল্প শৈত্য যোগে নরদেহে।
রুদ্ধতাপে দৃঢ় অগ্নি দীপ্তভাবে রহে॥
গুরুপাক দ্রব্য যাহা হেমন্তেতে খায়।
অনায়াসে অগ্নিবলে সুখে পাক হয়॥
উদর পুরিয়া যেবা না করে ভোজন।
দীপ্ত অগ্নি উদরেতে করয়ে দহন॥
অল্প শৈত্য হেতু বায়ু অল্প রুক্ষ হয়।
এজন্য বায়ুর কোপ মৃদুভাবে রয়॥
স্নেহযুক্ত সুব্যঞ্জন পিষ্টকাদি আর।
খাইলে অবশ্য নাশে বায়ুর বিকার॥
সদ্যোজাত গব্যঘৃত দুগ্ধান্ন ভোজনে।
অথবা গোঘৃত সহ মাংসান্ন সেবনে॥
বারিজাত কচ্ছপাদি বাতঘ্ন বলিয়া।
ভোজনে বিহিত আছে গুণ বিচারিয়া॥
এরূপ ভোজনে নাশে বায়ুর বিকার।
হেমন্ত কালেতে ধ্রুব দেহে সবাকার॥
স্নান আদি আচরিবে ঈষদুষ্ণ জলে।
ইক্ষু গুড় চিনি আদি খাইবে সকলে॥
বাতশীতনাশী দ্রব্য ক্রিয়া সমুদয়।
হেমন্তে সুপথ্য হয় জানিবে নিশ্চয়॥

চরক।

(ক্রমশঃ)

মস্তিষ্ক ও স্না:

শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এল, এম, এস।

কোনও কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে হইলে তাহার একজন বিচক্ষণ পরিচালকের আবশ্যক হয়। চালক যেভাবে যেরকম আজ্ঞা দিবে, তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ সেরূপভাবে কার্য্য করিবে। আমরা জানি যে মস্তিষ্কই আমাদের সমস্ত শরীরের কর্ত্তা। ইহার দ্বারাই আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়মিতরূপে পরিচালিত হইতেছে। শরীরের ভিতর সাদা সুতার ন্যায় এক প্রকার কোমল পদার্থ আছে তাহাকে স্নায়ু বলে। দেহের সকল স্থানেই এই স্নায়ু অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। যেমন বৈদ্যুতিক তারের দ্বারায় দেশ বিদেশের খবর লওয়া ও দেওয়া যায়, তেমনি এই সকল স্নায়ুর দ্বারাই মস্তিষ্ক শরীরের বিভিন্ন অংশ হইতে খবর পায় এবং যথাযথ আজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকে।

বেশী ভাগ স্নায়ুই মেরুস্নায়ুস্তম্ভের (স্পাইন্যাল্ কর্ডের) সহিত যুক্ত আছে আর মেরুস্নায়ুস্তম্ভও মস্তিষ্কের নিম্ন অংশের সহিত সংযুক্ত। আর কতকগুলি স্নায়ু মস্তিষ্কের সহিত সাক্ষাৎভাবে যুক্ত রহিয়াছে। ইহাদিগের কার্য্য অতি প্রয়োজনীয় ও গুরুতর বলিয়া পরিচালকের সহিত এরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। যেরূপেই হউক না কেন মস্তিষ্কের সহিত সকল স্নায়ুরই একটা অধীনস্থ সম্বন্ধ আছে। কর্ত্তাকে না জানাইয়া ভৃত্যেরা কোনও কার্য্য করিতে পারে না। মস্তিষ্ককে না জানাইয়া আমরা কাহাকেও আঘাত করিতে পারি না। যে স্থানে আঘাত করিব সেস্থানের স্নায়ু তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্ককে সংবাদ দিবে। মস্তিষ্কেরই সুখ দুঃখের বোধশক্তি আছে। যদি স্নায়ু সকল তাহাকে শরীরের বিভিন্ন অংশ হইতে সংবাদ না দেয় তাহা হইলে সে কেমন করিয়া বুঝিবে? স্নায়ুর অভাবে আমাদের সুখে আনন্দ ও দুঃখে কষ্ট অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকে না। যাহাতে মস্তিষ্ক আবশ্যকীয় সকল সংবাদ জানিতে পারে সেজন্য সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই স্নায়ু সকল বিশেষরূপে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে।

এখন কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পার "আচ্ছা, স্নায়ুর দ্বারা মস্তিষ্ক যদি কষ্টই অনুভব করে তবে স্নায়ু না থাকিলেও ত চলিত। আমাদের চর্ম্মে স্নায়ু না থাকিলে, কেহ আঘাত করিলে বা পুড়িয়া যাইলে আমরা বুঝিতে পারিতাম না।" কথাটা মন্দ শুনায় না। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে শারীরিক কোনও অনিষ্টের কথা যদি আমরা তৎক্ষনাৎ বুঝিতে না পারি তাহা হইলে আমাদের যে বিশেষ অনিষ্টকর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আঘাত পাইলে আমরা দুঃখ পাই বলিয়া বরং আমাদের প্রীত হওয়া উচিত। কারণ এই কষ্টটী পাই বলিয়াই ত যাহারা আমাদিগকে কষ্ট দিতেছে, যেটী দুঃখের কারণ, তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ সরিয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত হই। মনে কর, আমি যদি আমার অঙ্গুলী প্রজ্জলিত অগ্নির উপর রাখি, তাহা হইলে কি হইবে? তৎক্ষণাৎ আমার অঙ্গুলীর স্নায়ু মস্তিষ্কে সংবাদ দিবে। মস্তিষ্ক কষ্টে কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ স্নায়ুর দ্বারায় হস্তের মাংসপেশীকে বলিবে শীঘ্র আঙ্গুলটী সরাও নচেৎ পুড়িয়া যাইতেছে কর্ত্তার হুকুমমত মাংসপেশীর সঙ্কোচনে তৎক্ষণাৎ আঙ্গুলটী পুড়িয়া যাওয়া হইতে রক্ষা পাইল। আঙ্গুলটী পুড়িয়া

যাওয়া অপেক্ষা একটু কষ্ট অনুভব করিয়া তাহার রক্ষা হওয়া আমাদের পক্ষে কি বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়?

এখন দেখা যাইতেছে যে শরীরের কোথায় কি হইতেছে, সে সংবাদ মস্তিষ্কে পৌঁছিতেছে ও পরক্ষণেই কি করা কর্ত্তব্য তাহা মস্তিষ্ক স্নায়ুর দ্বারায় অঙ্গ বিশেষকে আজ্ঞা করিতেছে। যে সকল স্নায়ু মস্তিষ্কে সংবাদ লইয়া যায় তাহাকে অনুভূতিক স্নায়ু বলে (Nerves of sensation). শরীরের অংশবিশেষে যে স্নায়ু মস্তিষ্কের আজ্ঞা বহন করিয়া লইয়া যায় তাহাকে কার্য্যকারক স্নায়ু কহে (Nerves of motion). একই স্নায়ুগুচ্ছের ভিতরে এই দুই প্রকারেরই সূক্ষ্ম স্নায়ু মিশ্রিত থাকিতে পারে। তাহার মধ্যে কতকগুলি মস্তিষ্কে সংবাদ লইয়া যায় ও কতকগুলি মস্তিষ্কের আজ্ঞা বহন করে।

মস্তিষ্ক যখন কোনও সংবাদ পায় তখনি হুকুমজারি করিয়া থাকে তাহা নহে। তাহার বিবেচনা করিয়া দেখিবার ক্ষমতা আছে। ভাল মন্দ বিচার করিয়া যাহা প্রয়োজনীয় তাহাতে আজ্ঞা দিবার শক্তি আছে। কথাটা একটী উদাহরণ দিয়া বোঝান যাউক। কেশব রাস্তার এক পার্শ্ব দিয়া যাইতেছে। সে দেখিতে পাইল রাস্তার অপর ধার দিয়া তাহার বন্ধু হরি যাইতেছে। তৎক্ষণাৎ তাহার চক্ষুর স্নায়ু মস্তিষ্ককে সংবাদ দিল যে হরি রাস্তার অপর পার্শ্ব দিয়া যাইতেছে কিন্তু আমায় দেখিতে পায় নাই। মস্তিষ্ক এসংবাদ পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। হয়ত হরিকে কোন কথা বলিতে স্মরণ হইল অমনি সে স্নায়ুর দ্বারা পদদ্বয়কে হরির কাছে যাইবার জন্য আজ্ঞা করিল বা হরিকে ডাকিবার জন্য তাহার বক্ষ কণ্ঠ ও মুখের মাংসপেশীকে আজ্ঞা করিল। কিন্তু মস্তিষ্ক আর এক রকম ও ভাবিতে পারে। মনে করিতে পারে—"আজ থাক্, কাল হরির সহিত দেখা হইলে বলিব।" এখানে মস্তিষ্ক তাহার ভৃত্যদের কোনও হুকুম দিল না, কাজেই কেশব পূর্ব্বমত চলিয়া গেল। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে মস্তিষ্ক আপন বিবেচনা মত কোন কার্য্য করিতে বা না করিতে পারে।

যদি মস্তিষ্ক বার বার একটী সংবাদ পায় এবং একই প্রকার আজ্ঞা প্রদান করে তাহা হইলে আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে সে আর বড় একটা ভাল মন্দ বিচার করিয়া দেখে না। পরিশেষে এমন হয়, যে কোন চিন্তা না করিয়া সে আজ্ঞা দিয়া থাকে।

ইহাকেই অভ্যাস বলে। এরূপে আমাদের দৈনিক কার্য্যের অনেকগুলিই অভ্যাস হইয়া যায়। আহার নিদ্রা ব্যায়াম প্রভৃতি সকল কার্য্যই আমরা অভ্যাস মত করিয়া থাকি। সেজন্য যাহাতে ভাল অভ্যাস হয় সে বিষয়ে আমাদের সর্ব্বদা সাবধান হওয়া উচিত। মস্তিষ্কের জ্ঞান-পূর্ণ আদেশমত প্রতিদিন কার্য্য করিলে আমাদের যে সু-অভ্যাসগুলি হইয়া যায় তাহা আমাদের স্বাস্থ্য ও মানসিক সুখের কারণ হইয়া থাকে। অভ্যাস এমনি জিনিষ যে খারাপ অহিতকারী হইলে তাহা নষ্ট করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠে।

কতকগুলি কার্য্য আছে যাহাতে মস্তিষ্কের কোনও চিন্তার আবশ্যক করে না; যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস প্রণালী ও হৃৎপিণ্ডের কার্য্য আমাদের নিদ্রিতাবস্থায়ও হইয়া থাকে; ইহারা মস্তিষ্কের ইচ্ছাধীন হইয়া কার্য্য করে না। কতক কার্য্যের ভার মস্তিষ্ক মেরুস্নায়ুস্তম্ভের (Spinal cord)এর উপর দিয়া রাখিয়াছে যেমন কোন নিদ্রিত ব্যক্তির পায়ে যদি সুড়সুরি দেওয়া যায় সে সংবাদ তৎক্ষণাৎ মেরুস্নায়ুতে গিয়া পৌঁছে অমনি সে পা সরাইবার জন্য আজ্ঞা দেয়। মস্তিষ্ক এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে না। যদি স্নায়ু সুস্থ ও সবল না থাকে তাহা হইলে মস্তিষ্ক সুস্থ ও সবল থাকিলেও সম্যকরূপে কার্য্য পরিচালনা করিতে পারে না। স্নায়ুকে সুস্থ রাখিতে হইলে বিশুদ্ধ বায়ু ও শারীরিক পরিশ্রম বিশেষ প্রয়োজনীয়। পুষ্টিকর সাদাসিদে রকমের খাদ্য দ্রব্য পরিমিত রূপে আহার করা উচিত। মাদক দ্রব্যাদি সেবনে বা অতিরিক্ত ধূমপানে অকারণ উত্তেজনায় স্নায়ু বিকৃত ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় স্নায়ুরও সম্যক্ পরিচালনা আবশ্যক এবং ইহারও বিশ্রাম সম্যকরূপ হওয়া উচিত। দূষিত বায়ু সেবনে রক্তও দূষিত হইয়া থাকে। অপকৃষ্ট অন্ত্র হইতে বিষ উৎপন্ন হইয়া রক্ত দূষিত করে। এবং এই দূষিত রক্তদ্বারা পোষিত মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডল সহজেই অকর্ম্মণ্য হইয়া আমাদিকে নানাপ্রকার রোগেও অসুস্থতায় পাতিত করে।

মক্ষিকা ও সংক্রামক ব্যাধি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু লিখিত—

পৃথিবীর প্রায় সকল অংশেই মক্ষিকা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সাধারণতঃ মক্ষিকাকে অতি নিরীহ প্রাণী বলিযাই জানি। কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতে মক্ষিকা বিশেষ অনিষ্টকারী, সাধারণের ধারণামত নিরীহ নহে। মক্ষিকা, মনুষ্য সমাজে মারাত্মক ব্যাধি সংক্রামিত করে, তাহাদের অপেক্ষা বরং মনুষ্যভুক্ সিংহ, ব্যাঘ্রাদি নিরীহ।

গৃহ মক্ষিকা

মক্ষিকা নানাপ্রকারের আছে। সচরাচর আমরা বাড়িতে যে মক্ষিকা দেখিতে পাই তাহাদিগকে গৃহ-মক্ষিকা বলে। গৃহ-মক্ষিকা ধূসর বর্ণের ও লম্বে মাত্র সিকি ইঞ্চি। ইহাদের মুখ একবারে মস্তকের প্রান্তে অবস্থিত এই জন্য ইহারা কামড়াইতে পারে না। অন্যান্য মক্ষিকার সহিত গৃহ-মক্ষিকার অবয়বগত এই বিশেষ পার্থক্য আছে। বৈজ্ঞানিকেরা গৃহ-মক্ষিকাকে (Musca domestica) বলেন।

অপর প্রকারের মক্ষিকা

গৃহ মক্ষিকা ব্যতীত আরও কয়েকপ্রকারের মক্ষিকা কখনও কখনও গৃহমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার নীল বর্ণের মক্ষিকা আছে। ইহাকে সাধারণতঃ আমরা "গুয়ে মাছি" বলিয়া থাকি। মনুষ্য বিষ্ঠাই এই মক্ষিকার প্রিয় আহার। নানাপ্রকারের ফলও ইহারা খাইয়া থাকে। আম, কাঁঠালের সময় এই মক্ষিকার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। সাধারণ মক্ষিকার ন্যায় আর এক প্রকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মক্ষিকাও দেখিতে পাওয়া যায়।

মক্ষিকার বংশ বৃদ্ধি

মক্ষিকার অতি শীঘ্র বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্ত্রী মক্ষিকা এক এক বারে ১২০ হইতে ১৫০টি পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। গ্রীষ্ম ঋতুই ডিম পাড়িবার জন্য প্রশস্তকাল। এক ঋতুতে একটী মক্ষিকা ৬ বা ততোধিক বার ডিম পাড়িয়া থাকে। ২৪ ঘণ্টায় ডিম হইতে শাবক উৎপন্ন

হয়। এই শাবক নানা অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইয়া ৮ দিনে পূর্ণ মক্ষিকায় পরিণত হয়: এবং ডিম পাড়িতে সুরু করে। একটী মক্ষিকা হইতে মাত্র ৪০ দিন সময়ের মধ্যে ১২,৬২৭,৫৫০ মক্ষিকা জন্মিতে পারে। একজন বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন যে, একটী সিংহের একটী মৃত অশ্ব খাইতে যত সময় লাগে, তিনটী মক্ষিকার বংশাবলীও সেই সময়েই অশ্বকে উদরসাৎ করিতে পারে।

ডিম পাড়িবার উপযুক্ত স্থান

গৃহ মক্ষিকা সকল প্রকার আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থানেই ডিম পাড়িয়া থাকে। অশ্ব বিষ্ঠার স্তূপই ডিম পাড়িবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই গৃহ মক্ষিকা অশ্ব বিষ্ঠার উপরে ডিম পাড়িয়া থাকে। গোবরও উপযোগী। মোটের উপর আস্তাবল, গোয়াল এবং গৃহপালিত অন্যান্য পশুর খোঁয়াড় মক্ষিকার ডিম পাড়িবার উপযুক্ত স্থান। পচা প্রাণিজ পদার্থ, ফল শাকশবজী এবং রান্নাঘরের আবর্জ্জনার স্তূপও ডিম পাড়িবার উপযুক্ত স্থান। যে সকল আবর্জ্জনার স্তূপ শীঘ্র শীঘ্র পরিষ্কার করা হয়, মক্ষিকা তাহাতে ডিম পাড়ে না; অতি ভিজা বা অতি শুষ্ক গোবর কিম্বা ছাই ডিম পাড়িবার উপযোগী নহে।

মক্ষিকার আবির্ভাব

নানাকারণে মক্ষিকাশূণ্য স্থানে মক্ষিকার আবির্ভাব হয়। সচরাচর গৃহ মধ্যে যে সকল মক্ষিকা দেখা যায়, তাহাদের অধিকাংশই আস্তাবল, গোয়াল বা পাইখানা হইতে আসিয়া থাকে। গলিত খাদ্য দ্রব্যাদির গন্ধ দ্বারা আকৃষ্ট হওয়াই ইহাদের গৃহ প্রবেশের প্রধান কারণ। মক্ষিকা আহার অন্বেষণে অর্দ্ধ মাইল কিম্বা ততোধিক পথও অতিক্রম করে। ইহা ব্যতীত গরুর গাড়ি, ও রেলগাড়ি প্রভৃতির দ্বারাও মক্ষিকা একস্থান হইতে বহু মাইল দূরে অন্য স্থানে নীত হয়।

বীজাণু বহন-কারী

সাধারণ মক্ষিকা যে রোগের বীজাণু বহনকারী তাহা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রমাণিত হয়। ইহার কিছু দিন পরে প্রমাণ করা হয় যে মক্ষিকা যক্ষ্মারোগ বিস্তৃতির একটী প্রধান কারণ। কয়েক বৎসর হইতে আমরা জানিয়াছি যে মক্ষিকা প্লেগের এবং মশক ম্যালেরিয়ার বীজাণু বহন করে।

ইউগেণ্ডা দেশীয় সাংঘাতিক নিদ্রারোগ এক প্রকার মক্ষিকার দ্বারা সংক্রামিত হয়। উপরোক্ত ব্যাধি সমূহ ব্যতীত মক্ষিকা ডিপথিরিয়া, উদরাময়, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি ভীষণ ব্যাধি সমূহের বীজাণু বহন করে। একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছেন যে, মক্ষিকা এসিয়াটিক্ কলেরা বিস্তৃতির প্রধান কারণ।

বীজাণু বহন প্রণালী

মক্ষিকা দ্বারা দুই প্রকারে রোগ বীজাণু বাহিত হয়। (১ম) মক্ষিকারা আবর্জ্জনা পাইখানা, রোগীর পিক্‌দানী প্রভৃতি ঘুরিয়া, তাহাদের ব্রুসের মত পদে অনেক বীজাণু সংলগ্ন করে। পরে সেই মক্ষিকারা রান্না ও খাবার ঘরে প্রবেশ করিয়া খাদ্য ও পানীয়ে বীজাণু সংলগ্ন করে। ইহাই মক্ষিকার বীজাণু ছড়াইবার সাধারণ নিয়ম।

(২য়) বীজাণু খাদ্যের সহিত মক্ষিকার শরীরে প্রবেশ করে ও নিজ শক্তি অক্ষুণ্ন রাখিয়া পুনরায় মলের সহিত বাহির হয়। মক্ষিকার মল খাদ্যের সহিত উদরসাৎ হইলে রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে।

বীজাণুর সংখ্যা

মক্ষিকা একবারে কতগুলি বীজাণু বহন করে, তাহা গণনার জন্য দুইজন বৈজ্ঞানিক ৪১৪টা মক্ষিকা বীজাণু শূন্য জলপূর্ণ বোতলে ছাড়িয়া তৎসংলগ্ন সমস্ত বীজাণু পরিষ্কৃত করিয়া লইয়াছেন। পরে সেই জল লইয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে বীজাণুর গণনা করা হইয়াছিল। এইরূপে গড়ে প্রত্যেক মক্ষিকায় ১,২২২,৫৭০টী বীজাণু পাওয়া গিয়াছিল। এই পরীক্ষায় একটী মক্ষিকাতে ঊর্দ্ধ সংখ্যক ৬,৬০০,০০০ পর্য্যন্ত বীজাণু দৃষ্ট হইয়াছিল।

রোগ সংক্রামকতা

অন্য প্রকারের মক্ষিকা অপেক্ষা রোগ সংক্রামিত করিতে সাধারণ গৃহমক্ষিকাই অধিক দায়ী। যে ঋতুতে মক্ষিকার সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পায়, সেই সময়েই উদরাময়, কলেরা ও টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি সংক্রামক রোগেরও আধিক্য দৃষ্ট হয়। সংক্রামক রোগের অতি অল্প সংখ্যক বীজাণু উপযুক্ত ভাবে ছড়াইতে পারিলে একটী মক্ষিকার পক্ষে, এক পরিবারের সকলকেই রোগগ্রস্ত করা সম্ভবপর।

টিক্‌টিকি, মাকড়শা ও বৃশ্চিক প্রভৃতি গৃহমক্ষিকার প্রধান শত্রু। আস্তাবলে

মক্ষিকার শত্রু

মোরগ থাকিলে মক্ষিকার অপরিণত শাবকের সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। এক প্রকার পিপীলিকাও একার্য্যে বিশেষ সহায়তা করে। ক্ষুদ্র লাল বর্ণের একপ্রকার কীট দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অনেক মক্ষিকা বিনষ্ট হয়।

প্যারিস্ গ্রিন্ (Paris Green) নামক বিষাক্ত পদার্থ এক আউন্স পরিমাণ

বিনাশের উপায়

এক গ্যালন জলে গুলিয়া আস্তাবল, গোয়াল এবং গৃহপরিত্যক্ত আবর্জ্জনার উপর ঢালিয়া দিলে প্রায় সমস্ত মক্ষিকার ডিম নষ্ট হইয়া যায়।

প্রত্যেক আবর্জ্জনা স্তূপের উপর ১৬ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিলে সমস্ত মক্ষিকার ডিম নষ্ট হইয়া যায়।

মক্ষিকা ধরিবার আটা লাগান বিলাতী কাগজে (Fly paper) আট্‌কাইয়া অনেক মক্ষিকা বিনাশ করা যায়।

একটী জলপূর্ণ বড় ডিসে এক চামচ ফর্‌মেলডিহাইড্ মিশাইয়া ধারে ধারে চিনি ছড়াইয়া রাখিলে তাহাতে মক্ষিকাসমূহ শীঘ্র আকৃষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কয়েকটী অবশ্য পালনীয় ব্যবস্থা।

(১) সর্ব্বদা রোগীর বিশেষতঃ সংক্রামক রোগীর নিকট হইতে মক্ষিকাকে দূর করা কর্ত্তব্য। রোগীর ঘরের মধ্যে যদি দুই একটী মক্ষিকা দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করা উচিত।

(২) বাটীর নিকট কোন প্রকার পচনোন্মুখ দ্রব্যাদি ফেলিয়া রাখা উচিত নয়।

(৩) সকল প্রকার পরিত্যক্ত নেকড়া, খড় কুটা, কাগজ, শাকশবজী দূরে নিক্ষেপ করা কিম্বা তাহাদের উপরে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দেওয়া উচিত।

(৪) সমস্ত খাদ্য দ্রব্যাদি ঢাকা দিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

(৫) আস্তাবল ও গোয়ালে চুন কিম্বা কেরোসিন্ তৈল ছড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) তরকারীর খোসা প্রভৃতি যেখানে সেখানে না ফেলিয়া ঢাকা দিয়া রাখা উচিত।

(৭) খাদ্যের পরিত্যক্ত অংশ ঢাকা দিয়া রাখা কিম্বা ফেলিয়া দেওয়া উচিত।

(৮) দোকানের সকল খাদ্য ঢাকার মধ্যে রাখা কর্ত্তব্য।

(৯) রান্না ও খাবারের ঘরের জানালায় পরদা লাগান উচিত।

(১০) মক্ষিকা দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, নিকটেই কোথাও ডিম পাড়িয়াছে। সেইরূপ বুঝিয়া বাটীর নিকটস্থ সমস্ত আবর্জ্জনা অপসারিত করা কর্ত্তব্য।

কৃমি।

ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, বি, এস, সি, এম্, বি, লিখিত—

বঙ্গদেশে সাধারণতঃ আমরা দুই প্রকার কৃমি দেখিতে পাই। একপ্রকার কৃমি বড়—ইহাকে আমরা বৃহৎ কৃমি বলিব। অন্যপ্রকার কৃমি অতিশয় ক্ষুদ্র ও সুতার ন্যায় সরু—ইহাকে আমরা ক্ষুদ্র কৃমি বলিব। আরও একপ্রকার কৃমি আছে। তাহা দেখিতে ফিতার মত। এই কৃমি দৈর্ঘে ২০।৩০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। ইহা মাংসভোজী ব্যক্তিদিগের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ও খ্রীষ্টানদিগের ভিতরে ইহার প্রাদুর্ভাব অধিক। এই প্রবন্ধে আমরা কেবলমাত্র বৃহৎ ও ক্ষুদ্র কৃমি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বাল্যকালে প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর কৃমি রোগে কষ্ট পাইয়াছেন। সাধারণতঃ অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদের মধ্যেই কৃমি অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অশীতিপর বৃদ্ধ ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগেরও কখনও কখনও কৃমি হইতে দেখা গিয়াছে।

যদিও পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কৃমি রোগ আছে তথাপি উষ্ণপ্রধান দেশেই ইহার প্রকোপ অধিক। সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামবাসীদিগের মধ্যে কৃমি অধিক দেখা যায়।

ঔষধ দেওয়ার পর প্রভাতে কেষ্টর অয়েল দেওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ 'স্যান্টোনিন্'এর সহিত 'কেলোমেল' ও 'সোডিয়াম বাইকারবনেট' দিতে বলেন; এইরূপে 'স্যান্টোনিন্' দিলে পৃথক করিয়া জোলাপ দিবার আবশ্যক নাই।*

দেশী ঔষধের মধ্যে আনারসের পাতার রস, কমলা, সোমরাজ, বিড়ঙ্গ ও ইন্দ্রযব ইত্যাদি বিশেষ উপকারী। কেহ কেহ চিরেতাও ব্যবহারও করিয়া থাকেন।

ক্ষুদ্র কৃমি ঃ—এই কৃমি সূতার ন্যায় সরু ও অতিশয় ক্ষুদ্র। বৃহৎ কৃমির ন্যায় ইহার ডিম্ব গলাধঃকৃত হইলে পাকস্থলীতে যাইয়া কৃমি উৎপন্ন হয়। অন্ত্রমধ্যস্থ কৃমি যে ডিম্ব প্রসব করে তাহা মলের সহিত নির্গত হয়। বৃহৎ কৃমির ডিম্বের ন্যায় এই ডিম্ব পুনরায় মনুষ্য শরীর মধ্যে প্রবেশ না করিলে কৃমি শাবক উৎপন্ন হয় না।

রাত্রিকালে ক্ষুদ্র কৃমি সকল মলদ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই কারণে মলদ্বার অত্যন্ত চুলকাইয়া থাকে। চুলকাইবার সময় কৃমি ও ডিম্ব নখমধ্যে লাগিয়া যায়। হস্ত প্রক্ষালন না করিয়া আহার করিলে ডিম্ব শরীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং নূতন কৃমি উৎপন্ন হয়। যে সকল বালক বালিকাদের অঙ্গুল চোষা, দাঁতে নখ কাটা কিংবা কাপড় চিবান অভ্যাস আছে তাহাদের কৃমি হইলে আরোগ্য হওয়া দুষ্কর কারণ এই সকল অভ্যাসের ফলে কৃমিডিম্ব প্রায়ই তাহাদের গলাধঃকৃত হইয়া থাকে। অঙ্গুলি হইতে নাসিকার ভিতরেও ডিম্ব প্রবেশ করিতে পারে এবং এই কারণেই কৃমি হইলে অনেক সময় নাক চুলকাইয়া থাকে।

লক্ষণ ঃ—বৃহৎ কৃমিতে যে সকল লক্ষণ দেখা যায় ক্ষুদ্র কৃমিতে তাহার সকল গুলিই প্রকাশ পাইতে পারে। ক্ষুদ্র কৃমিতে নাসিকা ও মলদ্বারের চুলকানি অধিক মাত্রায় লক্ষিত হয়। মলদ্বার হইতে কৃমি বাহির হইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান সমূহে যাইতে পারে এবং এই কারণে বালিকাদিগের যোনি প্রদাহ হইতে দেখা গিয়াছে। অল্প বয়স্ক বালকদিগের মধ্যে হস্তমৈথুন অভ্যাস অনেক সময় ক্ষুদ্র কৃমি আক্রমণের ফল। কৃমির জন্যও নিদ্রিতাবস্থায় প্রস্রাব ত্যাগও লক্ষিত হয়।

---

* স্যান্টোনিন্ খাইলে প্রস্রাব হরিদ্রা বর্ণ হইতে পারে। কখনও কখনও রোগী সকল বস্তুই হরিদ্রাবর্ণের দেখে। ইহাতে বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নাই। অল্পদিনের মধ্যেই এই সকল উপদ্রব চলিয়া যায়। স্যানটোনিনের পরিমাণ অধিক হইলে শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ও স্নায়বিক বিকার হইতে পারে।

চিকিৎসা—এই রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে অন্ততঃ ২ মাস কাল সময় লাগে। রোগীকে মধ্যে মধ্যে জোলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য। এক পাইন্ট জলে এক আউন্স নুন গুলিয়া রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে পিচকারী দিলে কৃমি মরিয়া যায়। ছোট ছেলের ৪ আউন্স পরিমাণ এবং পরিণত বয়স্কদের জন্য ৮ আউন্স পরিমাণে উক্ত নুনের জলই যথেষ্ট। নুনের পরিবর্ত্তে জলে স্বল্পমাত্রায় কুইনাইন গুলিয়া দিলেও চলিতে পারে। কোয়াসিয়ার ইনফিউসনের পিচকারীতেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়। রাত্রে মলদ্বারে 'কোয়াসিন সাপোজিটারী' দিয়া রাখিলে কৃমি বিনষ্ট হয়। মলদ্বার চুলকানির জন্য 'হোয়াইট প্রেসিপিটেট্ অয়েণ্টমেণ্ট' ভেসেলিনের সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিলে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কৃমির আক্রমণ হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে।

(১) বালক বালিকাদিগকে মৃত্তিকা হইতে কোন দ্রব্য তুলিয়া খাইতে দিবে না। ধুলিতে কৃমি ডিম্ব ব্যতীত আরও নানাপ্রকার রোগের জীবাণু থাকিতে পারে।

(২) দাঁত দিয়া নখ কাটা, আঙ্গুল চোষা, কাপড় চিবান ইত্যাদি অভ্যাস বিশেষ অনিষ্ট জনক। বালক বালিকাদিগের যাহাতে এই সকল অভ্যাস না হইতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। নখ কখনও বড় হইতে দিবে না।

(৩) কৃমি হইলে বালক, বালিকারা যাহাতে মলদ্বার চুলকাইতে না পারে সেজন্য মোটা কাপড়ের জাঙ্গিয়া পরাইয়া রাখিবে। রাত্রে শুইবার সময়ই চুলকাইবার সম্ভাবনা অধিক।

(৪) কৃমি রোগীর সহিত সুস্থ ব্যক্তিকে একত্রে শয়ন করিতে দিবে না। কৃমি রাত্রে রোগীর শরীর হইতে নির্গত হইয়া পার্শ্বস্থ ব্যক্তির মলদ্বারে প্রবেশ করিতে পারে।

(৫) কৃমি রোগীর বস্ত্রাদি প্রত্যহ সাবান ও গরম জলে কাচিয়া ফেলিবে।

(৬) কৃমিরোগীর মল যাহাতে পানীয় জল কিংবা খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে না আইসে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

(৭) ফল মূল কখনও উত্তমরূপে না ধুইয়া খাইবে না।

(৮) পানীয় জল ফুটাইয়া লইবে।

বিবিধ সংগ্রহ।

মেডিক্যাল কলেজ—ঢাকায় এক মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইবে, কিন্তু ঐ কলেজ ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হইবে না।

বন্য জন্তু ও সর্পের আক্রমণে মৃত্যু—১৯১১ সমগ্র ভারতবর্ষে ২১৪৭ জন লোক বন্য জন্তু ও বিষধর সর্পের আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পঞ্জাবে ৬, ব্রহ্মদেশে, ৬৩, যুক্তপ্রদেশে ১৪২, মধ্য প্রদেশে ১২৯, মান্দ্রাজে ৩০০, পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে কিঞ্চিদধিক ৩০০ এবং বঙ্গদেশে ৯০৫ জন প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে।

কলিকাতার হোটেল—কলিকাতায় অনেক হোটেল আছে। লোকে সুখাদ্য খাইবার আশায় এই সকল হোটেলে যাইয়া থাকেন। কলিকাতা ৯ নং ওয়ার্ডের কমিশনার ডাক্তার হরিধন দত্ত তাঁহার নিজ ওয়ার্ডের হোটেলগুলি পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে অধিকাংশ হোটেল অতি কদর্য্য। হোটেলে বিশুদ্ধ ঘৃত প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না, মাট কলাইয়ের তৈল দ্বারাই ঘৃতের কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। ইহাতে উদরাময় হইবার খুব সম্ভাবনা। খাদ্য সামগ্রী প্রায়ই অবিশুদ্ধ, রন্ধনপাত্রগুলি অতি অপরিষ্কার, বড় বড় জালায় পানীয় জল রাখা হয়। জালাগুলি কখনও পরিষ্কার করা হয় না। মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য অতি নিকৃষ্ট কখনও কখনও এমন পচা জিনিষ ব্যবহার করা হয় যে তাহা খাওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। পূর্ব্ব-দিনের পক্কদ্রব্য পরদিন ভাজিয়া তাহাই খাইতে দেয়। হোটেল ওয়ালাদের অনেকেই ন্যায় অন্যায় জ্ঞানশূন্য, অর্থোপার্জ্জনই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য।

সৈনিক ও মদ্যপান—ফ্রান্সে উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষেরা সেনাবারিকের গায়ে বিজ্ঞাপনী সংলগ্ন করিয়া মদ্যপানের বিষয়ে সাবধান করিয়া দেন। যে সকল উচ্চপদস্থ ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারী অল্পস্বল্প মদ্য ব্যবহার করিতেন, তাহাদের মধ্যে অনেকে একেবারে মদ্যপান ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য সৈনিকদিগের আদর্শস্বরূপ হইয়াছেন। বৃটীশ সেনাদলে সম্পূর্ণরূপে মদ্যপান ত্যাগের যে চেষ্টা করা হইতেছে, তাহা এমন সর্ব্বলোক প্রিয় হইয়া উঠিতেছে যে, ভারতীয় সেনাদলের শতকরা চল্লিশজন একেবারে মদ খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। জর্ম্মান সম্রাট্ জর্ম্মান স্থলসেনা ও নৌ-সেনাদলের সৈনিকদিগকে মদ্যপান ত্যাগ করিবার নিমিত্ত আগ্রহ সহকারে উপদেশ দিতেছেন।

ইহার কারণ এই যে, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মনী সকল দেশেই সুদক্ষ কষ্ট সহিষ্ণু যোদ্ধা চাহেন। অল্প পরিমাণেও মদ্যপান করিলে সুদক্ষ কষ্ট সহিষ্ণু সৈনিক তৈয়ারী করা যায় না।

কুইন মেরি মেডিক্যাল কলেজ—লেডি হার্ডিং দিল্লীতে এক মেডিক্যাল কলেজ ও হাঁসপাতাল স্থাপনা করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এইখানে কেবল ভারতীয় মহিলারাই শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন এবং একমাত্র স্ত্রীলোকেরাই ইহার সংশ্লিষ্ট হাঁসপাতালে চিকিৎসিত হইতে পারিবেন। ইহার নাম রাখা হইবে "কুইন মেরি মেডিক্যাল কলেজ এবং হাঁসপাতাল।" সম্প্রতি এই কলেজ স্থাপনের অর্থ ভাণ্ডারে অনেক স্থান হইতে সাহায্য আসিয়াছে। প্রয়োজনীয় প’নের লক্ষ টাকার অর্দ্ধেক পরিমাণ উঠিয়া গিয়াছে। এই টাকায় গৃহাদি নির্ম্মিত হইবে। ইহার উপর গভর্ণমেণ্ট ও আশানুরূপ সাহায্যপ্রদান করিবেন। এদেশে স্ত্রীলোকের ও পুরুষের একসঙ্গে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। এই জন্য অনেক স্ত্রীলোক চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিতে পারেন না। নারীদের জন্য পৃথক মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইলে, দেশের একটী বিশেষ অভাব দূর হইবে। লেডি হার্ডিং আরও বলিয়াছেন যে সম্ভব হইলে ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইবে।

ম্যালেরিয়া দমনে যশোহরের কার্য্য—ম্যালেরিয়ার প্রকোপে যশোহরের বহুপল্লী জনহীন হইয়া যাইতেছে। কি উপায়ে ম্যালেরিয়াবিধ্বস্ত যশোহরের পল্লীভূমিকে রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই নদী সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এদিকে যশোহরের প্রখ্যাতনামা উকীল রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর "করোনেসনে য়্যাণ্টি ম্যালেরিয়াল সোসাইটী" নামে একটী সভা সংগঠন করিয়া ম্যালেরিয়া দমনে অগ্রসর হইয়াছেন। সম্প্রতি সভার পক্ষ হ'তে দুইখানি গ্রামের সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। যশোহরের অদূরবর্ত্তী ভেট্‌কি ও দৌলতপুর দুইখানি গ্রামে অন্যূন এক সহস্র অধিবাসী বাস করে। সভা এই দুইখানি গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার, পানীয় জলের বিধান, পয়ঃপ্রবাহের সংস্কার এবং পুরাতন ডোবাদি মৃত্তিকার দ্বারা পরিপূর্ণ প্রভৃতি কার্য্যে মনোযোগী হইয়াছেন। অত্যধিক বৃষ্টিবশতঃ এই সকল বিভিন্ন কার্য্যে ততদূর অগ্রসর হওয়া যায় নাই। তবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সভা গ্রামবাসীর মধ্যে কুইনাইন বিতরণ আরম্ভ করেন। প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ অথবা স্ত্রীলোককে দুই বটিকা এবং প্রত্যেক শিশুকে এক অথবা অর্দ্ধ বটিকা কুইনাইন খাইতে দেওয়া হয়। ইহার ফলে যখন চতুর্দ্দিকের গ্রাম সমূহ ম্যালেরিয়ায় বিধ্বস্ত হইতেছিল, তখন এই দুইখানি গ্রামের স্বাস্থ্য অনেক ভাল থাকে। কেবল ২৪ জন লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়. ইহাদিগের মধ্যে কেহই কুইনাইন ভক্ষণ করে নাই। সভার পক্ষ হইতে "পল্লী স্বাস্থ্য" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা জেলার সর্ব্বত্র বিতরণ করা হইতেছে। ইহাতে ম্যালেরিয়ার কারণ ও প্রতিকার এবং সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

খাদ্য দ্রব্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ—আমেরিকার ডাক্তার এলেন বলেন মাংসের খাদ্যে এক পাউণ্ডে (প্রায় অর্দ্ধ সের) তিন হইতে সাত গ্রেণ মূত্রোৎপন্ন অম্ল (ইউরিক এসিড) আছে, কিন্তু কাফিতে প্রতি পাউণ্ডে সত্তর গ্রেণ এবং চা'তে একশত সত্তর গ্রেণ আছে। এই মূত্রোৎপন্ন অম্লেই বাতরোগ জন্মে।

স্বাস্থ্যসমাচার

“শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্”।

প্রথম বর্ষ। } কার্ত্তিক ১৩১৯ সাল { সপ্তম সংখ্যা।

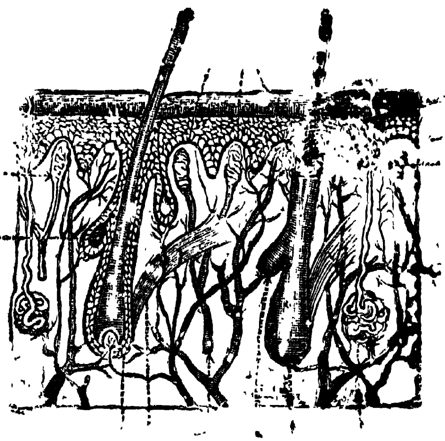
ত্বক্—স্নান।

ত্বক্।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিত—

ত্বক্ আমাদের শরীরের বাহ্য আবরণ। বিভিন্ন তিনটী স্তরে ইহা আমাদের শরীরকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সর্ব্বনিম্নস্তরে অসংখ্য কৈশিকনাড়ী এবং স্নায়ু-সূত্র অবস্থিত। সুতরাং ইহা কর্ত্তিত হইলে রক্ত নির্গত হইয়া থাকে এবং বেদনা অনুভূত হয়। ইহার মধ্যে ঘর্ম্মনালী নামক অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক প্রকার নালী আছে। এই সমস্ত ঘর্ম্মনালী প্রতিনিয়ত কৈশিকনাড়ীমধ্যস্থ রক্ত হইতে উহার দূষিত পদার্থ (মৃত শরীরতন্তু ইত্যাদি—Organic waste matter etc). এবং কিয়ৎ পরিমাণে রক্তের জলীয়াংশ বহন করিয়া শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। শরীরের এই দূষিত পদার্থ ও জলীয়াংশের নামই ঘর্ম্ম। সর্ব্বদাই ইহা আমাদের শরীর

হইতে বাষ্পাকারে অদৃশ্য ভাবে বহির্গত হইতেছে। পরিশ্রমকালে অথবা গ্রীষ্মাতিশয্যপ্রযুক্ত অধিক পরিমাণে ব'হর্গত হইয়া যখন বাহিরের বায়ুর সংস্পর্শে গাত্রোপরি বিন্দু বিন্দু জলাকারে সঞ্চিত হয় তখন উহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহাকেই ঘর্ম্ম বলা হয়। বস্তুতঃ ইহাকে দৃশ্য ঘর্ম্ম এবং পূর্ব্বোক্ত ঘর্ম্মকে অদৃশ্য ঘর্ম্ম বলা যাইতে পারে।



ত্বক্‌—বর্দ্ধিত আকৃতি।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা গোচরীভূত।

আমাদের শরীর নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টিমাত্র। গত কল্যকার শরীর যথাযথরূপে আজ নাই। আগামী কল্য আবার ইহারও পরিবর্ত্তন ঘটিবে। এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া শরীর কতিপয় মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ নূতন হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতিদিনই প্রভূত পরিমাণ শরীর তন্তু ইত্যাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। এই সমস্ত মৃত শরীরতন্তু ইত্যাদি রক্তে সংগৃহীত এবং তথা হইতে শোণিতস্রোতে ফুসফুস, মূত্রাশয়, ঘর্ম্মনালী ইত্যাদিতে নীত হইয়া তৎপথে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া

যায়। প্রশ্বসিত বায়ু এবং ঘর্ম্মের সহিত ঐ সকল পদার্থ সর্ব্বদাই আমাদের শরীর হইতে বহির্গত হইতেছে। রাসায়নিকবিশ্লেষণে ইহাদের মধ্যে মৃত শরীরতন্তু শরীরের পক্ষে মহানিষ্টকর ও জীবন্ত তন্তুসমূহের ধ্বংসকারক। সুতরাং ঐ সকল দূষিত পদার্থ শরীর হইতে যত সত্বর বহির্গত হইয়া যায় ততই শরীরের মঙ্গল। ঘর্ম্মনালীর প্রত্যেকটী দৈর্ঘ্যে প্রায় সিকি ইঞ্চি, কিন্তু কর্কস্কুর (Cork-screw) ন্যায় অবস্থিত। এক ব্যক্তির ঘর্ম্মনালী গুলি পরস্পর একত্রিত করিলে দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০ মাইল হয়।

ত্বকের দ্বিতীয় স্তরে অতি কোমল এক প্রকার পদার্থ আছে, যাহার বর্ণানুসারে চর্ম্মের রং হইয়া থাকে। নিগ্রোদের শরীরের এই পদার্থ কাল, ইণ্ডিয়ানদিগের তাম্রবর্ণ, চীনদিগের পীতবর্ণ ইত্যাদি।

ত্বকের সর্ব্বোপরিস্তর, এপিথিলিয়েল সেলস্ (Epithelial cells) নামক অতি সূক্ষ্ম এবং অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক প্রকার চর্ম্ম দ্বারা গঠিত। উহারা কিয়ৎপরিমাণে একটীর উপর আর একটী এরূপভাবে স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকিয়া শরীরকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে যে অণুবীক্ষণযোগে দর্শন করিলে উহাদিগকে কতকটা মৎস্যের আঁইশের ন্যায় দেখা গিয়া থাকে। উহাদেরও সর্ব্বোপরিস্তর অনবরত ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, তন্নিম্নবর্ত্তী স্তর তৎস্থান অধিকার করিতেছে এবং সর্ব্বনিম্নে নূতন স্তর নির্ম্মিত হইতেছে। এইরূপে উহাদের মধ্যেও প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

ত্বকের সর্ব্বোপরি স্নায়ু-সূত্র কি কোন প্রকার রক্তবহা নাড়ী নাই। সুতরাং ইহা কর্ত্তিত হইলে অথবা কোন দাহ্য পদার্থ সংস্পর্শে উঠিয়া গেলে কোন বেদনা অনুভূত কি রক্ত বহির্গত হয় না। সর্ব্বনিম্নস্তরদ্বয়কে বাহিরের আঘাত ইত্যাদি হইতে রক্ষা করিতেছে। ইহার কাঠিন্য, নমনীয়তা ও স্থিতিস্থাপকতা গুণপ্রযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নানা সময়ে নানাভাবে সঞ্চালিত হইলেও ইহা ফাটিয়া যায় না। এবং ঐ সমস্ত কারণে বায়ুস্থ কীটাণু প্রভৃতিও সহজে শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। ত্বকের পূর্ব্বোক্ত গুণবশতঃ দৈহিক উত্তাপেরও অনেকটা সমতা রক্ষিত হইয়া থাকে।

অণুবীক্ষণযোগে গাত্রোপরি দৃষ্টিপাত করিলে চর্ম্মমধ্যে অসংখ্য ছিদ্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ লোমকূপ বলে। এইগুলি পূর্ব্বোক্ত ঘর্ম্মনালীর মুখ।

চর্ম্ম মধ্যে ঘর্ম্মনালীর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য আর এক প্রকার নালী আছে। ইহাদিগকে তৈলনালী (Oil Glands) বলে। সর্ব্বোপরিস্থ চর্ম্ম এবং রোম-সমূহকে তৈলাক্ত বা মসৃণ ও পরিপোষণ করা ইহাদের কার্য্য। রোম বহুল স্থানে এই সকল তৈলনালী অধিক। রোমশূন্য পাণিপাদতলে ইহার অস্তিত্ব নাই।

লোমকূপ অর্থাৎ ঘর্ম্মনালীর মুখ কতকটা বন্ধ হইলে, ঘর্ম্ম ফুস্‌ফুস্‌ ও মূত্রাশয় দিয়া কিঞ্চিদধিক পরিমাণে বহির্গত হয় বটে ; কিন্তু ইহাতে ঐ দুই যন্ত্রের কাজ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় উহারা অতি সত্বর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সমস্ত লোপকূপ বন্ধ হইলে ফুস্‌ফুস্‌ ও মূত্রাশয় কিছুতেই শরীরকে মলমুক্ত রাখিতে সক্ষম হয় না এবং তদবস্থায় কোন জীবই অধিকক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কুকুরকে নির্লোম করিয়া উহার সমস্ত শরীর বার্ণিশ (Varnish) দ্বারা আবৃত করায় অত্যল্পকাল মধ্যে উহার প্রাণবিয়োগ হইতে দেখা গিয়াছে। কতিপয় বৎসর হয় আমাদের দেশে বহুরূপী সাজসজ্জিত একটী বালক শরীরস্থ রং বিধৌত না করিয়া রাত্রিকালে নিদ্রা যাওয়ায় কালনিদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই রং লেপনে সর্ব্বাঙ্গের লোমকূপই যে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়াছিল, তাহাও নিশ্চয় নহে। লোমকূপ সামান্যতঃ বন্ধ হইলেও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া থাকে।

ঘর্ম্মনালীনিঃসৃত মলাদি, তৈলনালীক্ষরিত তৈল, দেহোপরিস্থ মৃত চর্ম্ম, বায়ু এবং শয্যা ইত্যাদির ধুলিকণাদি দ্বারা অনেক সময় আমাদের লোমকূপগুলি বন্ধ হইয়া যায় ; সুতরাং শরীরস্থ মলাদি বহির্গত হইতে পারে না। এ কারণে প্রতিদিন উত্তমরূপে গাত্রমার্জ্জনপূর্ব্বক স্নান করা আবশ্যক। যেহেতু ইহাতে গাত্র এবং লোমকূপগুলি পরিষ্কার থাকে। শারীরিক পরিশ্রমেও একালে অধিক ঘর্ম্ম বাহির হয় বলিয়া লোমকূপগুলি বিধৌত হওয়ায় ঐ গুলি বেশ পরিষ্কার হয়। এতদ্দ্বারা ঘর্ম্ম (শরীরস্থ মলাদি) শরীর হইতে শীঘ্র বহির্গত হওয়ায় শরীরের মহোপকার সাধিত হয়। শারীরিক পরিশ্রমে ঘর্ম্মনালীগুলি পুষ্ট ও সবল হওয়ায় ঘর্ম্মাদি শরীর হইতে অতি সহজে বহির্গত হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণেই শারীরিক স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে। পরিশ্রম বিমুখ অলস ব্যক্তির শরীরে ঘর্ম্মাদি দীর্ঘকাল সঞ্চিত থাকে বলিয়া স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে।

চর্ম্মের সহিত মূত্রাশয়ের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। গ্রীষ্মের দিনে যখন চর্ম্মদ্বারা প্রচুর পরিমাণ ঘর্ম্মবাহির হয় তখন মূত্রের পরিমাণ অনেক কমিয়া যায় এবং শীতের দিনে যখন চর্ম্ম অনেকটা নিষ্ক্রিয়াবস্থায় থাকে। তখন মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আমাদের শরীর হইতে প্রতিনিয়ত যে দৃশ্যাদৃশ্য ঘর্ম্ম বাহির হয়, তাহা পরিধেয় বস্ত্রাদিতে সংলগ্ন হইয়া উহাদিগকে সত্বর সত্বর অপরিস্কৃত করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। শুচি ভাবাপন্ন হিন্দুগণ আজও রাত্রিবাস কাপড়ে সন্ধ্যা-বন্দনা, আহারাদি করেন না। এইরূপ আচারনিষ্ঠা, শরীর ও পরিধেয়বস্ত্রাদি পরিষ্কার রাখিতে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শরীর হইতে প্রচুর ঘর্ম্ম বাহির হয় বলিয়া ব্যবহৃত বস্ত্রাদি অতি সত্বর অপরিস্কৃত হইয়া থাকে।

ইদানীং আমরা অনেক শীতপ্রধান দেশবাসী ইংরেজের অনুকরণে গেঞ্জি, সার্ট, কোর্ট, বুট ইত্যাদি কতকগুলি অনাবশ্যক পোষাক পরিচ্ছদাদিদ্বারা অনেক সময় শরীর আবৃত করিয়া রাখি বলিয়া শরীর হইতে যথোপযুক্ত ঘর্ম্মাদি বহির্গত হইতে পারে না, অপিচ ঘর্ম্মসিক্ত পোষাকাদি হইতেও ঘর্ম্মাদি পুনর্ব্বার শরীরে প্রবৃষ্ট হয়। ইহা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে কিরূপ অনিষ্টকর তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। এতদ্দ্বারা শরীরের সহিত বাহিরের বিশুদ্ধ, সুশীতল সমীরণ সংস্পর্শ ঘটে না বলিয়াও স্বাস্থ্য বিশেষরূপেই ক্ষুন্ন হইয়া থাকে।

ঘর্ম্ম পুঁছিয়া শরীর সর্ব্বদা স্নিগ্ধ, শীতল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য যে দেশে পূর্ব্বে সকলে নিয়ত স্কন্ধোপরি আর্দ্র গাত্র মার্জ্জনী রক্ষা করিত, সে দেশে এখন সকলে নিরন্তর গেঞ্জি, সার্ট, কোট ইত্যাদি পরিধান করিতেছে; ইহাতে যে লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

সরকারী কার্য্যানুরোধেও অনেক সময় আমাদিগকে বিভিন্ন পোষাকাদিদ্বারা শরীর আবৃত করিয়া রাখিতে হয়; কিন্তু, ইহা যে আমাদের স্বাস্থ্যের বিষম পরিপন্থী তাহা বলাই বাহুল্য। ভারত প্রবাসী ইউরোপীয়গণেরও যে ইহাতে স্বাস্থ্য কতকটা

নষ্ট না হয় তাহা নহে; তবে তাঁহারা চিরাভ্যস্ত জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক নহেন এবং অনেকেই এদেশে অধিক দিন থাকেন না। কিন্তু আমরা যে সব স্থলে স্বাধীনভাবে চলিবার অধিকারী, সে সব স্থলেও জাতীয়ভাব বিসর্জ্জন দিয়া এবং স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ও বিবিধ পোষাক পরিচ্ছদে পরিবৃত হইয়া সাহেব সাজিয়া থাকি। নিদাঘকালে, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে যখন অনেক সময় নগ্নদেহে থাকিলেও অসহ্য গরম বোধ হয়, তখনও অনেককেই "লম্বা সার্ট পটাবৃত" অবস্থায় বিরাজ করিতে দেখা গিয়া থাকে। ধন্য আমাদের অনুকরণ প্রিয়তা !!!

অনেকে আবার কেবল আপনাদিগকে সাহেব সাজাইয়াই সন্তুষ্ট হন নাই কুললনাদিগকেও তাঁহাদের অনুপযোগী স্বাস্থ্যহানিকর পাশ্চাত্য দেশোচিত পরিচ্ছদ ও বিলাসোপকরণাদিতে সজ্জিত করিয়া মেম্ সাজাইয়া তুলিয়াছেন। ধন্য আমাদের রুচি !!!

যে দারিদ্র্যবহ্নিতে ভারতবাসী নিয়ত সন্তাপিত এতদ্দ্বারা স্বাস্থ্যনাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই দারিদ্র্যবহ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইতেছে। তবে পেটে না খেয়েও সুরভিস্নাত অনেক সৌখীন "বাবুর ট্যাকেতে ঘড়ি ইষ্টকীন্ পায়। ফুর্ত্তিখানি ষোল আনা কুর্ত্তি কোট গায়।"

"Simplicity, cleanliness, neatness, these are our canons of dress, and adhere we to them ever so closely, they will not run us into debt"—Adams.

প্রকৃতির সমুদয়ই নগ্ন। নগ্নতাই প্রকৃতির সর্ব্বপ্রধান সৌন্দর্য্য। নারীতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের চরম বিকাশ। লজ্জাই নারীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট আবরণ।

এতদ্দেশে পুরুষ অনেক সময় দশ হস্ত দীর্ঘ কাপড় নাও পড়িতে পারে; ইহাতে আর্থিকও কিঞ্চিৎ লাভ আছে। এইরূপ নানা বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারিলে আর্থিক অনাটনও কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে।

প্রবল শীতের দরুণ নিজ দেশে সাহেবদিগের নগ্নদেহে থাকা অনেক সময়ই কষ্টকর। ইহা হইতেই নগ্নদেহে থাকা তাঁহাদের অনেকের দৃষ্টিতে অসভ্যতার নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইদানীং আমাদের দেশের অনেক রুচিবাগীশেরও

এই ব্যাধি জন্মিয়াছে; কিন্তু আমাদের দেশে অনাবশ্যক পোষাক পরিচ্ছদাদিদ্বারা শরীর ব্যাপৃত রাখা মূর্খতারই নিদর্শন।

বলা বাহুল্য যে সময়োচিত নগ্নদেহ থাকা শীতপ্রধান দেশবাসীগণের পক্ষেও উপকারক।

শীতপ্রধান দেশবাসী বহু জ্ঞানী ব্যক্তি ও কবি প্রাকৃতিক নগ্নতা সৌন্দর্য্যবিমূঢ়। তদ্দেশে রমণীগণের বক্ষ অনাবৃত রাখা সকলের নিকটই পরম সৌন্দর্য্যের বিষয়। আর এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পুরুষের দেহও নগ্ন রাখা আমাদের অনেকের দৃষ্টিতে অসভ্যতা !!!

একাধিকক্রমে বহুদিন ব্যবহারেও দৃষ্টতঃ ময়লা ধরা পড়ে না বলিয়া অনেকে কাল রংয়ের জামাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাদের অজ্ঞতার পরিণাম কতদূর তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। কাল রং তাপ শোষক বলিয়া গ্রীষ্মকালে এতদ্দেশে কাল পোষাক ব্যবহার করা অনুচিত। এতদ্দেশে কাল কাপড়ের ছাতা ব্যবহারও অবিজ্ঞতা। এদেশে অন্ততঃ গ্রীষ্মকালে সাদা পোষাকাদি ব্যবহার করাই উচিত।

ঘর্ম্মদ্বারা গৃহের বায়ু দূষিত হইয়া থাকে। সুতরাং বাসগৃহ বেশ খোলামেলা (Ventilated) রাখা আবশ্যক। অদৃশ্য ঘর্ম্ম (এবং সমীরণ পরিচালিত ধূলিকণা বায়ুস্থ কীটাণু ইত্যাদি) গৃহপ্রাচীর ইত্যাদিতে সংলগ্ন হইয়া গৃহমধ্যস্থ বায়ুকে দূষিত করিয়া থাকে। সুতরাং এই সকল মাঝে মাঝে বেশ পরিষ্কার করা দরকার। এজন্যই সাহেবদিগের ঘর বৎসরে দু একবার সুধা ধবলিত (White wash, চূণকাম) করা হয়।

বিছানাপত্রাদি এমন কি বসিবার চেয়ার (Chair) ইত্যাদি পর্য্যন্ত ঘর্ম্মসিক্ত হওয়ায় অপরিষ্কৃত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সমস্তও সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

গৃহমধ্যে কদাপি নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা উচিত নহে। গৃহমেজ মাঝে মাঝে গোময় দ্বারা লেপন করা উত্তম ব্যবস্থা। সদ্য গোময় অতি উৎকৃষ্ট দুর্গন্ধ নাশক।

ফুসফুসের ন্যায় ত্বকের দ্বারাও সামান্যতঃ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। ত্বকের মধ্যে যে কৈশিকীনাড়ী আছে তন্মধ্যস্থ রক্ত সর্ব্বোপরিস্থ ত্বক্ (Epethelium)

ভেদ করিয়া বাহিরের বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ এবং রক্তস্থ কার্ব্বণিক এসিড ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া থাকে। তবে ফুস্‌ফুস্ মধ্যে মাত্র দুইটী সূক্ষ্ম চর্ম্ম ভেদ করিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য চলিয়া থাকে, কিন্তু এখানে কতিপয় অধিক সংখ্যক সূক্ষ্ম চর্ম্ম ভেদ করিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। সুতরাং ত্বক্‌দ্বারা রক্তে অক্সিজেনও যেমন কম গৃহীত হয়, কার্ব্বণিক্ এসিড ইত্যাদিও তদ্রূপ অনেক কম বহির্গত হয়। যাহা হউক, ত্বকের ঈদৃশ কার্য্য সুসম্পাদনার্থ উহাকে অনাবশ্যক বস্ত্রাদিদ্বারা আবৃত না রাখিয়া সর্ব্বদা সুশীতল, সুনির্ম্মল সমীরণ সংস্পর্শে রাখাই ভাল। শক্তিপ্রদ শীতল বায়ু শীতপ্রধান দেশবাসিগণের বলাধিক্য বিধান করে, সর্ব্বদা নগ্নদেহে থাকিলে আমরা তাহার কথঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইতে পারি।

স্নান।

প্রতিদিন উত্তমরূপে গাত্রমর্দ্দনপূর্ব্বক স্নানে দেহোপরিস্থ মলাদি বিদূরিত হয় এবং লোমকূপগুলি বেশ পরিষ্কার থাকে। সুশীতল জলে অবগাহন করিলে কেবল যে শরীরের মলাদি বিদূরিত হয় তাহা নহে, পরন্তু তদ্দ্বারা শারীরিক বলবৃদ্ধি (১) হয় এবং শরীর স্নিগ্ধ মস্তিষ্ক শীতল ও বহিঃস্থ শীতলতায় চর্ম্ম বেশ সতেজ হয় এবং সহজে সর্দ্দি লাগিতে পারে না।

(১) বহিঃস্থ শীতলতায় নিশ্বাসে অধিক পরিমাণ বায়ু গ্রহণ, রক্তে অধিক অক্সিজেন শোষণ এবং অধিক পরিমাণ কার্ব্বণিক এসিড ইত্যাদির বহির্গমন ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এতদ্দ্বারা শরীরের বল বৃদ্ধি হয় শীতল বায়ু এই নিমিত্তই বলকারক। শীতকালেও শীতল জলে স্নানের অব্যবহিত পরেই যে তেমন শীত থাকে না, অভ্যন্তরীণ উত্তাপবৃদ্ধিই তাহার কারণ। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে শীতকালে শীতল জলে স্নান সময়ে গ্রীষ্মপ্রধান স্থান হইতে শীতপ্রধান স্থানে গেলে প্রশ্বসিত বায়ুতে অধিক পরিমাণ কার্ব্বণিক এসিড ইত্যাদি বহির্গত হয় এবং অধিক পরিমাণ অক্সিজেন দেহে প্রবিষ্ট হয় বলিয়াই দাহক্রিয়ার প্রাবল্য ঘটিয়া থাকে। শীতল জলে স্নানের অব্যবহিত পরেই যে বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হয়, এই দাহক্রিয়ার বৃদ্ধিই তাহার কারণ। ক্ষুধাবৃদ্ধিই শরীর পরিপোষণের একটী প্রধান সহায়।

উষ্ণ জলে স্নান করিলে গাত্রমল বিদূরিত হয় বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত উপকার লাভ করা যায় না। অধিকন্তু ইহাতে শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ত্বক্ রুক্ষ হয় এবং শরীরে সামান্য শৈত্য লাগিলেই অনেক সময় সর্দ্দি হইয়া থাকে।

শরীর হইতে প্রচুর ঘর্ম্ম বহিষ্করণার্থ সময়বিশেষে উষ্ণজলে স্নান কি বাষ্প-স্নান (Vapour bath, ভাপ্‌রা লওয়া) শরীরের পক্ষে উপকারক হইলেও ঐরূপ নিত্য-স্নানে উত্তরোত্তর হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীর একেকালে নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, নাড়ী অতিশয় দুর্ব্বল ও দ্রুতগামিনী হয় এবং দৈহিক উত্তাপ যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

যাহাদের গরম জলে স্নান করা অভ্যাস, তাঁহাদের গরম জল ক্রমশঃ শীতল করিয়া স্নান করা উচিত। ইহাতে পরিশেষে শীতল জল শরীরে বেশ সহ্য হইবে।

এতদ্দেশে গ্রীষ্মকালে শীতলপাটীতে শয়ন যেমন আরামদায়ক তদ্রূপ উপকারক। দৃঢ় শয্যায় শয়নে শরীরও বেশ দৃঢ় হইয়া থাকে। পশম, তুলা, পাখীর পালক ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত বিছানা শরীরকে অযথা উত্তপ্ত করিয়া থাকে। পোষাক পরিচ্ছদাদির ন্যায় বিছানাপত্রাদিও বেশ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

স্নানকালীন সর্ব্বাগ্রে মস্তকে জল দিবে। নচেৎ মস্তকে হঠাৎ রক্ত উঠিয়া শিরঃপীড়াদি হইতে পারে।

দিবসের মধ্যে দুই তিনবার স্নান করায় অনেকের বেশ স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিতে দেখা যায়। তবে ইহা অনেকের পক্ষে সহ্য না ও হইতে পারে। তাহাদের পক্ষে আর্দ্র গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা দিবসের মধ্যে দুই তিনবার বিশেষতঃ প্রাতে সায়াহ্নে উত্তমরূপে শরীর মার্জ্জন করা ভাল।

(১) এতদ্দ্বারা চর্ম্মস্থ কৈশিকনাড়ীসমূহ স্ফীত হওয়ায় হৃৎপিণ্ড হইতে সবেগে রক্ত আসিয়া তন্মধ্যে উপস্থিত হয়। ইহাতে অভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদিগত রক্তের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস পাইয়া থাকে এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় উহা ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

বাহ্য উত্তাপে স্নায়ু-সূত্রের বৈদ্যুতিকপ্রবাহবহন শক্তির হ্রাস ঘটে সুতরাং দৈহিক তেজ ও বল কমিয়া যায়।

দিবসের মধ্যে যতবার মুখ ধুইবে ততবার চক্ষু কপাল ও কর্ণপ্রদেশে জল দিবে। স্নানান্তে ক্ষুধার উদ্রেক হয় বলিয়া আহারের পূর্ব্বে স্নান করার প্রচলিত প্রথাই বিশেষ ভাল। এতদ্দ্বারা স্নানের সম্পূর্ণ উপকারিতাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্নানান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম না করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইবে না। যেহেতু যখন শরীরস্থ রক্ত দৈহিক শীতলতা নষ্ট করিতে নিযুক্ত থাকে, তখন আহার করিলে উহা ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে না পারায় পরিপাকের বিঘ্ন ঘটে।

আহারান্তে স্নান করা অতীব দূষণীয়। কারণ তখন রক্ত, ভুক্ত জিনিষ পরিপাকে বিশেষরূপে নিযুক্ত থাকে। সুতরাং তখন উহাকে অন্য কার্য্যে নিয়োজিত করিলে ভুক্ত জিনিষ উত্তমরূপ পরিপাক হয় না।

এতদ্দেশীয় বহু স্ত্রীলোক এঁটোর আশঙ্কায় আহারান্তে বালকবালিকাদিগকে প্রায় আপাদমস্তক ধৌত করিয়া থাকেন। পরিণামে ঐ বালকবালিকাগণ ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও রোগশয্যায় শায়িত হইয়া থাকে কিম্বা ব্যাধি কখনও কখনও ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করায় অনেকের প্রাণান্তও ঘটিয়া থাকে। সরলা অবলা হইলে কি হইবে, প্রকৃতি অতি কোমল হৃদয়, অতি দয়ালু কোন মানবের ন্যায় নহেন যে কোন প্রকার অপরাধ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা পাইবে অথবা কোন প্রকারে প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গের শাস্তি ভোগ না করিয়া পরিত্রাণ পাইবে (We. cannot cheet natur)। শত কলসী অশ্রুজল বিসর্জ্জনেও তাঁহার মন কদাপি বিগলিত হইবে না। রমণীগণ! সব জান, শিখ এবং সকলকে শিক্ষা দেও। শিশু ও বালকবালিকাগণের জীবন, স্বাস্থ্য, শিক্ষাদীক্ষা, স্বভাবচরিত্র সমস্ত তোমাদের হস্তে সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত। ভাবী মনুষ্যজীবন সম্পূর্ণভাবে শৈশব জীবনের উপর নির্ভর করে। "A child is the father of the man." সুতরাং তোমরাই সমাজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির ও অবনতির বিধানকর্ত্রী।

জগৎপ্রসূতি আদ্যা, প্রকৃতি স্বরূপা, জাগতিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও অবনতির কারণ স্বরূপ, রমণীগণ! তোমরা একবার নিজকে নিজে ভালরূপ চিনিয়া লও। আপন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে শিখ। সাংসারিক ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কথিত আছে। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসমূহ সাংসারিক ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে।

"Men will always be what women make them; if, therefore, you would have men great and virtuous, impress upon the minds of women what greatness and virtue are."—Roussau.

যে গৃহে অথবা যে সমাজে স্ত্রীলোক অশিক্ষিতা বা কুশিক্ষাপ্রাপ্ত সে গৃহ বা সে সমাজের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির দ্বার রুদ্ধ। পূর্ণজ্যোতি রমণীহৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকা হেতু বিমল কিরণ প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় আমাদের সমাজ ক্রমেই এখন ধ্বংস-পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহার প্রতিকার কল্পে স্ত্রীলোকদিগকে দেশের উপযোগী সুশিক্ষা দানে যত্নশীল হওয়া সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

পরিশ্রমান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম না করিয়া কদাপি স্নান এবং আহার করিবে না।

সন্তরণ একটী উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। ইহাতে প্রায় সর্ব্বশরীরই অতি উত্তমরূপে সঞ্চালিত হইয়া থাকে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে অধিক পরিমাণ বায়ু ফুসফুসে যাতায়াত করে তবে অধিককাল জলে নিমগ্ন থাকা অনেকের পক্ষেই ভাল নহে। অধিককাল জলে থাকিলে অথবা নগ্নদেহে দীর্ঘকাল প্রবল শীতল বায়ু লাগিলে কি কোন প্রকার দীর্ঘকালস্থায়ী দারুণ শীতভোগে ত্বকের কৈশিকনাড়ীসমূহের সঙ্কোচনহেতু আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্তাবরোধ (Congestion) হইতে পারে।

মনের পবিত্রতা এবং দেহের নির্ম্মলতা সাধনে অবগাহন স্নানই সর্ব্বোত্তম।

স্নান করিবার অনতিপূর্ব্বে শরীরে উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দন করিবে। তৈলমর্দ্দন এবং তৈল ও তৈলাক্ত পদার্থ আহার শরীরস্থ তৈলনালীগুলির কার্য্যের বিশেষ সহায় হয়। এতদ্দ্বারা ঘর্ম্ম অধিকতর মসৃণ হয় এবং উহার স্থিতিস্থাপকতা শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। গাত্রোপরি তৈলদানে বহিস্থ কীটাণু প্রভৃতি চর্ম্মপথে শরীরস্থ হইতে পারে না। এমন কি, এতদ্দ্বারা দুর্নিবার ভীষণ সংক্রামক এক প্রকার কীটাণু হইতে উৎপন্ন প্লেগ-রোগ পর্য্যন্তও নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা সুবিদিত যে, কলুর ঘানিতে বা তৈলের কারখানায় (Oil mill) নিযুক্ত লোকগণ প্লেগাক্রান্ত হয় না।

মর্দ্দন (Massage.) এক প্রকার ব্যায়াম। এতদ্দ্বারা চর্ম্মের কৈশিকনাড়ীমধ্যস্থ শোণিতপ্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় চর্ম্ম সতেজ, পুষ্ট ও দৃঢ় হয় এবং কোন প্রকার চর্ম্মরোগ জন্মিতে পারে না। সুতরাং তৈল দেওয়ার সময় সর্ব্বাঙ্গ অতি উত্তমরূপে মর্দ্দন

করিবে। ঘাড় ইত্যাদি উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে সহজে মচ্‌কে যাইতে পারে না। অনেক ধনী ব্যক্তি সুনিপুণ তৈলমর্দ্দনকারী এই কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া থাকেন। তৈল মর্দ্দনে লোমকূপ বন্ধ হইয়া যায়; সুতরাং তৈলমর্দ্দনান্তে অস্নাত অবস্থায় অধিককাল থাকা অনুচিত। স্নানকালে খুব খস্‌খসে গামছা দ্বারা সজোরে ঘসিয়া তৈল তুলিয়া ফেলিলে লোমকূপগুলি বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে; মর্দ্দনে পূর্ব্বোক্ত উপকারও সংসাধিত হইবে। অবশ্য এত জোরে মর্দ্দন করা উচিত নয় যে চর্ম্ম খেৎলাইয়া যায়, কি এপিথিলিয়ান উঠিয়া যায়।

পুরুষের পক্ষে মস্তকে তিল তৈল ও অবশিষ্টাঙ্গে সর্ষপ তৈল ব্যবহার বিধেয়। কুন্তলরাজি পরিশোভিতা স্ত্রীলোকদের মস্তকে নারিকেল তৈলদান সঙ্গত। কারণ, সুদীর্ঘ কেশরাজি জনিত মস্তিষ্কের উষ্ণতা প্রশমনে নারিকেল তৈলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্ত্রীলোকেরাও অবশিষ্টাঙ্গে সর্ষপ তৈল ব্যবহার করিবেন।

পাশ্চাত্য প্রথানুকরণে আজকাল অনেকে তৈলের পরিবর্ত্তনে সাবান ব্যবহার করেন, এমন কি, কেহ কেহ এরূপ পাশ্চাত্যভাবানুপ্রাণিত যে, তৈল ব্যবহারকে গুক্কার জনক ব্যাপার মনে করেন। সাবান অপেক্ষা তৈল যে শরীরের পক্ষে অধিক উপকারী (বিশেষতঃ এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে) তাহা ইহারা কদাপি ভাবিয়া দেখে না। ("Men do not think. but follow the fashion" :—Manageten). সাবান কদাপি তৈলের ন্যায় চর্ম্মকে সরস সতেজ ও মসৃণ রাখিতে সক্ষম নহে। সাবান অপেক্ষা শরীরে তৈল মর্দ্দনের শ্রেষ্ঠতা ইদানীং কোন কোন সুবিজ্ঞ পাশ্চাত্য চিকিৎসকও স্বীকার করিয়া থাকেন।

তৈল ভাল সাবানের একটী প্রধান উপাদান। মাংসের মধ্যে যথেষ্ট তৈল আছে। মাংস সাহেবদিগের একটী প্রধান অথবা প্রাত্যহিক খাদ্য। এতদ্ব্যতীত সাহেবদিগের চর্ম্মের ক্রিয়া অল্প; শীতের দরুণ তাঁহাদের পক্ষে সাবান কতকটা উপযুক্ত হইলেও আমাদের পক্ষে উহা আদৌ উপকারক নহে। নিকৃষ্ট পদের সাবান সাহেবদিগের পক্ষেও মহা অনিষ্টকর।

ক্ষার, সাবানের একটী প্রধান উপাদান। ক্ষার মল নষ্ট করিতে বিশেষ সক্ষম (১) এবং সাবান ব্যবহার করিয়া সকলকেই শরীরের ঘষামাজাটা একটু বেশী

পরিমাণ করিতে দেখা যায়। এই দুই কারণে এদেশবাসিগণের পক্ষে মাসে দু'এক দিন সাবান ব্যবহার নিতান্তও মন্দ নহে। ঘামাচি ইত্যাদি গ্রীষ্মকালীন উত্তাপজনিত পীড়ায় সাবান ব্যবহারে কতকটা উপশম বোধ হইয়া থাকে। ভাল সাবানের অন্যান্য পরিচয়ের মধ্যে "জলে ভাসে' ইহাও একটী উৎকৃষ্ট পরিচয়। কারণ তৈলের ভাগ অধিক থাকিলেই সাবান জলে ভাসিয়া থাকে।

এই গ্রীষ্মপ্রধানদেশে চর্ম্মের ক্রিয়া অধিক (ঘর্ম্মঅধিক পরিমাণে বহির্গত হয়)। সুতরাং চর্ম্মকে অধিক সতেজ রাখা আবশ্যক। দ্বিতীয় এদেশে নগ্নদেহে থাকা উপকার বলিয়া বহিস্থ রোগোৎপাদক কীটাণু প্রভৃতির চর্ম্মপথে আক্রমণ ব্যর্থ করা আবশ্যক। এই দুই কারণে এতদ্দেশে শরীরে তৈলমর্দ্দন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তৈল ম্রক্ষণে বায়ুর শৈত্য কি উষ্ণতা শরীরের পক্ষে অধিক সহনীয় হইয়া থাকে।

এস্থলে আর একটী কথারও উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। অনেকেরই এইরূপ ধারণা আছে যে সাহেবদিগের সবই ভাল। বস্তুতঃ এইরূপ ধারণা যে কতদূর ভ্রমসঙ্কুল ও অবিবেচনাপ্রসূত এবং নিজেদের সম্বন্ধে মনে মনে কতদূর ক্ষুদ্র ধারণা পোষণ করিলে যে ইহা সম্ভবপর হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সাহেবদিগের মধ্যেও (এমন কি অনেক শিক্ষিত সাহেবের মধ্যেও) যে বহু বর্ব্বরোচিত আচার ব্যবহার ও নিয়মাদি প্রচলিত আছে তাহা ইঁহারা কখনও ভাবিয়া দেখেনা। সাহেবদিগের একটী বর্ব্বরোচিত প্রথা সম্বন্ধে দুইজন চিন্তাশীল, সুবিজ্ঞ সাহেবেরই মত নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

Avoid constricting the waist by the use of belts, stays or tight bands of any kind. Such practices are relics of barbarism, and indicate ignorance of the body and laws of health—Alfred B. Plsen, M.D. and: M Ellsworth Olsen, M. A

বাহ্য পোষাকপরিচ্ছদাদি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও দৈহিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তাঁহারা যে কতদূর নিকৃষ্ট তাহা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার স্বরচিত "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' নামক গ্রন্থে অতিকষ্টে ও উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

মস্তক, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, নাভি, মলদ্বার, পদনখ ও পদতলে তৈল প্রয়োগে প্রভূত উপকার হয়। তৈলাভ্যঙ্গকালে অগ্রে উভয় পদের বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠের নখ তৈলপূর্ণ করিবে। ইহাতে বৃদ্ধকালেও দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখে। মস্তকে উত্তমরূপে তৈলদানে কেশ সকল দৃঢ়মূল, দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়; ইহাতে শিরঃপীড়া টাকপড়া চুলওঠা, কেশের অকালপক্কতা ইত্যাদি নিবারিত হইয়া থাকে এবং সুনিদ্রালাভ হয়। চক্ষুতে তৈলদানে চক্ষু বেশ পরিষ্কার হয়। কর্ণকুহরে তৈল দানে তত্রস্থ মল দ্রব হওয়ায় সহজে বাহির্গত হইয়া যায়; ইহাতে বধিরতা, উচ্চ শ্রবণ (উচ্চ স্বরে না বলিলে শুনিতে না পাওয়া) কর্ণ পার্শ্বস্থ শিরার বেদনা (ঘাব ধরা) জন্মিতে পারে না। নাসিকা ও কর্ণরন্ধ্রে, এবং পদতলে সর্ষপ তৈল প্রয়োগে সর্দ্দির আক্রমণ অনেকটা প্রতিহত হইয়া থাকে। নাভিতে উত্তমরূপ তৈল মর্দ্দনে শিশিরকালীন ওষ্ঠ ফাটার মহৌষধ। ইহাতে মুখমণ্ডলস্থ ব্রণাদি নষ্ট হওয়ায় উহার লাবণ্য বৃদ্ধি হয়; এতদ্দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কারেরও সামান্যতঃ সহায়তা হইয়া থাকে। মলদ্বারে তৈল প্রয়োগে উহা বেশ স্নিগ্ধ ও কতকটা শিথিল থাকে সুতরাং কোষ্ঠ পরিষ্কারের সহায়তা করে।

স্নানান্তে শুষ্ক বস্ত্রাদি দ্বারা বেশ করিয়া গা মুছিয়া ফেলিবে।

নিতান্ত দুর্ব্বল, রোগপীড়িত কি সদ্যোরোগোন্মুক্ত ব্যক্তির এবং বৃদ্ধ ও শিশুর পক্ষে শীতল জলে স্নান ভাল নহে। তাহাদের আতপতপ্ত অথবা অগ্নিপক্ক নাতিশীতোষ্ণ জলে স্নান করা বিধেয়। যেরূপ জলে স্নান করিবে তদপেক্ষা স্বল্পোষ্ণ জল মস্তকে দেওয়া বিধেয়। গরম জলে স্নান করিতে হইলে তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ সামুদ্রিক লবণ মিশ্রিত করিয়া লওয়া ভাল। কোন প্রকার স্নানই সহ্য না হইলে আর্দ্র গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা সর্ব্বশরীর বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিবে। একবারে সমস্ত শরীর মুছিয়া ফেলা অসুবিধাজনক কি কষ্টকর হইলে দিবসের ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ মুছিয়া ফেলিবে। রোগপীড়িত ব্যক্তিগণের শরীর হইতে অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম (মৃত শরীরতন্তু ইত্যাদি) বহির্গত হয় বলিয়া উহাদের শরীর অধিকতর পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় অস্মদ্দেশীয় প্রায় লোককেই ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখা যায়। রোগপীড়িত ব্যক্তির শরীরে সাধারণতঃ যে এক প্রকার দুর্গন্ধ পাওয়া যায় ইহা মৃত শরীরতন্তুসমূহের ঘ্রাণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে এই

ত্রাণ বিশেষ পাওয়া যায় না। অপরিষ্কার থাকিলে রোগ সহজে আরোগ্য হয় না।

জ্বররোগে অথবা বিবিধ রোগজনিত জ্বরে অবস্থাবিশেষে শীতল জলে স্নান, শীতল জলসিক্ত বস্ত্রাদি দ্বারা শরীর আবৃত রাখা কিম্বা বরফ-থলী (ice bag) প্রয়োগে দৈহিক উত্তাপের হ্রাস এবং রোগেরও অনেকটা উপশম ঘটিয়া থাকে। অবস্থা এবং সময়বিশেষে উষ্ণ জলে স্নান কি বাষ্প-স্নানেও শরীরের প্রভূত উপকার সংসাধিত হয়। বারান্তরে এই সকল বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বলিবার বাসনা রহিল।

গামছা দ্বারা যেরূপ উত্তমরূপে শরীর মর্দ্দন করা আবশ্যক, চিরুণীদ্বারাও তদ্রূপ মস্তক পরিষ্কার করা বিধেয়। অপরিষ্কার থাকা হেতুই উকুন জন্মিয়া থাকে। উত্তমরূপ তৈলমর্দ্দনপূর্ব্বক স্নানে এবং চিরুণী ব্যবহারে রুথী (খুস্কী) নিবারিত হয় (১)। সিঁথি কাটা সৌন্দর্য্যের মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় মস্তক পরিষ্কার রাখার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হইয়াছে।

একের ব্যবহৃত চিরুণী, গামছা, বস্ত্রাদি অন্যের ব্যবহার করা উচিত নহে।

দুগ্ধের পরিপাক।

দুগ্ধ তরল পদার্থ কিন্তু ইহা সেবন মাত্র পাকস্থলীতে গিয়া চাপ বাঁধিয়া যায়।

পাকস্থলীতে দুগ্ধের পরিপাক।

পাকস্থলী নিঃসৃত রসে রেনেট নামক এক প্রকার জারক পদার্থ আছে। ইহার সংস্পর্শে আসিলে দুগ্ধস্থিত কেসিনোজেন নামক আমিষ জাতীয় উপাদান কেজিন নামক অপেক্ষাকৃত কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। ইহাই দুগ্ধের চাপ বাঁধিবার কারণ। চাপ যত কঠিন হইবে পরিপাকেরও তত ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা;

দুগ্ধকে সহজে পরিপাক করিতে হইলে যাহাতে শক্ত চাপ না বাঁধে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

---

(২) রুথী নিবারণকল্পে নারিকেল তৈল ব্যবহার্য্য।

কেজিনোজেন ও 'কেলসিয়ম' লবণ দুগ্ধে যত বেশী থাকিবে জমাট ততই শক্ত হইবে। পাকস্থলী নির্গত পাচক রসের (Gastric juice) অম্লতার আধিক্য হইলেও জমাট কঠিন হইয়া থাকে।

দুগ্ধে তুল্যাংশ জল মিশাইলে কেজিনের চাপ শক্ত হইতে পায় না এবং দুগ্ধ সহজে পরিপাক হয়। বার্লির জল আরও অধিক ফলপ্রদ। বার্লির জলে শ্বেতসার বর্ত্তমান থাকার জন্য মিশ্রিত দুগ্ধের জমাট অংশ শক্ত হইতে পারে না।

Citrate of Soda নামক লবণ অল্প মাত্রায় দুগ্ধে মিশাইলে দুগ্ধস্থিত কেলসিয়ম লবণ রূপান্তরিত হয় এবং এই জন্য দুগ্ধের জমাট অংশ বেশী শক্ত হয় না। এই Citate of Soda মিশ্রণে দুগ্ধের স্বাদ ও গন্ধের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। শিশুদের জন্য ইহা প্রচুর মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। দুগ্ধে কার্ব্বণিক অম্ল বাষ্প মিশ্রিত করিলেও কেজিনের চাপ শক্ত হয় না। সেইজন্য দুগ্ধের সহিত সোডা ওয়াটার মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পরিপাকের কোন ব্যাঘাত হয় না।

দুগ্ধকে কিরূপে সহজ পাচ্য করা যাইতে পারে।

দুগ্ধের সহিত রুটী বা ভাত খাইলে দুগ্ধ সহজে পরিপাক পাইয়া থাকে।

দুগ্ধ ফুটাইয়া লইলে দুগ্ধের কেলসিয়ম লবণের পরিবর্ত্তন হয় বটে কিন্তু ইহাতে পরিপাকের কোনই সহায়তা হয় না কারণ পাকস্থলীতে পৌঁছিলে এই লবণ অম্লরসের সাহায্যে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই কারণে কাঁচা দুগ্ধ ও জ্বাল দেওয়া দুগ্ধের চাপ প্রায় একই প্রকার কঠিন।

জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ।

প্রকারভেদে পাকস্থলীতে দুগ্ধের অবস্থানের সময়ের তারতম্য লক্ষিত হয়।

দুগ্ধের পাকস্থলীতে অবস্থান কাল।

১। কাঁচা দুগ্ধ—৩॥ ঘণ্টায় পাকস্থলী পরিত্যাগ করে।
২। মাটাতোলা দুগ্ধ— ঐ—
৩। দধি ইত্যাদি— ঐ—
৪। জ্বাল-দেওয়া দুগ্ধ—৪ ঘণ্টা—

ব্যক্তিগত অভ্যাসের উপরও এই অবস্থানকাল অনেক নির্ভর করে।

দুগ্ধ পাকস্থলী হইতে অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করে।

অন্ত্র মধ্যে নানা প্রকার পাচক রস আছে এবং ইহাদের সাহায্যেই দুগ্ধের পরিপাক সম্পূর্ণ হয়।

দুগ্ধের বিভিন্ন উপাদানের সারাংশ পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া কি পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করে নিম্নে তাহার আলোচনা করা গেল।

দুগ্ধের বিভিন্ন উপাদান সমূহ কি পরিমাণে শরীরে গৃহীত হয়।

কেজিন—যত প্রকার আমিষ জাতীয় খাদ্য আছে তন্মধ্যে দুগ্ধের কেজিনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শরীর মধ্যে গৃহীত হয়। মাংসের আমিষ হইতেও ইহা উৎকৃষ্ট।

মাখন—দুগ্ধের মাখন সকল প্রকার জান্তবীয় চর্ব্বির ন্যায় সহজেই শরীরমধ্যে প্রবেশ লাভ করে। কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস মিশ্রিত দুগ্ধের মাখন সাধারণ দুগ্ধের মাখন অপেক্ষা শীঘ্র শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়।

দুগ্ধ শর্করা—সম্পূর্ণরূপে শরীর মধ্যে প্রবেশলাভ করে।

যদিও দুগ্ধের প্রত্যেক উপাদান সম্পূর্ণরূপে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সক্ষম, তথাপি কার্য্যতঃ ইহার কিয়দংশ বিষ্ঠারূপে পরিত্যক্ত হয়।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে কেবলমাত্র দুগ্ধ খাইতে দিলে দেখা যায় যে শতকরা কেবল মাত্র ৯০ ভাগ রক্তের সহিত মিলিত হইয়া অবশিষ্ট ভাগ মল রূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। মাংসের পরিত্যক্ত অংশ দুগ্ধাপেক্ষা কম। বিষ্ঠারূপে পরিত্যক্ত অংশে দুগ্ধের সকল উপাদানই লক্ষিত হয়।

অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পান করিলে দুগ্ধের সারাংশঃ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করে।

বালক ও স্তন্যপায়ী শিশুদিগের দুগ্ধের সারাংশ গ্রহণের ক্ষমতা অধিক।

শিশুদিগের দুগ্ধ পরিপাক।

শিশু ও বালকদিগের পুষ্টির জন্য 'কেলসিয়াম' লবণের আবশ্যক। দুগ্ধের সমস্ত 'কেলসিয়াম' লবণই তাহারা গ্রহণ করিতে সক্ষম। 'কেলসিয়াম' লবণ অবশিষ্ট থাকিলে তাহা মাখনের সহিত মিলিত হইয়া এক প্রকার সাবানের ন্যায় পদার্থে পরিণত হয় এবং মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিগণ

দুগ্ধের সমস্ত কেলসিয়াম লবণ গ্রহণ করিতে অক্ষম এবং এই কারণেই তাঁহারা শিশু অপেক্ষা অল্প পরিমাণে দুগ্ধের সার গ্রহণ করিতে পারেন।

কাঁচা ও জ্বাল দেওয়া দুগ্ধের পার্থক্য।

কাঁচা দুগ্ধ ও জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ একই পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করে কি না দেখিবার জন্য পণ্ডিতগণ অনেক প্রকার পরীক্ষা করিয়াছেন। কুকুরকে দুই প্রকার দুগ্ধই খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে যে জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ অপেক্ষা তাহারা কাঁচা দুগ্ধের কেজিন (আমিষ জাতীয় উপাদান) অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিতে সক্ষম। উভয় প্রকার দুগ্ধের মাখন সম্বন্ধে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় নাই। প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থকায় যুবকদিগের উপর পরীক্ষা করিয়াও উক্ত প্রকার ফল পাওয়া গিয়াছে।

কি প্রকার দুগ্ধ খাওয়া উচিত।

কাঁচা ও জ্বাল দেওয়া দুগ্ধের মধ্যে উক্ত প্রকার তারতম্য লক্ষিত হইলেও দুগ্ধ জ্বাল দিয়া খাওয়াই ভাল, কারণ এই প্রভেদ বিশেষ গুরুতর নহে এবং কাঁচা দুগ্ধে অনেক প্রকার অনিষ্টকারী বীজাণু থাকা সম্ভব। উপায় থাকিলে শিশুদিগকে দুগ্ধ 'প্যাসট্যুরাইজ' করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, ইহাতে দুগ্ধের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু সমস্ত বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। "স্বাস্থ্য-সমাচারের" পূর্ব্ব সংখ্যায় 'প্যাসট্যুরাইজেসন্' আলোচিত হইয়াছে। প্রাপ্ত বয়স্কদিগের ভিতরে আমাদের দেশে অনেকেই কাঁচা দুগ্ধের স্বাদ ও গন্ধ একবারেই ভাল বাসেন না। ইহাদের জ্বাল দেওয়া দুগ্ধই খাওয়া উচিত। অনিচ্ছার সহিত কোন দ্রব্য আহার করিলে পরিপাক উত্তমরূপ হয় না।

শক্তি-পূজা।

আবার শরৎকাল উপস্থিত। বঙ্গবাসী আদ্যাশক্তির পূজার জন্য আবার ব্যস্ত। আবার বৎসরের পর মা উপস্থিত হইলেন। আমাদের এই বঙ্গদেশ আদ্যাশক্তির পূজার জন্য প্রসিদ্ধ।

এই আদ্যাশক্তির সম্বন্ধে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র কহিতেছেন :—

মহদাদ্যণুপর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ॥
ত্বমাদ্যাসর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎসর্ব্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন॥
ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তি স্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ॥
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥

(ভদ্রে! মহত্তত্ত্ব অবধি পরমাণু পর্য্যন্ত এবং স্থূল সূক্ষ্ম সমুদয় স্থাবর-জঙ্গম-স্বরূপ জগৎ তোমা কর্তৃকই উৎপাদিত হইয়াছে। এই সমুদয় জগৎ তোমারই অধীন; তুমি সকলের আদ্যা, সমুদয় বিদ্যা এবং আমরা সকলে তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি। সমুদয় জগতের সকল বিষয় তুমি জানিতে পারিতেছ। তোমাকে কেহই জানিতে পারে না। তুমি কালী, তুমি তারিণী, তুমি দুর্গা, তুমি ষোড়শী, তুমি ভুবনেশ্বরী, তুমি ধূমাবতী, তুমি বগলা, তুমি ভৈরবী, তুমি ছিন্নমস্তা, তুমি অন্নপূর্ণা, তুমি বাগ্দেবী, তুমি কমলালয়া লক্ষ্মী, তুমি সর্ব্ব শক্তি স্বরূপা, এবং তুমি সর্ব্ব দেবময়ী। তুমি সূক্ষ্মা, তুমি স্থূলা, তুমিই ব্যক্ত স্বরূপা, তুমিই অব্যক্ত স্বরূপা, তুমি নিরাকারা হইয়াও সাকারা। তোমাকে কেহই জানিতে পারে না।)

বঙ্গবাসী অতি ভক্তিভরে হৃদয় প্রাণ খুলিয়া মা মা বলিয়া ডাকিয়া বৎসরের পর বৎসর এই আদ্যাশক্তির পূজা ও আরাধনা করিয়া আসিতেছে। এত ভক্তির আবেগ, এত হৃদয়ের উন্মেষ, এত প্রাণ ভরিয়া ডাকা—কিন্তু কই ধর্ম্ম প্রাণের তৃপ্তি ছাড়া সকল যেন নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে। দেশ ব্যাপী ঘোর ম্যালেরিয়ায় বঙ্গবাসী দিন দিন শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। বঙ্গ জীবনের উৎকর্ষ পল্লীজীবনে। বঙ্গের সুখ দুঃখ, বৃক্ষলতা ঘেরা সহস্র কুটীরে। কিন্তু দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে। আজও গঙ্গার তীরে স্নিগ্ধ সমীরণে জীবন জুড়ায় বটে, কিন্তু তাহা পরিণামে ম্যালেরিয়া জ্বরের কম্প উপস্থিত করে। ছায়া সুনিবীড় শান্তির নীড় বাঙ্গালার ছোট ছোট গ্রামগুলি ম্যালেরিয়া ও বিসূচিকার প্রকোপে অশান্তির নীড় হইয়া উঠিয়াছে। রাখালের খেলাগেহ পল্লবঘন আম্রকানন এখন আর রাখাল বালকের আনন্দ ধ্বনিতে মুখরিত না হইয়া অনেক সময়ে জ্বরার্ত্ত কম্পিত দেহ রাখাল শিশুর জ্বরভোগের আর্ত্তনাদে কলুষিত। স্বচ্ছ অতল দিঘীর কালজল আর গ্রামে গ্রামে দেখা যায় না। পূর্ব্বে যে সব গভীর জলাশয় ছিল, আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে। যে সকল গোচারণের মাঠ ছিল, তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। দূষিত ঘি, দুধও দুর্ম্মূল্য, মৎস্য দুর্ল্লভ, তৈল বিষাক্ত; বাঙ্গালী দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি আসিয়া বাঙ্গালীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। বিশুদ্ধ জলাভাবে কদর্য্য জল ব্যবহারের জন্য, বিসূচিকা, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি রোগ গ্রামে গ্রামে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। আবার ডিপথিরিয়া, রাজযক্ষ্মা, টাইফয়েড্ প্রভৃতি রোগ সুবিধা পাইয়া শক্তিহীন বঙ্গবাসীর উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইতেছে। বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকে ক্রমশঃ ব্যাধিমন্দিররূপে পরিণত হইতেছে।

বৎসরের পর বৎসর, আদ্যাশক্তির সাধনা করিয়া, মহাশক্তির সন্তান আমরা, কেন দিন দিন এত শক্তিহীন হইতেছি? ইহার উত্তর অতি সরল। আদ্যাশক্তির উপাসক হইয়া আমরা আদ্যাশক্তির প্রকৃত উপাসনা ত্যাগ করিয়া ভাবের ঘোরে মাতালের মত পড়িয়া আছি। আমরা ভুলিয়া যাই যে মহাশক্তির রূপকল্পনা কেবল ভক্তির ও ভাবের উন্মেষের জন্য। সেই ভক্তিতে ও ভাবেতে মহাশক্তির প্রকৃত উপাসনা শেষ হয় না।

মহা নির্ব্বাণতন্ত্র বলিতেছেন :—

অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্মহাদ্যুতেঃ
গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপ-কল্পনা ॥

(নিরাকার কাল জননী মহাদ্যুতি কালিকার গুণ ও ক্রিয়ানুসারে রূপ কল্পনা হয়)

এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্ ॥ ১১

(অল্পবুদ্ধি ভক্তবৃন্দের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত উক্ত প্রকার গুণানুসারে সেই ভগবতীর বহুবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে)

মহামায়ার কল্পিত মূর্ত্তি পূজা করিয়া কেবল ভক্তিতে পূজা শেষ করিলে পূজা সম্পূর্ণ হইবে না। চতুর্ব্বর্গ ফললাভ করিতে হইলে মহামায়ার পূজা ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ দ্বারা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। কেবল ভাবযজ্ঞে ও ভক্তি যজ্ঞে মহামায়ার উপাসনা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এই সম্পূর্ণ উপাসনার অভাবে শক্তি উপাসক বঙ্গবাসী আজ শক্তিহীন হইয়া স্বাস্থ্য সুখে বঞ্চিত। আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠের সময় বলিয়া থাকি :—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

মার শক্তিতে অনুপ্রাণিত আমরা অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু আমরা এই শক্তির অবমাননা করিতেছি। এই শক্তির দান প্রত্যাখ্যান করিতেছি। মোহ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি। আমরা মনে করিতেছি যে আমরা মা মা বলিয়া ডাকিব, আর কেবল ঘুমাইব, আর মহাশক্তি আমাদের কাজ সব করিয়া দিবেন। কিন্তু মা আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে শক্তি স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। সেই শক্তির ব্যবহার না করিয়া আমরা মার অবমাননা করিতেছি। আর তাহার পাপে আমরা দিন দিন স্বাস্থ্য সুখে বঞ্চিত হইতেছি। প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়ে, মনে ও দেহে মা যে যথেষ্ট শক্তি দান করিতেছেন, সে শক্তির পূজা যদি প্রত্যেক বাঙ্গালী করে, তবে বঙ্গদেশ আবার হাসিবে ও প্রত্যেক বাঙ্গালী অসাধারণ শক্তিশালী হইবে। ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা প্রভৃতি সকল ব্যাধি দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে।

আবার দেশ সুজল ও সুবিমল বায়ু সেবিত হইবে। সকলে রোগ বিমুক্ত হইয়া নিরাময় দেহে সুদৃঢ় হইবে। বঙ্গদেশকে সর্ব্ববিধ রোগ মুক্ত করিতে হইলে কর্ম্মের দ্বারা মহামায়ার উপাসনা আবশ্যক।

১। এই কর্ম্মে সমস্ত বঙ্গবাসীকে প্রাণ ঢালিয়া দিতে হইবে। মুসলমান, খ্রীষ্টান, হিন্দু, ধনী, নির্ধন, জমিদার, প্রজা দেশের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী ও জনসাধারণ ও রাজকর্ম্মচারী, উচ্চ জাতি ও অস্পৃশ্য জাতি, ইউরোপীয় ও বাঙ্গালী সকলে এক হইয়া ভাই ভাই মিলিত হইয়া একপ্রাণে সমবেত চেষ্টায় কর্ম্ম করিতে হইবে। সকলেই মার সন্তান ও মার শক্তি সকলের ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে। মা এই সমবেত বঙ্গবাসী মধ্যে তাঁহার শক্তির প্রকাশ করিতেছেন। এই মহাশক্তি দেশের দানবরূপ ব্যাধির বিনাশে ব্যবহার করিতে হইবে। আমরা মার উপাসনা করিবার সময় শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ কালে বলিয়া থাকি :—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, সকল বঙ্গবাসীর চেতনা, বুদ্ধি, শক্তি, ক্ষমা, উৎপত্তি, শ্রদ্ধা, শোভা, সম্পদ, জীবিকা, স্মৃতি, পরদুঃখ-অপনয়নেচ্ছা, অধিকৃত অধিক অনভিলাষ, ইন্দ্রিয়সংযম সেই এক আদ্যাশক্তি মার আবির্ভাব। এই সকলের সমন্বয় শক্তির সাধনায় আদ্যাশক্তির পূজা ও উপাসনা কর্ম্মক্ষেত্রে সম্পন্ন হইবে।

এই সমন্বয় শক্তি দ্বারা বঙ্গদেশকে সর্ব্ব রোগ মুক্ত করিতে হইবে। প্রত্যেক বঙ্গবাসী পবিত্র ঘট স্বরূপ। মা এই প্রত্যেক বঙ্গবাসীতে অবতীর্ণ রহিয়াছেন। প্রত্যেক বঙ্গবাসীর সেবা মাতৃসেবা মনে করিয়া আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে। এ পূজা না করিলে আদ্যাশক্তি সন্তুষ্ট হইবেন না ও বঙ্গদেশ রোগ ও অসুস্থতা হইতে মুক্ত হইবে না।

২। দেশের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর উপর এক গুরুতর কর্ত্তব্য ভার রহিয়াছে. এই শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে অনেকে কত সময় বৃথা গল্প আমোদে ও নাটক নভেল্যাদি পাঠে নষ্ট করেন। অনেকে কত সময় আলস্যে বা তাস দাবা পাশা প্রভৃতি

অতিবাহিত করেন। অনেকে ইচ্ছা করিলে কিছু না কিছু সময় জনসাধারণের শিক্ষার জন্য অতিবাহিত করিতে পারেন। শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী মধ্যে যে সকল লোক দিবসের কত সময় বৃথা নষ্ট করেন, তাঁহারা যদি তাহার অল্পাংশ জনসাধারণের জ্ঞান শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন তাহা হইলে এ পোড়া দেশে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। এই জনশিক্ষা দেশের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর প্রথম কর্ত্তব্য।

৩। বঙ্গদেশ কৃষি প্রধান দেশ; বঙ্গদেশে কৃষিকার্য্যে সকল শ্রেণীর কৃষককুলকে বৎসরের সমস্ত সময় কার্য্য করিতে হয় না; যে কৃষক যে শস্যের চাষ করে তাহার জন্য জমি কর্ষণ, বীজ বপন বা চারা তৈয়ারী, চারা রোপণ, শস্য সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে তাহার অনেক অবসর থাকে। যদি বঙ্গের প্রত্যেক পল্লীর অধিবাসী নিজে অবসরের অল্পাংশ গ্রামের জঙ্গল পরিষ্করণে, নালা, নর্দ্দমা ও জল নিকাশের পথের কার্য্যে, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারে বা নূতন পুষ্করিণী খননে অতিবাহিত করেন, তবে বঙ্গদেশের জলকষ্ট চলিয়া যাইবে ও ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা প্রভৃতি ব্যাধি প্রকোপ অনেক হ্রাস হইবে। এরূপ কার্য্যে প্রত্যেক গ্রামের লোককে জোট বাঁধিয়া ব্যূহবদ্ধ (organized) হইতে হইবে ও গ্রামগুলি ছোট হইলে কয়েক গ্রামকে দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হইবে। এই প্রকার বঙ্গবাসীর হিতের জন্য স্বেচ্ছাব্রত ও স্বাবলম্বন, প্রকৃত মাতৃপূজা। তবে ত, মা অম্বা, অর্পিত শক্তির সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের সমবেত চেষ্টায় অধিষ্ঠান হইয়া দুর্গতি হরণে প্রবৃত্ত হইবেন।

৪। দেহ ও দ্রব্য শুচি না হইলে মাতৃপূজা হয় না। শুচিতা না থাকিলে মাতৃপূজা নিষ্ফল, অধিকন্তু অবিহিত অনুষ্ঠানের কুফল অনিবার্য্য। তাই অশুচি দেহে পূজা করিয়া আমরা স্বাস্থ্যরূপ শুভ ফল লাভ করিতে পারি না। গ্রামে গ্রামে আমাদের জল অশুচি, এই অপবিত্র জলই মাতৃপূজা সাধনে বিঘ্নস্বরূপ। কারণ যে জলে আমরা প্রস্রাব, বিষ্ঠা, নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করি, যে জলে রোগমল দূষিত শয্যা বস্ত্রাদি আমরা ধৌত করি, যে জলে উচ্ছিষ্টাদি নিক্ষেপ করি ও উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি ধৌত করি, সেই অপবিত্র জল আমরা আদ্যাশক্তির পূজায় ব্যবহার করি।

আমরা আদ্যাশক্তি মাকে নমস্কার করিবার সময় বলি :—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ

মা জল দ্বারা পূজা গ্রহণের জন্য তৃষ্ণা রূপে আমাদের মধ্যে আবির্ভূতা হন, কিন্তু হায়! তখন আমরা অশুচি অপবিত্র জল পানের দ্বারা মার আরাধনা করি না অবমাননা করি। সেই মহাপাপের ফলে যদি না আমরা রোগ প্রপীড়িত হইব তবে কে হইবে?

নদী ও জলাশয়ের জলকে নানা প্রকারে কলুষিত করিয়া আমরা যে মহাপাপ করিতেছি তাহা ভুলিয়া যাই। এই সকল জলে নানা ক্রিমি বীজ ভাসমান থাকে এবং না জানিয়া কত শুদ্ধাচারা ব্রহ্মচারিণী পূতস্বভাবা বঙ্গ বিধবাও এই জলের সহিত ডিম্ব ভক্ষণ করিয়া ক্রিমি প্রসব করেন। এইরূপে অজ্ঞানের দরুণ তাঁহার নিরামিষ ভোজন-ব্রত ভঙ্গ হয়। এই দূষিত জল পান করিয়া লোকে উদরাময়, আমাশয়, বিসূচিকা, টাইফয়েড, রোগগ্রস্ত হয়। কখনও কখনও কোন এক রোগী হইতে জল কলুষিত হইয়া রোগের বিস্তার চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে ও এক জনের নির্বুদ্ধিতা হইতে শত সহস্র লোকের প্রাণ বিয়োগ হয় ও শত সহস্র পরিবার অসহায় হইয়া পড়ে।

আমরা মহামায়াকে প্রণাম করিবার সময় আরও বলিয়া থাকি :—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

মা যখন ক্ষুধা রূপে আমাদের মধ্যে আবির্ভূতা হন তখন শুচি আহারের দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হইবে। ক্ষুধা না থাকিলে খাওয়া মাতৃপূজা নহে; তাহা অসুর পূজা; সে প্রকার আহার হইতে শারীরিক মঙ্গল হইতে পারে না। যে খাদ্য দ্বারা ও যেরূপ মাত্রায় খাইলে দেহের ও মনের যথার্থ পুষ্টি, উন্নতি ও প্রসন্নতা হইতে পারে, সেই খাদ্যই শুচি খাদ্য। কিন্তু যখন আমরা শুচি খাদ্য ব্যবহার করি না, তখন মাতৃ পূজা নিষ্ফল হয়।

আবার আমরা মাকে ডাকিবার সময় বলি :—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

যখন দেহের ও মস্তিষ্কের বিশ্রাম আবশ্যক তখন মা নিদ্রারূপে অবতীর্ণ হন। মাতৃস্বরূপা নিদ্রা আসুরিক আলস্য নিদ্রা হইতে বিভিন্ন, ও তাহা অবিহিতকালীন নিদ্রা নহে। মাতৃস্বরূপা নিদ্রাকে সাদরে গ্রহণ করিবে। কিন্তু যখন সহরের বিলাস কোলাহলের মধ্যে মাতৃস্বরূপা নিদ্রার অপমান করিয়া রজনীকে দিবসের ন্যায় কাটাই, তখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চয়ই আমাদিগকে রোগ শয্যায় করিতে হইবে। নিদ্রা-রূপে মা অবতীর্ণ হইলে মলয়জ সুনির্ম্মল পবন হিল্লোল ব্যজন যুক্ত স্বাস্থ্যকর সুন্দর প্রকোষ্ঠে মাতৃপূজা করা আবশ্যক। সেখানকার শয্যায় বিলাসের চিহ্ন থাকিবে না। সে শয্যা সংযম নিয়মিত হইবে, সে ঘরে সুবিমল সর্ব্বসন্তাপহারী বায়ু প্রবাহিত থাকিবে, সে ঘরে কোন দুর্গন্ধ যাইবে না, সেরূপ শুচি স্থানে সাত্ত্বিক নিদ্রা উপস্থিত হইয়া পূজা গ্রহণ করিবে; শুচিনিদ্রা হইতে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি বর স্বরূপ নূতন জীবন ও নূতন স্বাস্থ্য লাভ করিবে।

মহাশক্তির আহ্বানের ঘট শুচি হওয়া আবশ্যক, কিন্তু আমাদের দেহরূপ ঘট অনেক সময় শুচি থাকে না। কোষ্ঠবদ্ধতা আমাদের অনেকেরই মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধতার অর্থ কি? আমাদের মধ্যে অনেকে বিষ্ঠা মল ত্যাগ করিয়া শুচি হইয়া থাকেন, কিন্তু যখন কোষ্ঠবদ্ধতা তাহাদিগকে আক্রমণ করে, তখন সেই বিষ্ঠা মল, সেই দেহঘটের মধ্যে রহিয়া যায় এবং তাহা হইতে উত্থিত বিষ আমাদের রক্ত, হৃদয়, ফুসফুস, মস্তিষ্ক ও অন্যান্য সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মনকে কলুষিত করে। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে কোষ্ঠপরিষ্কার দ্বারা দেহের অন্তঃশুদ্ধি করা আবশ্যক। গভীর শ্বাস প্রশ্বাস অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা ফুসফুসের অন্তঃশুদ্ধি আবশ্যক। গভীর শ্বাস প্রশ্বাসের সময় ফুসফুস্ সাধারণ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া হইতে পাঁচগুণ পরিমাণ বেশী বায়ু গ্রহণ করে; ইহাতে বায়ুকোষের (air cells) সুদূর অংশ সমূহ ক্রিয়াশীল হয় ও রক্তের সহিত অধিক পরিমাণে অক্সিজেন বাষ্প মিলিত হয়। এই প্রাণায়াম দ্বারা কেবল যে ফুসফুসের অন্তঃশুদ্ধি হয় তাহা নহে; সমস্ত রক্ত-

স্রোতের শুদ্ধির সাহায্য হয়। বিধিপূর্ব্বক প্রাণায়াম দ্বারা ফুস্‌ফুসের মাংসপেশী সকল বর্দ্ধিত হয়, বক্ষ বিস্তৃত হয়, শরীর ও মন উৎফুল্ল থাকে। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রমতে কিরূপ বিধিতে প্রাণায়াম করিতে হয়, তাহার বিবরণ "জ্যৈষ্ঠের স্বাস্থ্য-সমাচারে" প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহারে দেহের অন্তঃশুদ্ধির অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়। নিয়মমত প্রত্যহ শারীরিক ব্যায়ামে উৎপন্ন ঘর্ম্মদ্বারা শরীরের ময়লা নির্গত হয় ও দেহের অংশ সকল সবল থাকিয়া দেহে উৎপাদিত বিষদানব সকলকে তাড়াইবার সাহায্য করে। প্রত্যহ শারীরিক ব্যায়াম সময় সর্ব্বশক্তিময়ী জগদম্বাকে স্মরণ করিবে, মার নিকটে শারীরিক ব্যায়াম সময় প্রত্যহ শক্তির আরাধনা করিলে ও দেহকে রীতিমত শুচি অবস্থায় রাখিতে পারিলে, দেহঘটে নিশ্চয় অপূর্ব্ব শক্তির অধিষ্ঠান হইবে। কোন প্রকার রোগ বীজাণু এই শুচিদেহের সহসা ক্ষতি করিতে পারে না। বিসূচিকা, টাইফয়েড, রাজযক্ষ্মা, রোগের বীজাণু শুচি সুস্থ দেহেও পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহারা কোন রোগ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। রোগ নিবারণ ক্ষমতা শতগুণ বৃদ্ধি করিতে হইলে ও সুদীর্ঘ জীবনের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিতে হইলে দেহের অন্তঃশুচি বহিশুচি দ্বারা বিধিপূর্ব্বক ব্যায়াম দ্বারা দেহকে আত্মাশক্তির অধিষ্ঠানের উপযুক্ত ঘট করিতে হইবে। তাহা হইলে তাপহারিণী মা অভয়া আমাদের দেহঘটে অধিষ্ঠান করিয়া ব্যাধিরূপ অসুরের হস্ত হইতে আমাদিগকে সতত রক্ষা করিবেন।

(৫) কেবল মুখে ভক্তি করিলে হইবে না। কার্য্যে ভক্তি দেখান আবশ্যক। এদেশে অনেক ধনবান ও ভূসম্পত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা গাভীকে সাক্ষাৎ ভগবতীর মূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া ভক্তি করিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে গাভী বঙ্গবাসীর পক্ষে মাতৃস্বরূপা। আশৈশব মৃত্যু পর্য্যন্ত আমরা গাভীর দুগ্ধ ও দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন নানাবিধ দ্রব্য খাইয়া যে জীবনীশক্তি লাভ করি, তাহার স্মরণ হইলে গাভীর প্রতি যে ভক্তির উদ্রেক হয় তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু গোচারণ মাঠের অভাবে গোজাতির বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। গাভীর প্রতি যাহার প্রকৃত শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে, তাহার সেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি কার্য্যে প্রকাশ না পাইলে প্রকৃত বলা যাইতে পারে না। ধনী ও ভূস্বামীরা এই শারদীয় ভগবতীর পূজার সময়ে কত টাকা থিয়েটার, যাত্রা,

নাচ, ভোজন, আমোদ প্রমোদে ব্যয় করিবেন। যগুপি তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকে সেই সময়ে কিছু জমি গোচারণের জন্য দান করেন তাহা হইলে গাভীর প্রতি তাহাদের যে প্রকৃত ভক্তি আছে তাহা প্রকাশ পাইবে ও সেইরূপে মহাশক্তির প্রতি প্রসন্নতার প্রকৃত কার্য্যে ভক্তি করিলে দেশে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

এস বঙ্গবাসী ভাই সকল আমাদের আবার শক্তি পূজার দিন আসিয়াছে। এবার যেন আমাদের মাতৃপূজা কেবল ভক্তি ও ভাবেতে পর্য্যবসিত না হয়। যে শক্তি-পূজা করিলে বাঙ্গালীর প্রত্যেক নর নারীকে সবল ও সর্ব্ববিধ রোগ মুক্ত করা যাইতে পারে, সেই শক্তি-পূজা করিবার শক্তি আমাদিগকে দিবার জন্য দুর্গতিহারিণী সর্ব্বশক্তি স্বরূপার চরণে আমরা বার বার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি।

গার্হস্থ্য নীতি।

শ্রীমতী ঊষাবতী সোম লিখিত—

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শারীরিক পরিচ্ছন্নতা যেমন প্রয়োজন, বাড়ী, ঘর, উঠান, রান্নাঘর ও ভাঁড়ারঘর পরিষ্কার রাখাও সেইরূপ প্রয়োজন। এ বিষয়ে বাটীর গৃহিণীদেরই দৃষ্টি রাখা উচিত।

পরিবারস্থ সকলের জীবন রক্ষার প্রধান অবলম্বন আহারাদির সুব্যবস্থা তাঁহাদেরই হস্তে, ইহা মনে রাখিয়া সকল কার্য্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। নিজে যগুপি অপারগ হয়েন তাহা হইলে কন্যা, বধূ কিম্বা পরিচারক পরিচারিকা দ্বারা সংসারের সুব্যবস্থা করাইবেন। প্রথমে ভাঁড়ার ঘর হইতেই খাদ্যের আয়োজন হয়। সে ঘরে চাল, ডাল, লবণ, তৈল প্রভৃতি সকল দ্রব্যই উত্তমরূপ ঢাকা দেওয়া উচিত; তাহা হইলে ইন্দুর, আরসোলা প্রভৃতি অন্যান্য জীব জন্তুতে তাহা ময়লা করিতে পারিবে না; ঘরে হাওয়া ও রৌদ্র আসিলে দ্রব্যাদি ভাল থাকে।

জানালা খোলা, প্রত্যহ ঝাঁট দেওয়া, মধ্যে মধ্যে কলি ফেরান, ঝুল ঝাড়া এবং দ্রব্যাদি রৌদ্রে দেওয়া উচিত। ভাঁড়ার ঘরেই ইঁদুরের উৎপাত অধিক, এজন্য ভাঁড়ার ঘরের দেওয়ালে বা মেজেতে ফুটা ফাটা না থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আধুনিক চিকিৎসকগণের মতে ইঁদুর হইতেই প্লেগ রোগের উৎপত্তি।

হাজা, পচা, ছাতাপড়া দ্রব্য রাঁধিতে বা খাইতে দিবে না। সামান্য অপচয়ের ভয়ে উহা ব্যবহার করিলে নানা প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে। তরকারি কুটিয়া নির্ম্মল জলে ধুইবে। ময়লা জলে কোন কার্য্যই করিতে নাই। প্রায় অনেক বাড়ীতে দেখা যায় ভাঁড়ার ঘরের কোন একটা দড়িতে একখানা গরদ বা তসর ঝুলান থাকে তাহার নাম শুদ্ধ কাপড়। যিনি ভাঁড়ারের কাজ করেন তাঁহাকে সেই কাপড় পরিয়া কাজ করিতে হয়। তাহা কখন বোধ হয় জলকাচা হয় না। সে জন্য ক্রমে দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। অনেকে তাহার গন্ধে বিলক্ষণ কষ্টও অনুভব করেন। কিন্তু কি করিবেন, যাহা নিয়ম তাহা বুঝি করিতেই হয় মনে করেন। ঐ সকল ঘৃণাকর জিনিষ গৃহিণীরা পরিত্যাগ করিলেই সংসারের মঙ্গল হয়। ভাঁড়ার ঘরের প্রত্যেক দ্রব্য তেল, ঘি, গুড়, চিনি প্রভৃতি আবৃত পাত্রে রাখা কর্ত্তব্য। বিস্কুটের বাক্স, চায়ের টিন, মেলিন্স ফুডের বোতল ইত্যাদি অনেক স্থলে হাঁড়ি কিম্বা ভাঁড়ের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা ভাল। মৃত্তিকা পাত্রে দ্রব্যাদি রাখিলে মধ্যে মধ্যে তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

রান্নাঘর এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে উত্তমরূপ হাওয়া ও আলোক আসিতে পারে। আলোক না আসিলে খাদ্য দ্রব্যে কিছু পড়িলে দেখিতে পাওয়া যাইবে না এবং অন্ধকারে ঘর ক্রমশঃ সেঁতাইয়া যাইবে। বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল না হইলে ঘরের রুদ্ধ বায়ু দূষিত হইয়া যায়, আহার্য্য দ্রব্যাদিও দূষিত হইয়া পীড়াদায়ক হয়। রান্নাঘর অনেক দ্রব্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করা উচিত নহে। রন্ধন করিবার কাষ্ঠ, কয়লা, ঘুঁটে, ঝুড়ি, চুপড়ি প্রভৃতি অন্য স্থানে রাখিবে। ঐ সকল দ্রব্যে ঘর পূর্ণ থাকিলে মাকড়সা, টিক্‌টিকি ইঁদুর প্রভৃতি বাসা করিবে এবং খাদ্য দ্রব্য সহজেই নষ্ট করিবে। রান্নাঘর ঝুলকালি দ্বারা শীঘ্রই মলিন হয়। বেশী মলিন হইবার আগেই সেগুলি শীঘ্র শীঘ্র পরিষ্কার করা প্রয়োজন। রান্নাঘর অপরিষ্কার হইলে খাদ্য দ্রব্যও অপবিত্র হয়। সেই দ্রব্য আহার করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। অনিচ্ছায় আহারে খাদ্য

অজীর্ণ হয়; রান্নাঘরের ধোঁয়া যাহাতে বাড়ীময় না হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থা করা উচিত, নচেৎ কাপড় চোপড় ও দেওয়াল শীঘ্রই মলিন হয়। রান্নাঘরের চারিদিক যাহাতে পরিষ্কার থাকে সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে। চতুঃপার্শ্বের ময়লা, ধুলা ইত্যাদি পায়ে পায়ে ঘরে আসিলে তাহাই আবার অন্ন ব্যঞ্জনে আসিবে। রান্নাঘরের নিকটে দুর্গন্ধময় আঁস্তাকুড় থাকা উচিত নয়। ভাতের ফেন, হাঁড়ি, কড়া ধোওয়া জল দূরে ফেলিয়া আসিবে; নিকটে ফেলিলে যদি রীতিমত পরিষ্কার না হয় তাহাতে পোকা জন্মিবে এবং ঘরের দ্বারে আসিবে। অনেক বাড়ীতেই রন্ধন গৃহে ভাতের ফেন ঢালিবার জন্য নর্দ্দমা আছে। এই নর্দ্দমা যাহাতে পরিষ্কার থাকে সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবে। এই নর্দ্দমার পথে ইঁদুর প্রভৃতি প্রায়ই গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। এজন্য রাত্রে ইহা ঢাকিয়া রাখা উচিত।

চিম্‌নিহীন কেরোসিনের আলো রাত্রে জ্বালান উচিত নয়, তাহাতে ঘর শীঘ্র মলিন হইবে এবং নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তাহা শরীরে প্রবেশ করিয়া ক্রমে রোগের সৃষ্টি করিবে। রন্ধন শেষ হইলে প্রত্যহ গোবর দিয়া রান্নাঘর ধোয়া আবশ্যক। ধাতু পাত্র অপেক্ষা মাটীর পাত্রে রন্ধনই অধিক উপকারী। রন্ধনের পরে এরূপে হাঁড়ি ধোয়া আবশ্যক যাহাতে অন্ন ব্যঞ্জনের কিছু না লাগিয়া থাকে। রন্ধন শেষ হইলেই সকল জিনিষে ঢাকা দিবে, খুলিয়া রাখিলে হঠাৎ কোন জন্তু আসিয়া মুখ দিতে পারে। ইতর জন্তুতে নানা ব্যাধি আনিতে পারে। খাদ্যদ্রব্যে কখনও মক্ষিকা বসিতে দিবে না; গত মাসের স্বাস্থ্য-সমাচারে মক্ষিকা সম্বন্ধে প্রবন্ধ সকলেরই পাঠ করা উচিত।

পিত্তল কাঁসার পাত্র সামান্য কারণেই মলিন হয়, তাহা ভাল মাজা না হইলে ব্যবহার করিতে নাই। ধাতু পাত্র অপেক্ষা কাচ কিম্বা পাথর ব্যবহার করা ভাল। ধাতু পাত্রে আহার্য্য অধিকক্ষণ থাকিলে স্বাস্থ্যের পক্ষে হানি হইতে পারে। কাচ কিম্বা পাথরে, তাহা হয় না। কলাপাত ব্যবহার করা খুব ভাল এবং উহা সহজেই পাওয়া যায়। ১০।১৫ দিন বাদ হাঁড়ি, ঝিড়ে, হাতা ফেলিয়া দিবে। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা বোধ হয় এই কারণেই গ্রহণাদির সময় হাঁড়ি ফেলিয়া দিবার নিয়ম করিয়াছেন। পিতলের হাঁড়ি হইলে রোজ মাজিবে। তামার হাঁড়ি কলাই করা

রন্ধনের পক্ষে ভাল নহে, একটু কলাই উঠিয়া গেলেই আহারীয় দ্রব্য বিষাক্ত হয়। তাহা ব্যবহার একেবারেই পরিত্যাগ করা ভাল। পিত্তলে রন্ধন করিয়া অধিকক্ষণ তাহাতে রাখা ভাল নয়।

রাত্রিকালে রন্ধন ও ভোজন গৃহ যাহাতে উত্তমরূপ আলোকিত হয় সে ব্যবস্থা করিবে। অনেক ধনিগৃহে পায়খানায় ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট জ্বলে কিন্তু রন্ধন গৃহে কেরোসিনের ডিবার ব্যবস্থা। চিম্‌নিহীন কেরোসিনের ডিবা অপেক্ষা প্রদীপের আলোক সহস্রগুণে ভাল। পাচকেরা অপরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখে না। তাহারা ময়লা গামছা দ্বারা থালা পোঁছে। কাসি হাঁচি পাইলে খাদ্য দ্রব্যের উপর হইতে মুখ ফিরায় না। তাহাদের ঘর্ম্মও খাদ্য দ্রব্যে অনেক সময় পড়ে। গ্রীষ্মকালে পাচকেরা গেঞ্জিফ্রক পরিলে খাদ্যদ্রব্যে ঘর্ম্ম পড়িতে পারে না। গেঞ্জি প্রত্যহ কাচা উচিত।

পাচকের রন্ধন খাইলে তাহার রন্ধনের দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। হস্ত দ্বারা পরিবেশন করা ভাল নহে, চামচা কিম্বা খন্তি দ্বারা পরিবেশন করা উচিত। তাহাতে খাদ্য দূষিত হয় না এবং সকলে রুচিপূর্ব্বক আহার করে। যেখানে সেখানে আহার করা উচিত নয়, আহারের স্থান পূর্ব্বে ঝাঁট দিয়া জলের ছিটা দিতে হয়, তাহা হইলে শীঘ্র কোন দ্রব্য উড়িয়া ভাতে আসিয়া পড়ে না। তাহা ছাড়া জায়গাটী ও পরিষ্কার করা হয়, যিনি পরিবেশন করিবেন তাঁহার দেহ ও কাপড় পরিষ্কার থাকা উচিত নচেৎ যাঁহারা ভোজনে বসিয়াছেন তাঁহাদের আহারে বিঘ্ন হইবে। ভোজনে বসিবার পূর্ব্বে স্নান করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া কেশ সংস্কার করিবে। পরে পরিষ্কৃত স্থানে পিঁড়া বা আসনে হাত ধুইয়া ভোজনে বসিবে। হাত ধোয়া জল যেন অন্য ভোজনকারীর থালার নীচে কিম্বা আসনে গড়াইয়া না যায়। ভোজনে বিঘ্ন হইলে হজমেও বিঘ্ন ঘটে; হজমে বিঘ্ন নানা রোগের পথ। ভালরূপে চর্ব্বণ করিয়া ধীরে ধীরে আহার করিবে, তাড়াতাড়ি আহার করা ভাল নয়, তাহাতে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়, এবং হেঁচ্‌কি (ঢেকুর) উঠে কিম্বা যদি কণামাত্র শ্বাস নালীতে গিয়া পড়ে তাহা বিষম যন্ত্রণাদায়ক হয়। পাঁচ রকম পরিবর্ত্তন করিয়া প্রত্যহ দ্রব্যই আহার করা উচিত। মিশ্র আহারে দেহ গঠনের উপযোগী সমস্ত উপাদানই

পাওয়া যায়। গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তব্য রুগ্ন, বৃদ্ধ, শিশু, গর্ভিণী যে যেমন তাহার সেইরূপ উপযুক্ত খাদ্য নির্ব্বাচন করা। এ বিষয়ে মহিলাগণের বিশিষ্টরূপ জ্ঞান থাকা অতীব প্রয়োজন। অনেক শিক্ষিতার গৃহিণীপণা প্রবীণা নিরক্ষরা স্ত্রীলোকের গৃহিণীপণার সমকক্ষ হইতে পারে না। নবীনাদের উচিত প্রবীণাদের নিকটে অনেক বিষয় শিক্ষা করা। তাঁহারা এক একটী ভোজে নিজেরাই রন্ধন কার্য্য সমাধা করিতেন এবং সকলেই তাহাদিগকে অতিশয় সম্মান করিত। এখনকার স্ত্রীলোকদের পাচকের এক দিন অসুখে যদি রন্ধন করিতে হয় তাহা হইলে "শেষের সে দিন" বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হয়। সে কালের বৃদ্ধারা এত টোট্‌কা জানিতেন যে তখনকার অনেকেই তাহাতে আরোগ্য হইত এখনকার গৃহিণীরা দ্রব্যগুণ জ্ঞানে একেবারেই অজ্ঞ। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই এ বিষয়ে ঔদাসীন্য ত্যাগ করিতে পারেন। অনেক বাড়ীতে মধ্যাহ্ন আহার প্রায় ২॥ টা ৩টার সময়। ঐ সকল বাড়ীতে অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ প্রায় সকলেরই হয় তাঁহারা ঔষধাদি খান বটে কিন্তু মূল কারণ অনুসন্ধান করেন না। অতএব স্বেচ্ছা ক্রমে তাঁহারা শরীর নষ্ট করেন। উপযুক্ত গৃহিণী দ্বারা এরূপ হয় না। আলস্য পরায়ণা সংসারানভিজ্ঞা গৃহিণী দ্বারা গৃহস্থ নষ্ট হয়।

শিশু চুরি।

(সত্য ঘটনা মূলক ছোট গল্প।)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল, লিখিত—

হরিহর পুরের শ্যামাধন রায় মহাশয় পূর্ব্বে সরকারী কমিসেরিয়াট্ ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করিতেন। তিনি কর্ম্মোপলক্ষে বহুকাল পশ্চিমাঞ্চলে কাটাইয়া, আমরা যে ঘটনাটি বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পেন্‌সন্ লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। শ্যামাধন বাবু যে একজন সম্পত্তিপন্ন লোক, তাহা তাঁহার বৃহৎ বসতবাটী ও তৎসংলগ্ন সুরম্য উদ্যান ও পুষ্করিণী দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। বাড়ীটি সুরুচি অনুযায়ী নির্ম্মিত ও সজ্জিত।

শ্যামাধন বাবুর গৃহিণী, অনেক বৎসর হইল, একটী পুত্র ও একটী কন্যা মাত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। কন্যা শৈলবালার নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে একটী সুপাত্রের সহিত বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু বাপের আদরের মেয়ে বলিয়া সে মধ্যে মধ্যে পিতৃগৃহে আসিয়া কিয়ৎকাল বাস করে। পুত্র তারাপদ যেমন সচ্চরিত্র, তেমনি সুশিক্ষিত। তিনি কলিকাতার একটী ছাত্রাবাসে কয়েক বৎসর থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং যথাক্রমে "এম্, এ" ও "বি, এল্" পরীক্ষা সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন; তৎপরে আলিপুরে কিছুকাল ওকালতি করিয়া একটী মুন্সেফী পদের প্রার্থী হন। কয়েকবার অস্থায়ী মুন্সেফের কাজে নিযুক্ত হইয়া, তারাপদ সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভার্য্যা শশীমুখী, প্রায় দুই বৎসর হইল, একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন, কিন্তু অস্থায়ী মুন্সেফের গতি বিধির কোন স্থিরতা নাই, সুতরাং তারাপদকে এ পর্য্যন্ত প্রতিবার কর্ম্মস্থানে একাকী থাকিতে হইয়াছে। এক্ষণে স্থায়ীপদে নিয়োগের কাল আসন্ন প্রায় এবং তখন কর্ম্মস্থানে পরিবার লইয়া যাইতে পারিবেন, এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তারাপদ পিতৃগৃহে পরম সুখে কাল কাটাইতেছেন। শশীমুখী ধনাঢ্যের কন্যা ও সঙ্গতিপন্ন শ্বশুরের একটী মাত্র বৌ, তাহার স্বামীও সর্ব্বগুণে গুণান্বিত, সুতরাং শশীমুখীর নিষ্কলঙ্ক চিত্তে কখনও কোনও ভাবনা চিন্তার কালিমা দেখা দিত না। শৈলবালা শশীমুখীর সমবয়স্কা ও সমহৃদয়া, সুতরাং উভয়ের মধ্যে যে অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল দুইজনে মিলিয়া সমস্ত দিন সাংসারিক কার্য্যে ও হাস্য কৌতুকে কাটাইত। তারাপদও নবীন যৌবনে সর্ব্বসুখে সুখী ও সর্ব্ববিষয়ে কৃতকর্ম্মা হইয়াছেন সুতরাং তাঁহারও কোন চিন্তার কারণ ছিল না তিনি সমস্ত দিন বন্ধুসহবাসে ও নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে কাটাইতেন, খোকাকে আদর করিবার ও সুযোগ পাইতেন না। খোকা বাটীর সকলের—বিশেষতঃ তাহার বৃদ্ধ ঠাকুর দাদার ও স্নেহময়ী পিসীমার—প্রাণস্বরূপ, সে সারাদিন সকলের কোলে কোলে ফিরিয়া রাত্রিকালে জননীর ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাইত। তারাপদের শয়নকক্ষে তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর জন্য দুইখানি খাট পাশাপাশী পাতাছিল—মধ্যে এক হস্তের অনধিক স্থান ব্যবধান। তারাপদ প্রতিদিন শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার

রুদ্ধ করিতেন, এবং প্রণয়িনীর সহিত কথা কহিতে কহিতে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইতেন; কারণ, সুষুপ্তির ঘোর সপত্নী চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে মোটেই স্থান পায় নাই। ঠিক সেই কারণে শশীমুখীও অনতিবিলম্বে ঘুমে অচৈতন্য হইত। এক দিন খোকা ঘুমের ঘোরে জননীর শয্যাচ্যুত হইয়া খাটের নীচে পড়িয়া গিয়াছিল। সে কাঁদিয়া বাড়ী মাৎ করিয়া দিল, কিন্তু নিদ্রাতুর দম্পতির ঘুম কিছুতেই ভাঙ্গিল না। শৈলের শয়নগৃহ বাটীর আর এক মহলে অবস্থিত, কিন্তু সে সেখান হইতেও শিশুটীর ক্রন্দন শুনিতে পাইল। সে প্রথমে ভাবিল খোকার মা শীঘ্রই জাগরিত হইয়া খোকাকে সান্ত্বনা করিবেন, কিন্তু যখন দেখিল যে খোকার কান্না না থামিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে তখন সে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না' ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য শয্যা ত্যাগ করিল এবং ভ্রাতার শয়নগৃহের দ্বারস্থ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে দাদা! দাদা! বৌ! বৌ! ছেলে কাঁদে কেন?' বলিয়া বারংবার নিদ্রিত দম্পতির ঘুম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনও ফল হইল না। দ্বার ঠেলিয়া দেখিল উহার ভিতর হইতে রুদ্ধ; অবশেষে তাহার হঠাৎ মনে পড়িল যে, দ্বারের বিপরীত দিকের: খড়খড়ির একটা পাখী কিছুকাল পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ খোলা ছাদ দিয়া সেই দিকে ধাবমান হইল এবং ভগ্ন পাখীর ভিতর হাত গলাইয়া কৌশলে খড়খড়ী খুলিয়া গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিল; দেখিল দম্পতি তখনও ঘোর নিদ্রায় অচেতন। সে আস্তে আস্তে রোরুদ্যমান শিশুটীকে বুকে তুলিয়া লইয়া যে খড়খড়ীটা দিয়া গৃহে প্রবেশলাভ করিয়াছিল সেই পথ দিয়াই নিষ্ক্রান্ত হইল এবং খড়খড়ীটা পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ করিয়া নিজের শয়নকক্ষে আসিয়া খোকাকে ভুলাইতে প্রবৃত্ত হইল। আলো আনিয়া দেখিল যে খোকার কপালের একদেশ খাটের খুরায় লাগিয়া কিঞ্চিৎ ফুলিয়া উঠিয়াছে মাত্র—বিশেষ কোনও আঘাত লাগে নাই। শৈল তথায় একখানি জলপটী বাঁধিয়া দিল খোকার হাতে একটী খেলানা দিয়া ত্বরায় উহাকে শান্ত করিল; সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। রজনী প্রভাত হইলে শৈল দেখিল যে, রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে বলিয়া খোকা এখনও অনেকক্ষণ ঘুমাইবে। সে তখন তাহার শয়নকক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী একটী নিভৃত কক্ষে প্রাতঃসমীরণ সেবিত বাতায়নের সন্নিহিত কক্ষতলে

খোকাকে একটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শয্যায় শোয়াইয়া দ্বার ভেজাইয়া দিল এবং দোতালা হইতে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গিয়া পিতৃদেবের প্রাত্যহিক পূজার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে খোকার মার প্রাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইল সে ছেলেটীকে কাছে দেখিতে না পাইয়া প্রথমে বিস্মিত ও ভীত হইল—কারণ, অল্পদিন পূর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে এক দল বেদিয়া দেখা গিয়াছিল এবং তৎসঙ্গে ছেলেধরা ভয়ের একটা হুজুগ উঠিয়াছিল। তাহার বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল—কিন্তু দ্বার রুদ্ধ ও জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে আশ্বাস পাইল যে খোকা নিশ্চয়ই গৃহের মধ্যে কোনও খানে আছে। কিন্তু হায়! সে আশা শীঘ্রই বিলীন হইল; গৃহের প্রত্যেক অংশ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও খোকাকে কোথাও পাওয়া গেল না। তখন ভীত-বিহ্বলা শশীমুখী স্বামীর গা ঠেলিয়া তাঁহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিল। তারাপদ একবার চক্ষু কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?,, শশীমুখী রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "খোকাকে দেখিতে পাইতেছি না, কোথায় আছে জান? তারাপদ ঘুমের ঘোরে বলিলেন "বাক্সের ভিতর রাখিয়াছি, কাল সকালে দিব, আমাকে আজ আর বিরক্ত করিও না, গরমের জন্য সারা রাত চ'খের পাতাটী বুজিতে পারি নাই এইমাত্র একটু তন্দ্রা আসিয়াছে।" তারাপদ আর অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া পাশমোড়া দিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার নাসাগর্জ্জন আবার আরম্ভ হইল। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের আর বৃথা চেষ্টা না করিয়া শশীমুখী অগত্যা গৃহ হইতে বহির্গত হইল এবং দোতালার ঘরগুলি পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া নিচে নামিয়া গেল। নীচেকার কক্ষগুলিতেও অনুসন্ধানের ত্রুটি হইল না, কিন্তু লজ্জা ও ভয় প্রযুক্ত শশীমুখী কাহাকেও মুখ ফুটিয়া খোকার কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। পরিশেষে খিরকির পুকুর ঘাটের অনুসরণ করিয়া চলিল; পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় এক পসলা বৃষ্টি হওয়াতে মাটি তখনও ভিজা ছিল, কিন্তু কোথাও খোকার একটীও পদচিহ্ন দেখিতে পাইলনা— মন্দের ভাল! খোকা নিশ্চয়ই জলে পড়ে নাই। উদ্যানের ভিতর দিয়া ফিরিবার সময় শশীমুখী দেখিল যে শৈল এক ফুলের সাজি হাতে করিয়া একমনে পূজার

ফুল তুলিতেছে। শৈলকে পাইয়া শশীমুখী তাহার কাছে ছুটিয়া গেল কিন্তু ভয়ে ও দুঃখে তাহার বাঙনিষ্পত্তি হইল না। শশীকে মৌন ও ম্লানমুখী দেখিয়া শৈল পরিহাসের ভান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বৌ! তোর আজ কি হয়েছে? অমন ক'রে ফুলকোমুখী হয়ে বনে বনে বেড়াচ্ছিস্ কেন দাদার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে না কি?" শশীমুখী রুদ্ধশ্বাসে ও গদ গদ স্বরে বলিল "না ঠাকুর ঝি! সে সব কিছু নয়, তুমি খোকাকে দেখিয়াছ?" শৈল এবার কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, "আ মরণ বৌ তোর কি রঙ্গ করিবার সময় অসময় নাই বাবা বলেন ঢ্যাঢোড়া সহরমে, ল্যাড়কা বগলমে।, তোর দেখছি তাই হয়েছে"। কাল সন্ধ্যার পর খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া তোর কাছে শোয়াইয়া এলুম, খানিক পড়ে দাদা এসে দোরে খিল দিয়ে শুলেন তাও দেখ্‌লুম; তুই কিনা এখন আমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছিস্ 'ঠাকুর ঝি! খোকাকে দেখেছ?' এত রঙ্গও জানিস! খানিক রাত্তিরে দোর খুলে রেখেছিলি না কি? শশীমুখী উত্তর করিল, "না ঠাকুরঝি! সকালে উঠিয়া দেখলুম দোর জানালা সব বন্ধ, কিন্তু ছেলে ঘরে নাই।" শৈল বলিল, "দোর বন্ধ ছিল যদি, তবে মানুষ ঢুক্‌লো কেমন ক'রে? ছেলেই বা ঘরের বার হ'ল কেমন ক'রে? তবে কি ছেলেকে ভূতে নিয়ে গেল? শশীমুখী কোন উত্তর দিল না—শৈলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল ও বলিল, "ঠাকুর ঝি! তোর পায়ে পড়ি, তুই আর আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস্‌নে—আমার অঞ্চলের নিধি আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।" কোমল হৃদয়া শৈল এতক্ষণ যে কপট নাট্যাভিনয় করিতেছিল তাহা আর চালাইতে পারিল না; সে শশীমুখীকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "কাঁদিয়া খোকার অকল্যাণ কচ্ছিস্ কেন? সে নিশ্চয়ই বাড়ীর কোথাও না কোথাও আছে—পালাবে কোথায়? তোর ত খোঁজা—সোণা ফেলে আঁচলে গেরো! আয় দেখি, একবার তোতে আমাতে দু'জনে মিলে খুঁজি। এই বলিয়া শৈল শশীমুখীকে সঙ্গে লইয়া খানিকক্ষণ এঘরে সে ঘরে খোঁজ তল্লাস করিয়া শেষে নিজের শোবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত:হইল। দৈবাৎ পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া গেল এবং খোকার মা আনন্দ-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল যে, তাহার হারানিধি

একটী পশমের মেষ-শাবক বুকে করিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। তখন সে বেশ বুঝিতে পারিল যে এ সমস্ত ব্যাপার শৈলের কাণ্ড; সে শৈলের গাল টিপিয়া বলিল, "রাক্ষুসি! তুই এত দুঃখ দিতে জানিস!" শৈল প্রত্যুত্তর করিল, "পোড়ার মুখি! আমি রাক্ষুসি! না তুই রাক্ষুসি? তোর নাড়ী-ছেঁড়া ধনের কেঁদে কেঁদে দম বন্ধ হবার যো হ'য়েছিল তবুও তোর ঘুম ভাঙ্গ্‌লো না? শৈল এই বলিয়া যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল।

এই ঘটনা-উপলক্ষে শশীমুখীকে বাড়ীর সকলকার কাছে বিস্তর তিরস্কার ও পরিহাস সহ্য করিতে হইয়াছিল, বলা বাহুল্য; কিন্তু ব্যাপারটা এই খানেই শেষ হইলে তত গুরুতরও হইয়া দাঁড়াইত না। কথাটা ক্রমে কর্ত্তার কাণে গেল। তিনি তারাপদকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমার ও বৌমার ঘুমের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি; বাড়ীতে ডাকাত পড়িলে বা সাতটা খুন হইয়া গেলেও দেখ্‌ছি তোমাদের ঘুম ভাঙ্গে না। আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাকে সপরিবারে বিদেশ যাত্রার অনুমতি দিয়াছিলাম বটে; কিন্তু এখন স্থির করিয়াছি যে, যতদিন পর্য্যন্ত তোমাদের ঘুম সজাগ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত খোকা আমার কাছে থাকিবে।" পিতার এই কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তারাপদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বিষণ্নবদনে তাঁহার বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার বাল্যসুহৃৎ অভেদাত্মা রসময় মিত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রসময় তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তারাপদকে পরিহাসপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জাহাপনা সেলামৎ! বান্দাকে আজ এত সকালে তলব করিয়াছেন কেন?" তারাপদ বলিলেন, "এখন পরিহাসের সময় নয়, ঘোর বিপদ উপস্থিত।" এই বলিয়া সজল নয়নে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন এবং কি উপায়ে ঘুম সজাগ হয় তদ্বিষয়ে বন্ধুর নিকট পরামর্শ যাচ্‌ঞা করিলেন। রসময় বলিলেন, "তুমি নিজে কি উপায় ঠাওরাইয়াছ আগে বল দেখি শুনি।" তারাপদ কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না; অনেক দিন পূর্ব্বে কি একখানা কেতাবে পড়িয়াছিলাম যে চীন দেশের তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিত নিদ্রাকে বশে আনিবার জন্য নিজ মস্তকের কেশগুচ্ছ রজ্জু দ্বারা ঘরের

কড়িকাঠের সহিত সংযুক্ত করিতেন, চুল আসিলেই চুলে টান পড়িত ও নিদ্রাভঙ্গ হইত। এক একবার মনে হয়, সেইরূপ করিয়া দেখিলে হয় না? রসময় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, "এমন কাজ কখনও করিও না; তোমার ঘুম গণ্ডারের খড়্গে নির্ম্মিত; তোমার চুল ছেঁড়া দূরে থাকুক, তোমার মুণ্ডুটী ছিঁড়িয়া গেলেও, তোমার ঘুম ভাঙ্গিবে না এটী আমার ধ্রুব বিশ্বাস।" তারাপদ কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আর একটা উপায়ও মনে উদয় হয়; একটা এলার্ম্ বেল্ (Alarm bell) ঘরের দেওয়ালে সংলগ্ন করিয়া, খোকার কোমর-পাটায় একটা লম্বা দড়ী বাঁধিয়া ঐ শঙ্কাসূচক ঘণ্টার সহিত যোগ করিয়া দিলে হয় না? খোকা খাট হইতে গড়াইয়া পড়িলেই দড়ীতে টান পড়িবে ও ঘণ্টা বাজিয়া আমাদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিবে।" রসময় আবার উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বাড়ীশুদ্ধ লোক জ্বালাতন হইবে বটে, কিন্তু একটা এলার্ম্ বেলে তোমার ঘুমের কি করিবে? বাল্মীকি বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক হাজার হাতী কুম্ভকর্ণের গায়ের উপর দিয়া গেলে পর কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল :—

'বারণানাং সহস্রঞ্চ শরীরেঽস্য প্রধাবিতম্।
কুম্ভকর্ণস্তদা প্রাপ্য স্পর্শং পরমবুধ্যত॥'

তোমার ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য অন্ততঃ একশটা এলার্ম্ বেল্ চাই! রমেশ যে কলেজে তোমার নাম 'গোবর গণেশ' রাখিয়াছিল তাহা সার্থক, তোমার ঘটে একটা কাণা কড়িরও বুদ্ধি নাই; তুমি হাকিমি করিয়াছিলে কি করে? তারাপদ হাসিয়া বলিলেন, "ঘটে কিছু থাকিলে তোমাকে ডাকিব কেন? এখন তুমিই এ রোগের ঔষধ ব্যবস্থা কর—আমিত ভাই। হালে পানী পেলাম না।" রসময় বলিলেন, ঔষধ কি তুমি জান না? আমরা যখন কলিকাতার 'মেসে' থাকিতাম, তখন আমরা পরীক্ষার সময়েও কখনও নয়টার বেশী রাত জাগিয়া পড়ি নাই, কিন্তু তোমার কি মনে নাই যে দুই তিন জন ফরিদপুর নিবাসী ছাত্র বাটী বাটী চা খাইয়া প্রায় রাত্রি শেষ পর্য্যন্ত পড়িত?"

কথাটা তারাপদের ঠিক মনে লাগিল ; তিনি তদ্দণ্ডেই তাঁহার কলিকাতা নিবাসী বন্ধু রমেশকে লিপ্টনের এক প্যাকেট চা ও তিন সেট পেয়ালা প্রভৃতি চা খাইবার সরঞ্জাম পাঠাইবার জন্য একখানি জরুরী পত্র লিখিলেন ও পত্রখানি পূর্ব্বপরিচিত "গোবর গণেশ" নামে স্বাক্ষর করিলেন। বহির্ব্বাটীর ছোঁয়ালেপায় পাছে শশীমুখী আপত্তি করেন এই ভয়ে তাঁহার জন্য এক সেট্ স্বতন্ত্র চা খাইবার সরঞ্জাম পাঠাইবার অর্ডার দেওয়া হইল। রমেশ একজন প্রসিদ্ধ চা-খোর ও চা-পানের মিশানারি। তিনি পত্রপাঠ সমস্ত জিনিষ সরবরাহ করিলেন। যে দিন সন্ধ্যার সময় চা ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যগুলি হরিহরপুরে আসিয়া পৌছিল, তারাপদ সেই দিনেই শয়নাগারে স্বহস্তে চা প্রস্তুত করিয়া শশীমুখীকে খাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত হইল না। সে বলিল "আমি বাপের জন্মে চা কখনও স্পর্শ করি নাই। তুমি আজ চা খাইতে বলিতেছ, কাল মদ খাইতে বলিবে।" তারাপদ বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন ; তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, চা মাদক দ্রব্য নহে, আমাদেরই দেশের এক প্রকার গাছের পাতা মাত্র, রমেশের স্ত্রী ও কলিকাতার অনেক ভদ্র মহিলা চা পান করেন ; কিন্তু কিছুতেই কোনও ফল দর্শিল না। পরিশেষে তারাপদ শশীমুখীকে পিতৃদেবের কঠোর প্রতিজ্ঞার কথা জানাইয়া বলিলেন চা পানই ঘুম সজাগ করিবার একমাত্র উপায়! পুত্রবৎসলা তখন গত্যন্তর না দেখিয়া চা পান করিতে স্বীকৃত হইল।

মাসখানেক পরে তারাপদ রঙ্গপুর জেলায় স্থায়ী মুনসেফী পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর ঘুম এখন চা-পানের গুণে বেশ সজাগ হইয়াছে, সুতরাং শ্যামাধন বাবু খোকাকে তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে দিলেন। রঙ্গপুরের ভূমি নাবাল ও বায়ু বাষ্প সিক্ত বলিয়া তথাকার সকল লোকেই স্বাস্থ্যের জন্য চা-পান করিয়া থাকে ; সুতরাং রঙ্গপুরে গিয়া তারাপদ বাবুর চা-পানের অভ্যাস বেশ বদ্ধমূল হইল। আমরা যে সময়ের কথা লিখিলাম তাহার পর অনেক বৎসর অতীত হইয়াছে এবং অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। "খোকা" এখন আর খোকা নাই—সে ইতিমধ্যে অনেকগুলি ইংরাজী পুস্তক পড়িয়া ফেলিয়াছে। খোকার মা গুরুর নিকট মন্ত্র লওয়া অবধি চা একেবারে বর্জ্জন করিয়াছে ; তিনি আরও দুই তিনটী সন্তান

প্রসব করাতে তাঁহার ঘুম বেশ সজাগ হইয়াছে। তারাপদ বাবুর পদোন্নতি হইয়াছে, এবং তিনি রঙ্গপুর হইতে বদ্‌লি হইয়া বঙ্গের অনেক জেলায় ঘুরিয়াছেন, কিন্তু তিনি এখন একজন পাকা চা-খোর, এবং যেখানেই যান এজলাসেও চা-পান করিতে ছাড়েন না। তিনি বলেন চা না খাইলে রায় ঠিক হয় না। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে "স্বাস্থ্য-সমাচারের" গত সংখ্যায় চা-পানের বিরুদ্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পাঠ করিয়া তিনি এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রবন্ধ লেখক কখনও চা-পান করেন নাই বলিয়া এরূপ বে-ঠিক "রায়" দিয়াছেন, কিন্তু উহা "আপীলে টেঁকিবে না।

শাস্ত্রীয় স্বাস্থ্য-কথা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবতারণ বিদ্যারত্ন লিখিত-

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সাধারণ বিধি।

নীরোগ জনের জন্য আহার বিহার।
বর্ণিত হইল অগ্রে যাহা শাস্ত্র সার॥
অসুস্থ জনের যাহা নাশে রোগচয়।
শাস্ত্রমতে সেই দ্রব্য তার হিত হয়॥
দেশ আর দেহ ভেদে পথ্য বিচারিয়া।
ব্যবহার করিবেক সুস্থির হইয়া॥
পরিণামে রোগকর প্রথমে মধুর।
এইরূপ ভোজনাদি ত্যজিবে চতুর॥
প্রত্যহ অভ্যস্ত যেবা কুপথ্য সেবনে।
বিচারিয়া ক্রমে তাহা ত্যজিবে যতনে॥
অবৈধ আহার আর অবৈধ বিহার।
ক্রমশঃ ঘটায় দেহে বিবিধ বিকার॥
পিতা মাতা আর গুরু শিক্ষক সকল।
অবোধে শিখালে ধ্রুব পাইবে সুফল॥
ভুক্ত দ্রব্য রীতিমত জীর্ণ না হইলে।
কখন না খাইবেক প্রলোভের বলে॥
পথ পর্য্যটন হাস্য ব্যায়াম ভাষণ।
দারাভিগমন আর রাত্রি জাগরণ॥
আবশ্যক হইলেও বুদ্ধিমান্ নর।
পরিমিত করিবেক হইয়া তৎপর॥
অধিক মাত্রায় যেবা করয়ে নিয়ত।
অল্পকালে দেহ তার হয় রোগযুত

চরক।

ব্যায়াম প্রশংসা।

পরিমিত ব্যায়ামেতে দেহ লঘু হয়।
আর ক্রমে ক্রমে ধ্রুব জড়তা নাশয়॥
যে পর্য্যন্ত নাহি হয় পরিশ্রম বোধ।
সে পর্য্যন্ত করিবেক ব্যায়াম সুবোধ॥
ক্রমে জন্মে বহুতর শরীরের বল।
তাই নিত্য করে বিজ্ঞ হইয়া অচল॥
যৌবন সুস্থির রহে অঙ্গ দৃঢ় হয়।
কায়াগ্নি বর্দ্ধিত হয় জানিবে নিশ্চয়॥
অতি শীঘ্র হয় ভুক্ত দ্রব্যের পচন।
তাহাতে স্বাস্থ্যের ঘটে কল্যাণ সাধন॥

চরক।

অতিরিক্ত ব্যায়ামের দোষ।

অতিরিক্ত ব্যায়ামেতে দেহ জীর্ণ হয়।
মনের জন্মায় গ্লানি হয় রোগোদয়॥
ধাতুক্ষয়, রক্তপিত্ত শ্বাস কাস জ্বর।
বমি তৃষ্ণা ঘটে দেহে অতি কষ্টকর॥

চরক।

বর্জ্জনীয় বেগ কথন।

করিলেও সুভোজন আর সুবিহার।
জন্মে রোগ বেগ রোধে বিবিধ প্রকার॥
তাই এই ত্রয়োদশ বেগের ধারণ।
ধ্রুব না করিবে স্বাস্থ্য-প্রিয় নরগণ॥
মল, মূত্র, শুক্র, বায়ু, ক্ষবথু, বমন।
উদ্গার, জৃম্ভন, ক্ষুধা, নেত্রাম্বু, শয়ন॥
পিপাসা, শ্রমজ-দীর্ঘশ্বাস ইহাদের।
বেগ ধারণেতে হয় রোগ মানবের॥
এজন্য আলস্য ত্যজি যথাকালে সবে।
উক্ত ত্রয়োদশ বেগ যতনে ত্যজিবে॥
শরীর সক্রিয় বহু-বিধ যন্ত্রালয়।
অনুচিত বেগ রোধে অল্পে নষ্ট হয়॥

চরক।

ধারণীয় বেগ কথন।

ধরিলে যাহার বেগ নর সুখী হয়।
ক্রমে ক্রমে শুন সবে তার পরিচয়॥
মানস বাচিক আর কায়িক সাহস।
কলুষিত করে নিত্য নরের মানস॥
পরে কলুষিত মন পাপ প্রতি ধায়।
তাহার কারণে লোক শান্তি নাহি পায়॥
ক্রমে পাপে দেহক্ষয় হয় ধর্ম্ম-ক্ষতি।
নিরন্তর রোগ ভোগ নরকেতে গতি॥
এজন্য করিবে সদা জ্ঞানী নরগণ।
ত্রিবিধ এ সাহসের বেগ বিধারণ॥
ইহাদের বেগ হয় অতি ভয়ঙ্কর।
না ধরিলে পরিণামে হয় হানিকর॥
অবিরত অর্থনাশ মনস্তাপ ভয়।
লোকনিন্দা অপমান আর কত হয়॥
সম্ভ্রম বিনষ্ট হয় নাম কলঙ্কিত।
এজন্য এ সব বেগ ধারণ উচিত॥

পরধনে স্পৃহা লোভ শোক ক্রোধ ভয়।
নির্লজ্জতা পরনিন্দে অত্যাসক্তি রয়॥
মান দ্বেষ ঈর্ষা এই সাহস মানস।
অতঃপর শুন সবে বাচিক সাহস॥
কর্কশ কথন আর বহু সম্ভাষণ।
পরের অনিষ্ট কথা মিথ্যা উচ্চারণ॥
অযোগ্য কথন ইহা সাহস বাচিক।
মহা হানিকর লোকে হয় স্বাভাবিক॥
কায়িক সাহস পরদ্রব্যের হরণ।
পর পীড়া আর পরদারায় রমণ॥
দেহ দ্বারা পরহানি যত কিছু হয়।
কায়িক সাহস তাহা জানিবে নিশ্চয়॥
অধর্ম্মে পরস্ব আর আয়ত্তী-করণ।
পাপকার্য্য হয় ইহা পাতকী ভূষণ॥
অবশ্য ইহার বেগ ধরিবেক নর।
না ধরিলে হয় পাপ অতি গুরুতর॥

চরক।

সদাচার।

প্রত্যূষে উঠিয়া মল মূত্র ত্যাগ আর।
শুদ্ধ জলে হস্তপদ ধৌত বার বার॥
দন্ত জিহ্বা বদনের শুদ্ধি সম্পাদন।
রাত্রিবাস ত্যাগ দেহে তৈল বিমর্দ্দন॥
স্বচ্ছ শুচি জলে স্নান দেহের সংস্কার।
জলাপনয়ন শুদ্ধ বস্ত্র ব্যবহার॥
মাল্যাদি চন্দন আর রত্নাদি ধারণ।
দেব ঋষি পিতৃ কৃত্য দান বিতরণ॥
অতিথি সৎকার পিতৃ মাতৃপদে নতি।
পূজ্য জনে ভক্তি সদা আর স্তুতি নতি॥
আশ্রিত জনে সদা সাধু ব্যবহার।
সমাগত অভ্যাগত আত্মীয় সৎকার॥
সর্ব্বদা প্রফুল্ল চিত্ত প্রসন্ন বদন।
সকলের প্রতি ধীর বিনয় বচন॥
সম্বন্ধে ও শাস্ত্রমতে যেবা পূজ্য হয়।
তাহার সম্মান পূজা কর্ত্তব্য নিশ্চয়॥
অবশ্য কর্ত্তব্য দ্বিজ আচার্য্য সেবন।
ধনী মানী আর জ্ঞানী নৃপতি পূজন॥
পঞ্চম দিবস প্রাতে ক্ষৌর কর্ম্মে মতি।
বিপন্নের সমুদ্ধারে যত্ন যথাশক্তি॥
সুবিমল নিত্য ধৌত বস্ত্রাদি ধারণ।
পরিমিত প্রিয় হিত সত্য সম্ভাষণ॥
অগ্রে পূজ্যজন পদে প্রণাম উচিত।
পরে ধীরে সদালাপ বিধি সুবিহিত॥
ধর্ম্ম পথে থাকি সদা অর্থাদি অর্জ্জন।
পরে প্রয়োজন মতে তার নিয়োজন॥
জীবে দয়া পূজ্যে ভক্তি ক্রুদ্ধে অনুনয়।
মিত্রে সমাদর আর সজ্জনে প্রণয়॥
পাপে ঘৃণা ধর্ম্মে মতি শাস্ত্রে অনুরাগ।
বিবাদে বিরাগ আর কপটতা ত্যাগ॥



ম্যালেরিয়া অভিযান

(মশকবংশ ধ্বংসের বিরাট আয়োজন।)

বিবিধ সংগ্রহ।

চিত্রপরিচয়—স্বাস্থ্য-সমাচারের পূজার সংখ্যায় প্রকাশের জন্য প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত জ্যোতীন্দ্র কুমার সেন মহাশয় দুইখানি রহস্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

১ম চিত্রে—ম্যালেরিয়া অভিযান—মশকবংশ ধ্বংসের জন্য উৎসাহী জনসাধারণ নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন। বংশ দণ্ড, মুদ্গর, কেরোসিন, গন্ধক কিছুই বাদ যাইতেছে না, কিন্তু এত পরিশ্রম স্বত্ত্বেও ক্রমশঃই মশকের মাত্রা বাড়িয়া উঠিতেছে।

২য় চিত্রে—বিংশ শতাব্দীর বীজাণু ভীতি—এক্ষণে মনুষ্য হিংস্র জন্তুকে গ্রাহ্য মধ্যেই আনে না। লোকে সখ করিয়া শীকার করিতে যায়। শীকারের দ্বারা পাছে বন একেবারে পশু শূন্য হয়, সেজন্য গবর্ণমেণ্টকে নিয়ম করিয়া দিতে হইয়াছে যে, কোন সময় কোন জন্তু শীকার করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে সংক্রামক রোগের বীজাণু সমূহই মনুষ্য সমাজে ভীষণ ভীতি উৎপাদন করিতেছে। প্রতি বৎসর সংক্রামক রোগের আক্রমণে পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক প্রাণ হারাইতেছে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এই সকল রোগ বীজাণুর আক্রমণ হইতে মনুষ্যসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবনে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।

বন্য জন্তুর আক্রমণেও লোকে প্রাণ হারায়। কিন্তু তাহা অতি অল্প, সংক্রামক রোগ আক্রমণের সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না। এই সকল কারণে বিশালকায় হিংস্র বন্য জন্তু অপেক্ষা, চক্ষুর অগোচর রোগ বীজাণুই অতি ভীষণ ও মনুষ্যের বিশেষ ভয়ের কারণ।

তিব্বতবাসীর চা পান—পৃথিবীর মধ্যে তিব্বতবাসীরাই সর্ব্বাপেক্ষা অপরিমিত চা পান করে। সে দেশে বৎসরে মোটের উপর ১৯,০০০,০০০ পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হয়। লোক সংখ্যার অনুপাতে গড়ে প্রত্যেকের ভাগে ১৩ পাউণ্ড করিয়া পড়ে। অত্যধিক চা পানের জন্য তাহাদের ক্ষুধা একেবারে কমিয়া যায়। অনেকে নিয়মিত আহার করে না, অধিকাংশ সময়ই অভুক্ত অবস্থায় থাকে। তিব্বতবাসীরা ব্যবহার করে তাহাও অতি নিকৃষ্ট জাতীয়। এই চা চাপ বাঁধা ইষ্টকের আকৃতিতে চীন দেশ হইতে আসে। ইহাতে শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ চা থাকে। বাকি অন্য পাতা ও জঞ্জালে পূর্ণ। এই চায়ের পাউণ্ড ৵১৫ পয়সারও কম। তিব্বতে অনেক সময় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে চায়ের ইষ্টক ব্যবহৃত হয়।

কলিকাতায় যক্ষ্মা—১৯১১ সালে কলিকাতার হাঁসপাতাল সমূহে ৮০৮ যক্ষ্মারোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল। ৬৭২ জন ভারতবাসী রোগীর মধ্যে ৩৩৬ (অর্দ্ধেক) এবং বাকি ১৩৬ জন ইউরোপীয় রোগীর মধ্যে মাত্র ৩২ জন পতিত হইয়াছিল। বঙ্গের হাঁসপাতাল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল হ্যারিসের মতে দারিদ্রতাই ভারতবাসী রোগীর মৃত্যুর হার বৃদ্ধির প্রধান কারণ। খাদ্যের অভাব, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, অস্বাস্থ্যকর কার্য্য এবং রোগের প্রারম্ভকাল অগ্রাহ্য করাতেই ভারতবাসীর মৃত্যু সংখ্যা অধিক হয়। বিধিমতে চিকিৎসিত হওয়ার অভাবে, দেশীয় রোগীর রোগের সহিত যুঝিবার ক্ষমতা হ্রাস পায়।

মশা ও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ডাক্তার ফ্রাই সাহেবের মতামত—

মশা যাহাতে পুষ্করিণী ও কূপের জল অশুদ্ধ করিতে না পারে তদ্বিষয়ে মেজর ফ্রাই সাহেব একটী প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নিম্ন বাঙ্গালা দেশে মশা জন্মাইবার যথেষ্ট স্থান আছে। একারণে আমরা এদেশে যে পরিমাণে মশা দেখিতে পাই তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনও কারণ নাই। এদেশে কের সাধারণ শত্রু বর্ত্তমান না থাকিলে কখনই ইহা মনুষ্য বাসোপযোগী

হইত না। মৎস্য মশকের শত্রু। এহেতু রাস্তা কিম্বা রেলওয়ে বাঁধ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত নিখাত জলাশয়ের জল অধিক পরিমাণে অপকারী হইতে পারে না। মশকের অন্যান্য এরূপ প্রবল শত্রু আছে যে, আগাছা সমূহের আশ্রয় না পাইলে কখনই ইহাদিগের অস্তিত্ব থাকিত না। ডাক্তার ফ্রাই সাহেব অনেক জলাশয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে যদ্যপি কোন জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে কোনরূপ ঘাস, ঝোপ, কর্দ্দম ইত্যাদি না থাকে তাহা হইলে ইহাতে কোন ক্রমে মশক জন্মিতে পারে না। মোটের উপর ডাক্তার ফ্রাই সাহেবের মতে পুষ্করিণীর ও কূপের জল অপকারী হইলেও ইহার চতুষ্পার্শ্ব পরিষ্কার ও আগাছা সমূহ নির্ম্মূল করাইলে জল বিশুদ্ধ হইতে পারে। রেলওয়ে কোম্পানি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এবং পল্লীবাসিগণ মৃত্তিকা লইবার জন্য যে সকল কূপ খনন করেন তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন। ডাক্তার ফ্রাই সাহেবের মতে এই সকল কূপ যত্নসহকারে খনন করিলে ম্যালেরিয়া উৎপত্তির কারণ অনেকটা নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু মৎস্য থাকিতে পারে এরূপভাবে সুবৃহৎ ও বৃহৎ করিয়া খনন করিলে ও যাহাতে ইহাদিগের জল পরিষ্কার এবং বিশুদ্ধ থাকিতে পারে তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইলে অধিকতর উত্তম হয়। রেলওয়ে কোম্পানি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও পল্লীবাসিগণ যদি আবশ্যক মত স্থানে স্থানে এক একটী কূপ খনন না করিয়া একেবারে কতকগুলি এরূপভাবে খনন করেন যে ইহাদের জল একটী সুবৃহৎ গভীর কূপের ভিতর গিয়া পড়ে তাহা হইলে মশক জন্মাইবার একটী বিশেষ স্থান একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর বীজাণু ভীতি।



কি ভীষণ প্রাণী



বন্য জন্তুকে আর কে ভয় করে।

সমালোচনা।

সংক্ষিপ্ত গার্হস্থ্য চিকিৎসা বা আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ সংগ্রহ :—কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন বিদ্যাভূষণ, এম, এ, এল, এম, এস, প্রণীত।

গণনাথ বাবু কলিকাতা সহরের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। ইনি পাশ্চাত্য ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ইঁহার লিখিত পুস্তিকা খানি যে বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে এ কথা বলাই বাহুল্য।

এই রোগ প্রপীড়িত বঙ্গদেশের অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র, এজন্য ব্যয়সাধ্য ঔষধাদি ব্যবহার করা অনেকের পক্ষে অসম্ভব। বহুমূল্য বিলাতী ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্য হয় নাই, এরূপ অনেক রোগ দুই এক পয়সা দামের গাছ গাছড়াতে সম্পূর্ণরূপে সারিতে দেখা গিয়াছে। সেকালের বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা এরূপ অনেক মুষ্টিযোগ জানিতেন। আমাদের দেশে যাহাতে পুনরায় এই সকল মুষ্টিযোগের প্রচলন হয় গণনাথবাবু সেই উদ্দেশ্যেই এই পুস্তিকাখানি লিখিয়াছেন। রোগ সম্বন্ধে সামান্য পরিচয় না থাকিলে ঔষধ দেওয়া চলে না এজন্য সাধারণ রোগের লক্ষণাদিও সংক্ষিপ্তভাবে এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাধারণের সুবিধার জন্য রোগীচর্য্যা, রোগ প্রতিষেধ, পথ্য প্রস্তুত বিধি, বিষ চিকিৎসা ও আকস্মিক দৈবদুর্ঘটনার প্রতীকারও বর্ণিত হইয়াছে।

কোনরূপ অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক কথা লিখিয়া পুস্তিকার কলেবর পুষ্ট করা হয় নাই।

সকল গৃহস্থের এরূপ একখানি পুস্তিকা রাখা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষিত ডাক্তারেরও ইহাতে অনেক নূতন জানিবার বিষয় আছে।

এই পুস্তিকার সাহায্যে গৃহস্থেরা অনায়াসে সাধারণ রোগ সকলের ও আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা বিনা ঔষধ বা চিকিৎসকের সাহায্যে করিতে পারিবেন। এই পুস্তিকাখানির যত অধিক প্রচার হইবে ততই এই রোগ বহুল দেশের মঙ্গল হইবে। এরূপ একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তিকার মূল্য কেবলমাত্র আট আনা ধার্য্য করা হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—"বিশ্বনাথ নিকেতন" আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়, ৬৫ নং বিডন ষ্ট্রীট ও "স্বাস্থ্যসমাচার" কার্য্যালয়, ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্"।

প্রথম বর্ষ। } অগ্রহায়ণ ১৩১৭ সাল { অষ্টম সংখ্যা।

অন্ত্র ধৌতি।

অন্ত্র কাহাকে বলে

অন্ত্রধৌতি কি বুঝাইতে হইলে অগ্রে অন্ত্র কাহাকে বলে বুঝান কর্ত্তব্য। খাদ্য দ্রব্য মুখবিবরে প্রবেশ করিবার পর কোন পথে চালিত হইয়া বিষ্ঠারূপে পরিত্যক্ত হয় পরপৃষ্ঠার চিত্রে তাহা দেখান হইয়াছে। খাদ্য দ্রব্য মুখবিবর হইতে গলনালী দ্বারা পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। পাকস্থলীতে কিয়ৎকাল জীর্ণ হইয়া খাদ্য দ্রব্য অন্ত্র মধ্যে উপস্থিত হয়। মনুষ্য অন্ত্র প্রায় ২৫ ফুট লম্বা। অন্ত্রের প্রথম ভাগের নাম ক্ষুদ্রান্ত্র (Small Intestines) ইহা প্রায় অঙ্গুলি প্রমাণ স্থূল এবং দৈর্ঘে ২০ ফুট। ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে অভিহিত হয় যথা—ডুয়োডিনম্ (Duodenum), যেযুনাম্ (Jejunum) এবং ইলেয়ম্ (Ileum)। অন্ত্রের শেষ ভাগের নাম বৃহদন্ত্র (Large Intestine) ইহা প্রথম ভাগ অপেক্ষা অধিকতর স্থূল এবং দৈর্ঘে ৫ ফুট। বৃহদন্ত্রের ৩টী অংশ আছে যথা—(১) এসেণ্ডিং কোলন্ (Ascending Colon (২) ট্রান্সভার্স কোলন্ (Transverse Colon) এবং (৩) ডিসেণ্ডিং কোলন্ (Descending Colon)। তৃতীয়টী মল নালীতে (Rectum) যাইয়া মিলিত হইয়াছে। মল নালীর শেষ ভাগেই গুহদ্বার (Anus) অবস্থিত।

ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগ স্থলে সিকম্ (Cæcum) অবস্থিত। সিকম্ (Cæcum)এর পরিধি অন্ত্রদ্বয়ের অপেক্ষা অনেক বড়। সিকম্ (Cæcum) এর সন্নিকটেই ভারমিফরম এপেনডিক্স। এই Vermiform appendix এর প্রদাহ হইলেই appendicitis রোগ হইয়া থাকে। খাদ্য দ্রব্যের পচন ক্রিয়া প্রধানতঃ পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রেই সম্পন্ন হয়। বৃহদন্ত্র তরল ভুক্ত দ্রব্যের জলীয় অংশ শোষণ করিয়া তাহাকে কঠিন মলে পরিণত করে। বৃহদন্ত্র সদাসর্ব্বদা মলে পূর্ণ থাকে বলিয়া ইহাতে বীজাণুর প্রাদুর্ভাব অধিক হয়।

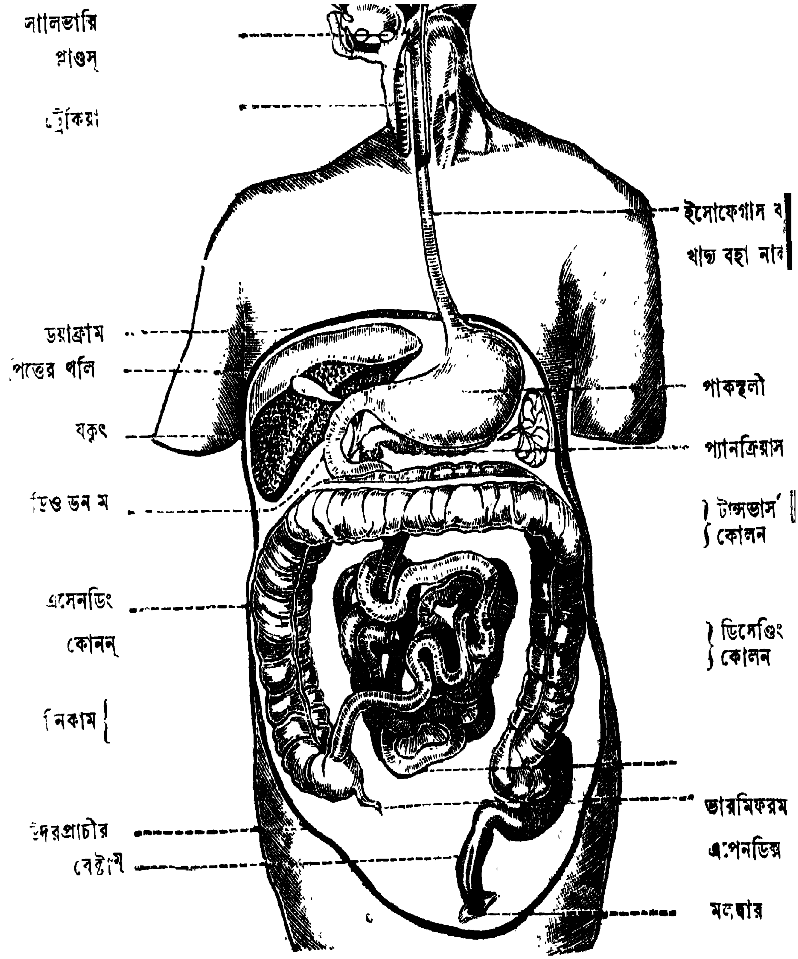
বৃহদন্ত্রের অভ্যন্তর মসৃণ নহে। ইহাতে অনেক খাঁজ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সামান্য কারণেই এই সকল খাঁজের মধ্যে মল আট্‌কাইয়া থাকিতে পারে। অন্ত্রধৌতিতে কেবল মাত্র বৃহদন্ত্রই পরিষ্কৃত হয়।

বৃহদন্ত্রকে শরীরের নর্দ্দমা বলা যাইতে পারে।

বড় বড় সহরে ময়লা ও অপরিষ্কৃত জল নির্গত হইয়া যাইবার জন্য পয়োনালীর যেরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়, বৃহদন্ত্রকে সেইরূপ আমাদের শরীরের নর্দ্দমা বলা যাইতে পারে। খাদ্যের উদ্বৃত্ত অংশ ও শরীরের পরিত্যক্ত অনাবশ্যকীয় কতকগুলি দ্রব্য এই পয়োনালীর সাহায্যে শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। বৃহদন্ত্রে মলের জলীয় ভাগ শোষিত হইয়া মল কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

বৃহদন্ত্র ব্যতীরেকেও প্রাণ ধারণ সম্ভব।

মল নির্গম ব্যতীত বৃহদন্ত্রের দ্বারা শরীরের অপর কোন অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য সাধিত হয় বলিয়া বোধ হয় না। মেটসিনিকফ, আরবুথনট্‌লেন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে বৃহদন্ত্রের একেবারেই আবশ্যক নাই। আরবুথনটলেন প্রভৃতি শাস্ত্রবিদ্ চিকিৎসকগণ অধুনা অনেক রোগে বৃহদন্ত্র কাটিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন; এরূপ রোগীর জীবনধারণের পক্ষে কোনই অসুবিধা দেখা যায় নাই। এরূপ স্থলে ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে মল একেবারেই বাহিরে নির্গত হইয়া যায়। কোন কোন জন্তুর বৃহদন্ত্র একেবারেই নাই।


লালগ্রন্থি
প্লাণ্ডস্
ট্রেকিয়া
ডয়াফ্রাম
পিত্তের থলি
যকৃৎ
ডিওডনম
এসেনডিং
কোলন্
নিকাম
উদরপ্রাচীর
বেষ্টনী
ইসোফেগাস ব
খাদ্য বহা নাব
পাকস্থলী
প্যানক্রিয়াস
টান্সভার্স
কোলন
ডিসেণ্ডিং
কোলন
ভারমিফরম
এপেনডিক্স
মলদ্বার

পরিপাক যন্ত্র।

বৃহদন্ত্রের গঠন শরীরের মল নির্গমনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। ইহা লম্বে ৫ ফুট। ইহা সরলভাবে না যাইয়া দুই স্থানে বক্রভাবে গিয়াছে। এই দুই স্থানেই ময়লা জমিবার সম্ভাবনা অধিক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইহা খাঁজে পরিপূর্ণ। নর্দ্দমা সরল ও মসৃণ না হওয়ায় তাহাতে যেরূপ ময়লা জমে এবং তাহা ধৌত করা আবশ্যক হয় সেইরূপ অসরল খাঁজপূর্ণ বৃহদন্ত্র মধ্যে সহজেই মল জমিয়া থাকে ও তাহার ধৌতির আবশ্যক হয়।

বৃহদন্ত্র মল-নিসঃরণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে

নর্দ্দমা অপরিষ্কৃত থাকিলে যেরূপ বাটী দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর হয় বৃহদন্ত্রও অপরিষ্কৃত থাকিলে সেইরূপ শরীরের স্বাস্থ্যের হানি ঘটে। বৃহদন্ত্রের খাঁজের মধ্যে অনেক সময় বৎসরাধিক কাল মল আট্‌কাইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। এরূপ আবদ্ধ মল হইতে মাথা ধরা, পেটের অসুখ হইতে আরম্ভ করিয়া Appendicitis পর্য্যন্ত সকল প্রকার অসুখই হইতে পারে। মল জমিলে খাঁজের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। খাঁজ মলে পরিপূর্ণ থাকিলেও প্রথম প্রথম মল ত্যাগের কোন অসুবিধা হয় না কারণ বৃহদন্ত্রের অভ্যন্তরের পরিধি সমানই থাকে।

অন্ত্রধৌতির আবশ্যকতা:—আমরা স্নান, দন্তমঞ্জন, মুখধাবন প্রভৃতি দ্বারা শরীরের বহির্ভাগ সদা সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিতে চেষ্টা করি। কিন্তু শরীরাভ্যন্তরে ময়লা জমিলেও ঐরূপ পরিষ্কার করিবার আবশ্যক হয়। বৃহদন্ত্রের গঠনের বিশেষত্ব হেতু, সামান্য কারণেই ইহাতে মল আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে। এই জন্য ইহার প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা কর্ত্তব্য। দুর্গন্ধময় নর্দ্দমার নিকট বাস করিলে স্বাস্থ্যের হানি ঘটে একথা সকলেরই জানা আছে। তখন আমাদের নিজ নিজ শরীরস্থ নর্দ্দমা মলপূর্ণ থাকিলে যে স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি হইতে পারে এ কথা বলাই বাহুল্য। এই জন্যই আমাদের বৃহদন্ত্র ময়লা পরিপূর্ণ হইলে তাহা ধৌত করা আবশ্যক। এই প্রক্রিয়ার নাম অন্ত্রধৌতি। বিখ্যাত অধ্যাপক Metchinikoff এর মতে বার্দ্ধক্য আনয়নকারী বীজাণু সমূহ বৃহদন্ত্র মধ্যে বাস করে। অন্ত্রধৌতিক্‌ দ্বারা ইহাদিগকে বাহির করিয়া দিলে মনুষ্য দীর্ঘজীবী হইতে পারে। বোধ হয় এই কারণেই আমাদের দেশে যোগিগণ অন্ত্রধৌতি করিয়া থাকেন।

অন্ত্রমধ্যে মল আবদ্ধ থাকিলে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় :—অন্ত্রে মল পরিপূর্ণ থাকিলে ক্ষুধামান্দ্য, দুর্ব্বলতা এবং কালে রক্তাল্পতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। জিহ্বা অপরিষ্কার এবং মুখে দুর্গন্ধ হয়। চক্ষের জ্যোতি কমিয়া যায় এবং গাত্রের বর্ণ ফ্যাকাসে হয়। অনিদ্রা, মাথা ধরা, বুক ধড়ফড় করা এবং শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট প্রায়ই লক্ষিত হইয়া থাকে। ছোট ছেলেদের তড়কা হইতে পারে। পেট ফাঁপা অজীর্ণ ও মধ্যে মধ্যে পেটের অসুখ হইতে দেখা যায়; অনেকের অন্ত্রমধ্যে মল আবদ্ধ থাকিলেও প্রত্যহ নিয়ম মত দাস্ত হইতে দেখা যায়; ইহার কারণ এই যে মল বৃহদন্ত্রের খাঁজের মধ্যে আট্‌কাইয়া থাকে এবং অন্ত্রবিবরের পরিধির কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

অন্ত্রধৌতি কিরূপে করিতে হয়।

শুনা যায় যোগিগণ জলমধ্যে শরীরের অধোভাগ নিমজ্জিত করিয়া অন্ত্রমধ্যে জল টানিয়া লইতে পারেন এবং ঐ জল পুনরায় পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্রধৌতি করেন। সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা অসম্ভব। এই হেতু অন্ত্রধৌতির জন্য কিছু সরঞ্জামের আবশ্যক। ৩ পাইণ্ট জল ধরে এরূপ একটী ডুস্‌ক্যান, ৩।৪ ফুট লম্বা একটী রবারের নল, জলের প্রবাহ বন্ধ করিবার ও খুলিবার জন্য একটী ষ্টপ্‌কক্ ও একটী ১২ নং ক্যাথিটার হইলেই সরঞ্জাম সম্পূর্ণ হইল। রবারের নল ডুস্‌ক্যানের সহিত সংযুক্ত থাকিবে এবং ক্যাথিটার ও রবারের নলের সংযোগস্থলে ষ্টপ্‌কক্ দেওয়া আবশ্যক। ডুস্‌ক্যানের পরিবর্ত্তে বড় বোতল ব্যবহার করা যাইতে পারে। এরূপ স্থলে নল ও ক্যাথিটার জল পূর্ণ করিয়া পরে নলের এক প্রান্ত বোতলের জলের মধ্যে দেওয়া উচিত; কিংবা বোতলের মধ্যে নল দিয়া পিচকারির সাহায্যে একবার জল টানিয়া লইলে পরে আপনিই জল আসিতে থাকিবে।

ডুস্‌ক্যানে জল ভরিয়া প্রথমে ষ্টপ্‌কক্ খুলিয়া কিছু জল বাহির করিয়া দিবে। এরূপে নলস্থিত সমস্ত বায়ু নির্গত হইয়া যাইবে। ডুস্‌ক্যান রোগীর বিছানা হইতে কিছু উচ্চে থাকিবে। ক্যাথিটারে উত্তমরূপে ভ্যাসেলিন বা নারিকেল তৈল মাখাইবে। রোগী পা গুটাইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবে এবং রোগীর নিতম্বদেশ বালিস দিয়া ঈষৎ উচ্চ করিবে। পরে ক্যাথিটার মলদ্বারে এক ইঞ্চি বা দুই ইঞ্চি

পরিমাণ প্রবেশ করাইয়া ষ্টপ্‌কক্ অল্প খুলিয়া দিবে। অন্ত্রমধ্যে জল প্রবেশ করিতে থাকিলে ক্যাথিটার অল্পে অল্পে ভিতরে প্রবেশ করাইবে। এরূপে বিনা ক্লেশে সমস্ত ক্যাথিটারই অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করান যাইবে। ষ্টপ্‌কক্ সামান্য মাত্র খুলিয়া ধীরে ধীরে জল যাইতে দিবে। ডুস্‌ক্যান নিচু করিয়াও জলের বেগ কমান যাইতে পারে। জলের বেগ অধিক হইলে রোগী কেবলমাত্র সামান্য পরিমাণ জল ধারণে সক্ষম হইবে এবং অন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ধৌত করা হইবে না। এক পাইণ্ট জল যাইবার জন্য ১০ মিনিট সময় দেওয়া উচিত। জল যাইবার সময় রোগী ধীরে ধীরে গভীর শ্বাস লইবে। রোগীর পেট মোচড় দিলে বা জল ত্যাগের জন্য বেগ উপস্থিত হইলে কিছুক্ষণের জন্য জলপ্রবাহ বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য।

রোগী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জল গ্রহণ করিলে ষ্টপ্‌কক্ বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে ক্যাথিটার টানিয়া লইবে। এখন বার কতক পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া রোগী উঠিতে পারে। বেগ আসিলে পর রোগী পায়খানায় যাইয়া জলত্যাগ করিয়া আসিতে পারে।

সাধারণতঃ ১॥ হইতে ৩ পাইণ্ট পর্য্যন্ত জল দেওয়া হইয়া থাকে। কেহ কেহ ৬ পাইণ্ট পর্য্যন্ত জল লইতে পারেন। সময় সময় দেখা যায় যে সমস্ত জল নির্গত হয় না, এরূপ স্থলে ভীত হইবার কোনই কারণ নাই। জল থাকিয়া যাইলে শরীরের উপকার ব্যতীত অপকার হয় না। পেট আস্তে আস্তে টিপিয়া দিলে জল নির্গমনের সুবিধা হয়। গর্ভিণী ও শিশুদিগের নিরাপদে অন্ত্রধৌতি করা যাইতে পারে।

অন্ত্র ধৌতির উদ্দেশ্য

অন্ত্রধৌতির উদ্দেশ্য এই যে জল সিকাম্ পর্য্যন্ত পৌছিয়া খাঁজের মধ্যে যে সকল ময়লা আটকাইয়া থাকে তাহাকে দ্রবীভূত করিয়া বহিষ্কৃত করিবে। অন্ত্র ধৌতির পর কিছু জল অন্ত্রমধ্যে থাকিয়া যায়। এই জল অন্ত্র হইতে শোষিত হইয়া মূত্র রূপে নির্গত হইয়া যায়। এইরূপ ধৌতি ক্রিয়া শরীর হইতে অনেক বিষাক্ত পদার্থ নির্গমনের সহায়তা করিয়া থাকে।

শরীরের উপর অন্ত্রধৌতির ক্রিয়া—সাধারণ এনিমা বা পিচকারী লইবার মত অন্ত্রধৌতি করা উচিত নহে। এনিমা বা পিচকারী দ্বারা

কেবল মলনালী (Rectum) স্ফীত হয় এবং জলনির্গমনের সহিত তথাকার মল বাহির হইয়া আইসে। কিন্তু অন্ত্রধৌতি দ্বারা সমস্ত বৃহদন্ত্র ধীরে ধীরে জল দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। ইহাতে অন্ত্রের খাঁজ সকল সরল হইয়া যায় এবং তন্মধ্যস্থিত চট্‌চটে মল, আম ও অন্যান্য পদার্থ সকল দ্রবীভূত হয়। যে সকল বিষাক্ত পদার্থ ও জীবাণু বিদ্যমান থাকে তাহা ধুইয়া যায় এবং কৃমিকীট ও তাহাদের ডিম্ব সকল স্থানচ্যুত হইয়া জলের মধ্যে আসিয়া পড়ে।

এই অন্ত্রধৌতি ক্রিয়ার দ্বারা আমাদের পাকাশয় ও বস্তি গহ্বরস্থ (Pelvic) যন্ত্র সমূহের স্বেদের কার্য্য হয়। হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কার্য্য উত্তেজিত হয়, রক্তস্থিত বিষ সকল দূরীভূত হয় এবং চর্ম্মের কার্য্য সম্যক্‌রূপে সাধিত হয়। এই জল রক্তের সহিত মিলিত হইয়া মূত্রগ্রন্থিদ্বয়কে বিধৌত করে।

মোটের উপর ইহার দ্বারা ক্ষুধার উত্তেজনা হয়, পরিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের পুষ্টি সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। দেহ সুস্থ ও সবল হয়।

আমাদের শাস্ত্রে অন্ত্রধৌতির উল্লেখ—ঘেরণ্ড-সংহিতায় কথিত হইয়াছে—

১। অপানক্রূরতা তাবৎ যাবন্মূলং ন শোধয়েৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মূলশোধনমাচরেৎ ॥

১। যে পর্য্যন্ত মূলাধার শোধিত না হয় সে পর্য্যন্ত অপান বায়ুর ক্রূরতা যায় না। এজন্য অতি যত্নে মূল শোধন করিবে।

২। পীতমূলস্য দণ্ডেন মধ্যমাঙ্গুলিনাপি বা।
যত্নেন ক্ষালয়েদ্‌গুহ্যং বারিণা চ পুনঃপুনঃ ॥

২। পীতমূলের দণ্ড দ্বারা কিম্বা মধ্যম অঙ্গুলি দ্বারা অতি যত্নে জলে পুনঃপুনঃ গুহ্যদেশ প্রক্ষালন করিবে।

৩। নাশয়েৎ কোষ্ঠকাঠিন্য মামাজীর্ণং নিবারয়েৎ।
কারণং কান্তিপুষ্ট্যোশ্চ দীপয়েদ্বহ্নিমণ্ডলম্‌ ॥

৩। এইরূপ মূলশোধন আমাজীর্ণ ও কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করে। আর কান্তি ও পুষ্টিসাধন এবং অগ্নি প্রদীপ্ত করে।

৪। নাভিমগ্নজলেপায়োর্ন্যস্তস্যচোৎকটাসনে।
আকুঞ্চনং প্রসারশ্চ জলবস্তিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

৪। উৎকটাসনে (১) বসিয়া নাভিমগ্ন জলে স্থাপিত পায়ুর (মলদ্বারের) বারম্বার আকুঞ্চন ও প্রসারণকে জলবস্তি কহে।

৫। উদাবর্ত্তং প্রমেহঞ্চ ক্রূরবায়ুং নিবারয়েৎ।
ভবেৎ স্বচ্ছন্দদেহশ্চ কামদেবসমো ভবেৎ॥

৫। জলবস্তি উদাবর্ত্ত প্রমেহ ও বায়ুর বিলোমতা দূর করে জলবস্তিকারী মানব স্বচ্ছন্দ দেহ ও কামদেব তুল্য রূপবান্ হয়।

৬। বস্তিং পশ্চিমোত্তানেন চালয়িত্বা শনৈরধঃ।
অশ্বিনীমুদ্রয়া পায়ুমাকুঞ্চয়েৎ প্রসারয়েৎ॥

৬। পশ্চিমোত্তান আসনে বসিয়া ধীরভাবে বস্তি অধোদেশে চালিত করিয়া অশ্বিনীমুদ্রা (২) দ্বারা পায়ুকে আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিবে।

৭। এবমভ্যাসযোগেন কোষ্ঠদোষো ন বিদ্যতে।
বিবর্দ্ধয়েজ্জাঠরাগ্নিং আমবাতং বিনাশয়েৎ॥

৭। এইরূপ ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা কোনরূপ কোষ্ঠ দোষ থাকে না জাঠরাগ্নি বিবর্দ্ধিত এবং আমবাত বিনাশিত হয়।

সুস্থ অবস্থায় অন্ত্রধৌতি করিলে কি ফল পাওয়া যায়—অধুনাতন অধ্যাপক মেটসিনিকফ প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে বৃহদন্ত্রে বিষাক্ত জীবাণু সকল বাস করে এবং ইহাদের নিঃসৃত বিষ শরীরস্থ রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীর মধ্যে বার্দ্ধক্যজনিত পরিবর্ত্তন সকল আনয়ন করে।

---

(১) উৎকটাসন—পদাঙ্গুলির উপর ভার রাখিয়া উবু হইয়া বসা। ইহাতে পায়ের গোড়ালি মৃত্তিকা স্পর্শ করে না।

পায়ু......ের পুনঃপুনঃ আকুঞ্চন ও প্রসারণের নাম অশ্বিনী মুদ্রা।

এক্ষণে অন্ত্রধৌতি দ্বারা এই সকল জীবাণু বা তাহাদের নিঃসৃত বিষ সকল বৃহদন্ত্র হইতে পরিষ্কৃত হয় এবং যাহারা নিয়মমত অন্ত্রধৌতি করেন তাঁহারা দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন। এই জন্য যোগিগণও অন্ত্রধৌতি করিয়া দেহশুদ্ধি করেন।

সুস্থ শরীরে ৪ দিন হইতে ৮ দিন ব্যবধানে অন্ত্রধৌতি করিলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে এবং রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা একবারে কমিয়া যায়। যেমন আমরা স্নান দ্বারা বাহ্য শরীরের ময়লা পরিষ্কার করিয়া থাকি তদ্রূপ ঈষদুষ্ণ জলে অন্ত্রধৌতি দ্বারা ভিতরের চর্ম্মও পরিষ্কার করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

অন্ত্রধৌতি দ্বারা রোগ চিকিৎসা—অন্ত্রধৌতি সম্বন্ধে ডাক্তারি চিকিৎসাগ্রন্থসকলে বিশদভাবে উল্লেখ দেখা যায় না। কেবল মাত্র উদরাময় রোগে ও অন্যান্য অন্ত্র সম্বন্ধীয় রোগে ঔষধ মলদ্বার দ্বারা প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। কয়েক বৎসরের কথা পূজনীয় ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম, ডি, মহাশয় বহুমূত্র রোগে অন্ত্রধৌতির ব্যবস্থা দেন এবং মন্ত্রৌষধির ন্যায় ফল দেখান। আমি তাঁহার নিকট ইহার প্রণালী সবিশেষ শিক্ষা করিয়া নানা প্রকার রোগে এই অন্ত্রধৌতি সাহায্যে চিকিৎসা করি এবং সেই পর্য্যন্ত সুন্দর ফল পাইয়া এই চিকিৎসা প্রণালীর বিশেষ ভক্ত হইয়াছি।

কোষ্ঠবদ্ধতা—কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে অন্ত্রধৌতির দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কিছুদিন নিয়মিত রূপে অন্ত্রধৌতি করিলে কোষ্ঠবদ্ধতা আরোগ্য হইতে পারে। অনেকের ধারণা আছে নিয়মিত অন্ত্রধৌতি করিলে তাহা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং তখন অন্ত্রধৌতি না করিলে আর কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না এ ধারণা ভ্রমাত্মক। দিন কতক অন্ত্রধৌতির পর আপনিই নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে দেখা যায়।

কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে সাধারণতঃ সাবানের জল অন্ত্রধৌতির জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে শুষ্ক মল নরম হইয়া সহজেই নির্গত হয়। অনেকে সাবানের জল ব্যবহার জন্য পেটের মধ্যে বেদনা বোধ করেন এবং সেই কারণে আর অন্ত্রধৌতি করিতে চান না। এই সকল রোগীর জন্য কেবল মাত্র পরিষ্কার জল গরম করিয়া তদ্দ্বারা করাইলে কোন বেদনা অনুভূত হয় না।

সাবানের জল ব্যবহারে পেটের বেদনা হয় বলিয়া অনেক চিকিৎসকেরাও এই অন্ত্রধৌতির বিশেষ বিরোধী। তাহারা যেন বিশুদ্ধ জল দ্বারা এই প্রক্রিয়ার সাধন করেন।

পেটের পীড়া ও আমাশয় রোগে—অনেক সময় অন্ত্র মধ্যে পুরাতন মল জমিয়া পেটের পীড়া আনয়ন করে। কখনও বা খাদ্য দ্রব্য পচন দ্বারা কখনও বা দুষ্পাচ্য খাদ্য দ্রব্যের দ্বারা এই সকল পীড়া জন্মে। এই সকল রোগে অন্ত্রধৌতি মন্ত্রৌষধির ন্যায় কার্য্য করে। সাধারণতঃ বোরিক লোসন (One dram to one pint) দ্বারা অন্ত্রধৌতি করিলে সদ্য ফল পাওয়া যায়। প্রত্যহই একবার ধৌতি করা আবশ্যক। মলে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকিলে দুইবারও করা যাইতে পারে। আমাশয় রোগে বোরিক লোসন ব্যতীত কুইনাইন লোসন (20 grains to one pint) বা মেথিলিন্ ব্লু (Methylene Blue) সলিউসন (2 grains to one pint) বিশেষ ফল দেখায়। এই মেথিলিন ব্লু লোসন দিয়া অন্ত্রধৌতি করিলে প্রস্রাবের বর্ণ নীল এবং রোগীর শরীর ও ত্বক্ নীলাভ হয়। আমাশয় রোগে যখন অন্ত্রমধ্যে পচন আরম্ভ হয় এবং মলে অতিশয় দুর্গন্ধ হয় তখন এই মেথিলিন্ ব্লু সলিউসনের দ্বারা অন্ত্রধৌতি করিয়া অনেক রোগী আরোগ্য হইয়াছে।

বহুমূত্র রোগে—অন্ত্রধৌতি দ্বারা আশ্চর্য্য ফল দেখা গিয়াছে। যখন প্রস্রাবে শর্করার পরিমাণ কমিয়া গেল, আল্‌বুমেন দেখা দিল এবং এই সঙ্গে এসিটোন নামক বিষ প্রকাশ পাইল তখন কেবল সোডাবাইকার্ব্ব লোসন দিয়া অন্ত্রধৌতি করিয়া অনেক রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে আরোগ্য করা হইয়াছে।

বহুমূত্র রোগের সাধারণ অবস্থায় প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়। এই কোষ্ঠ কাঠিন্যের জন্য অন্ত্রধৌতি একমাত্র মহৌষধ।

সান্নিপাত জ্বরে—যখন সবিরাম জ্বরে জ্বরের প্রকোপের বৃদ্ধির সহিত রোগী বেহুস হইয়া পড়ে, সময় সময় প্রলাপ বলিতে আরম্ভ করে, নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত হয়, জিহ্বা উষ্ণ হয়, এবং বিশেষ চিন্তার কারণ হয় তখন অন্ত্রধৌতি দ্বারা জ্বর কমিয়া যায়, রোগীর জ্ঞানের উদয় হয়, নাড়ী বলবান হইয়া থাকে। নর্‌ম্যাল সালাইন্ সলিউসান (Normal Saline Solution) (১ ড্রাম লবণ এক পাইণ্ট জলে

দ্রব করিয়া) দ্বারা অন্ত্রধৌতি উপরিলিখিত অবস্থায় বিশেষ উপকারী। যদি রোগীর তরল দুর্গন্ধযুক্ত দাস্ত হয় তাহা হইলে বোরিক লোসন প্রযোজ্য।

এই প্রকার অন্ত্রধৌতি প্রত্যহ একবার এবং রোগের প্রকোপের বৃদ্ধির সহিত দুইবার করা হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত রোগ বেশ সুবিধা জনক অবস্থায় না আসে ততদিন পর্য্যন্ত নিয়ম মত করা উচিত।

ওলাউঠা রোগে—প্রথম অবস্থায় রোগের বিষ ধ্বংস করিবার জন্য পটাশ পারমাঙ্গানেট সলিউসন্ (5 to 10 grains to a pint) দ্বারা তিন ঘণ্টা অন্তর অন্ত্রধৌত করা আবশ্যক। পরে যখন প্রস্রাবের আবশ্যক হয় তখন নরম্যাল সালাইন সলিউসান দ্বারা অন্ত্র ধৌত করাইলে শীঘ্রই প্রস্রাব হইয়া থাকে।

শোথ রোগে—রক্তের মধ্যে লবণাংশ অধিক পরিমাণে থাকিলে শরীরে শোথ দেখা যায়। এই জন্য শোথ রোগে রোগীকে লবণ বর্জ্জন করিতে হয়। এবং শোথ কমাইবার জন্য মূত্র কারক ও তরল ভেদক ঔষধ ব্যবহার করান হয়। আমি কয়েকটী অতি দুর্ব্বল শোথ রোগীকে কেবলমাত্র পরিশ্রুত জলের (লবণশূন্য জলের) দ্বারা অন্ত্রধৌতি করাইয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি। যখন রোগ অনেক বাড়িয়াছে, শরীরও ক্ষীণ: হইয়াছে, মূত্রকারক ও ভেদক ঔষধ সকল অতি সন্তর্পণে ব্যবহার করিতে হয় বা রোগীর অন্ত্রমধ্যস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির শোথ বশতঃ উদরাময় প্রকাশ পাইয়াছে তখনও পরিশ্রুত জলের দ্বারা অন্ত্রধৌতি একমাত্র নির্দ্দোষ, ও সদ্য ফলপ্রদ ব্যবস্থা।

হাঁপানি রোগে—পেট গরম হইয়া অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য অন্ত্রমধ্যে অস্বাভাবিক রূপে পচিয়া যে বিষ উৎপাদন করে, সেই বিষ রক্তের সহিত মিলিত হইয়া হাঁপানি উৎপাদন করে। এই সকল রোগীরা নিয়ম মতে অন্ত্রধৌতি এবং স্বল্প আহার করিলে এই ভীষণ রোগ যন্ত্রণা হইতে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। আমার নিজের তত্ত্বাবধারণে এই প্রকার বহু রোগী আরোগ্য হইয়াছে।

গর্ভিণীর বমন রোগে—গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন বা চারি মাস পর্য্যন্ত. অল্প বিস্তর প্রায় প্রত্যেক গর্ভবতী স্ত্রীলোককে বমন করিতে দেখা যায়।

কিন্তু সময় সময় এই বমন অতি ভীষণ ভাব ধারণ করে এবং রোগীর

জীবন সংশয় উপস্থিত করে। গর্ভাবস্থায় শরীর হইতে উদ্ভূত বিষ সকল সম্যক বহির্গত না হইলে এই উপসর্গ দেখা যায়। এই জন্য নিয়ম মত অন্ত্রধৌতি করিলে শরীরস্থ বিষ সকল ধৌত হইয়া শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায় গর্ভিণীর বমনও কমিয়া যায় এবং তিনি সুস্থ ও সবল শরীরে প্রসব করিতে সমর্থ হন।

যখন বমনের আধিক্য দেখা যায় তখন প্রত্যহ তিনবার পর্য্যন্ত নরম্যাল সালাইন সলিউসান দ্বারা অন্ত্র ধৌত করান উচিত। পরে বমন কমিয়া গেলে দিনে দুইবার এবং তৎপরে ১ বার নিয়মমত প্রসব হওয়া পর্যন্ত্য প্রত্যহ অন্ত্র ধৌত করা আবশ্যক।

পুরাতন জ্বর ও যক্ষ্মা রোগে—পুরাতন জ্বর, যক্ষ্মা রোগাদিতে রোগীর পরিপাক ও পুষ্টির বৃদ্ধি করা চিকিৎসার প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। যদি রোগী যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য দ্রব্যাদি আহার করিয়া সুচারুরূপে পরিপাক এবং তজ্জনিত দেহের পুষ্টি সাধনে সমর্থ হন তাহা হইলে এই পুরাতন রোগ সকল ক্রমশঃ কমিয়া যায় ও রোগী রোগমুক্ত হন। অন্ত্রধৌতির দ্বারা ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত হয়। এইজন্য এই সকল রোগের চিকিৎসাকালীন অন্ত্রধৌতি নিয়মমত সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক। নরম্যাল সালাইন দ্বারা এই সকল রোগে অন্ত্রধৌতি বিধেয়।

সরু সরু কৃমি রোগে—কোয়াসিয়া ভিজান জল দ্বারা বা লবণাক্ত জল দ্বারা নিয়ম মত ধৌত করিলে এই সকল অন্ত্রমধ্যস্থিত কৃমি বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং রোগী অচিরে আরোগ্য লাভ করে।

অন্ত্রধৌতির জন্য জলের তাপ—অন্ত্রধৌত করিবার জন্য জল ঈষদুষ্ণ হওয়া আবশ্যক। ১০২ ডিগ্রি হইলেই যথেষ্ট। পরে এই জলে নল দিয়া মলদ্বার পৌছান পর্য্যন্ত ১০০ ডিগ্রি থাকে।

অত্যধিক জ্বর অবস্থায় ঈষৎ ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে জ্বর কমান গিয়া থাকে। এই জন্য ৯৫ ডিগ্রি জল ব্যবহার করিয়া ১৫ মিনিটের মধ্যে জ্বর ১০৫ হইতে ১০২ ডিগ্রি হইয়াছিল।

আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা।

ডাক্তার শ্রীসত্যশরণ চক্রবর্ত্তী, এম্, বি, লিখিত-

চতুর্থ অধ্যায়।

"ক্ষত" এবং তাহার উপস্থিত মত চিকিৎসা

ক্ষত কাহাকে বলে—কোন কারণে শরীরের চামড়া ও তাহার নীচের অংশ সকল অল্প বিস্তর কাটিয়া গেলে যে চর্ম্মবিকৃতি হয় তাহাকে ক্ষত বা ঘা বলে।

চামড়া না ছিঁড়িয়া যদি চামড়ার নীচের কোমল অংশ ছিড়িয়া গিয়া রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে চামড়া বিবর্ণ ও স্থানটী ফুলা দেখায়। এইরূপ হইলে শীতল জলপটী বা বরফ লাগাইতে হইবে, চামড়ার উপর এক টুকরা লিণ্ট হেজলিনে ভিজাইয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ঘা দুই রকমের হয়—(১) সাধারণ ও (২) বিষাক্ত।

(১) সাধারণ ঘা আবার নানা প্রকার হয় যেমন :—

(ক) পরিষ্কার ভাবে কাটা ঘা —বেশ ধারাল অস্ত্রের দ্বারা কাটা ঘায়ের মুখ বেশ পরিষ্কার ভাবে বিভক্ত থাকে এবং অল্প বিস্তর অবাধ রক্তস্রাব হয়।

(খ) থ্যাঁতলান ঘা—ভোঁতা অস্ত্র দ্বারা কাটিলে স্থানে স্থানে থ্যাঁতলাইয়া যায় এবং বাহিরে সামান্য রক্তস্রাব হয় বা আদবেই হয় না।

(গ) ছেঁদা করা ঘা অর্থাৎ ছোরা মারিলে যেরূপ ঘা হয়—খুব সরু মুখওয়ালা অস্ত্রের দ্বারা কাটা ঘা। সাধারণতঃ এই ঘা দিয়া অজস্র রক্তপাত হয় এবং ভিতরে অনেক দূর পর্য্যন্ত ক্ষত হয়।

(ঘ) ছেঁড়া ঘা—কোন চালিত কলে, কোন জন্তুর কামড়ান, বা অন্য কোনও উপায়ে এই ঘা হয়। ঘায়ের মুখ অত্যন্ত অসমান এবং রক্তস্রাব খুব কম হয়।

বন্দুকের গুলির ঘায়ে সাধারণতঃ ছেঁদা করা ও ছেঁড়া এই দুই প্রকার ঘায়েরই লক্ষণ সকল একত্রে দেখা যায় ও সময়ে সময়ে হাড় পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়।

সাধারণতঃ ঘায়ের উপস্থিত মত চিকিৎসায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখিতে হইবে।

(১) রক্তস্রাব বন্ধ করা।

(২) ঘা পরিষ্কার করা।

(৩) যদি পারা যায়, তাহা হইলে কাপড় দ্বারা ঝুলাইয়া কিম্বা বাড় (স্প্লিণ্ট) বাঁধিয়া ক্ষত স্থানকে স্থিরভাবে রাখা।

(৪) পরিষ্কার এণ্টিসেপ্টিক্ ড্রেসিং দ্বারা বাহিরের ধূলা ও ময়লা ঘায়ে না লাগিতে দেওয়া।

(৫) সক্ (Shock) অবসাদ কিম্বা মূর্চ্ছা বা অন্য রূপ দৈহিক সাধারণ লক্ষণগুলির উপযুক্ত চিকিৎসা করা।

আঘাত লাগিলে সর্ব্ব প্রথম রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া দেখিতে হইবে যে আহত স্থানে অর্থাৎ ঘায়ে কোনও রকমে ময়লা হাত বা ময়লা যন্ত্রাদি না লাগে ঘায়ের উপর ময়লা থাকিলেও তাহার উপর নূতন করিয়া ময়লা লাগান অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য।

ক্ষত স্থানকে স্থিরভাবে রাখা :—

প্রথমে ষ্ট্রাপিং দিয়া ঘায়ের মুখ যতদূর পারা যায় একত্র করিবে। ঘা যদি উর্দ্ধাঙ্গে হয় তাহা হইলে একটী বড় আর্ম স্লিং এ বাহু ঝুলাইয়া রাখিবে ও ঘা যদি গ্রন্থির নিকটে হয় তাহা হইলে স্প্লিণ্ট লাগাইয়া স্লিং এ ঝুলাইয়া রাখিবে। ঘা যদি নিম্নাঙ্গের দিকে হয় তাহা হইলে ক্ষত অঙ্গের বাহিরের দিকে একখানি স্প্লিণ্ট লাগাইবে। ঘা যদি পেটে কিম্বা বুকে হয় তাহা হইলে খুব আঁটিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে।

রক্ত বন্ধ হইলে এইরূপ করিবে—হাত এবং ঘা পরিষ্কার করিবার জিনিষ পত্র যদি নিকটে না থাকে তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ঐ সকল জিনিষ পাওয়া যায় ততক্ষণ হয় ঘা সম্বন্ধে কিছু করিবে না, কিম্বা এণ্টিসেপ্টিক ড্রেসিং থাকিলে তাহা দ্বারা ঘা ঢাকিয়া রাখিবে।

ঘা পরিষ্কার করিবার নিয়ম—অঙ্গুলি দ্বারা ঘা স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে হাত দুইখানি গরম জল ও সাবান দ্বারা ধুইয়া তারপিন তৈল দ্বারা ঘসিবে কিম্বা কার্ব্বলি-

কের জলে (৪০ ভাগে ১ ভাগ) ডুবাইয়া লইবে। তাহার পর এন্টিসেপ্টিক্ জল দ্বারা (৪০ ভাগ জলে এক ভাগ কার্ব্বলিক্ এসিড বা ২০০০ ভাগ জলে এক ভাগ পারক্লোরাইড অব মার্কারি) ঘা বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিবে।

উপরোক্ত রূপ ধুইবার জল না পাইলে নিম্নলিখিত জিনিষগুলির কোনও একটী ব্যবহার করিবে।

(১) এল্‌কোহল—সম পরিমাণ জল ও স্পিরিট বা মির্থিলেটেড স্পিরিট্ একত্র মিশাইবে। জল প্রথমে ফুটাইয়া পরে ঠাণ্ডা করিয়া স্পিরিট মিশাইবে।

(২) কণ্ডিস ফ্লুইড—এক পাইণ্ট গরম জলে দুই টেবল চামচ (অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে মিশাইবে।

(৩) সাধারণ লবণ—বড় গ্ল্যাসের এক গ্ল্যাস জলে এক ডেসার্ট (মাঝারি চাম্‌চে) লবণ মিশাইবে।

ঘা ধুইবার সময়ে ঘায়ে রক্তের চাপ থাকিলে তাহা কখনও তুলিয়া ফেলিবে না। কারণ ঐ সকল রক্তের চাপ রক্তস্রাব বন্ধ রাখে এবং ঘায়ে বাহিরের ময়লা লাগিতে দেয় না।

ঘায়ের ময়লা সব বেশ পরিষ্কার করিয়া ধোয়া হইলে পর তাহাকে পরিষ্কার রাখিবার জন্য এক খণ্ড কটন্ উল্ ঘা ধোয়াইবার এন্টিসেপ্টিক্ জলে ভিজাইয়া ও তৎপরে উত্তমরূপে নিংড়াইয়া, উপস্থিত সময়ের জন্য ঘায়ের উপর চাপা দিয়া রাখিবে।

ঘা ড্রেস করিবার নিয়ম—

যদি এন্টিসেপ্টিক্ ড্রেসিং থাকে তাহা, হইলে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি না থাকে তবে এক খণ্ড পরিষ্কার কাপড় পাঁচ মিনিট জলে ফুটাইয়া ও পরে নিংড়াইয়া ব্যবহার করিবে ; কিম্বা এক খণ্ড লিণ্ট কার্ব্বলিকের জলে ভিজাইয়া ব্যবহার করিবে।

এই ড্রেসিংএর উপর কয়েক খণ্ড পরিষ্কার কটন্ উল্ চাপা দিবে ও তার পর ড্রেসিং ঠিক্ স্থানে রাখিবার জন্য ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে।

উপস্থিত মত চিকিৎসা ও সেই সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ কথা :—

(১) পরিষ্কার ভাবে কাটা ঘা—প্রথমে রক্ত বন্ধ করিবে। তাহার পর যদি দরকার হয় তবে উপরোক্ত রূপে ঘা ধুইয়া ড্রেস্ করিবে। ঘাএর মুখ যদি ফাঁক হইয়া থাকে তাহা হইলে ষ্ট্রাপিং দ্বারা একত্র করিবে। সাবধান হইয়া দেখিবে ঘা যেন একেবারে ঢাকা না পড়ে। এই জন্য ষ্ট্রাপিং ছুরি দ্বারা কাটিয়া একটু ফাঁক রাখিবে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে ঐ ফাঁক দিয়া রক্ত বা প্রদাহ জনিত পদার্থ পরে নির্গত হইয়া যাইতে পারিবে।

(২) থ্যাতলান ঘা—চামড়া ছিড়িলে উপরোক্ত এন্টিসেপ্টিক্ সলিউসনে ডোবান তুলা বা বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ক্ষত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে। যদি চমড়া না ছিঁড়িয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত স্থানে স্পিরিট লোসনে (২ ভাগ জল ও ১ ভাগ স্পিরিট্) একটী কাপড়ের পটী লাগাইবে ও উহা ক্রমাগত ভিজাইতে থাকিবে।

(৩) ছেঁদা করা ঘা—রক্ত বন্ধ করিবে এবং ঘা ধুইয়া ড্রেস করিবে।

(৪) ছেঁড়া ঘা—ঘা ধুইয়া ড্রেস করিবে। ইহার সহিত প্রায়ই সক্ (Shock) থাকে ও সেই জন্য তাহারও চিকিৎসা করিবে।

বিষাক্ত ঘা—

বিষাক্ত ঘা নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের হইতে পারে যথা :—

(ক) প্রকৃত বিষাক্ত ঘা—চামড়ার নীচে পচা জান্তব পদার্থ বা অন্য কোনও রূপ ময়লা ঢুকিয়া যে ঘা হয়।

চিকিৎসা—ক্ষত হইবা মাত্র খুব তেজী প্রতিশোধক (Disinfectant) দ্বারা ক্ষত স্থান ধুইয়া ফেলিবে।

মনে রাখিতে হইবে যে—ঘা যদি ঠিক্ মত পরিষ্কার করা না হয় তাহা হইলে পূয হইতে পারে, কিম্বা ক্ষত স্থানে ফোড়া বা সপূয ঘা হইতে পারে অথবা সমস্ত শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া বিষাক্ত হইয়া যাইতে পারে।

(খ) মক্ষিকার হুল ফোটা—(মধুমক্ষিকা, বোল্‌তা, ভিমরুল প্রভৃতি) চিকিৎসা—ক্ষত স্থানের উপর একটী ছোট চাবি (ঘড়ির চাবি হইলেই সর্ব্বাপেক্ষা

ভাল হয়) চাপিয়া ধরিয়া হুলটী বাহির করিয়া লইবে। তাহার পর এন্টিসেপ্টিক্ সলিউসন্ বা এমোনিয়া, সোডা কিম্বা পটাসের জল দিয়া ক্ষত স্থান ধুইয়া ফেলিবে। সক্ (Shock) থাকিলে উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বৃশ্চিক ও মাকড়সা কামড়াইলে অনেক লোক বিশেষ যন্ত্রণা পায় ও কেহ কেহ প্রাণ পর্য্যন্ত হারায়াছে। জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য শীতল সোডা, পটাস্ বা এমোনিয়ার জল দ্বারা ধুইয়া ফেলা উচিত। ফটকিরি লাগাইয়া—ইপিকাক্ গুলিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইলেও উপকার হয়। পরে বোরাসিক্ লোসন্ দ্বারা পটী বাঁধিলে বিশেষ উপকার হয়। বিচুটী, কচু, ওল প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হইলে ডাইলিউট এমোনিয়া দ্বারা আক্রান্ত স্থানটী ধুইয়া তাহার উপর সোডা ও স্পিরিট এমোনিয়া এরোমেটীক্ দ্বারা প্রস্তুত প্রলেপ লাগাইলে ভাল হয়। সময়ে সময়ে স্পিরিট দ্বারা ধুইয়া ফেলিলেই উপকার হয়।

(গ) সাপে কামড়ান—

চিকিৎসা—ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইবে কিন্তু ইতি মধ্যে ক্ষত স্থানের উপরে অর্থাৎ ক্ষত স্থান ও হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তাগা বাঁধিবে। প্রথমে রক্তস্রাব বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্ষত স্থানের উপর গরম জল ঢালিবে ও তাহার পর খুব তেজী এন্টিসেপ্টিক্ সলিউসন্ ঢালিয়া ক্ষত স্থান নাইট্রেট অফ্ সিলভার কিম্বা লাল করিয়া পোড়ান লৌহ দ্বারা পুড়াইয়া দিবে। তাগা বাঁধার উদ্দেশ্য এই যে ইহা দ্বারা বিষকে সমস্ত শরীরে চালিত হইতে না দিয়া ক্ষত স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। বিষ বাহির করিবার জন্য ক্ষত স্থান চুষিয়া ফেলা যাইতে পারে। কিন্তু যে চুষিবে তাহার ঠোঁটে বা মুখে যেন কোনও প্রকার ক্ষত না থাকে। সক্ (Shock) থাকিলে উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং শ্বাস রোধ হইয়া আসিলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস লওয়াইবে।

অনেক সময়ে ক্ষত স্থান চিরিয়া পার্ম্মাঙ্গানেট অফ্ পটাস্ ঘসিয়া দিলে বিষ নষ্ট হয় ও ইহা ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বেই "রজার্স ও ব্রাণ্টান" ল্যানসেট্ ও তন্মধাস্থ পার্ম্মাঙ্গানেট্ অফ পটাস্ দ্বারা সম্পন্ন করা যাইতে পারে। চামড়ার নীচে কিছু

পার্ম্মাঙ্গানেট্ জলে গুলিয়া ইন্জেক্ট করা যাইতে পারে। শেষোক্ত ক্রিয়া ডাক্তার দ্বারা হওয়া ভাল। এণ্টিভেনিন্ও ঠিক সময়ে প্রযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

ঘ) পাগলা কুকুরে কামড়ান—

সাপে কামড়াইলে যেরূপ চিকিৎসা ইহারও সেইরূপ চিকিৎসা করিবে। যে কুকুর কামড়াইয়াছে উহা পাগলা কি না সে বিষয় বিশেষ করিয়া জানিবে। পাগলা কুকুরে কামড়াইলে রোগীকে কসৌলি পাস্তুর ইন্ষ্টিটিউটে পাঠাইতে বিলম্ব করা উচিত নহে। পাগলা কুকুর ৮।১০ দিনের বেশী বাঁচে না।

(ঙ) নানা প্রকার—

যদি সন্ধিস্থল গুলি দ্বারা আহত হয়, কিম্বা তীর, বর্শা দ্বারা আহত হয়, বা কোনও দ্রব্য ক্ষত মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় তবে উক্ত স্থান তুলা দ্বারা আবৃত করিয়া অঙ্গটী স্প্লিণ্টে রাখিবে। এরূপে অঙ্গটী রাখিতে হইবে যে ক্ষত মুখ বিভিন্ন অবস্থায় না থাকিয়া জুড়িয়া থাকে। সূচ চাম্ড়ার নীচে বিধিয়া অদৃশ্য হইলে রোগীকে ডাক্তার দেখাইবে। যদি কোন সন্ধি স্থলে বিঁধিয়া থাকে তাহলে অঙ্গটীর নাড়া-চাড়া বন্ধ করিবার জন্য স্প্লিণ্ট বা বাড় বাঁধা দরকার।

বড়সি যদি শরীরের মধ্যে বিঁধিয়া যায় তবে টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করা অন্যায়। সুতা কাটিয়া ফেলিয়া চামড়ার ভিতর দিয়া বড়সির অগ্রভাগ বাহির করিতে হইবে ও আলের দিক বাহির হইলে ঐ দিক ধরিয়া টানিলে বড়সি বাহির হওয়া সম্ভব। যে দিক দিয়া ঢুকিয়াছে আল থাকা হেতু সেই দিকেই বাহির করা সম্ভব। বিপরীত দিকে টানিলে আল আটকাইয়া যায় ও বড়সি বাহির করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন আঘাত।

চক্ষু।

চক্ষুর পাতা মুদিলে অক্ষিগোলকের উপরিভাগকে বাহিরের পদার্থের দ্বারা অনিষ্ট হইতে রক্ষা করে। চক্ষুর পাতার নীচে ও অক্ষিগোলকের উপরিভাগে একটী ভিজা চামড়ার পর্দ্দার ন্যায় (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি) আছে। কোনও প্রকার বাহিরের পদার্থ চক্ষুমধ্যে প্রবেশ করিলে ঐ পর্দ্দায় আটকাইয়া থাকে।

চক্ষুতে বাহিরের পদার্থ পড়িলে তাহার চিকিৎসা।

রোগীকে চক্ষু রগড়াইতে দিবে না। বালক হইলে আবশ্যকমত তাহার হস্ত বন্ধন করিয়া রাখিবে। চক্ষুর নিম্নের পাতা নীচে টানিয়া আনিলে যদি ঐ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় তবে উহাকে উটের চুলের ক্রস দ্বারা কিম্বা একটী রুমালের কোণ পাকাইয়া আর্দ্র করিবে ও তদ্দ্বারা ঐ পদার্থ বাহির করিবে।

কোন বাহিরের পদার্থ চক্ষুর উপর পাতার নীচে প্রবেশ করিলে (ক) ঐ চক্ষুর উপর পাতাকে অক্ষিগোলকের সম্মুখে (বহির্দ্দিকে) টানিয়া লইয়া নীচের পাতাটীকে উহার ভিতর প্রবেশ করাইয়া উভয়কেই ছাড়িয়া দিবে। নীচের পাতার পক্ষ্মগুলি দ্বারা উপর পাতার নিম্ন প্রদেশটীকে পরিষ্কার করিয়া আনিয়া বাহিরের পদার্থটীকে স্থানচ্যুত করিবে। ইহাএকবারা করিলে যদি কার্য্য সাধন না হয় তবে আবশ্যক মত উপর্য্যুপরি ২।৩ বার করিবে ইহাতে কোন ফল না হইলে শীঘ্র চিকিৎসক ডাকিবে।

(খ) জাহাজের বা অন্য কোনও স্থানে অর্থাৎ যেখানে চিকিৎসক পাওয়া যায় না সেখানে নিম্নলিখিত মত পরীক্ষা করিবে; রোগীকে আলোকের দিকে মুখ করাইয়া বসাইয়া রাখিবে ও নিজে তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইবে। রোগীর মস্তক নিজের বক্ষঃপার্শ্বে নিশ্চল ভাবে রাখিয়া দিবে। আক্রান্ত চক্ষুর উপর পাতার ধার হইতে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ উর্দ্ধে পাতার উপরিভাগে একটী দাঁত খোঁটা দেশালাইয়ের কাটি বা সেইপ্রকার কোন জিনিষ আড়ভাবে রাখিবে। পরে উপরের পক্ষ্মগুলি ধরিয়া উক্ত শলাকাদ্বারা চাপিয়া পাতাটী উল্‌টাইয়া পতিত দ্রব্য বাহির করিবে।

লৌহ কারখানায় ক্ষুদ্র লৌহকণা অক্ষিগোলকে বিদ্ধ হইয়া থাকিলে, নীচের পাতা টানিয়া চক্ষুমধ্যে দুই এক বিন্দু অলিভ অয়েল কিম্বা ক্যাষ্টর অয়েল দিবে ও ঐ চক্ষু বন্ধ করিয়া চক্ষুর উপরে তুলার পটী দিয়া দৃঢ়ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে যেন অক্ষিগোলক নড়িতে না পারে ও রোগীকে ডাক্তারের নিকট লইয়া যাইবে।

চক্ষু মধ্যে চুণ পড়িলে যথাসম্ভব চুণ বাহির করিয়া ফেলিবে ও ভিনিগার ও গরম জল দ্বারা চক্ষুর ভিতর ধৌত করিবে। এইরূপে বহুবার ধৌত করিয়া লৌহকণা পড়িলে যেমন তৈল প্রয়োগ ও ব্যাণ্ডেজ বাধিতে হয় সেইরূপ করিবে।

রেলের গাড়ীতে যাইবার সময় চক্ষুতে কয়লার কণা পড়িলে অপর চক্ষুটী রগড়াইবে। এরূপ করিলে পূর্ব্ব চক্ষু জলপূর্ণ হয় ও ইহাতে ঐ চক্ষুর কয়লা কণা ভাসিয়া বাহির হইয়া পড়িতে পারে। যে চক্ষে কয়লার কণা পড়িয়াছে সে চক্ষু কদাপি রগড়াইবে না।

কর্ণ।

কর্ণের ভিতর কিছু প্রবেশ করিলে ডাক্তার ডাকা দরকার। ইহা বাহির করিবার চেষ্টা করিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। কর্ণের বধিরতা এমন কি প্রাণনাশও ঘটিতে পারে। যদি বালক কোনও মতে কর্ণের ভিতর অঙ্গুলি না দিয়া থাকিতে না পারে তাহা হইলে উহার হাত বাঁধিয়া বা কর্ণ ঢাকিয়া রাখিবে। কর্ণে পোকা প্রবেশ করিলে তৈল দ্বারা কর্ণ পূর্ণ করিবে—তাহাতে পোকা ভাসিয়া উঠিবে ও তখন উহা বাহির করা সহজ হইবে। কিছুতেই কর্ণে পিচকারি করিবে না বা পালক বা কাঠি প্রবেশ করাইতে দিবে না। যে কর্ণের মধ্যে বস্তু আছে সেই কাত করিয়া রোগীকে শয়ন করাইবে ও অপর কর্ণে ধীরে ধীরে আঘাত করিবে। এইরূপ করিলে কর্ণমধ্যস্থ বস্তু বাহির হইতে পারে। ইহাতে বাহির না হইলে ডাক্তার দেখান উচিত।

নাসিকা।

নাসিকা মধ্যে বাহিরের কোন বস্তু প্রবেশ করিলে বা করাইলে সহসা বিপদের আশঙ্কা নাই। নস্য বা নাকে কাঠি দিয়া হাঁচাইবে বা আক্রান্ত নাকের বিপরীতটী বন্ধ করিয়া জোরে নাক ঝাড়াইবে ; ইহাতে নাসিকাস্থিত পদার্থ বাহির হইতে পারে না হইলে চিকিৎসক দেখাইবে।

কণ্ঠ।

গলায় মাছের কাঁটা বা মাংসের হাড় আটকাইলে যদি উহা খুব সরু হয় তাহা হইলে শুধু ভাত, কলা প্রভৃতি না চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিলে নামিয়া যায় ; যদি উহাতে কাঁটা না নামে তাহা হইলে চিকিৎসক দেখান উচিত।

ক্ষুদ্র বালক বালিকারা কথনও কথনও পয়সা বা সেইরূপ কিছু গিলিয়া ফেলে, গলায় কিছু আটকাইলে প্রথমে আঙ্গুল দিয়া উহা বাহির করিতে চেষ্টা করিবে তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে পা ধরিয়া তুলিয়া অর্থাৎ মাথা নীচু দিকে করিয়া ঘাড়ে বা পৃষ্ঠে আঘাত করিলে উহা বাহির হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। ইহাতেও অকৃতকার্য্য হইলে চিকিৎসক দেখাইবে।

যদি পিন্ পেরেক বা ঐ প্রকার কোন অসম জিনিষ কোনও বালক বালিকা বা অপর কেহ যদি গিলিয়া ফেলে ও উহা পাকস্থলীতে চলিয়া যায় তাহা হইলে সুজীর পায়স, হালুয়া, পাঁওরুটী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে খাইতে দেওয়া উচিত। জোলাপ দেওয়া অবিহিত, কারণ এই উপায়ে উক্ত দ্রব্যটী খাদ্য দ্বারা আবৃত হইয়া কোনও ক্ষতি না করিয়া মলের সহিত বহির্গত হয়। ঐ মল অন্বেষণ করা উচিত। বহির্গত না হইলে আশঙ্কার কারণ আছে। ময়লা জলের সহিত জোঁক খাইলে লবণ মিশ্রিত জলপান করিতে দিবে। লবণের জলে জোঁক ছাড়িয়া দেয় ও লবণাক্ত জলে বমি হয় ও বমির সহিত ঐ জোঁক বাহির হইতে পারে।

বক্ষঃ।

বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থিত যন্ত্র সকল।

হৃদয় ও ফুস্‌ফুস্ বক্ষঃস্থল ব্যাপিয়া থাকে। (হৃদয়ের গঠন ও স্থান রক্ত চলাচল অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।) হৃদয়ে আঘাত লাগিলে সচরাচর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

ফুস্‌ফুস্ বক্ষঃস্থলের পশ্চাৎ, সম্মুখ ও পার্শ্বদেশ ব্যাপিয়া থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস অধ্যায়ে ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ফুস্‌ফুসে আঘাতের বিষয়।

যখন পঞ্জর ভাঙ্গিয়া ভিতর দিকে ঢুকিয়া যায় তখন ইহা ফুস্‌ফুস্ ও তাহার আবরণ স্বরূপ যে পর্দ্দা আছে (প্লুরা) তাহাকে ভেদ করে। ছুরিকা দ্বারা বা ষ্টাইলেটো (কোঁচ বা যাহাতে মাছ বিদ্ধ করে) দ্বারা খুচিয়া গেলে কিংবা বেয়নেটের অগ্রভাগ পাঁজরার ভিতর প্রবেশ করিলেও এই দুইটী যন্ত্র (ফুস্‌ফুস্ ও প্লুরা) আহত হইতে পারে। বন্দুকের গুলি বক্ষঃস্থল ভেদ করিবার কালেও ফুস্‌ফুস্ ভেদ করিয়া যায়।

ফুস্‌ফুসে আঘাত লাগিলে তাহার লক্ষণ।

শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, হিমাঙ্গ হইবার লক্ষণ, মূর্চ্ছা ও মুখ হইতে ফেনার সহিত রক্ত নির্গমনে সচরাচর ফুস্‌ফুসে আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। ফুস্‌ফুস্ হইতে বায়ু বহির্গত হইয়া ত্বকের নিম্ন ও বক্ষো-গহ্বরে প্রবেশ করিতে পারে, আভ্যন্তরিক রক্তস্রাবও হইতে পারে ও ঐ রক্ত বক্ষো-মধ্যে সঞ্চিত হইলে রোগী বিবর্ণ হয়, নিশ্বাস মৃদু ও নাড়ী ক্ষীণ হয়, দৃষ্টিশক্তির হানি হয়, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে, মুখ ব্যাদান করিতে থাকে, ভুল বলে ও ক্রমশঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা।

রোগীকে মাথা নীচে রাখিয়া শয়ন করাইবে। বরফ চুষিয়া খাইতে দিবে। আহত স্থানে বরফ বসাইয়া দিবে। গৃহ শীতল রাখিবে ও বায়ু প্রবেশ করিতে দিবে। আঘাত প্রাপ্ত স্থানটীর দিকে রোগীকে ফিরাইয়া রাখিবে। যখন ফুস্‌ফুস্

ভাঙ্গা পাঁজরা দ্বারা ছিন্ন হয় তখন বক্ষঃস্থলের উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা উচিত নহে; কারণ ইহাতে ভাঙ্গা পাঁজরার ধার দ্বারা ফুস্‌ফুস নূতন ভাবে আহত হইতে পারে। যদি আঘাত কেবলমাত্র বাহিরে লাগিয়াছে বলিয়া বোধ হয় তখন উহা পরিষ্কার ড্রেসিং দ্বারা বাঁধিয়া দিবে।

উদর।

উদর গহ্বরের সম্মুখের আঘাত দুই প্রকার (ক) ভার্টিক্যাল্ ও (খ) ট্রান্‌স্‌ভারস্। ভার্টিক্যাল্ অর্থাৎ উদরের উপর দিক হইতে ঠিক সোজা নিম্নদিকে ও ট্রান্‌স্‌ভারস্ অর্থাৎ উদরের আড় ভাগে। উদর গহ্বর কাটিয়া দিলে অন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্র সকল বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপ ঘটনা হইলে হাঁটু দুইটী গুটাইয়া দিবে ও স্কন্ধদ্বয় উচ্চ ভাবে রাখিবে। লিণ্ট তোয়ালে কিংবা তুলা কাপড়ের থলির মধ্যে পুরিয়া গরম জলে ভিজাইয়া পটী বাঁধিয়া দিবে—যতক্ষণ চিকিৎসক উপস্থিত না হন।

চিকিৎসা :—উদরের উপরিস্থিত আঘাত সরল ভাবে হইলে রোগীকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইবে এবং শরীরের নিম্ন প্রদেশ সরলভাবে রাখিবে। ক্ষতের উপর একটী শুষ্ক লিণ্টের প্যাড বা লিনেন্ প্যাড্ দিবে এবং একটী ব্যাণ্ডেজ দ্বারা পেটের চারিদিক শক্ত করিয়া জড়াইয়া দিবে। উদরের উপরের আঘাত আড় দিকে হইলে হাঁটু দুইটীকে গুটাইয়া রাখিবে যেন উদর প্রাচীরের মাংসপেশীগুলিতে টান না লাগে। স্কন্ধদেশ উপরে উঠাইবে তাহা হইলে ক্ষতের দুইটী মুখ জোড়া লাগিবে তৎপরে ক্ষতের উপরে প্যাড ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে।

পাকস্থলী—পাকস্থলী বা ষ্টম্যাকে আঘাত লাগিলে গভীর অবসাদ, হিমাঙ্গ ও বমি হইতে থাকে। বমিতে কাফি চূর্ণের ন্যায় বিকৃত রক্ত থাকে। মুখ দিয়া কিছু খাইতে দেওয়া উচিত নহে ও রোগীকে শয়ন করাইয়া রাখা প্রয়োজন।

লিভার ও প্লীহার আঘাত—উদর গহ্বরের ডানদিকে নীচের পাঁজরা ভাঙ্গিয়া গিয়া যকৃৎকে আহত করিতে পারে অথবা খোঁচা বা বন্দুকের গুলির আঘাতে

বা অন্য উপায়ে ঐ প্রকার আঘাত লাগিলে, উদর গহ্বর মধ্যে রক্তস্রাব হয়। আভ্যন্তরীণ রক্তস্রাব হইলে যেমন চিকিৎসা আবশ্যক সেইরূপ হওয়া উচিত। রোগীকে দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করাইবে।

প্লীহায় আঘাত লাগিলে রক্তস্রাব হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া রোগীর সামান্য আঘাতেই এই বিপদ হইতে পারে। প্লীহায় আঘাত সচরাচর শীঘ্র মারাত্মক হয়। আহত রোগীকে বামপার্শ্বে শয়ন করান উচিত।

অন্ত্রে আঘাত।

অন্ত্রে আঘাত লাগিলে হিমাঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতেও আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব হইতে পারে। কিংবা অন্ত্রের মধ্যস্থিত পদার্থ উদর গহ্বরে বাহির হইয়া পড়িতে পারে; রোগীকে স্থির ভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে। উদরের উপর একটী ফ্লানেল প্যাড্ বা তুলার প্যাড্ দিবে। ঐ প্যাডের উপর একখানি তোয়ালে দিয়া টান করিয়া বাঁধিবে ও ঐ তোয়ালেটীকে তিন চারি জায়গায় এমন ভাবে পিন দিয়া আটকাইয়া রাখিবে যেন প্যাডটী কোনও মতে সরিতে না পারে। মুখ দিয়া কিছু খাইতে দিবে না।

কিড্নিদ্বয়—ইহার পশ্চাদ্ভাগ কটীদেশের মধ্যে থাকে। যখন একাদশ ও দ্বাদশ পঞ্জরাস্থি চাপ লাগিয়া বা আঘাত লাগিয়া বা বন্দুকের গুলিতে বা কোনও ধারাল অস্ত্রের আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায় তখন কিডনিদ্বয় আঘাত প্রাপ্ত হয়। প্রস্রাবের সহিত রক্ত নির্গত হয়। আহত কিডনীতে ফুলা ও বেদনা থাকে। কোমরে আঘাত লাগিলেও কিড্নী আহত হইতে পারে।

ব্ল্যাডার বা মূত্রাশয় বস্তিকোটরে থাকে, বস্তিকোটরের অস্থি ভগ্ন হইলে উহা আঘাত প্রাপ্ত হয়। প্রস্রাব করিতে না পারা কিংবা যদি সামান্য প্রস্রাব হয় তাহা রক্তে রঞ্জিত থাকে। কিডনী বা মূত্রাশয় আঘাত পাইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ডাক্তার না আসে ততক্ষণ পর্য্যন্ত রোগীকে স্থির ভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে ও আহত বা বেদনা স্থানে উষ্ণ বা সেঁক দিবে। যদি অন্ত্র বা উদর গহ্বরের কোন যন্ত্র উদর

প্রাচীর ভেদ করিয়া, কুঁচকীর স্থান দিয়া বা স্বাভাবিক কোনও ছিদ্র পথে বাহিরে আসিয়া পড়ে তাহাকে র‍্যাপচার বা হার্ণিয়া অথবা অন্ত্র বৃদ্ধি বলে।

উক্ত স্থানে হঠাৎ বেদনা ও স্ফীতি লক্ষিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগী বমন করিতে থাকিলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক ডাকাইবে। চিকিৎসক আসিবার পূর্ব্বে রোগীর কোমরের নীচে বালিশ দিয়া উচ্চ করিবে ও স্ফীত স্থানের উপর জলপটী বা বরফ দিবে।

অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা।

অধুনা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী সমাজে অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতার প্রকোপ যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে এ বিষয়ের আলোচনা বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় কলিকাতাবাসী শতকরা ৯৯ জন এই রোগে কষ্ট পাইতেছেন।

অসভ্য বর্ব্বর জাতীর ভিতর এই দুই রোগ দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজে এই দুই ব্যাধি বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতা যে কত রোগের মূল তাহা বলা যায় না। অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর কলেরা, যক্ষ্মা, টাইফয়েড্, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা।

জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ যক্ষ্মা রোগ অতি দ্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। এই রোগ নিবারণ কল্পে আমাদের যে যে উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহার মধ্যে অজীর্ণতা দমন একটী প্রধান উপায়।

খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক না হওয়াই অজীর্ণতা। মনুষ্যের সমস্ত শক্তি খাদ্য হইতে উদ্ভূত। পরিপাক ক্রিয়ার দ্বারা খাদ্যদ্রব্য রূপান্তরিত হইয়া অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস ইত্যাদিতে পরিণত হয়।

খাদ্যদ্রব্যের অভাবে শরীরের পুষ্টির ব্যতিক্রম ঘটে এবং ইহাতে স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী। পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটিলে যথেষ্ট আহার সত্ত্বেও শরীর পুষ্ট হয় না।

মুখ বিবর হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত্রমধ্যে যাইয়া পরিপাক ক্রিয়ার সমাপ্তি হয়। মুখমধ্যে দন্ত দ্বারা পিষ্ট হইয়া খাদ্যদ্রব্য অতি সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত না হইলে পাক রসের কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। এই কারণে অনেক সময় দন্ত রোগের ফল অজীর্ণতা। মুখনিঃসৃত লালার দ্বারা শালিজাতীয় খাদ্য শরীরের গ্রহণোপযোগী শর্করা-জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। ভীত, কিংবা চিন্তিত অবস্থায় থাকিলে লালার নিঃস্রাব উত্তমরূপ হয় না। এরূপ অবস্থায় আহার করিলে অজীর্ণ হইবার সম্ভাবনা। পাকস্থলীতে খাদ্যের আমিষ উপাদানের পরিপাক আরম্ভ হয়। অন্ত্রমধ্যে শালি, আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাদ্যের পরিপাক সম্পূর্ণ হয় মানসিক উত্তেজনার ফলে পাকস্থলী ও অন্ত্র হইতে নিঃসৃত রসের পরিমাণ কমিয়া যায়। অনিচ্ছায় আহারেও এই ফল হয়। বিখ্যাত রুষিয়ান অধ্যাপক "পলো" পরীক্ষায় প্রমাণিত করিয়াছেন যে কুকুরকে অজ্ঞাতসারে মাংস আহার করাইলে মাংসের পরিপাক হয় না, কিন্তু এইরূপ আহার করাইবার পর যদি কুকুরকে মাংস দেখান যায়, তাহা হইলে ভুক্ত মাংসের উত্তম পরিপাক হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা পরিপাকের উপর ইচ্ছা শক্তির যে কিরূপ প্রভাব তাহা বুঝা যায়।

পাকযন্ত্র সমূহের কোন একটীর বিকৃতি ঘটিলেই অজীর্ণ রোগ জন্মে। ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের সারাংশ শরীর মধ্যে গৃহীত হইবার পর, অসারভাগ মলে পরিণত হইয়া শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। মলে যে কেবল খাদ্যের পরিত্যক্ত অংশ থাকে তাহা নহে, ইহার সহিত শরীরের ক্ষয়জনিত নানা প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য নির্গত হইয়া যায়। খাদ্যের পচনকালে এমন কতকগুলি বিষাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, যাহা আমাদিগকে সহজেই পীড়িত করিতে পারে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে আমাদের দেহ এই সকল নানা প্রকার বিষময় পদার্থ দ্বারা পীড়িত হইয়া পড়ে। সহজ অবস্থায় খাদ্যের অসার অংশই কোষ্ঠ পরিষ্কারের সহায়তা করিয়া থাকে। এই অসারভাগ, অন্ত্রস্থিত মাংসপেশী সমূহকে উত্তেজিত করিয়া, মলত্যাগের বেগ আনয়ন করে। অনেক কারণে অন্ত্রপেশী সমূহের দুর্ব্বলতা হইতে পারে এইরূপ অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ জন্মে। উপযুক্ত শারীরিক ব্যায়ামের অভাবে শরীরের সকল মাংসপেশীই দুর্ব্বল হয়। এইজন্য অলস ব্যক্তিদিগের মধ্যে কোষ্ঠবদ্ধতা অধিক দেখা

যায়। খাদ্যে অসারভাগ না থাকিলে কিংবা রন্ধনের গুণে অসার অংশ অধিক কোমলতা প্রাপ্ত হইলে অন্ত্রপেশীসমূহ উত্তেজিত হয় না। ইহা সুসেব্য খাদ্য-সেবী ধনীদিগের মধ্যে কোষ্ঠবদ্ধতার একটী প্রধান কারণ। মাংসের অসার ভাগ অতি অল্প। এজন্য মাংসাহারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে কোষ্ঠবদ্ধতা অধিক দেখা যায়।

অনেকের প্রত্যহ মলত্যাগ করিলেও, কোষ্ঠ সম্পূর্ণরূপ পরিষ্কার হয় না। কিয়দংশ মল থাকিয়া যাওয়ার জন্য কোষ্ঠবদ্ধতার অনেক লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অজীর্ণ রোগী খাদ্যের সারাংশ শরীর মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে না। এজন্য যথেষ্ট খাদ্য গ্রহণ সত্ত্বেও তাঁহার অবস্থা অনাহারী ব্যক্তির সমান। আমাদের চারিদিকে শত শত নর নারী এইরূপ অনাহারে ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। লক্ষপতি হইলেও যদি কেহ অজীর্ণ রোগগ্রস্ত হন, তাহা হইলে তিনি আহারের প্রাচুর্য্যের মধ্যেও দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকের সমান।

অপর পক্ষে কোষ্ঠবদ্ধতার দ্বারা রোগীর শরীর দিন দিন বিষাক্ত হইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে নানাপ্রকার ব্যাধি উপস্থিত হয়। সময় সময় শরীরাভ্যন্তরে মল সঞ্চিত থাকার জন্য কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর প্রশ্বাসে এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। বিচক্ষণ চিকিৎসক মাত্রেই রোগীর কোষ্ঠসাফের বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন।

অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতার কারণ—কি কি কারণে এই দুই ব্যাধি আমাদের সমাজে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে নিম্নে তাহার আলোচনা করা গেল।

অজীর্ণতার কারণ—(১) আমাদের অনেকেই খাইবার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না। মফঃস্বল হইতে চাকরী বা ব্যবসার জন্য যাঁহারা প্রতিদিন সহরে যাতায়াত করেন তাঁহাদের প্রায় সকলেরই কোনরূপে তাড়াতাড়ি দুই চারি গ্রাস অন্ন মুখে দিয়া কর্ম্মস্থলে আসিতে হয়। ইঁহাদের খাদ্য আর চিবান হয় না। গিলিয়াই সকল দ্রব্য উদরসাৎ করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় অজীর্ণ রোগ না হওয়াই আশ্চর্য্য। আস্তে আস্তে চিবাইলে, যে কেবল পরিপাকের সহায়তা হয় তাহা নহে, ইহাতে অল্পমাত্র খাদ্যে ক্ষুধারও নিবৃত্তি হয় এবং অতি ভোজনের কুফল হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

(২) আহারের অব্যবহিত পরেই অত্যধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করা উচিত নহে। পরিপাকের সময় পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে যথেষ্ট রক্ত সঞ্চালন হওয়া আবশ্যক। এই সময় পরিশ্রম করিলে রক্ত পাকযন্ত্রসমূহে না যাইয়া শরীরের অন্যান্য স্থানে পরিচালিত হয়। ছাত্রদিগের মধ্যে অজীর্ণ রোগের ইহা একটী প্রধান কারণ। গুরু ভোজনের পর পাঠাভ্যাসে রত হওয়া উচিত নহে।

(৩) আহারের সময়ের সম্বন্ধে একটা বাঁধা নিয়ম থাকা ভাল। কারণ এইরূপ অভ্যাসের ফলে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে স্বতঃই ক্ষুধার উদ্রেক হইবে ও পরিপাক উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবে। আমাদের দেশে কাজকর্ম্মহীন ধনীলোক বেলা একটা বা দুইটার সময় ভোজন করেন, বলা বাহুল্য ইহা নিতান্তই অস্বাস্থ্যকর। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অবস্থানুযায়ী ২ হইতে ৪ বার আহার করা উচিত, অবশ্য শিশু ও বালকের কথা স্বতন্ত্র। দিবসের প্রধান আহারের পর ৫ ঘণ্টা ব্যবধান দেওয়া উচিত। রাত্রে আহারের পর আমরা ঘুমের জন্য প্রায় ৭ ঘণ্টা সময় পাই।

(৪) উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাবেও অজীর্ণ রোগ জন্মে। আমরা যদি প্রতিদিন অন্ততঃ ১০ মিনিট কাল ব্যায়ামে অতিবাহিত করি, তাহা হইলে বোধ হয় অনেক স্থলেই অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতার হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারি।

(৫) আহারের সময়ে অধিক পরিমাণ জল পান করা উচিত নহে। ইহাতে পরিপাকের ব্যাঘাত হইতে পারে। অজীর্ণ রোগীদিগের মধ্যে অনেকেই আহারের দুই ঘণ্টাকাল পরে জল পান করিয়া থাকেন।

(৬) মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের মধ্যে অনেকেই সংসার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকেন। পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ সন্তানদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও কন্যার বিবাহ ইত্যাদি নানা কারণে মধ্যবিত্ত সংসারে আমাদের চিন্তায় ও মানসিক উদ্বেগে কালযাপন করিতে হয়। দুশ্চিন্তা, নিরাশা, উদ্বেগ, শোক প্রভৃতি নানা কারণ হইতে অজীর্ণ রোগের উৎপত্তি হয়।

(৭) ভেজাল মিশ্রিত খাদ্য অজীর্ণ রোগের আর একটী প্রধান হেতু। আজকাল দুগ্ধ, তৈল, ঘৃত, ময়দা, চিনি প্রভৃতি সকল খাদ্য দ্রব্যই বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া দুর্ঘট। পল্লীগ্রামবাসীদের অপেক্ষা সহরবাসীরা অজীর্ণ রোগে এই কারণে অধিক কষ্ট পাইয়া থাকেন।

কোষ্ঠবদ্ধতার কারণ সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা গেল—

অন্ত্রমধ্যে জল জমিলে খাদ্যের কঠিনভাগ অন্ত্রস্নায়ুসমূহকে উত্তেজিত করে। এই উত্তেনার ফলে অন্ত্রপেশী সমূহ সঙ্কুচিত হইয়া মল নির্গমনের সুবিধা করিয়া দেয়।

স্নায়ুমণ্ডলী অথবা পেশীসমূহের দুর্ব্বলতা হইলে সামান্য উত্তেজনায় কোন ফল হয় না। এ অবস্থায় অন্ত্রমধ্যে অধিক মল না জমিলে, অর্থাৎ উত্তেজনার আধিক্য না হইলে মল ত্যাগের বেগ আসে না। এজন্য প্রত্যহ নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। শরীর দুর্ব্বল হইলে এবং অসুস্থাবস্থায় এই কারণে কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মাইতে পারে। জোলাপ দ্বারা উত্তেজনা বৃদ্ধি করে এবং মল নির্গমের সুবিধা হয়। প্রত্যহ জোলাপ লইলে তাহার উত্তেজনা স্নায়ুমণ্ডলীর অভ্যস্ত হইয়া পড়ে এবং এইরূপ স্থলে বিশেষ ফল দর্শায় না। এই কারণেই প্রত্যহ জোলাপ সেবীর জোলাপের মাত্রা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হয়। মল ত্যাগের জন্য যে স্নায়বিক উত্তেজনা আবশ্যক, তাহা যে কেবল অন্ত্র হইতে আইসে এমন নহে, আমাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মস্তিষ্ক হইতেও মলত্যাগের আদেশ আসিতে পারে। নিয়মিত সময়ে মলত্যাগের অভ্যাস করিলে, আপনিই সেই সময়েই বেগ আইসে। অনেকের ধূম বা চা পান করিলে বেগ আসে। এস্থলে তামাক কিম্বা চায়ের যে কোন বিরেচক গুণ আছে, তাহা নহে। ইহা কেবলমাত্র অভ্যাসের ফল। উপযুক্ত পরিমাণ জল পান না করাও কোষ্ঠবদ্ধতার একটী প্রধান কারণ। আমরা দিবাভাগে যে জল পান করি তাহার অধিকাংশই মূত্র ও ঘর্ম্মরূপে নির্গত হইয়া যায় এবং ইহার অতি অল্প ভাগই অন্ত্রমধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারে।

অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া জল পান করা অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণের একটী প্রকৃষ্ট উপায়। নিদ্রিত অবস্থায় শরীরের অন্যান্য স্থানে জলের আবশ্যক কম বলিয়া অন্ত্রমধ্যে অধিক পরিমাণে জল যাইতে পায় এবং মল নির্গমনের সহায়তা হয়।

নিয়মিত ফল মূল ভোজনে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ দূর হয়। ফলের অসারভাগ অধিক বলিয়া, সেই সকল অসার অংশ, অন্যান্য খাদ্য অপেক্ষা অন্ত্রপেশী সমূহকে অধিক উত্তেজিত করে এবং মল নির্গমনের সুবিধা করিয়া দেয়। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে ফল মূল দুষ্প্রাপ্য বলিয়া, কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ সহরে অধিক দেখা যায়।

শারীরিক ব্যায়ামের অভাব কোষ্ঠবদ্ধতা রোগের আর এক প্রধান কারণ। ব্যায়ামের দ্বারা শারীরিক পেশীসমূহ বিশেষরূপে সঞ্চালিত হয়। উদরের পেশীসমূহ সঞ্চালিত হইলে মল নির্গমনের বিশেষ সুবিধা হয়। যে ব্যায়ামে উদরের পেশীসমূহ বিশেষরূপে সঞ্চালিত হয়, তাহাই কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর বিশেষ উপযোগী। শ্রমজীবী অপেক্ষা, যাঁহাদের অধিক মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় তাঁহারাই কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে অধিক কষ্ট পাইয়া থাকেন। শারীরিক ব্যায়ামের অভাবেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধতা ও অজীর্ণতার চিকিৎসা রোগীর অবস্থা ভেদে নানা রূপ হইয়া থাকে। আমরা এবিষয়ের আলোচনা না করিয়া, বিনা ঔষধে কি কি উপায় অবলম্বনে এই দুই রোগের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

(১) সকল সময় দাঁত পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

(২) খাদ্য তাড়াতাড়ি না গিলিয়া ভালরূপে চিবাইয়া খাইতে হইবে।

(৩) যথাসাধ্য সকল প্রকার তাড়া ও উদ্বেগ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

(৪) নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করিতে হইবে। কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর পক্ষে সিঁড়ি ও পাহাড়ে উঠা, বৈঠক করা প্রভৃতি বিশেষ উপকারী।

(৫) সাদাসিদা আহার করা এবং আহারের মাত্রার প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা কর্ত্তব্য।

(৬) আহারের পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করা উচিত। কার্য্যের পর ক্লান্ত হইয়া, অল্পক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া আহার করা উচিত নয়।

(৭) অজীর্ণ রোগীর আহারের সময় জল পান করা উচিত নয়, আহারের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে গরম জল গ্রহণ করান যাইতে পারে। আহারের অল্প পূর্ব্বে ঠাণ্ডাজল পান করা উচিত নয়। আহারের সময়, অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে কখনও বরফ জল পান করা উচিত নয়।

(৮) আহার গ্রহণের পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় আহার করা অনুচিত। জ্বর কিম্বা অসুখের সময় শরীরের অত্যধিক ক্ষয় হইলে, দুই ঘণ্টা অন্তর অল্প অল্প পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(৯) আঁট কাপড় বা পোষাক (যদ্দ্বারা উদরের রক্ত চলাচলের অসুবিধা হয়) পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(১০) আহারের সময় অন্য সকল ভাবনা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(১১) অতিরিক্ত খাওয়া বা ক্ষুধা না পাইলে খাওয়া উচিত নয়; পেট ভার থাকিলে আহার বন্ধ করিতে হইবে। অজীর্ণ রোগীর কখনও গুরুপাক খাদ্যাদি বেষ্টিত নিমন্ত্রণ স্থলে যাওয়া উচিত নয়।

(১১) চা পান আবশ্যক হইলে, চা মাত্র তিন মিনিট কাল গরম জলে রাখিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে। পাকস্থলীর ও স্নায়ুমণ্ডলীর উপর চার কিয়ৎপরিমাণ ক্রিয়ার ফলে অজীর্ণ রোগ জন্মায়। চা পান পরিত্যাগ করিতে পারিলেই উত্তম হয়।

(১৩) রন্ধন পাত্রাদি বিশেষ পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। অনেক স্থলে ব্যবহারের অব্যবহিত পরেই পাত্রাদি না ধৌত করিবার জন্য তৈল ঘৃতাদির পচন হয়। এই পচনই অজীর্ণ রোগের প্রধান কারণ।

(১৪) রুচিকর খাদ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে লালা নিস্রাব অধিক হয়, তদ্দ্বারা পাকস্থলী ও অন্ত্রমধ্যে হইতে অধিক রস নির্গত হয়। অরুচিকর খাদ্য গ্রহণে এই সকল রস নির্গত হয় না ও তজ্জন্য পরিপাকের বিশেষ অসুবিধা হয়।

(১৫) এক সঙ্গে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পান করা উচিত নয়। দুগ্ধ, ভাত কিম্বা বিস্কুটের সহিত খাওয়া ভাল।

(১৬) প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে পাইখানা যাওয়া কর্ত্তব্য।

(১৭) বিরেচক ঔষধাদি ব্যবহার না করাই ভাল। যাঁতা ভাঙা আটার রুটী ও প্রতিদিন নিয়মমত ফল খাওয়া কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

(১৮) বদ্ধমূল কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে, প্রতিদিন প্রাতে ও রাত্রে অল্পে অল্পে পেট টেপায় অধিক উপকার দর্শে।

(১৯) পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধতায় অন্ত্রধৌতি দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

শাস্ত্রীয় স্বাস্থ্য-কথা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবতারণ বিদ্যারত্ন লিখিত—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সদাচার।

ধন মান বয়োজ্ঞান সদৃশ সুবেশ।
বিমল মস্তক পরিষ্কৃত স্নিগ্ধ কেশ॥
দৃষ্টিমাত্রে বন্ধুজনে অগ্রে আলিঙ্গন।
পরে মনোহর বাক্যে সাধু আলাপন॥
অপরাধী জনে ক্ষমা দাম্ভিকতা ত্যাগ।
পরোপকারেতে সদা আর অনুরাগ॥
ধর্ম্ম অর্থ[উপ]র্জ্জনে আর কীর্ত্তি উপার্জ্জনে।
সতত উৎসাহ আর আশ্রিত পালনে॥
পর নিন্দা প্রাণি-হিংসা বাচালতা ত্যাগ।
সর্ব্ববিধ পরহিতে সদা অনুরাগ॥
পরদারা পরধনে বাঞ্ছা-পরিহার।
অশুভে ধাইলে মন দমন তাহার॥
দুষ্ট যান আর উচ্চ কঠিন আসন।
সর্ব্বথা উচিত হয় করিতে বর্জ্জন॥
নদীতীর বৃক্ষচ্ছায়া সেবনে বিরতি।
আর অতিস্রোতোজলে স্নানত্যাগে মতি॥
অগ্নিরাশি সমুখেতে বর্জ্জিবে গমন।
অনুচিত আর উচ্চৈঃস্বরেতে হসন॥
অনাবৃত মুখে হাস্য জৃম্ভা দোষ হয়।
মুখের আবরণ হাস্যে কর্ত্তব্য নিশ্চয়॥
অনুচিত হয় আর নখের বাদন।
নখ দ্বারা তৃণাদির আর বিখণ্ডন॥
দীপ্ত অগ্নি শিখা তীক্ষ্ম-জ্যোতিষ্ক মণ্ডল।
ঘৃণার্হ দ্রব্যেতে পূর্ণ আর ক্ষিতিতল॥
অতি হেয় পুরীষাদি দ্রব্যের দর্শন।
ত্যাজ্য হয় আর জনে অন্যায় ভৎর্সন॥
জনগণে ভীতিদান বলীসহ বাদ।
করিবে না আর একা সুখের আস্বাদ॥
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অত্যন্ত চালন।
ত্যাজ্য হয় ইহা জান শাস্ত্রের বচন॥
হিংস্র দংষ্ট্রী শৃঙ্গী প্রাণী সমীপে গমন।
পূর্ব্ববায়ু অতিরৌদ্র শিশির সেবন॥
কুটিলের সহস্থিতি অথবা মিত্রতা।
এই সব হয় ত্যাজ্য আর অসাধুতা॥
পাপাচারী ভৃত্যমিত্রাদিতে সাবধান।
গুরুতত্ত্ব জ্ঞাতজনে ন্যায্য মানদান॥
অবিজ্ঞাত দেশে আর একাকী নিশায়।
ত্যজিলে গমন তাহে কুশল ঘটায়॥
ত্যাজ্য হয় বক্রভাবে বসিয়া ভোজন।
আর বক্রদেহে ত্যাজ্য ক্ষবথু শয়ন॥
অসরল দেহে এই তিন আচরিলে।
জন্মে বহুবিধ ব্যাধি মানব সকলে॥

জনাকীর্ণ স্থানে কিম্বা দেবাদি ভবনে।
জন্মে বহু দোষ নরে থুৎকার ক্ষেপণে॥
নাসিকা হইতে শ্লেষ্মত্যাগে সেইরূপ।
হয় বহুবিধ দোষ থুৎকারে যেরূপ॥
চন্দ্র সূর্য্য দিকে কভু করিয়া বদন।
মলমূত্র ত্যাগ কিম্বা থুৎকার পাতন॥
না করিবে বিজ্ঞ নর আত্মহিতে রত।
সর্ব্বদা সুপাল্য ইহা জানিবে নিশ্চিত॥
জল অগ্নি বায়ু দ্বিজ গুরু দিকে আর।
সেই মত ত্যজিবেক উক্ত ব্যবহার॥
গরুর উপরে কিম্বা অগ্নির উপরে।
পদাঘাত না করিবে গর্ব্বিত অন্তরে॥
দেবতার পূজা কিম্বা পূজ্যের পূজন।
অশুচি জনের কার্য্য নহে কদাচন॥
বৃদ্ধ গুরু নৃপে মিষ্ট ভাষিবে বচন।
স্তুতিচ্ছলে নিন্দা নাহি করিবে কথন॥
জানিবেক সুনিশ্চয় যুক্তি সহকারে।
ব্যসন দুশ্চিন্তা ত্যাজ্য হয় সদাচারে॥
পাপান্বিত যাহাদের কার্য্য বাক্য মন।
তাহাদের সঙ্গ ত্যাগে করিবে যতন॥
যাহারা বিবাদপ্রিয় শঠ লোভী খল।
আর তাহাদের সঙ্গ ত্যাগে মহাফল॥
নিজের সুখ্যাতি নিজে করা ভাল নয়।
অসত্য কর্কশ বাক্য আর ত্যাজ্য হয়॥
অপবিত্র লোম অস্থি চর্ম্মাদি বসন।
স্পর্শ না করিবে কভু শুচি বিজ্ঞ জন॥

বামে শব শিবা জলপূর্ণ ঘট হেরি।
দক্ষিণে গো মৃগ বিপ্র দরশন করি॥
দেব দ্বিজ গুরু আর মঙ্গল জনক।
দ্রব্য স্পর্শ করি কিম্বা ঈশ স্মরি লোক॥
করিলে গমন কার্য্যে শুভ ফল হয়।
শঙ্কটে না পড়ে ইথে জানিবে নিশ্চয়॥
মল মূত্র বেগ কভু উপস্থিত হলে।
অগ্রে মল মূত্র ত্যাগ করিবে সকলে॥
পশ্চাতে করিবে অন্য কার্য্য যাহা হয়।
পালিবেক ইহা নিত্য নর সমুদয়॥
প্রাতঃকৃত্য দেব পিতৃ কৃত্যাদি করিয়া।
যোগ্য কাল আত্মহিত দ্রব্য বিচারিয়া॥
শুদ্ধ দেহে শুদ্ধবেশে রত্ন মাল্য পরি।
হস্তপদ ধৌত আর আচমন করি॥
সুখাসনে ঋজুদেহে বসি স্থির মনে।
সুস্থানে সুপাত্রে রত হইবে ভোজনে॥
দোষহীন শুচি পটু পাচক পাচিত।
অন্নাদি ভোজনে হয় হিত সমুচিত॥
দধি ঘৃত মধু শক্তু খাইবে নিঃশেষ।
অন্য ভোজনেতে কিছু রাখিবেক শেষ॥

চরক ও মহাভারত।

আগন্তুজ রোগের হেতু।

দেব গ্রহ বিষ বায়ু অগ্নি অভিঘাত।
আর অভিশাপ করে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত॥
জন্মায় ইহাতে ব্যাধি নাম আগন্তুজ।
প্রজ্ঞাদোষ তার বীজ জানিবে মনুজ॥

আর প্রজ্ঞাদোষে হয় মনের বিকার ;
তাহাতে ঈর্ষাদি জন্মে দেহে সবাকার ॥
প্রজ্ঞাদোষ মহাদোষ স্বাস্থ্য করে নাশ ।
থাকিলে নিশ্চয় পরে করায় হুতাশ ॥
প্রজ্ঞাদোষ শোধনের এই সদুপায় ।
গুরু শাস্ত্র বাক্যে আর অধ্যাত্ম বিদ্যায় ?
স্থিতি সদা আর সদাচারের পালন ।
ইহাতে প্রজ্ঞার দোষ করয়ে শোধন ॥

চরক ।

(ক্রমশঃ)

দর্শনেন্দ্রিয় ।

ডাক্তার শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এল্, এম্, এস, লিখিত—

সকল ইন্দ্রিয়েরই এক একটী বিশেষ বিশেষ কার্য্য ও প্রয়োজনীয়তা আছে । কারণ ইহারা সকলেই আমাদের মস্তিষ্কে স্নায়ুর দ্বারায় সর্ব্বদা অতি আবশ্যকীয় সংবাদ পাঠাইতেছে । মস্তিষ্ক তাহা ভাল মন্দ বিচার করিয়া সুখ দুঃখ উপলব্ধি করিতেছে ও বিপদ্ হইতে প্রয়োজনীয় রূপে সতর্ক হইতেছে । এই সকল ইন্দ্রিয়ের সুস্থ ও সবল অবস্থায় সামঞ্জস্য করিয়া কার্য্য করাই আমাদের জীবনের সকল সুখের মূলাধার ।

দর্শনেন্দ্রিয় যে সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অধিক মূল্যবান ও আবশ্যকীয় সে কথা কাহাকেও বলিতে হইবে না । অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় অপরের ও আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কি প্রয়োজনীয় ও কি করিলে কোথায় তাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহা আমরা বলিতে পারি না । চক্ষু মুদ্রিত করিলে যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধের দ্বারায় বুঝিতে পারি না, চক্ষু খুলিলেই তাহাদের প্রকৃত অস্তিত্ব কিরূপ তাহা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারি । উপস্থিত বিপদ্ দেখিলে আমরা অতি সত্বর তাহার প্রতিকারে যত্নবান্ হই । রেলের গাড়ীর চালক বা জাহাজের নাবিক দূর হইতে লাল কি সবুজ নিশানা দেখিয়াই সকল বুঝিতে পারে ও সেই মত গাড়ী ও জাহাজ চালায় । দৃষ্টিশক্তিহীনতায় সময় সময় কত বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে ।

মনুষ্য চক্ষুর চিত্র

(দ্বিখণ্ডে বিভক্ত)

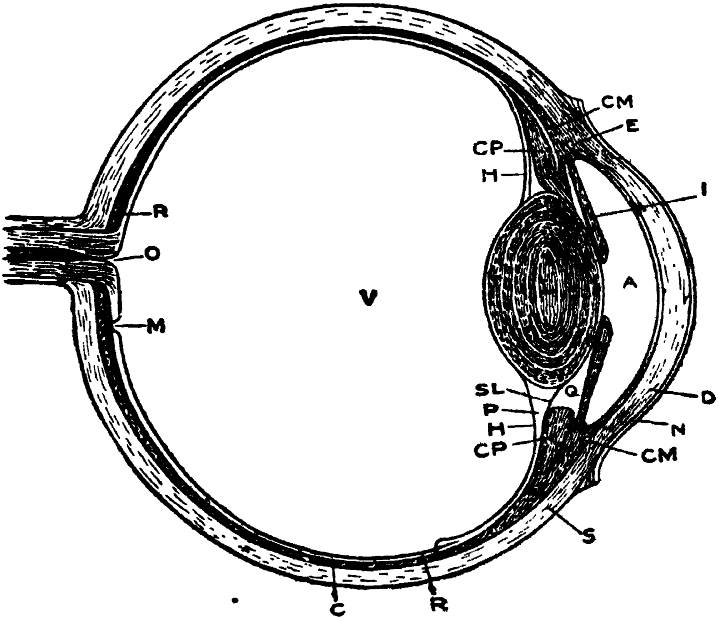


DIAGRAM OF HUMAN EYE IN SECTION.

S. Sclerotic.
D. Cornea.
N. Epithelial Layer of Cornea.
C. Choroid.
I. Iris.
C.P. Ciliary Processes.
C.M. Ciliary Muscle.
E. Canal of Schlemm.
R. Retina.

M. Macula Lutea.
O. Optic Disc
S.L. SuspensoryLigamentof Lens.
H. Hyaloid Membrane.
P. Canal of Petit.
V. Vitreous Humour.
Q. Posterior Chamber.
A. Anterior Chamber.
L. Crystalline Lens.

S. এস্‌ক্লেরটিক্
D. কর্‌নিয়া
N. কর্‌নিয়ার আচ্ছাদন
C. কোরয়েড্
I. আইরিস
C. P. সিলিয়ারি প্রোসেস্
C. M. সিলিয়ারি পেশী
E. সেম নালী
R রেটিনা

M, মেকুলা লিউটিয়া
O. অপটিক্ ডিস্ক
S. L, সাস্‌পেনসারি লিগামেণ্ট
H. হায়েলয়েড্ মেম্‌ব্রেন্
P. পেটিট্ নালী
V. ভিট্রাস্ হিউমার্
Q. পোষ্টিরিয়ার চেম্বার
A. এন্টিরিয়ার চেম্বার
L. লেন্স

দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারাই জীবনের কতকগুলি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ আমরা ভোগ করিয়া থাকি। আমরা যাহাদের ভালবাসি তাহাদের মুখ, তাহাদের হাঁসি দেখিয়া সুখী হই। অসীম নীল আকাশ, প্রশান্ত সমুদ্র ও প্রকৃতির সহস্র সহস্র প্রকারের দৃশ্যাবলী দেখিয়া আমরা নয়ন সার্থক করিয়া থাকি। অন্ধ হইলে যে জীবনের কত সুখে বঞ্চিত থাকিতে হয় তাহা বলা যায় না!

আমরা আলোকের সাহায্যে দেখিতে পাই। চক্ষু যন্ত্রটী একটী ফটোগ্রাফের ক্যামেরার মতন, কেবল চতুষ্কোণ না হইয়া ইহা একটী গোলাকার বলের মতন। ক্যামেরার সম্মুখে একখানি কাচ আছে, তাহাকে "লেন্স" (Lens) বলে। কোনও বস্তুর প্রতিকৃতি এই কাচের ভিতর দিয়া গিয়া একস্থানে পড়ে সেখানে সেই বস্তুর প্রতিকৃতি উঠিয়া যায়। আলোক কম ও বেশী থাকিলে বস্তুর প্রতিকৃতিও স্পষ্ট ও অস্পষ্ট হইয়া থাকে। সেজন্য আলোক আবশ্যক মত কম বেশী করিবার উপায় এই "ক্যামেরার" সম্মুখে আছে। ক্যামেরার ভিতরটীও কাল রং করিয়া রাখা হইয়াছে।

এই সকল বিষয়ই অবিকল চক্ষুর ভিতর আছে। সম্মুখে কাচ বা 'লেন্স' ভিতরটী একটী কাল পর্দ্দায় আবৃত। কাচের সম্মুখেই একটী গোলাকার পর্দ্দা আছে তাহাকেই আইরিস্ (Iris) বলে। আলোক বেশী হইলে এই পর্দ্দা আকুঞ্চিত হয় আর অন্ধকার হইলে ইহা প্রসারিত হইয়া থাকে। এই পর্দ্দাটী এতদ্দেশীয় লোকের চক্ষুতে কাল বা ধূসর রংয়ের দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপীয়দিগের ভিতর প্রায়ই নীলাভ হইয়া থাকে। যাহা হউক এই রঙ্গীন পর্দ্দার মাঝে একটী সুগোল ও কাল ক্ষুদ্র বিন্দু দেখিতে পাই। ইহাই চক্ষুর জানালা বা কনীনিকা। চক্ষুর ভিতরটী কাল হওয়ার জন্য এই জানালাটী কাল দেখা যায়। যেমন ঘরের ভিতরটী অন্ধকার থাকিলে একটী ক্ষুদ্র জানালা দিয়া দেখিলে ঘরের ভিতরটী কাল দেখা যায়।

দর্শন শক্তির প্রকৃত যন্ত্র চক্ষুর পশ্চাৎভাগে আছে। এই পর্দ্দার গাত্রে দৃষ্ট বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। আর এই বিচিত্র যন্ত্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সকল সংলগ্ন

থাকিয়া মস্তিষ্কের সহিত যুক্ত হইয়াছে। চক্ষুর সম্মুখে কি বস্তু আছে তাহা এই স্নায়ুর সাহায্যেই মস্তিষ্ক বুঝিতে পারে।

মস্তকের সম্মুখ ব্যতিরেকে শরীরের অন্য কোনও স্থানে চক্ষু থাকিলে বোধ হয় এরূপ সুবিধা হইত না। আর দুইটী চক্ষু থাকাতে আমরা বস্তুর প্রকৃত আকৃতি ও পরিমাণ বুঝিতে পারি ও ভাল রকম করিয়া দেখিতে পাই। এক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অপর চক্ষুর সাহায্যে এক হস্ত পরিমাণ দূরে আমরা যদি লোন্সনের অগ্রভাগ ধরিতে যাই তাহা হইলে হঠাৎ তাহা পারা যায় না। ইহা সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

সম্মুখ ব্যতীত চক্ষুর চারিদিকই অস্থির প্রাচীর দ্বারাই রক্ষিত হইয়াছে। ইহাকেই চক্ষুকোটর বলে। চক্ষুর চারিদিক একখণ্ড চর্ব্বির ন্যায় পদার্থে আবৃত থাকায় তাহাতে কোনরূপ আঘাত পাইতে পারে না। চক্ষুর চারিদিকে ছয়টী মাংসপেশী সংলগ্ন আছে। তাহাদের আকুঞ্চন ও প্রসারণে আমরা মাথা নরাইয়াই উপর নীচে বা পার্শ্বে যে দিকে ইচ্ছা দেখিতে পারি। চক্ষু মুদ্রিত করিবার প্রয়োজন হইলে আমরা চোখের উপরকার ও নীচেকার পাতা বন্ধ করিতে পারি। পাতার অগ্রভাগে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোম আছে তাহাতে ধূলা বা অপর কোনও পদার্থ চক্ষে পড়িতে পারে না। চক্ষুর উপরকার পাতার নীচে একটী জল নিঃসারণের যন্ত্র আছে। তাহাকে (Tear gland) টিয়ার গ্লাণ্ড বলে। তাহা হইতে সর্ব্বদাই সামান্য সামান্য জল নিঃসারিত হওয়ায় চক্ষুর সম্মুখ ভাগ পরিষ্কৃত থাকে। এই যন্ত্র হইতে নাসিকার ভিতর পর্য্যন্ত একটী ক্ষুদ্র নল আছে। যখন আমাদের দুঃখ হয় কিম্বা আমরা ক্রন্দন করি তখন এই যন্ত্র হইতে জল বাহির হয় ও কিছু নাসিকার ভিতরও আসে।

এখানে চক্ষু সম্বন্ধে অতি সামান্যই বলা হইল। কিন্তু যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই সকলের ধারণা হওয়া কর্ত্তব্য যে এই বিশেষ প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয়ের কোন রকম অনিষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়। অতিরিক্ত উগ্র আলোক বা অতি ক্ষীণ প্রদীপে আমাদের পাঠ করা উচিত নয়। যে আলোক বাতাসে কেবল নড়িতেছে সেরূপ আলোতে পড়াও ভাল নয়। পাঠ করিবার সময় মাথা বেশ উন্নত করিয়া রাখা উচিত। টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পাঠ করা কদাপি কর্ত্তব্য নয়।

তাহাতে আমাদের চোখের অনিষ্ট হয়। প্রয়োজন হইলে বরং বইখানি সুবিধামত চোখের নিকটবর্ত্তী করা উচিত। অনেকের শুইয়া পাঠ করা অভ্যাস, তাহাতেও চক্ষুর হানি হইয়া থাকে। খারাপ কাগজে ও অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে ছাপা পুস্তক পাঠ করায় দৃষ্টিশক্তিতে অনাবশ্যক জোর লাগায় দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আইসে।

চক্ষু কোন কারণে চুলকাইলে বা ব্যথিত হইলে তাহা ঘর্ষণ না করিয়া যতদূর সম্ভব স্থির অবস্থায় রাখা কর্ত্তব্য। এরূপ প্রদাহ হইলে পরিষ্কার গরম জলে চক্ষু ধৌত করিলে ভাল হয়। ঠাণ্ডা অপরিষ্কার জল বা দুগ্ধ দ্বারা কদাপি ধৌত করা উচিত নয়। সুচিকিৎসকের নিকট হইতে চক্ষু ধোয়াইবার ঔষধের ব্যবস্থা লওয়া দরকার। চক্ষু আমাদের এতই মূল্যবান্ যে তাহার কিছুমাত্র অনিষ্ট সম্ভাবনা দেখিলে তখনি তাহার প্রতিকারে যত্নবান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বালক বালিকাদিগের ভিতর অনেকেরই দৃষ্টিশক্তি কম দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও আজন্ম দৃষ্টি হীনতা দেখা গিয়া থাকে পড়িবার সময় বই খানি চক্ষুর খুব নিকটে না আনিলে ভাল দেখা যায় না, দূরের বস্তু অস্পষ্ট দেখায়। ইহাদিগকে 'মায়োপিক্' (myopic) বলে। কোনও বালকের দৃষ্টিশক্তি কম হইলে অভিভাবকের তাহা অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। তখন ডাক্তারকে দেখাইলে চসমা প্রভৃতি দ্বারা চক্ষু অনায়াসে ভাল হইতে পারে। এ সকল বিষয়ে অবহেলা করিলে চক্ষুর অস্বাভাবিক পরিচালনে আরও ক্ষতি হইয়া থাকে জানি। চক্ষুর অনেক রোগই সংক্রামক। সে জন্য বাড়িতে একজনের চোখ উঠিলে সকলেরই সাবধান হওয়া দরকার। অপরিষ্কার হস্ত কখনও চক্ষুতে দিবে না। অপরে যে গামছা ব্যবহার করে বা যে জলপাত্রে মুখ ধোয় তাহা ব্যবহার করা উচিত নয়।

বঙ্গদেশের গ্রামসমূহের জলের অবস্থা।

বঙ্গদেশের গ্রাম্য জলের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আমাদের সহৃদয় গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর দার্জ্জিলিং শৈলে দেশস্থ মুখপাত্র বড় লোকদিগকে আহ্বান করিয়া এক মন্ত্রণা বৈঠক বসাইয়াছিলেন। গভর্ণর বাহাদুর স্বয়ং এই সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে তাঁহার সভার দেশীয় মেম্বর মৌলবী সামসুল হুদার নেতৃত্বে সভাতে বিভিন্ন প্রকার জলের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে বিচার হইয়াছিল। এই বৈঠকের আলোচনার ও মন্তব্যের সারাংশ ১৩ই নভেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

বিশুদ্ধ পানীয় জল যে আমাদের সুখ ও স্বাস্থ্যের প্রধান উপাদান তাহা বলা অত্যুক্তি মাত্র। আমাদের মহামান্য গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর প্রায়ই সকল প্রধান প্রধান সহরে বিশুদ্ধ কলের জলের সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে তথাকার অধিবাসীরা যথেষ্ট সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে।

কিন্তু এই বঙ্গদেশ কৃষি প্রধান দেশ। ছোট ছোট গ্রাম দ্বারা পরিপূর্ণ। প্রত্যেক গ্রামে জলের কল স্থাপন কদাচ সম্ভবে না। গ্রামবাসীদিগকে পুষ্করিণী বা নিকটস্থ নদীর জলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। এই সকল নদী বা পুষ্করিণীর জলই বঙ্গদেশবাসীর জীবন স্বরূপ।

যাহাতে এই সকল পুষ্করিণীর বা নদীর বিশুদ্ধ পরিষ্কৃত জল এই দেশবাসীরা ব্যবহার করিতে পারে এবং রোগ জরা ও অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ জন্যই এই মন্ত্রণা বৈঠক বসিয়াছিল।

গ্রামবাসীদের জন্য বিশুদ্ধ জল সরবরাহ দুই প্রকার হইতে পারে।

১। নূতন পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করা—

২। পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা বা যাহাতে পুষ্করিণীর জল দূষিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা—

গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর উপর এই কার্য্যের ভার অর্পণ করিবেন এবং দেশীয় সহৃদয় জমিদারবর্গেরাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইযাছেন। সে জন্য তাঁহারা সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

কিন্তু আমাদের পুষ্করিণী বা নদী এবং বিলের জল কি প্রকারে অবিশুদ্ধ হয় তাহার আলোচনা দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে এদেশবাসী লোকদের অজ্ঞতাই ইহার মূল কারণ। মহামান্য সহৃদয় গভর্ণর বাহাদুর, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপালিটী এবং জমিদার বর্গের চেষ্টায় অসংখ্য পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হইবে এবং সহস্র সহস্র পুষ্করিণী খোদিত হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাদিগকে বিশুদ্ধ অবস্থায় রাখিবার জন্য প্রত্যেক দেশবাসীকে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। তবে এ মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইবে।

এইজন্য প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর মহা কর্ত্তব্য রহিয়াছে। যাহাতে অশিক্ষিত অধিবাসীরা এই বিশুদ্ধ জলের উপকারিতা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারে প্রত্যেক শিক্ষিতকে সাধ্যানুসারে অশেষ চেষ্টা দ্বারা তাহা করিতে হইবে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির কি করা কর্ত্তব্য এবং কি প্রকারে অশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে বুঝাইতে হইবে তাহার কার্য্য প্রণালী কি ?

এইজন্য আগামী পৌষ সংখ্যা "স্বাস্থ্য-সমাচারে" পানীয় জল সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা প্রকাশিত হইবে। যথা :—

১ জলের সহিত শরীরের সম্বন্ধ।
২ বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পানীয় জলের অবস্থা।
৩ কি প্রকারে জল দূষিত হয়।
৪ দূষিত জলের প্রকৃতি এবং দূষিত জল নির্ণয়।
৫ দূষিত জল শোধন।
৬ জল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা।
৭ দূষিত জল বঙ্গদেশের কি ক্ষতি করিতেছে।
৮ গ্রামবাসীরা কি প্রণালীতে ব্যবহার করিলে জল দূষিত হই
৯। দূষিত জল সম্বন্ধে কি প্রকারে সাধারণকে শিক্ষা দিতে হই
১০। কি উপায়ে সাধারণকে জল দূষিত করা হইতে নিবৃত্ত রাখি

থুতু ফেলা।

আমাদের দেশে অনেকেই যেখানে সেখানে থুতু ফেলিয়া থাকেন। ইহা অতিশয় কদভ্যাস ও স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হানিকর। অনেক বাটীতে সুসজ্জিত গৃহের দেওয়ালেও থুতু, গয়ার এবং পানের পিচে রঞ্জিত দেখিতে পাওয়া যায়। বহুলোকে তামাক পান খাইয়া ইতস্তত থুতু ফেলিতে খারাপ বোধ করেন না। যেখানে সেখানে থুতু ফেলা কিরূপ স্বাস্থ্য হানিকর নিম্নে তাহা লিখিত হইল। সকলেরই এই কদভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত। প্রত্যেক পিতা মাতা ও শিক্ষকের বালক বালিকাদিগকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

থুতুর দ্বারাই যক্ষ্মারোগের বীজাণু সংক্রামিত হইয়া থাকে। যক্ষ্মাবীজ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেও অনেকদিন পর্য্যন্ত কোনরূপ রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় না, কিন্তু এইরূপ রোগীর থুতুর সহিত অনেক সময় যক্ষ্মা বীজাণু বাহির হইতে পারে। এজন্য আমাদের স্বাস্থ্য ভাল বোধ হইলেও যেখানে সেখানে থুতু ফেলা উচিত নয়।

কেবল মাত্র থুতুর দ্বারা যে যক্ষ্মারোগই সংক্রামিত হয়, এরূপ নহে। সর্দ্দি রোগও থুতু এবং কফ দ্বারা একের দেহ হইতে অন্যের শরীরে প্রবেশ করে। রুমালে নাক ঝাড়িবার সময় অংখ্য সর্দ্দি বীজাণু রুমালে ও হস্তে লাগিয়া যায়। এইরূপে সর্দ্দিরোগী অপর ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলে সর্দ্দি সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা। যক্ষ্মারোগীর থুতু ও সর্দ্দি শুষ্ক হইলেও বীজাণু সমূহ অনেকদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে এবং ধূলি ও বায়ু সংযোগে চালিত হইতে পারে। সর্দ্দি সামান্য রোগ হইলেও অন্যান্য গুরুতর ব্যাধি আনয়ন করে।

আমাদের শরীর মধ্যে যক্ষ্মা কিম্বা সর্দ্দি না থাকিলেও ইতস্তত থুতু ফেলা উচিত নয়। সুস্থ ব্যক্তির মুখ মধ্যে যে পরিমাণ লালাস্রাব হয় তাহাতে যখন তখন থুতু ফেলিবার আবশ্যক হয় না। যাঁহারা অনবরত থুতু ফেলিয়া থাকেন, তাঁহাদের কোন না কোন রোগ আছে বুঝিতে হইবে এবং এই রোগ থুতু দ্বারা সংক্রামিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে।

আমাদের শরীরে কোন রোগ নাই নিশ্চিত জানিলেও, যেখানে সেখানে থুতু ফেলা উচিত নয়। কারণ এই অসৎ দৃষ্টান্তের ফলে রোগীরাও থুতু ফেলিতে আরম্ভ করিবে। অনেক দেশে রাস্তার যেখানে সেখানে থুতু ফেলা আইনানুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ।

যদি সকলে থুতু ফেলা সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে উপস্থিত যক্ষ্মা-রোগিগণের সঙ্গে সঙ্গেই যক্ষ্মা রোগ পৃথিবী হইতে একেবারে নির্ম্মূল হইতে পারে।

যক্ষ্মারোগ চিকিৎসাতে বিশ্রামের আবশ্যকতা।

আমেরিকার "Journal of Outdoor Life" নামক পত্রিকাতে ডাক্তার প্রাই এম, ডি, মহোদয় যক্ষ্মা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

যক্ষ্মা রোগে বিশুদ্ধ বায়ুতে বিশ্রামে যেরূপ ফল লাভ হয় তাহা আর অন্য কোনরূপ চিকিৎসায় দেখা যায় না। রোগী ব্যায়াম কিম্বা চলাফেরা না করিলে শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি লাভ করে; রোগীর ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং শরীরের পুষ্টিও সম্যক্‌রূপ সম্পাদিত হয়। বিশ্রামে রোগী নানারূপ উপসর্গের হস্ত হইতেও নিস্তার পায়। অধিক দিন বিশ্রামের ফলে অনেক যক্ষ্মা রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। সময় সময় বৎসরাধিক কাল এইরূপ বিশ্রামের আবশ্যক হইতে পারে।

রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে বিছানা হইতে উঠিতে দেওয়া উচিত নহে এমন কি বিছানায় বসিতে দেওয়াও ঠিক নহে। রোগের বৃদ্ধি বন্ধ হইলে পর রোগীকে প্রত্যহ ½।১ ঘণ্টাকাল ঠেস্ দিয়া বসিতে দেওয়া যাইতে পারে। পরে ক্রমশঃ রোগীকে অল্প চলিতে ফিরিতে দেওয়া যাইতে পারে।

অল্প চলাফেরার পর রোগীর মলদ্বার মধ্যে তাপ লইবে এবং যদি তাপ বেশী দেখা যায় তাহা হইলে ১৫ মিনিট অন্তর চারি বার দেখিতে হইবে। যদি চলা ফেরার ১৫ মিনিট পরে গুহ্যমধ্যের তাপ ৭৯'৪ না দেখা যায় তাহা হইলে চলা ফেরা কমাইয়া দেওয়া বা একেবারে বন্ধ করা উচিত।

প্রথমতঃ ৫ মিনিট বেড়াইতে দিবে। পরে প্রতি সপ্তাহে ৫ মিনিট করিয়া বাড়াইয়া ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত করিবে।

পরে এই ভ্রমণ আরও শীঘ্র শীঘ্র বাড়াইবে এবং কোন রোগীকে ১ ঘণ্টা হইতে ২ ঘণ্টার বেশী বেড়াইতে দিবে না।

ভিজা তোয়ালের দ্বারা প্রত্যহ প্রাতে গা মুছাইয়া দিবে এবং পরে রোগী আপনিই নিজে এই কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

যে সকল রোগী অল্পই পীড়িত তাহারা টবের মধ্যে ১০ মিনিট যাবৎ অবগাহন স্নান করিতে (৯০°—৯৫° তাপের) পারিবে।

দীর্ঘকালব্যাপী বিশ্রাম দ্বারা এই সকল যক্ষ্মা রোগীর রোগ সম্পূর্ণভাবে প্রতিরুদ্ধ হয় (Specific Immunity) যাঁহারা এই প্রকারে আরোগ্য হইয়া পুনরায় পরিশ্রম সাধ্য কাজ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আর রোগ পুনরায় দেখা যায় নাই।

বিশ্রাম দ্বারা (যত দীর্ঘব্যাপী হউক না কেন) কোন যক্ষ্মা রোগীর কখনও ক্ষতি হইতে দেখা যায় নাই। অপর পক্ষে অঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা যক্ষ্মা রোগীদিগকে সদাসর্ব্বদা নানা প্রকার কষ্ট পাইতে দেখা যায়।

বিবিধ সংগ্রহ।

কৃত্রিম দুগ্ধ—জার্মাণ দেশীয় তিনজন বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম উপায়ে দুগ্ধ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই দুগ্ধ আকৃতিতে, স্বাদে ও গন্ধে প্রকৃত দুগ্ধের অনুরূপ। ইহা দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক কাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে এবং অতি সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

সমগ্র ভারতীয় বৈদ্য সভা—আগামী ২৯শে, ৩০শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর কানপুরে সমগ্র ভারতীয় বৈদ্য সভার চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ বৈদ্যরত্ন যোগেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

বাঁশী বাজান—আমাদের দেশে অনেকের ধারণা যে যাঁহারা বাঁশী, ফ্লুট, ক্লেরিওনেরট ইত্যাদি বাজান তাঁহাদের যক্ষ্মা ইত্যাদি হইবার সম্ভাবনা অধিক। বাস্তবিক পক্ষে এই ধারণা ঠিক নহে। বাঁশী বাজাইবার সময় বায়ু ফুসফুসের সমস্ত বায়ুকোষকে পূর্ণ করে। সমস্ত বায়ু-কোষ পূর্ণ হইলে যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা অল্প। এদেশে যে শ্রেণীর লোকে কনসার্ট ইত্যাদিতে বাঁশী বাজান, তাহাদের মধ্যে অনেকেই নানাপ্রকার অনিয়ম ও অত্যাচার করিয়া থাকেন। অত্যাচারের ফলে রোগাক্রান্ত হইলে অত্যাচারের দোষ না দিয়া বাঁশীকে দোষ দেওয়া অন্যায়। বাঁশী বাজান শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হইলেও অতিরিক্ত ভাল নহে।

ডাক্তার ম্যাক্স ব্যাফ্—ব্যাফ সাহেব ক্লার্ক ইউনিভারসিটীর একজন ফেলো। ইনি X Rayর সাহায্যে, পীড়িত ব্যক্তির মস্তিষ্কের ভিতরের অবস্থা নিরূপণের জন্য একটী স্বতন্ত্র যন্ত্র প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ডাক্তার সাহেব বলেন এই যন্ত্রের সাহায্যে লোক প্রকৃতস্থ কি উন্মত্ত, দোষী কি নির্দ্দোষী মনে মনে কোনরূপ মন্দ অভিসন্ধি কল্পনা করিতেছে কি না, ভাল মন্দ সর্ব্বপ্রকার মনের ভাব জানিতে পারা যাইবে।

প্লেগ রোগের টীকার তালিকা—১৯১১ সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ৯৩৬৪৪ জন লোকে প্লেগ রোগের টীকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ধারওয়া নগরেই ৩৩০৪৭ জন। ইহাদিগের মধ্যে ৮১ জন মাত্র প্লেগাক্রান্ত হইয়াছিল ও ৩৮ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এই ৩৮ জনের মধ্যে ৩৬ জন প্লেগ রোগাক্রান্ত অবস্থাতেই টীকা গ্রহণ করিয়াছিল। অবশিষ্ট দুইজনের মধ্যে একজন এক মাস ও অপরটী দুই মাস পরে এই রোগগ্রস্ত হইয়াছিল।

বিজাপুরে ৩৫৯০ জনে টীকা গ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে ২৮ জনের প্লেগ ও ৮ জনের প্লেগে মৃত্যু হইয়াছিল। সেই স্থানের অবশিষ্ট ৬৪১০ জন টীকা গ্রহণ করেন নাই ইহাদিগের মধ্যে ১২২৮ জন রোগাক্রান্ত ও ৮ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

উপরোক্ত তালিকাতে এবম্বিধ টীকার উপকারিতা বা অনুপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বুঝা যায় না;

কিরূপ আলোকে পড়া উচিত—কিরূপ আলোকে পড়া উচিত সে বিষয়ে সাধারণ লোকের মধ্যে নানাপ্রকার ভ্রান্তমত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে মনে করিয়া থাকেন, প্রদীপ কিংবা মোম বাতির আলোক স্নিগ্ধ ও চক্ষুর পক্ষে হিতকর। ইহাদের মতে উজ্জ্বল কেরোসিন, গ্যাস বা বৈদ্যুতিক আলোকে পাঠ করা একেবারে উচিত নহে। চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল আলোক রাখিয়া পাঠ করা বাস্তবিকই অন্যায়। প্রদীপ বা মোম বাতিতেও যথেষ্ট আলোক হয় না, এবং ক্ষুদ্র অক্ষর পড়িতে হইলে চক্ষু বিশেষ পরিশ্রান্ত হয়। এজন্য যাঁহারা অধিক লেখা

পড়া করেন তাঁহাদের প্রদীপ কিম্বা মোম বাতির আলোকে পাঠ করা উচিত নহে। রাত্রিকালে পাঠের জন্য উজ্জ্বল আলোকই প্রশস্ত। পাঠের সময় আলোক পশ্চাদ্ভাগে ও উচ্চে রাখা কর্ত্তব্য এবং এই আলোক পাঠকের বাম পার্শ্বে রাখা দরকার। ইহাতে পাঠের বা লিখিবার কোন প্রকার অসুবিধা হইবে না এবং চক্ষেও উজ্জ্বল আলোক লাগিবে না। অনেকের কেরোসিনের আলোকে পাঠ করিলে মাথা ধরে। ইহার কারণ এই তাঁহারা আলোক সম্মুখে ও অতি নিকটে রাখিয়া পাঠ করেন। এই জন্য আলোকের সমস্ত বাষ্প, ধূম ও তাপ তাঁহাদের সহ্য করিতে হয় ক্রমে ইহারই ফলে তাঁহারা পীড়িত হন। পুস্তকের কাগজ চক্‌চকে হইলে তাহা এরূপভাবে ধরা আবশ্যক, যেন চক্ষে প্রতিফলিত আলোক না পড়ে। শীতকালে দোর বন্ধ করিয়া কেরোসিনের আলোকে পাঠ করা অস্বাস্থ্যকর। রৌদ্রে বসিয়া পাঠ করাও অন্যায়।

ম্যালেরিয়া কমিটি—মাদ্রাজ সহরে All India Sanitary Conference এর তৃতীয় অধিবেশনে, ম্যালেরিয়া কমিটির সভাপতি সার্জ্জন জেনারেল মাননীয় ডাক্তার লিউকিস্ সাহেব ম্যালেরিয়া নিবারণের সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মতামত ব্যক্ত করিয়া ১৮ই নভেম্বর তারিখে বক্তৃতা করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য সাধারণের জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য কার্য্যাবলীর মধ্যে তিনি (১) জঙ্গল পরিষ্কার সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন। অত্যধিক বৃক্ষলতাদি ও ম্যালেরিয়ার বৃদ্ধি প্রায় একত্রই দেখা যায়। জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমিয়া যায়। সমতল প্রদেশে এই প্রণালী বিশেষ কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

(২) আবদ্ধ জল নিকাশ—গ্রামস্থ খানা, ডোবা সকল ভরাট করা এবং পুষ্করিণী পরিষ্কার করা এবং জলজ বৃক্ষাদি সকল বিনাশ করা উচিত, যেহেতু ইহাদের মধ্যেই মশক শাবকেরা গুপ্তভাবে শত্রুদিগের ভয়ে লুক্কায়িত থাকে।

(৩) মশক ধ্বংসকারী মৎস্যের বৃদ্ধি—কয়েক প্রকার মৎস্য মশকের শাবকদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা যদি জলমধ্যে বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে জলাশয়স্থ মশক বংশ নির্ম্মূল হয়।

(৪) বিশুদ্ধ পানীয় জল—বিশুদ্ধ পানীয় জল যে অত্যাবশ্যক তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যদি কোন কারণে আমাদের স্বাস্থ্য দুর্ব্বল হয় তাহা হইলে আমাদের শরীর মধ্যস্থিত ম্যালেরিয়ার জীবাণু সকল অতি দ্রুতবেগে বর্দ্ধিত হয়, এবং যদি শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যা কমিয়া যায়। ব্যক্তিগতস্বাস্থ্যের উন্নতিই ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। এই জন্য গ্রামবাসীদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক।

(৫) জনসাধারণের সাহায্য—গত বৎসর ১২ই ডিসেম্বর তারিখে যশোহরে রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরের যত্নে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় এক ম্যালেরিয়া নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভায় উপরোক্ত প্রণালীতে গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের কার্য্য হইতেছে। আমরা আশা করি যেন এই সভার চেষ্টা সফল হয়। রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার মহাশয় জনসাধারণকে এই পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন এজন্য তাঁহাকে আমরা আহ্লাদের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। সাধারণের এই প্রকার সহানুভূতি ও সমবেত চেষ্টা হইলেই গভর্ণমেণ্টের ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টা কৃতকার্য্য হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৬) কুইনাইনের ব্যবহার—গত বারমাস যাবৎ কুইনাইনের ব্যবহার বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে। অনেক পরীক্ষাকারী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, নিয়ম মত প্রত্যহ অধিক মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার সত্ত্বেও $\frac{1}{3}$ অংশ লোকের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গিয়াছিল। এজন্য অনেকে মনে করেন যে এ দেশীয় মানবদেহে কুইনাইনের কার্য্য তত উপযোগী নহে।

ডাক্তার টমসন্ মহোদয় বলেন যে প্রত্যহ মাত্র ৫ গ্রেণ কুইনাইন সেবন যথেষ্ট নহে। এই মাত্রায় মশক দ্বারা প্রবিষ্ট ম্যালেরিয়া বিষ বিনষ্ট হয় না এবং রক্তে ম্যালেরিয়া বীজাণু থাকিলে তাহাদেরও কোন ক্ষতি হয় না অধিকন্তু রোগ যাপ্য ভাবে থাকিয়া যায়। লিউকিস্ সাহেব বলেন, যে সকল ম্যালেরিয়া রোগীর পক্ষে কুইনাইন কার্য্যকারী হয় নাই তাঁহারা যথেষ্ট মাত্রায় কুইনাইন সেবন করেন নাই।

ইতালী দেশস্থ বিখ্যাত অধ্যাপক সেলি সাহেব কুইনাইনের বিশেষ পক্ষপাতী। তিনি বলেন যদি পুরাতন ম্যালেরিয়া রোগীগণ জ্বর হইতে অব্যাহতি পাইবার পরও আগামী বৎসরের ম্যালেরিয়া প্রকোপের কাল পর্য্যন্ত যথেষ্ট মাত্রায় কুইনাইন সেবন করেন তাহা হইলে আর নূতন রোগীর সৃষ্টি হয় না। এই সকল পুরাতন রোগীরাই ম্যালেরিয়া বিষের আকরস্বরূপ এবং তাঁহাদের দেহ হইতেই ম্যালেরিয়া বিষ সংক্রামিত হয়। লিউকিস্ সাহেবের মতে এই উপায় অবলম্বন করা আমাদের দেশে সম্ভবপর নহে। তিনি কেবল জ্বরের সময় কুইনাইন সেবন, জঙ্গলাদি পরিষ্কার, মশক ধ্বংস, উত্তম পানীয় সরবরাহ ইত্যাদি ব্যবস্থাই এদেশের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত।

ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর—কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র বসু, রায় বাহাদুর মহাশয় ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার মতে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর একই ব্যাধি। কেবল জ্বরের তাপের গতির প্রভেদ দৃষ্ট হয়। তিনি বলেন যে এখনও কালাজ্বরকে আমরা স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারি না এবং ইহার জন্য আরও পরীক্ষা ও গবেষণার আবশ্যক।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্"।

প্রথম বর্ষ। } পৌষ ১৩১৯ সাল { নবম সংখ্যা।

জলের সহিত শরীরের সম্বন্ধ।

জল বিনা কোন প্রাণী জীবন ধারণ করিতে পারে না। জল প্রাণীগণের জীবন স্বরূপ। আমাদের শরীরের জন্য জলের আবশ্যক সর্ব্বপ্রথম। সমগ্র মানব শরীরের ৩ ভাগের ২ ভাগ জল। রক্তে শতকরা ৭৯ ভাগ, মস্তিষ্ক ও মাংসপেশীতে ৮০ ভাগ, এবং অস্থিতে ১০ ভাগ জল বর্ত্তমান থাকে। এই জল দ্বারা রক্ত তরল থাকে, শরীর মধ্যে ভুক্ত বস্তুর পরিপাক হয় ও তাহা হইতে শরীরের পুষ্টি ও কার্য্যকরী শক্তি জন্মে। স্নান দ্বারা আমাদের চর্ম্ম কোমল ও সুন্দর থাকে। শরীরের ক্ষয় প্রাপ্ত বা পরিত্যক্ত অংশ সকল জলের সহিত ঘর্ম্ম ও মূত্রাদিরূপে বহির্গত হইয়া যায়। এইরূপে জল দ্বারা শরীরের পোষণ ও শোষণাদি সকল প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, আমরা সুস্থদেহে জীবন যাপন করি এবং সকল প্রকার কাজ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারি।

প্রশ্বাস, ঘর্ম্ম, মূত্র ও বিষ্ঠার সহিত প্রত্যহ শরীর হইতে প্রায় তিন সের জল বাহির হইয়া যায়। এই ক্ষতি পূরণের জন্য আমাদের পিপাসা বা তৃষ্ণা হয়। গ্রীষ্মকালে অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম হয় বলিয়া আমাদের পিপাসাও বেশী হইয়া থাকে। বহুমূত্র রোগীরা প্রস্রাবের সহিত অধিক পরিমাণ জল শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয় বলিয়া তাহাদের পিপাসা অধিক হইয়া থাকে।

এক জন লোকের শরীর পোষণার্থ গড়ে প্রতিদিন প্রায় /২॥০ হইতে /৩ জলের আবশ্যক। ইহার প্রায় ২॥০ পোয়া হইতে ১ সের পর্য্যন্ত জল খাদ্য দ্রব্যাদির সহিত শরীরে প্রবেশ করে। অবশিষ্ট জল আমাদিগকে পান করিতে হয়।

পরিশ্রম, বয়স, ও ঋতু বিশেষে তৃষ্ণার তারতম্য হয়। পিপাসাতুরের নিকট জল যে কি উপাদেয় পদার্থ তাহা সকলেই অবগত আছেন।

জলের অভাবে আমাদের পরিপাক ও পোষণ কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, মাংসপেশী সকল ও স্নায়ুমণ্ডলী নিস্তেজ হইয়া যায়, শরীর শুষ্ক ও শক্ত হইয়া থাকে। রক্ত গাঢ় হওয়াতে শরীরের দূষিত অংশ বাহির হইতে পারে না। ঘর্ম্ম, প্রস্রাব ও মলের পরিমাণ কমিয়া যায়, শীঘ্রই শরীর রুগ্ন হইয়া থাকে। অবশেষে অস্থিরতা আসিয়া অতি কষ্টে প্রাণবিয়োগ হয়।

জলের ব্যবহার—সুচারুরূপে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে আমাদের জলের আবশ্যক।

নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারে আমরা জল ব্যবহার করিয়া থাকি।

১। পানীয় রূপে—

২। ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য—

৩। সাংসারিক কাজ কর্ম্মের জন্য—

৪। নর্দ্দামা, পাইখানা, আস্তাবল এবং গৃহপালিত জন্তুদিগের জন্য।

পান, রন্ধন, স্নান ও ধোওয়া প্রভৃতি কার্য্যে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে জল আমাদের যে কত প্রয়োজনে আইসে তাহা বলা বাহুল্য। দেহের প্রত্যেক অর্দ্ধ সেরের ওজনের জন্য এক কাঁচ্চা পরিমাণ জলের আবশ্যক। সাধারণতঃ মনুষ্যের ওজন ... এক সের ধরিলে প্রত্যহ প্রায় আড়াই সের জলের আবশ্যকতা দেখা যায়

শরীরের যে বস্তু যত অধিক প্রয়োজন সেই বস্তু দূষিত হইলে শরীরের তত বেশী অপকার হইয়া থাকে। দূষিত জল ব্যবহারে শরীরে ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে।

জল পান করিবার পর তাহা পাকস্থলী হইতে শরীর মধ্যে শোষিত হয় না; কিন্তু অল্পে অল্পে পাকস্থলী হইতে অন্ত্রমধ্যে চলিয়া যায়। মোটামুটি আড়াই পোয়া জল ৪৫ মিনিটের মধ্যে পাকস্থলী হইতে অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করে। গরম জল দ্বারা পাকস্থলীর সঞ্চালন অধিক দ্রুত হয় বলিয়া ইহা ঠাণ্ডা জল অপেক্ষা শীঘ্র পাকস্থলী হইতে বহির্গত হয়। অন্ত্র হইতেই জল পূর্ণমাত্রায় শরীর মধ্যে শোষিত হয়। পাকস্থলী দিয়া যাইবার কালে পাকস্থলীর অম্লজাতীয় রস জলের উপর কোন ক্রিয়া প্রকাশ করিতে অবসর পায় না। সেইজন্য জল মধ্যে যদি কোন দূষিত জীবাণু থাকে তাহা হইলে সেই সকল জীবাণু অবাধে অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার রোগোৎপাদন করে।

যত প্রকার দূষিত খাদ্য দ্রব্য আমরা আহার করি না কেন জল দূষিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপকার হইয়া থাকে। পাকস্থলীতে অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যাদির যখন পরিপাক হয় তখন পাকস্থলী নিঃসৃত পাচকরসের অম্লত্ব সকল দোষকে নষ্ট করে কিন্তু জল পানের পর ইহা শীঘ্রই পাকস্থলী হইতে অন্ত্রমধ্যে প্রবাহিত হয় বলিয়া জলের সকল দোষই অবিকৃত অবস্থায় অন্ত্রমধ্যে নীত হয় এবং দূষণীয় জীবাণু সকল তথায় বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় ও নানা প্রকার রোগ উৎপাদন করে।

কি কি কারণে জল দূষিত হয় এবং দূষিত জলে কত অপকার হয় তাহা সকলেরই জানা আবশ্যক। এই সকল কারণের অজ্ঞতার জন্য সচরাচর মনুষ্য নিজেই নিজের পীড়ার কারণ হইয়া অকাল মৃত্যু, রোগ, শারীরিক প্রভৃতি বিপদ ডাকিয়া আনে।

জলের উৎপত্তি।

আমরা নদ, নদী পুষ্করিণী প্রভৃতিতে যে জল দেখিতে পাই তাহার আদি উৎপত্তিস্থান সমুদ্র। সমুদ্রের জল সূর্য্যোত্তাপে বাষ্পাকারে পরিবর্ত্তিত হয় এবং এই বাষ্প হইতেই মেঘের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মেঘ বৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়া ভূতলে পতিত হয়। বৃষ্টির জলের কিয়দংশ খাল ও নদী দ্বারা পুনরায় সমুদ্রে নীত হয়, কিয়দংশ মৃত্তিকা মধ্যে শোষিত হয় এবং অবশিষ্টাংশ জলাশয়, হ্রদ প্রভৃতিতে সঞ্চিত হইয়া থাকে। বৃষ্টির জলের যে অংশ মৃত্তিকা মধ্যে শোষিত হয় তাহার পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নহে। এই জল হইতেই প্রস্রবণ, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী ও কূপের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পৃথিবীর গঠন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহার উপরিভাগ কেবলমাত্র সাধারণ মৃত্তিকা নির্ম্মিত নহে। নিম্নে কিয়দ্দূর খনন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তথাকার মৃত্তিকার প্রকৃতি ভিন্নরূপ। এইরূপে ক্রমশঃ নিম্নে খুঁড়িয়া গেলে বিভিন্ন প্রকারের স্তর সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। পলাণ্ডুর যেরূপ উপর্য্যুপরি অনেকগুলি আবরণ লক্ষিত হয় পৃথিবীরও সেইরূপ অনেকগুলি স্তর দেখা যায়। কোন কোন স্তরের গভীরতা এক মাইলেরও অধিক। এই সকল স্তরের কোন কোনটীর মধ্য দিয়া জল সহজেই চোঁয়াইয়া যাইতে পারে; ইহাদের গঠন অনেকটা বালুকা স্তূপের ন্যায়। সাধারণ মৃত্তিকা এই শ্রেণীর পদার্থে গঠিত। কোন কোন স্তর অতিশয় কঠিন কিংবা এঁটেল মাটীর অনুরূপ; জল এই সকল স্তর ভেদ করিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত স্তরকে শোষক বা রসবাহী স্তর বলা হয়। শেষোক্ত স্তরের নাম অবরোধক বা রসাবরোধক স্তর। পৃথিবীর উপরিভাগের মৃত্তিকা রসবাহী, ইহার নিম্নের স্তর রসাবরোধক। তন্নিম্নে পুনরায় রসবাহী এবং রসাবরোধক স্তর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বৃষ্টির জল উপরের মৃত্তিকা ভেদ করিয়া নিম্নের রসাবরোধক স্তরের উপরে যাইয়া সঞ্চিত হয়। রসাবরোধক স্তরে ফাট থাকিলে জল তন্নিম্নস্থ রসবাহী স্তর ভেদ করিয়া দ্বিতীয় রসাবরোধক স্তর পর্য্যন্ত পৌছিয়া থাকে। এরূপ ফাটের সংখ্যা অল্প।

প্রথম রসাবরোধক স্তরের উপরিভাগস্থ জল সহজেই দূষিত হইতে পারে। মৃত্তিকার উপরে কিংবা মধ্যে কোনরূপ দূষণীয় পদার্থ থাকিলে তাহা বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হইয়া প্রথম রসবাহী স্তরের উপরিস্থিত জলের সহিত মিলিত হয়। এইরূপে এক স্থানের ময়লা ও আবর্জ্জনা চতুপার্শ্বস্থ অনেকদূর পর্য্যন্ত প্রথম জল স্তরকে দূষিত করিতে পারে। দ্বিতীয় স্তরের জল সহজে অপবিত্র হয় না।

পুষ্করিণী বা কূপ খননকালে প্রথম রসাবরোধক স্তর পর্য্যন্ত পৌছিলেই জল উঠিয়া থাকে। সাধারণ কূপ বা পুষ্করিণীতে প্রথম স্তরের জলই আসিয়া থাকে। কূপের গভীরতা দ্বিতীয় জলস্তর পর্য্যন্ত পৌছিলে তাহাকে গভীর কূপ বলা হইয়া থাকে। এইরূপ কূপের পার্শ্বদেশ বাঁধান না হইলে তাহাতে প্রথম ও দ্বিতীয় দুই স্তরের জলই আসিয়া থাকে। গভীর কূপের পার্শ্বদেশ নিম্ন পর্য্যন্ত সিমেণ্টমাটী দ্বারা বাঁধাইয়া দিলে তাহাতে কেবল দ্বিতীয় স্তরের জলই আইসে। এরূপ কূপের জল অগভীর কিংবা কাঁচা গভীর কূপের জল অপেক্ষা অনেক স্বাস্থ্যকর।

বৃষ্টির জল—প্রাকৃতিক জলের মধ্যে বৃষ্টির জল অতি বিশুদ্ধ। বৃষ্টি আরম্ভ হইলেই বায়ু মণ্ডলস্থ ধূলিকণা সকল ও দূষিত বাষ্পাদি ধুইয়া বায়ু পরিষ্কার হইয়া যায়। তাহার পর যে বৃষ্টি পতিত হয় তাহা পরিষ্কার পাত্রে রক্ষা করিলে অতি নির্দ্দোষ সুপেয় জল পাওয়া যায়। বর্ষাকালে বৃষ্টি সর্ব্বত্রই পতিত হইয়া থাকে। এই বৃষ্টির জল কতক ভূগর্ভে প্রবেশ করে, কতক মাটীর উপর দিয়া গড়াইয়া জলাশয়ে বা ডোবা ইত্যাদিতে সঞ্চিত হয়, কতক নালা বা পগার দিয়া প্রবাহিত হইয়া নদীতে পড়ে।

সহরে বৃষ্টির জল ড্রেন দিয়া বহুদূরে জলা বা নদীতে নীত হয়।

বৃষ্টির জল পাত্রাদিতে সঞ্চয় করিয়া ব্যবহার করিবার আবশ্যক এ দেশে হয় না কারণ এ দেশে নদী, জলাশয় ইত্যাদি বৃষ্টির জল সঞ্চয়ের স্থান যথেষ্ট আছে এবং বৃষ্টিও খুব হয়।

পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ জল পাইবার জন্য কখন কখন বৃষ্টির জল সংগৃহীত হইয়া থাকে। একখানি পরিষ্কার মাড় শূন্য কাপড়ের চারিকোণে চারিটী খোঁটা বাঁধা হয়। পরে এই কাপড়ের মধ্য স্থানে একটী পরিষ্কার প্রস্তর খণ্ড বা

ভারী দ্রব্য ভার রূপে রাখিয়া দেওয়া হয়। প্রথমে দুই এক পশলা বৃষ্টিতে কাপড়খানি ও বায়ুমণ্ডল বেশ ধুইয়া গেলে একটী ঘড়া বা প্রশস্ত জলপাত্র তাহার নিম্নে রাখিয়া জল সংগ্রহ করা হয়। এই জল ঔষধাদি করণে বা রোগীর পানীয় রূপে গ্রাম্য চিকিৎসকেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বর্ষাকালে বঙ্গদেশে নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতির জল প্রায়ই ঘোলা বা দূষিত হয়, তাহাতে সেই সময় এই উপায়ে জল সংগ্রহ করিয়া পান করা অতি যুক্তিযুক্ত পরামর্শ।

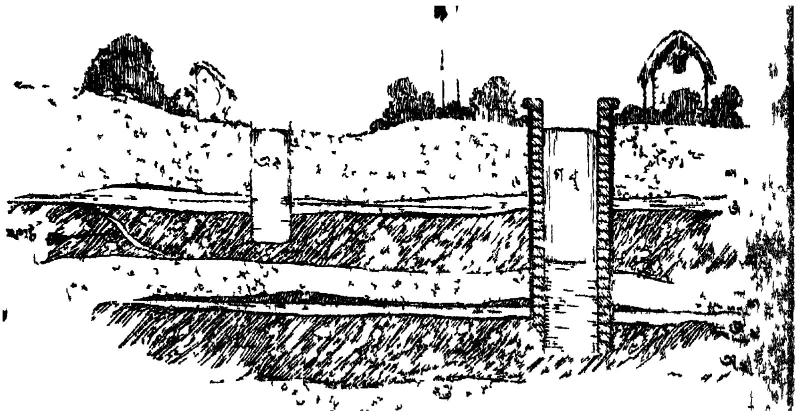
কূপ বা পাতকুয়া—অনেক গৃহস্থ জলের সুবিধার জন্য নিজ নিজ অঙ্গনে কূপ কাটাইয়া তাহার জল সাধারণতঃ সমস্ত গৃহকার্য্যে ব্যবহার করেন। জমির প্রকৃতি অনুসারে কূপ অগভীর বা গভীর হইয়া থাকে।

এ দেশের অধিকাংশ কূপই অগভীর। তাহা আবার কাঁচা ও পাকা দেখা যায়। কুম্ভকারের মাটীর পাট দ্বারা বেষ্টিত কূপকে কাঁচা কূপ বলিয়া গণ্য করা হয়। কূপের চতুর্দ্দিকে গাথনি করিয়া সিমেণ্ট প্রভৃতি দ্বারা উত্তমরূপ রসাবরোধক ভাবে গঠিত করিলে তাহাকে পাকা কূপ বলা হয়।

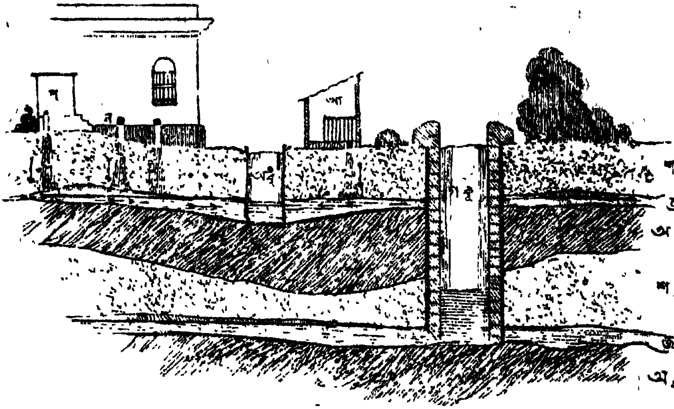
বাঁকুড়া ও বীরভূম অঞ্চলে গভীর কূপ দেখা যায়। এই সকল কূপ অনেক গভীর হয়। ইহারা প্রথম রসবাহী স্তর ও তৎনিম্নস্থ রসাবরোধক স্তর ভেদ করিয়া গভীর রসবাহী স্তর পর্য্যন্ত উপনীত হয়। এই গভীর রসবাহী স্তর হইতে স্বভাবতঃ অধিকতর বিশুদ্ধ জল সংগৃহীত হইয়া থাকে।

পুষ্করিণী ঃ—পুষ্করিণীর জল দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ মাটীর ভিতর দিয়া চোঁয়ানি জল আসিয়া উহাতে সঞ্চিত হয়; দ্বিতীয়তঃ উহার মধ্যে বৃষ্টির জল পতিত হয় ও চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান হইতে বৃষ্টির জল গড়াইয়া আইসে।

নদী—যখন প্রস্রবণ হইতে ইহার উৎপত্তি হয় তখন ইহার জল অতি স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ থাকে। বহু প্রস্রবণ মিলিত হইয়া নদীর উৎপত্তি হয়। পাহাড় ছাড়িবার পরেই প্রবাহ বেগমান হইলেই নদীর জল কর্দ্দম যুক্ত হয় ও ঘোলা হইয়া উঠে। যতই জনপদের মধ্য দিয়া সাগরাভিমুখে আসিতে থাকে, ততই নানারূপ আবর্জ্জনা উহাতে মিশ্রিত হয়।



(২নং চিত্র)



১ম চিত্রে—ভূপৃষ্ঠের শোষক ও অবরোধক স্তর সমূহ অঙ্কিত হইয়াছে। প্রথম অবরোধক স্তরের একটী কাটও দেখান হইয়াছে। এই চিত্রে অগভীর ও গভীর কূপের প্রভেদ ও কোনটীতে কিরূপে জল আসে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

২য় চিত্রে—নর্দ্দমা পাইখানা ও আস্তাবল ইত্যাদি হইতে কি প্রকারে দূষিত পদার্থ আসিয়া অগভীর কূপের জলের সহিত মিশ্রিত হয় তাহা → চিহ্ন দ্বারা দেখান হইয়াছে।

শ১—প্রথম শোষক স্তর। জ১—প্রথম জল স্তর। অ১—প্রথম অবরোধক স্তর। শ২—দ্বিতীয় শোষক স্তর। জ২—দ্বিতীয় জল স্তর। অ২—দ্বিতীয় অবরোধক স্তর। অ কূ—অগভীর কূপ। গ কূ—গভীর কূপ। প—পাইখানা। ন—নর্দ্দমা। আ—আস্তাবল।

বঙ্গদেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পানীয় জলের অবস্থা।

বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত পল্লীগ্রামেই জলকষ্ট অতি ভীষণ। বিশুদ্ধ জল দূরে থাক কোনরূপ জল পাওয়াই অনেক স্থলে দুরূহ ব্যাপার। যে সমস্ত গ্রামের সন্নিকটে নদী নাই সেই সকল স্থানে জল আনিবার জন্য অনেক সময় এক ক্রোশেরও অধিক পথ যাইতে হয়। অধিকাংশ গ্রামেই জলাশয় বা কূপের জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয় এবং এই সমস্ত কূপই অগভীর ও কাঁচা ও ইহাদের জলও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে অনেক গভীর কূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহাদের জলও বেশ ভাল। দেওঘর, মধুপুর প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থান সমূহের কূপ গভীর এবং ইহাদের জল সুস্বাদু ও দোষশূন্য। নদীতীরস্থ গ্রাম সমূহের জলের অনেক সুবিধা আছে, কিন্তু এই সকল গ্রামেও গ্রীষ্মকালে নদী শুখাইয়া যাইলে জলকষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে। সকল নদীর জলই যে পবিত্র তাহা বলা যায় না; মল মূত্রাদি নিক্ষিপ্ত হইলে কিংবা পাট ইত্যাদি পচাইবার জন্য নদীর জল দূষিত হইতে পারে। বড় নদী অপেক্ষা ছোট নদীই অধিক কলুষিত হইয়া থাকে। গঙ্গার ধারে যে সকল পাট প্রভৃতির বড় বড় কল কারখানা আছে তথাকার সহস্র সহস্র কুলী মজুরদিগের মল বিশেষ প্রক্রিয়া (Septic Tank) দ্বারা তরলীভূত করিয়া গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হয়;—এজন্য গঙ্গার জল অনেকদূর পর্য্যন্ত দূষিত হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশে কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরে কলের জল আছে। কলের জল নদী হইতে সংগৃহীত হইয়া বিশুদ্ধ করিবার পর নগরবাসীদিগকে সরবরাহ করা হয়। জল বিশুদ্ধ বলিয়া এই সকল সহরে কলেরা প্রভৃতি রোগের আশঙ্কা অল্প। কলিকাতায় বিশুদ্ধ জল ব্যতীত পায়খানা প্রভৃতি পরিষ্কার করাইবার জন্য গঙ্গার জলও অপরিষ্কৃত অবস্থাতেই সরবরাহ হইয়া থাকে; এই জলে কোন কোন বাড়িতে বাসন মাজা হইয়া থাকে এবং এরূপ পাত্রে আহারের ফলে আমাশয়, পেটের অসুখ ও এমন কি টাইফয়েড্‌ জ্বর ও কলেরা পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

প্রাকৃতিক কারণে কি প্রকারে জল দূষিত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জলাশয়, খাল, বিল, নদী, কূপ ও ইন্দারা প্রভৃতি যত প্রকার জলের আধার দেখা যায় বৃষ্টি হইতেই সচরাচর সকলের জল সঞ্চিত হয়। ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে মল, মূত্র, মৃত বা গলিত জন্তু, উদ্ভিদ, আবর্জ্জনা ও পশুদিগের মলমূত্রাদি পরিব্যাপ্ত থাকে। বৃষ্টির জল ঐ-সকল দ্রব্যের সহিত মিশিয়া তাহাদের কতক অংশকে দ্রবীভূত করে এবং এই জল সঞ্চিত জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদিগকে দূষিত করিয়া থাকে। আবার বৃষ্টির জলের কতক অংশ মাটিতে শুষিয়া যায়। এই শোষিত জল মাটীর মধ্যস্থিত জন্তুদেহ বা আন্যান্য অপকারী দ্রব্যের সহিত মিলিত হইয়া মাটীর ভিতর দিয়া চুয়াইয়া কূপে বা জলাশয়ে জল বর্দ্ধিত ও দূষিত করে।

পর্ব্বতে তুষার পড়িয়া বরফ সঞ্চিত হয়। এই বরফ গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে গলিয়া যায় এবং ঝরণার আকারে নদী ও নালা দিয়া প্রবাহিত হয়। এই প্রকারে বর্ষাকালে নদীর জল বৃদ্ধি হয়। জলস্রোত যে যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হয় সেই সেই স্থানে কোন কিছু দূষিত পদার্থ থাকিলে তাহাও জলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া জল দূষিত করে। প্রবল স্রোতের সহিত কখনও অনেক মাটী বা কর্দ্দম মিশিয়া যায় এবং তাহাতেই জল ঘোলা হইয়া পড়ে। যেমন বৃষ্টির জলে খাল, বিল, ক্ষেত প্রভৃতি ভাসিয়া যায় তেমনই নদীর জল বাড়িয়া খাল ও নালা দিয়া প্রবেশ করিয়া মাঠ ও জলাশয় সকল জলে পূর্ণ করিয়া ফেলে। এইরূপে এক স্থানের দূষিত জল নানাস্থানে যাইয়া বহু জলাশয়ের জলকে দূষিত করিতে পারে। বর্ষাকালে যেমন এই সকল কারণে জল অধিক দূষিত হয় তেমনি দূষণীয় দ্রব্যগুলি অধিক জলের সহিত মিলিত হওয়াতে দোষের তীক্ষ্ণতা কমিয়া যায়।

অনাবৃষ্টি কালে যখন জল শুকাইয়া কমিতে থাকে তখন অল্প পরিমাণ দূষনীয় দ্রব্য সহযোগে তাহা অধিক পরিমাণে দূষিত হইয়া থাকে। অনাবৃষ্টি কালে যে সকল স্থানে শুষ্ক তৃণ লতাদি পূর্ণ থাকে তাহাতে বর্ষার জল সঞ্চিত হইলে ঐ সকল তৃণ

উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিয়া জল দূষিত করে। অনেক পুষ্করিণীর চারিপার্শ্বের তৃণ, লতা, বৃক্ষ, গুল্ম ইত্যাদি বর্ষাকালে কতক পরিমাণে জলে ডুবিয়া গিয়া পচিতে থাকে। দূষিত নদীর জল জোয়ার ভাঁটার সময় এদিক ওদিক প্রবাহিত হইয়া দূরস্থ জলকে দূষিত করিয়া থাকে।

বৃষ্টি পতনকালে দূষিত বায়ুর কোন কোন বস্তু গ্রহণ করিয়া জলকে দূষিত করে। বড় বড় সহরের উপরিভাগ দিয়া যখন মেঘ চলিয়া যায় তখন বায়ুর কোন কোন বস্তুর সংযোগে বৃষ্টির জলও কিঞ্চিৎ দূষিত হইতে পারে।

——:():-

কত প্রকারে মনুষ্য কর্ত্তৃক জল দূষিত হয়।

স্বাভাবিক কারণে জল যে প্রকার অপকারী হয় তাহা তত মারাত্মক নহে। আমাদের আত্মদোষেই নিজ কর্ত্তৃক জল অত্যন্ত দূষিত হইয়া বিষবৎ হইয়া থাকে। নিম্নে এই সকল দোষের আলোচনা করা হইল—

(১) **মল অর্থাৎ বিষ্ঠা সংযোগে**—বিষ্ঠা শরীরের অপকারী দ্রব্য এবং ইহা শরীর হইতে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। যদি ইহা শরীর মধ্যে থাকিয়া যায় তাহা হইলে আমাদের নানা প্রকার অসুখ হইয়া থাকে। এই বিষ্ঠা উদর মধ্যে থাকিয়া যে প্রকার অপকার করে, বাহির হইলে পর পচিয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া উদর গহ্বরে পুনঃ প্রবেশ করিলে তদপেক্ষা অধিক অপকার করে। যেখানে সেখানে মল ত্যাগ করিলে সেই মল নানা প্রকারে জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া আমাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ইহাতে আমাদের বিশেষ অপকার হয়। অনেকে নদী, খাল, পুকুর বা দীঘির জলের কিঞ্চিৎ উপরিভাগেই মল ত্যাগ করিয়া থাকেন। এই মল বৃষ্টির জলের সহিত মিলিত হইয়া জলাশয়ে পতিত হইলে জলকে দূষিত করে। জোয়ারের বা বৃষ্টির জল বাড়িলেও ঐ সকল মল জলে ভাসিয়া যায়। কোন কোন স্থানে পুষ্করিণীর পাড়েই পাইখানা দেখা যায়। এই সকল স্থানের মল

অতি সহজেই জলের সহিত মিশিয়া থাকে এবং জলকে দূষিত করে। অনেকে মলত্যাগ করিবার সময় সঙ্গে জল লইয়া যান না, জলাশয়ের মধ্যে শৌচ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাহাতেও জল দূষিত হয়। কখন কখন শিশুদিগের গাত্র সংলগ্ন মল পুষ্করিণীতে ধৌত করা হয়। সেই মল জলে মিশিয়া জল দূষিত করে। ছোট ছোট শিশুগণ বিছানায় মলত্যাগ করিয়া থাকে। সেই সকল বিছানা পুষ্করিণীতে কাচা হয়। তাহাতেও জল দূষিত হয়। অনেক বাড়ীর পাইখানা অতি পুরাতন। তাহাতে বহুকালের পচা মল সঞ্চিত থাকে। বৃষ্টির বা জোয়ারের জল বাড়িয়া এই সকল পচা মলকে ধুইয়া দেয়, ইহাতে বিশেষরূপে জলের ক্ষতি হইয়া থাকে। ওলাউঠা, উদরাময় প্রভৃতি পীড়াগ্রস্ত রোগীরা অগত্যা বিছানায় মল ত্যাগ করিয়া থাকে। ঐ সকল বিছানাও পুষ্করিণীতে কাচা হয় এবং ব্যাধির বিষ পূর্ণমাত্রায় জলমধ্যে বিস্তৃত হয়। অনেক বাড়ীর চারিপার্শ্বে পরিখা বা পগার থাকে। তাহার একস্থানে ঘাট ও কিছু দূরে পাইখানা থাকে। জলাশয়ের এক অংশে মল পড়িলে তাহার দ্বারা সমস্ত জল যে দূষিত হয় তাহা অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। কাজেই ঐ জল ব্যবহার করিয়া নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। পশুর মলও নানা প্রকারে জলের সহিত মিশ্রিত হয় এবং ইহাতেও জল অত্যন্ত দূষিত হয়। এইরূপে চারিপার্শ্বের লোকের নিক্ষিপ্ত মলের দ্বারা কালক্রমে জলাশয়ের জল একেবারে ঘৃণিত, অস্পৃশ্য ও বিষবৎ অপকারী হইয়া উঠে।

(২) **মূত্র সংযোগে**—লোকের অজ্ঞতার জন্য নানারূপ মল সংযুক্ত হইয়া জল যেমন দূষিত হয় সেই প্রকার প্রস্রাব দ্বারাও তদপেক্ষা অধিক দূষিত হইয়া থাকে। প্রস্রাবের স্থানে যে সকল বিষবৎ বস্তু সঞ্চিত থাকে তাহাও বর্ষার জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া জলাশয়ে পড়ে। তাহাতেও জল অত্যন্ত দূষিত হয়।

জলে প্রস্রাব করিলে অবন্ত প্রমেহ রোগ আরোগ্য হয় এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে জলে প্রস্রাব করিয়া জলকে দূষিত করেন। স্নানাদি কালে অনেকে পুকুরের কিঞ্চিৎ উপরে জলের একপার্শ্বে প্রস্রাব করিয়া থাকেন। আর এই মূত্র গড়াইয়া জলের সহিত মিশিয়া যায়। নিজে করিয়া বা স্বচক্ষে অন্যকে করিতে দেখিয়াও কেহ সাবধান হন না।

কোন কার্য্যে জলে নামিলে বা ঘাটে হাত পা প্রভৃতি ধুইতে গেলে শৈত্য লাগিয়া অনেক সময় প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা হয় এরূপ স্থলে জলের নিকটে কোন স্থানে প্রস্রাব করা হয়। শিশুরা কিংবা শয্যামূত্র ও অন্যান্য রোগীরা বিছানা বা কাপড়ে প্রস্রাব করিলে তাহা ঘাটে ধোওয়া হয় বলিয়া জল দূষিত হয়। শিশুদিগকে প্রস্রাব না করাইয়া স্নান করাইতে লইয়া গেলে তাহারাও জলে প্রস্রাব করিয়া থাকে।

স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়ম সকলের অজ্ঞতার জন্য আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই পুষ্করিণীতে নামিয়া প্রস্রাব করিয়া থাকেন। তাঁহারা এতদূর জ্ঞানান্ধ যে এই জলে প্রস্রাব করিলে যে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় তাহা আদৌ মনে করেন না। যদিও তাঁহারা জলকে নারায়ণ বলিয়া জানেন তথাপি প্রায়ই তাহারা ঘাটের জলে প্রস্রাব করিয়া থাকেন। ঘাটের যেখানে প্রস্রাব করেন তাহারই নিকট হইতে ঘটি বা কলস পূর্ণ করিয়া জল আনিয়া থাকেন। এই মূত্রের অধিক বা অল্পাংশ যে জলের সহিত অবশ্যই মিশিয়া আসে, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও অজ্ঞতা জন্য সে দোষ অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহারা এই দূষিত অস্পৃশ্য বিষবৎ জল দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করেন এবং স্নেহাস্পদ সন্তান ও গুরুজনদিগকে তাহা খাইতে দিয়া থাকেন। অধিক কি নিজেরাও পান করিতে ঘৃণা বোধ করেন না। অনেক সময়ে ঐরূপ জলদ্বারা পবিত্র দেবার্চ্চনা করিতেও তাহাদের মনে ঘৃণা, সঙ্কোচ বা পাপ বোধ হয় না। এইরূপ বিষবৎ জলপানে অভ্যাস বশতঃ কত যে শিশুর প্রাণ নষ্ট হয় তাহার সংখ্যা করা যায় না। যে জলাশয়ের জল কম, এই সকল দোষে তাহার জল আরও মারাত্মক হইয়া থাকে। যে জল সর্ব্বদাই বদ্ধ থাকে তাহাতে এ সকল দোষ অতি গুরুতর রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

এইরূপ অহরহঃ জল দূষিত হয়। একদিন নয়, দুইদিন নয়, বৎসরাবধি নয়, জলাশয়ের খনন হইতে চিরকাল এরূপ দোষ ঘটিতেছে। কাজেই আমরা দিন দিন হীন, ক্ষীণ অল্পায়ু ও রুগ্ন হইতেছি। এরূপ ঘৃণিত জলপান করা দূরে থাকুক, এ সকল বিষয় মনে হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, অপবিত্র হাঁড়ি কলস ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়, বমন করিয়া ভক্ষিত দ্রব্য সকল বাহির করিবার প্রবৃত্তি হয়।

এ সকল বিষয়ে নিরীহ অজ্ঞ স্ত্রীলোকদিগের আর দোষ কি? যদি আমরা তাহাদিগকে নিয়মমত শিক্ষা দিয়া তাহাদের অজ্ঞতা রূপ অন্ধকার দূর করিতে পারি এবং উপযুক্ত জ্ঞান দিতে পারি, তাহা হইলে বোধ হয় মা লক্ষীরা কথনও এ কুকার্য্য করেন না।

এত দেখিয়া ও ঠেকে শিখিয়া আমাদের সমাজপতিদিগের কোন চৈতন্য হইতেছে না। হায় অজ্ঞতা কি ভয়ানক দোষ। যে মাতা, সন্তানের জন্য, সকল কষ্ট স্বীকার করিতেছেন এমন কি প্রাণ দিতে পশ্চাৎপদ হন না অজ্ঞতার জন্য সেই মাতাই নিজে বিষতুল্য জল আনিয়া, নিজ হাতে নিজ সন্তানকে অমৃত ভ্রমে বিষ খাইতে দেন। এই বিষ পান দ্বারা সন্তান রুগ্ন, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ মৃত্যু মুখে পতিত হয়। সন্তান হারাইয়া মাতা নিজ পাপ ও অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া বিয়োগ দুঃখে আজন্ম কাঁদিয়া কালাতিপাত করেন এবং এই বিশ্ব সংসার তাহার নিকট শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

(৩) **স্নান বা শরীর ধৌত করণে**—প্রস্রাব যেমন অপকারী ঘর্ম্মও তেমনই অপকারী। শরীরের ক্ষয় প্রাপ্ত ও অসার অংশ যেমন প্রস্রাবের সহিত শরীর হইতে পরিত্যক্ত হয় তেমনই ঘামের সহিত ও ইহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এজন্য ঘাম লাগিলেই, শরীরে ও কাপড়ে দুর্গন্ধ হয় এবং স্নানের পর জল দূষিত হইয়া থাকে। জলে নামিয়া স্নান করিলে, শরীরের ঘর্ম্ম ও ময়লা এবং কাপড়ের ময়লা জলের সহিত মিশিয়া জলকে দূষিত করে। ধোপারা ময়লা কাপড় জলে কাচিয়া জল খারাপ করে। পশু পক্ষিদিগকে জলে নামাইয়া স্নান করাইলে তাহাদের গাত্রমল দ্বারা জল দূষিত হইয়া থাকে। প্রতিদিন আহার্য্য দ্রব্যাদি—চাউল, ডাল, তরিতরকারি ও মৎস্য মাংসাদি পাক ও ভোজন পাত্র সকল এই পুষ্করিণীর জলে ধৌত হইবার জন্য ইহার জল নানপ্রকারে দূষিত হয়।

রজঃস্বলা স্ত্রীলোকের রক্তমাখা কাপড়, পুঁজভরা কাপড়, পিকদান, কফযুক্ত কাপড়, গোময়-ছড়ারহাঁড়ি ইত্যাদি এবং ময়লা হাত পা ধৌত হইবার জন্য জল যথেষ্ট পরিমাণে দূষিত হইয়া থাকে।

পল্লীগ্রামের লোকেরা সকল প্রকার ময়লা দ্রব্যাদি ঘাটে লইয়া ধুইয়া থাকেন। এই সকল দ্রব্যাদির যে যে অংশ জলের সহিত মিলিত হয় তাহাই পচিয়া উঠে এবং জলকে খারাপ করে।

প্রায়ই গ্রামবাসী লোকদিগকে প্রত্যহ পুষ্করিণীতে যাইয়া মুখ ধুইতে দেখা যায়। তাহারা মুখ ধাবন কালে নেত্রমল, দন্তমল, জিহ্বার মল, কফ ও থুথু প্রভৃতি জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।

নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অনেক লোকের আহার হইলে, তাহারা প্রায় সকলেই ঘাটে গিয়া আচমন করেন। ইহার দ্বারা জল যথেষ্ট পরিমাণে দূষিত হয়।

চলিত কথায় বলে যে "থুক ফেলিয়া থুক খায় কে" কিন্তু বলিতে লজ্জা করে যে আমরা যে ঘাটের জল খাই সেই ঘাটের জলেই রোজ রোজ আমরা থুথু ফেলিয়া থাকি। গোয়াল ঘর পরিষ্কার করিয়া, ঘর নিকাইয়া, বা ঘুটের নোদি দিয়া এবং আপন আপন মল ত্যাগ করিয়া আমরা ঘাটে গিয়া প্রক্ষালন করিয়া থাকি। হাত পা ধুই এবং গুহ্যদ্বার পরিষ্কার করি। ইহা কি কম লজ্জার কথা। যে জল আমরা পান করিব, সেই জলেই গো বিষ্ঠা ও মনুষ্য বিষ্ঠার সংযোগ!

বোক্‌নো, কড়া, হাতা বেড়ি ইত্যাদি রন্ধনের ধাতু নির্ম্মিত তৈজসপত্রাদি প্রথমতঃ ঘাটে ভিজান হয় পরে এই সকল ঘাটেই মাজা ও ধোয়া হইয়া থাকে। ইহাদের হইতে ভাতের এবং ডাউলের অংশ, তরকারি ও মৎস্য ইত্যাদির টুক্‌রা জলমধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয় এবং ইহারা জলমধ্যে পচিয়া জল দূষিত করে। প্রায় গৃহস্থের আহারের উচ্ছিষ্টাংশ পুষ্করিণীর পাড়ে ফেলা হয়। ইহারা বৃষ্টির জলেরসহিত পুষ্করিণী মধ্যে নীত হয় এবং যত পচিতে থাকে ততই জল খারাপ হয়।

(৪) **মৃত জন্তু সংযোগে**—মৎস্য ও মাংস জলে ধুইলে ঐ সকল খাদ্য দ্রব্যের অনেক অংশ জলে মিশিয়া পচিতে থাকে। বিবিধ চর্ম্ম (খোস প্যাচড়া) ও সংক্রামক (বসন্ত) রোগের পুঁজ মামড়ি ইত্যাদি অনেকে ঘাটের জলে ধুইয়া থাকেন। কখন কখন বস্ত্রলগ্ন বড় বড় ঘায়ের পুঁজ রক্তাদি ঘাটেই প্রক্ষালিত হয়। মৎস্য এবং মাংসের ত্যক্ত অংশ এবং ভক্ষণের পর তাহাদের কাঁটা হাড় ও চর্ব্বিত পরিত্যক্ত অংশ সকল জলেই ফেলা হয়।

মৎস্যাশী জন্তুরা মৎস্য খাইয়া তাহার কঠিনাংশ প্রায় জলমধ্যে ফেলিয়া যায় এবং এই পরিত্যক্ত অংশ জলে পচিয়া জলকে খারাপ করে। অনেক স্থানে মনুষ্য, গরু ও অন্যান্য মৃত প্রাণীর দেহ জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল প্রাণীর দেহ ক্রমশঃ পচিয়া জলকে দূষিত করে। মৃত কীট, পতঙ্গাদি জলে পড়িয়া এই প্রকারে জল খারাপ করে।

(৫) পচা উদ্ভিদ সংযোগে—পুষ্করিণীর পাড়ে বড় বড় গাছ সকল হইতে পরিত্যক্ত পত্রাদি জলে পড়ে এবং পচিয়া জল দূষিত করে। তাল, নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষই পুষ্করিণীর ধারে ধারে লাগাইবার প্রথা বহুদিন হইতে প্রচলিত। ইহাদের দ্বারা জল কোনরূপ দূষিত হয় না। কিন্তু সাধারণের অজ্ঞতার দোষে নানা প্রকারের বৃক্ষ লতাদি পুষ্করিণীর পাড়েই জন্মাইয়া জঙ্গলে পরিণত হয় ও তাহাদের গলিত পত্রাদিতে জল সদাসর্ব্বদা দূষিত হয়। সময় সময় জঙ্গল এত ঘন হয় যে সূর্য্যরশ্মি পর্য্যন্ত পুষ্করিণীতে পড়িতে পারে না। জলাশয়ের উপর উপযুক্ত রৌদ্র ও বাতাস খেলিতে পারে না। জল দূষিত হয় এবং স্বাভাবিক উপায়ে বিশোধিত হয় না।

পাট ও শন পচাইবার জন্য আজকাল প্রায় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জল খারাপ হইতেছে। পাটের দামের ক্রমশঃ বৃদ্ধির সহিত কৃষকেরা ধান ও অন্যান্য চাষ পরিত্যাগ করিয়া কেবলই পাট ও শনের চাষ আবাদ করিতেছে।

এই সকল পাট পাকিবার পর, কাটিয়া জলে পচাইতে হয়। এই পাট গাছ হাল্‌কা বালিয়া তাহার সহিত বড় বড় মাটির চাপড়া বান্ধিয়া পুষ্করিণী, ডোবা ও নদী প্রভৃতিতে ডোবান হয়। এই সকল পাট পচার জন্য জল দুর্গন্ধযুক্ত হয় ও তাহাতে এনোফিলিস নামক ম্যালেরিয়াবাহী মশকেরা শাবক উৎপাদন করে ও ম্যালেরিয়া বিষ ব্যাপ্তির সহায়তা করে। যতই পাটের চাষ বৃদ্ধি হইতেছে, ততই ম্যালেরিয়া দেশব্যাপী হইয়া ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিতেছে।

অনেকে পুষ্করিণীতে বাঁশ ও অন্যান্য কাষ্ঠ দ্রব্যাদি ভিজাইয়া রাখিয়া মজবুদ করিয়া থাকেন। এই সকলের দ্বারাও জল দূষিত হয়।

জলে দাম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানা থাকিলে তাহারাও পচিয়া জল খারাপ করে। এই সকল দাম ও পানা পুষ্করিণী পরিষ্কার কালে প্রায়ই পুষ্করিণীর কিনারায় নিক্ষিপ্ত হয়. এবং তাহারা পুনরায় পচিয়া বর্ষার জলের সহিত মিলিত হইয়া পুষ্করিণীর মধ্যে আসিয়া পড়ে ও জল বিশেষ রূপে দূষিত করে।

(৬) **পুষ্করিণীর সংস্কারাভাবে**—অনেক পুষ্করিণী বহুকাল যাবৎ খোদিত হইয়াছে এবং তাহার এ পর্য্যন্ত পঙ্কোদ্ধার হয় নাই। পানা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ সমস্ত পুষ্করিণী আচ্ছন্ন করিলেও কেহ তাহার পরিষ্কার করেন না। অনেক স্থানে ভাগের পুষ্করিণী বলিয়া কোন মালিকই এই বিষয় লক্ষ্য করেন না এবং জলাশয়টী ক্রমশঃ মজিয়া যায়।

একে নানা দোষে আমরা জল দূষিত করি, তাহাতে আবার জলাশয় সংস্কার করিতে এই প্রকার. উদাসীন হইলে যে জলাভাব আরও বৃদ্ধি হইবে তাহার আর বিচিত্র কি?

অনেকের বিশ্বাস যে, জলে পানা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ হওয়া ভাল। কিন্তু এই জলজ উদ্ভিদের মূল ইত্যাদি পচিয়া জল খারাপ করে।

দীঘি ও পুষ্করিণীর পাড় ভাঙ্গিয়া গেলে বা বসিয়া গেলে, বাড়ী বা পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে জলাশয় নীচু হইলে, অথবা কোন প্রকার অন্তর্নালী থাকিলে বা গুপ্ত জলনালী থাকিলে আবর্জ্জনা সম্মিলিত বৃষ্টির জল আসিয়া জলাশয়ে পড়ে এবং এই জন্য জল দূষিত হয়।

(৭) **কুসংস্কার জন্য বা অপরিষ্কার দোষে**—অনেক সম্প্রদায়ের সংস্কার আছে যে, জলে মরা মানুষ ফেলিলে তাহার সদগতি হয়। এই সংস্কার জন্য গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদ প্রভৃতির জলে প্রায়ই মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হয় এবং সেই জন্য জল দূষিত হয়। কোন কোন অঞ্চলের লোকেরা প্রসবের পর ফুল ও রক্ত ইত্যাদি ঘটে পুরিয়া জলে ফেলিয়া দেয় ও সেই জন্যও জল খারাপ হয়। পশ্বাদির মৃতদেহও অনেক সময় জলে ফেলিয়া দেওয়ার জন্য জল দূষিত হয়। কোন কোন লোকের ধারণা আছে যে ঘায়ের পুঁজ ও রক্ত বিড়ালে শুঁকিলে ঘা দূষিত হয় ও সহজে শুকায় না। এজন্য তাহারা পুঁজও রক্ত মাখা নেকড়াগুলি জলে ফেলিয়া দেন।

অনেক স্বাস্থ্যরক্ষার পুস্তকে লিখিত আছে পদ্ম, শালুক প্রভৃতির পত্রে পুষ্করিণীর জল পরিষ্কৃত রাখে। ঐ গুলি হইতে অম্লজান বাষ্প নির্গত হয়, তাহার শক্তিতে জল বিশোধিত হয়। মনে কর এই উপদেশ মতে পুকুরে পদ্ম ও শালুক লাগান হইল। দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে দুই চারি বৎসর মধ্যে সমস্ত পুকুর পদ্ম ও শালুক বনে পরিণত হইল। ভেক ও বিষধর সর্পের আবাস স্থান হইল। এই সকল শালুক ও পদ্ম প্রস্ফুটিত হইবার পর ঝরিয়া পড়িল। ফুলের পাপড়ী ও ডাঁটা জলমধ্যে পড়িয়া পচিয়া জলকে নষ্ট করিল। পুনঃ পুষ্করিণী সংস্কার ভিন্ন এই প্রকার উদ্ভিদ নির্ম্মূল করা অসম্ভব।

(৮) **মাটীর বা স্থানের দোষে**—যে মৃত্তিকাতে পুষ্করিণী বা কূপ খোদিত হয়, তাহাতে যদি অপকারী ধাতু দ্রব্য মিশ্রিত থাকে বা গলিত জন্তু দেহ বা উদ্ভিদাদি নিহিত থাকে তাহা হইলে ইহাদের সংমিশ্রনে, তাহাদের জলও দূষিত হয়। অভ্র, গন্ধক ও লবণময় স্থান হইতে যে সকল নদী উৎপন্ন হয় তাহাদের জল ব্যবহারে নানাপ্রকার পীড়া হইয়া থাকে। গলগণ্ড রোগ এই প্রকার দূষিত জল পান দ্বারা হইয়া থাকে।

নিম্ন ভূমির মধ্যে পুষ্করিণী খনন করাইলে যদি তাহার চতুর্দ্দিকের পাড় যথেষ্ট উচ্চ না করা যায়, তাহা হইলে বর্ষাকালে চারিদিক হইতে জল নানাপ্রকার আবর্জ্জনা ধৌত করিয়া নিম্ন স্থানের পুষ্করিণীর জল দূষিত করে। সমাধি স্থানের মধ্যে বা নিকটে পুষ্করিণী খনন করাইলে পচা জীবদেহ নিঃসৃত বিষাক্ত দ্রব্য সকল জলের সহিত মিলিত হয়।

যে সকল স্থানে চারিদিক উচ্চ বৃক্ষ বা বাগান দ্বারা আচ্ছন্ন—তাহার মধ্যে পুষ্করিণী খনন করাইলে, তাহার জলে বায়ু বা সূর্য্যরশ্মি লাগিতে পারে না এবং জল বিশোধিত হইতে না পারিয়া, অল্পেই দূষিত হইয়া যায়।

কূপ জল—যে সকল কারণে পুষ্করিণীর জল দূষিত হইতে পারে, সেই সকল কারণে কূপজলও দূষিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু জল অল্প বলিয়া সহজেই দূষিত হয়। আরও ব্যবহার দোষেও কূপার জল দূষিত হয়। ময়লা দড়ি বা পাত্র দ্বারা জল তুলিলে ইহা দূষিত হয়। কি প্রকারে অগভীর কূপের মধ্যে চতুঃপার্শ্বস্থ ময়লা ইত্যাদি আসিয়া মিশ্রিত হয় ও জলকে দূষিত করে তাহা ২নং চিত্রে দেখান হইয়াছে।

দূষিত জল নির্ণয়।

গ্রামবাসীদের আপততঃ পানীয় জলের জন্য কোন কূপ বা জলাশয় ব্যবহার করা উচিত তাহা নির্ণয় করা প্রধান কর্ত্তব্য। এই নির্দ্ধারণ ব্যাপার বিশেষ দুরূহ নহে এবং ইহাতে কোন রূপ বিশেষ অভিজ্ঞতারও আবশ্যকতা নাই। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখিলে কোন পুষ্করিণী বা কূপের জল ভাল তাহা সহজেই নিরূপণ করা যাইতে পারিবে।

(১) পানীয় জলের কূপ বা পুষ্করিণী পাইখানা, আঁস্তাকুড়, নর্দ্দামা, গো শালা, সার দেওয়া জমি ও মনুষ্য আবাসভূমি হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিবে।

(২) জলাশয়ের মধ্যে ও চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষলতাদি না থাকাই শ্রেয়ঃ।

(৩) জলাশয় বা কূপ উচ্চভূমিতে অবস্থিত হইলে বৃষ্টির সময় তাহাতে চতুষ্পার্শ্বস্থ আবর্জ্জনা ধুইয়া আসিতে পারে না।

(৪) জলাশয় বা কূপ এরূপ বৃহৎ ও গভীর হওয়া উচিত যাহাতে জলের কখনও অনাটন না হয়।

(৫) জলাশয় বা কূপের জল গন্ধহীন, বর্ণহীন ও স্বাদহীন হওয়া উচিত।

দূষিত জলের বর্ণ ফিকা সবুজ বা হরিদ্রা বর্ণের হইয়া থাকে এবং ইহা ঘোলা হয়। জলের মধ্যে নানারূপ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় এবং জ্বাল দিলে রংয়ের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যাঁহাদের পরিষ্কৃত জল পান করা অভ্যাস তাঁহারা খারাপ জল মুখে লইলেই বিস্বাদ বলিয়া বুঝিতে পারেন। খারাপ জলে দুর্গন্ধ থাকিতে পারে। সর্ব্বদা খারাপ জল ব্যবহার করিলে দুর্গন্ধ বা স্বাদ অনুভূত হয় না। যে সকল জলাশয়ে নামিলে তরল কাদা পায়ে লাগে এবং পাদক্ষেপ কালে বুদ্বুদ উঠে তাহার জলও খারাপ বলিয়া জানিবে।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা জল অব্যবহার্য্য কিনা বলা যাইতে পারে। আমরা এই প্রবন্ধের পরিশেষে জল পরীক্ষার জন্য সহজ রাসায়নিক উপায় বর্ণনা করিয়াছি। রসায়ন শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন না হইলেও যে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এই প্রক্রিয়া দ্বারা জল পরীক্ষা করিতে পারিবেন। এই পরীক্ষার জন্য যে সকল দ্রব্যাদির আবশ্যক—

তাহা প্রত্যেক মফঃস্বলের ডিস্‌পেন্‌সারিতে পাওয়া যাইতে পারে। আজ কাল অনেক স্কুলেই বালকদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়, এই সকল বালকদিগের দ্বারা সহজেই এই পরীক্ষা হইতে পারিবে। পরীক্ষার যন্ত্র ও ঔষধাদিও স্বল্প ব্যয় সাধ্য; ৫৲ টাকার মধ্যেই সমস্ত সরঞ্জামের জোগাড় হইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট নিয়োজিত পরিদর্শকদিগের জল পরীক্ষার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

কোন জলাশয় বা কূপ হইতে গ্রামের পানীয় জল সরবরাহ হইবে সাব্যস্ত হইলে সেই জল যাহাতে কলুষিত না হইতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। কি কি কারণে জল কলুষিত হয় এবং কিরূপেই বা তাহার প্রতিকার হইতে পারে আমরা গত প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিয়াছি।

জল দূষিত হইলেই রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা ধরা পড়িবে একথা সকল সময়ে বলা যায় না। অনেক সময় জলে রোগের বীজাণু থাকে কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষায় তাহা নির্ণীত হয় না। জলে মল মূত্রাদি মিশ্রিত হইয়াছে কিংবা জান্তব বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ আছে কিনা ইহাই রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারে। যে জলে মল, মূত্র বা জান্তব পদার্থ আছে তাহা পান করা কিছুতেই নিরাপদ নহে। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা কোন জলাশয়ের জল পান করা উচিত নহে কেবল মাত্র তাহাই বলা যাইতে পারে। পরীক্ষায় জল নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইলেও সেই জল ব্যাধি আনয়ন করিতে পারে। যে জল পানীয় রূপে ব্যবহৃত হইবে তাহাতে রাসায়নিক পরীক্ষায় কোন দোষ পাওয়া উচিত নহে।

জল পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত যন্ত্র ও ঔষধাদির আবশ্যক :—

টেষ্ট টিউব—৬টী ও টেষ্ট টিউব ষ্ট্যাণ্ড
স্পিরিট্ ল্যাম্প—১টী
মেথিলেটেড্ স্পিরিট্—১বোতল
তেপায়া—১টী (জল গরম করিবার জন্য) (Tripod stand)
তারের জাল (" " " ") (Wire gauze)
কাচের পাত্র (" " " ") (Glass beaker)

কাচের রড (নাড়িবার জন্য) (Glass rod)
মাপিবার জন্য কাচ পাত্র—(২ আউন্স) (Measure Glass)
লিটমাস্ কাগজ (নিউট্রাল) (Litmus paper neutral)
কাঁসার বা জার্ম্মান সিল্‌ভারের বাটি
ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্র (Dropper)
কাচের স্লাইড বা টুকরা (Glass slides)
সিল্‌ভার নাইট্রেট্ (Silver nitrate crystals)
ডিষ্টিল্ড্ জল (Distilled water)
সালফিউরিক্ এসিড্ (Sulphuric Acid)
পোটাসিয়াম্ পারম্যাঙ্গানেট্—(Potassium permanganate crystals)
পোটাসিয়াম্ আইওডাইড—(Potassium Iodide)
দস্তার টুকরা—(Granulated zinc)
এরারুট
গ্লেসিয়াল্ এসেটিক্ এসিড্ (Glacial acetic acid)
*নেস্‌লার সলিউসান্ (Nessler's Solution)

---

* নেসলার সলিউসান্ প্রস্তুত করিতে হইলে ২টী কাচ পাত্রে পোটাসিয়াম্ আইওডাইড (Potassium Iodide) ও মারকিউরিক্ ক্লোরাইড্ (Mercuric Chloride) ডিস্‌টিল্‌ড জলে দ্রবীভূত করিতে হইবে। পোটাসিয়াম্ আইওডাইডের জলে অল্পে অল্পে মারকিউরিক্ ক্লোরাইড্ ঢালিতে হইবে। এই সময় অনবরত কাচের রড দ্বারা নাড়া আবশ্যক। মারকিউরিক্ ক্লোরাইড্ ঢালিবার সময় জলের বর্ণ লাল হয় এবং নাড়িলে পুনরায় তাহা মিলাইয়া যায়। মারকিউরিক্ ক্লোরাইড অধিক হইলে এই লাল গুঁড়া অদ্রবীভূত অবস্থায় থাকিয়া যায়। জলে সামান্য পরিমাণ লাল গুঁড়া দেখা দিলেই মারকিউরিক্ ক্লোরাইড দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে। এই জলে এখন ৫ ভাগের ১ ভাগ পরিমাণ কষ্টিক্ পটাস্ দিতে হইবে। কিছুকাল এই জল রাখিয়া দিলে দেখা যাইবে যে পাত্রের নীচে একপ্রকার ব্রাউন রংএর গুঁড়া পড়িয়াছে এবং উপরের জলীয় ভাগ পরিষ্কার হইয়াছে। এই পরিষ্কার জলীয় অংশই নেসলার সলিউসান্। ইহা একটী পরিষ্কার শিশিতে ঢালিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

পরীক্ষার জন্য জল সংগ্রহ—পরীক্ষার জন্য জল সংগ্রহ করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। পরিষ্কার কাচের বোতলই জল সংগ্রহের পক্ষে প্রশস্ত। বোতল উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া যে জল পরীক্ষিত হইবে সেই জলেই বার কতক ধুইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। জলাশয় বা কূপের জল পরীক্ষা করিতে হইলে বোতলটী জলের মধ্যে ডুবাইয়া পূর্ণ করা উচিত। নিতান্ত তলদেশের বা উপরিভাগের জল লওয়া কর্ত্তব্য নহে। জল পূর্ণ হইলে বোতলটী পরিষ্কার নূতন ছিপি দ্বারা বন্ধ করা উচিত। বোতলের মুখ পর্য্যন্ত জল ভরা ঠিক নহে; ইহাতে ছিপি জলের সংস্পর্শে আসিতে পারে। পরীক্ষার জন্য জল দূরে লইয়া যাইবার আবশ্যক হইলে এক খণ্ড পরিষ্কার বস্ত্র বা কাগজ বোতলের মুখে ছিপির উপর দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া ভাল ইহাতে ছিপি ও বোতলের সংযোগ স্থলে ধূলা প্রভৃতি পড়িতে পারে না। সংগ্রহের পর যত শীঘ্র সম্ভব জল পরীক্ষা করা উচিত।

(১) **বর্ণ**—একটী কাচের গেলাস (বিকার-Beaker) জল পূর্ণ করিয়া সাদা কাগজের উপর রাখিয়া উপর হইতে দেখ। জলে কোন বর্ণ থাকিলে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। পানীয় জলের কোনরূপ বর্ণ থাকা উচিত নহে। বিশুদ্ধ জলও কখন কখন ঈষৎ নীলাভ হইয়া থাকে। জলের হরিদ্রা বা সবুজ বর্ণ হইলে তাহা কলুষিত বুঝিতে হইবে।

(২) **নির্ম্মলতা**—বর্ণ নির্ণয়ের সময়েই জল নির্ম্মল কিনা অনেকটা বুঝা যাইবে। পানীয় জল এরূপ স্বচ্ছ হওয়া উচিত যেন ১৬ ইঞ্চি জলের মধ্যদিয়াও ছাপার অক্ষর পড়িতে পারা যায়। খবরের কাগজের উপর তিনটী কাচের গেলাস জল পূর্ণ করিয়া উপর্য্যুপরি ধরিলে উপর হইতে লেখা পড়িতে পারা উচিত। চওড়া মুখ বিশিষ্ট বড় সাদা বোতল জল পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে একটী টাকা ফেলিয়া দেখা যাইতে পারে যে টাকার উপরের লেখা পড়া যায় কি না। লেখা না পড়া যাইলে জল পানীয় রূপে ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত নহে বুঝিতে হইবে।

(৩) **গন্ধ**—একটী টেষ্ট টিউব জলে অর্দ্ধপূর্ণ করিয়া গরম কর। জল গরম হইলে মুখে ছিপি আঁটিয়া অল্পক্ষণ নাড়িয়া আঘ্রান লইলে জলে গন্ধ আছে কিনা বুঝা যাইবে। পানীয় জলে কোন গন্ধ থাকা উচিত নহে।

(৪) **স্বাদ**—স্বাদ নির্ণয়ের জন্য জল অল্প গরম করা কর্ত্তব্য। গন্ধ নর্ণয় করিয়া সেই জলেরই স্বাদ গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিশুদ্ধ জল স্বাদশূন্য হওয়া উচিত। দেশভেদে বিশুদ্ধ জলেও এক প্রকার আস্বাদন পাওয়া যাইতে পারে।

(৫) **লিট্‌মাস্ পেপার**—ইহা অম্ল সংযোগে লাল ও ক্ষার সংযোগে নীলবর্ণ হয়। বিশুদ্ধ জলে লিট্‌মাস্ পেপার ঈষৎ নীলবর্ণ হইতে পারে বা অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে। বর্ণ লাল হইলে জল পানের উপযুক্ত নহে বুঝিতে হইবে।

(৬) **দ্রবনীয় পদার্থ**—কাঁসার কিম্বা জার্ম্মান সিল্‌ভারের বাটিতে খানিকটা জল আগুনের উপর ফুটিতে দাও। সমস্ত জল শুকাইয়া যাইলে কি পরিমাণ এবং কি বর্ণের পদার্থ পড়িয়া থাকে দেখ। অগ্নির উত্তাপ দিলে ইহা পুড়িয়া কৃষ্ণবর্ণ হয় কিনা এবং ইহা হইতে কোন ধূম বা গন্ধ নির্গত হয় কিনা লক্ষ কর। বিশুদ্ধ জল হইতে অতি সামান্য পরিমাণই শ্বেতবর্ণের পদার্থ পড়িয়া থাকে এবং ইহা অগ্নির উত্তাপে কৃষ্ণবর্ণ হয় না। অবশিষ্ট পদার্থ উত্তাপে কৃষ্ণবর্ণ হইলে এবং তাহা হইতে ধূম বা গন্ধ নির্গত হইলে জল পরিত্যজ্য বলিয়া জানিতে হইবে।

(৭) **এমোনিয়া**—এক টেষ্ট টিউব জলে ৫।৬ ফোঁটা নেসলার সলিউসন্ দাও। ৫ মিনিটের মধ্যে জল হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিলে তাহাতে এমোনিয়া আছে বুঝিতে হইবে। এমোনিয়ার পরিমাণ অনুসারে বর্ণের গাঢ়ত্ব দেখা যায়। জলে এমোনিয়া থাকিলে তাহা অপবিত্র বুঝিতে হইবে। মল, মূত্রাদি ও জান্তব পদার্থ মিশ্রিত হইলেই জলে এমোনিয়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

(৮) **ক্লোরাইড্ বা লবণ জাতীয় পদার্থ**ঃ—একটী টেষ্ট টিউবে কিছু সিল্‌ভার নাইট্রেট্ দিয়া সামান্য মাত্র ডিষ্টিল্‌ড জল দাও যেন সমস্ত দানা না গলে। এই জল এক ফোঁটা কাচের রডে তুলিয়া একটী পরিষ্কার কাচের স্লাইডের উপর রাখ। এখন ইহাতে ৪ ফোঁটা জল ড্রপারে করিয়া দাও। জলে লবণ জাতীয় দ্রব্য থাকিলে তাহা সাদা হইয়া যাইবে। ১ মিনিট অপেক্ষা করিয়া ইহাতে ৩০।৪০ বার আস্তে আস্তে ফুঁ দাও। লবণের অংশ অধিক থাকিলে

জলেতে সাদা সাদা গুঁড়া দেখা যাইবে বা সাদা সাদা চাপ বাঁধিবে। অল্প পরিমাণ লবণ থাকিলে কোন রূপ গুঁড়া বা চাপ দেখা যাইবে না। জল কেবল মাত্র জল মিশ্রিত দুধের ন্যায় ঘোলা হইবে। জলে অধিক লবণ পাইলে জলের সহিত সমপরিমাণ ডিষ্টিল্‌ড জল মিশাইয়া পুনরায় পরীক্ষা করিবে; এখনও যদি গুঁড়া দেখা যায় তবে জল পরিত্যজ্য বুঝিতে হইবে। জলে লবণ অধিক থাকিলে তাহাতে মল মূত্রাদি মিশ্রিত হইয়াছে জানিতে হইবে। অবশ্য সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানের জলাশয় ও কূপাদিতে লবণের পরিমাণ অধিক হওয়া স্বাভাবিক।

(৯) **নাইট্রাইট্**—একটী টেষ্ট টিউবে অতি সামান্য পরিমাণ এরারুট ডিষ্টিল্‌ড জল দিয়া ফুটাইয়া লও পরে ইহাতে অল্প পোটাসিয়াম্ আইওডাইড দিয়া রাখিয়া দাও। এক টেষ্ট টিউব জলে অল্প পরিমাণ এই এরারুটের জল দিয়া কিছু গ্লেসিয়াল এসেটিক্ এসিড্ ঢালিয়া দাও। জলে নাইট্রাইট্ থাকিলে ১০মিনিটের মধ্যেই জলের বর্ণ নীল হইবে। জলে নাইট্রাইট্ থাকিলে সম্প্রতি তাহাতে কোন জান্তব পদার্থ মিশ্রিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এরূপ জল ব্যবহার করা উচিত নহে।

(১০) **নাইট্রেট্**—জলে নাইট্রাইট্ পাওয়া যাইলে নাইট্রেট্ দেখিবার বিশেষ কোন আবশ্যক নাই। নাইট্রাইট্ না থাকিলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অনুসারে নাইট্রেট্ দেখিতে হইবে। টেষ্ট টিউবে জল দিয়া তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণ এসেটিক্ এসিড ও এক টুকরা দস্তা ছাড়িয়া দাও। পরে ইহাতে অল্প এরারুট ও পোটাসিয়াম্ আইওডাইডের জল দিয়া টেষ্ট টিউব ষ্ট্যাণ্ডে ১৫।২০ মিনিট রাখিয়া দাও। জলে নাইট্রেট্ থাকিলে জল অল্পে অল্পে নীল বর্ণ ধারণ করিবে।

জলে নাইট্রাইট্ থাকিলে নাইট্রেট্ ধরিবার জন্য এই প্রক্রিয়াই অবলম্বন করা যাইতে পারে কেবল প্রভেদ এই যে এসিটিক্ এসিড্ দিবার পর জলকে ১০ মিনিট কাল ফুটাইয়া লইতে হইবে।

জলে নাইট্রেট্ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে ইহাতে কিছুদিন পূর্ব্বে জান্তব পদার্থ মিশিয়াছে। এরূপ জল ব্যবহার করা উচিত নহে।

কখনও কখনও বিশুদ্ধ গভীর কূপের জলে অল্প পরিমাণ নাইট্রাইট্ ও নাইট্রেট্ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি অন্যান্য (বিশেষতঃ ১১ নং) পরীক্ষায় গভীর কূপের

৬। জলাশয় ও জলদান মাহাত্ম্য।

জলই আমাদের জীবন, জলই নারায়ণ, জলদুষ্টি করা মহাপাপ ও সেই জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এই জল দান করিলে মহাপুণ্য হয় ও অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। জলদানরূপ পুণ্য কার্য্যের ফল শাস্ত্র হইতে লইয়া বর্ণিত হইল।

সংক্ষেপাত্তু প্রবক্ষ্যামি জলদান ফলং শৃণু।
পুষ্করিণ্যাদি দানেন বিষ্ণুঃ প্রীণাতি বিশ্বধৃক্॥ কপিল পঞ্চরাত্রে।

সংক্ষেপে জলদানের ফল বলি শুন। পুষ্করিণী প্রভৃতি দান করিলে দাতার প্রতি বিশ্বম্ভর বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন।

যো বাপী মথবা কূপং দেশে তোয় বিবর্জিতে।
খানয়েৎ স দিবং যাতি বিন্দৌ বিন্দৌ শতং সমাঃ॥ নন্দিপুরাণ।

নির্জল দেশে বাপী বা কূপ দিলে দাতা সেই কূপ ও বাপীর জল বিন্দুর শতগুণিত বৎসর ব্যাপিয়া স্বর্গে বাস করে।

তড়াগকৃন্নিত্যতৃপ্তো বারুণং লোকং অশ্নুতে। বিষ্ণুসংহিতা ৯১।২।

তড়াগ প্রস্তুতকারী নিত্য তৃপ্ত হয় ও বরুণ লোকে বাস করে।

সেতুবন্ধরতা যে চ তীর্থ শৌচরতাশ্চ যে।
তড়াগ কূপ কর্ত্তারো মুচ্যন্তে তে তৃষাভয়াৎ॥ আদিত্য পুরাণ।

সেতু (সাঁকো) নির্ম্মাণকারী, জলাশয়ে নামিবার পথ পরিষ্কারকারী, শৌচ পরায়ণ, এবং কূপ ও তড়াগ খননকারী তৃষ্ণা ভয় হইতে মুক্ত হয়।

তড়াগ কূপ কর্ত্তারস্তথা কন্যা প্রদায়িনঃ।
ছত্রোপানহ দাতারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিণঃ॥ বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে।

তড়াগ ও কূপ নির্ম্মাণকারী কন্যাদাতা, ছত্র ও উপানহ (পাদুকা) দানকারী স্বর্গে গমন করে।

অন্নে দত্তে নরেণেহ প্রাণা দত্তা ভবন্ত্যুত।
প্রাণদানাদ্ধি পরমং ন দান মিহ বিদ্যতে॥ মহাভারত দানধর্ম্মে।

অন্নদান করিলে প্রাণদান করা হয়। প্রাণদান অপেক্ষা ইহলোকে আর উৎকৃষ্ট দান নাই।

অন্নঞ্চাপি প্রভবতি পানীয়াৎ কুরু সত্তম।
নীরজাতেন হি বিনা ন কিঞ্চিৎ সংপ্রবর্ত্ততে॥ ঐ মহাভারত

কিন্তু হে কুরুসত্তম প্রাণ ধারণের প্রধান সামগ্রী যে অন্ন তাহাও জল হইতে উৎপন্ন হয়, জল ব্যতীত কিছুই জন্মিতে পারে না।

অন্নৌষধ্যো মহারাজ বীরুধশ্চ জলোদ্ভবাঃ।
যতঃ প্রাণভৃতাং প্রাণাঃ সম্ভবন্তি বিশাম্পতে॥ ঐ মহাভারত।

হে বিশাম্পতে মহারাজ! যাহা দ্বারা প্রাণিগণের প্রাণ সুস্থ ও সুরক্ষিত হয়। সেই সকল অন্ন ওষধী ও লতা জল হইতেই উৎপন্ন হয়।

তস্মাৎ পানীয়-দানাদ্বৈ ন পরং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
তচ্চ দদ্যাৎ নরোনিত্যং যদীচ্ছেদ্ভূতিমাত্মনঃ॥ ঐ মহাভারত।

সেইজন্য জলদান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জলদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠদান কোথাও নাই, যদি কেহ আপনার উন্নতির অভিলাষী হন তাহা হইলে তিনি যেন নিত্য জলদান করেন।

ধন্যং যশস্যং আয়ুষ্যং জলদান মিহোচ্যতে।
শত্রূাচ্চাপ্যধি কৌন্তেয় সদা তিষ্ঠতি তোয়দঃ॥ ঐ মহাভারত!

জলদান করিলে ধন, যশ ও পরমায়ু বর্দ্ধিত হয়। হে কৌন্তেয় জলদাতা ইন্দ্র হইতেও অধিক সুখে সদা বাস করে।

সর্ব্বকামানবাপ্নোতি পাপেভ্যশ্চ প্রমুচ্যতে।
তোয়দো মনুজ-ব্যাঘ্র স্বর্গং গত্বা মহাদ্যুতে॥
অক্ষয়ান্ সমবাপ্নোতি লোকানিত্যব্রবীন্মনুঃ॥ ঐ মহাভারত।

হে মহাদ্যুতি সম্পন্ন মহারাজ জলদাতার সমস্ত কামনা সিদ্ধি হয় এবং স্বয়ং সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গিয়া অক্ষয় লোকে বাস করে, ইহা স্বয়ং ভগবান মনু বলিয়াছেন।

৭। জলাশয় সংস্কারকের ফল।

বাপী কূপ তড়াগাংশ্চ দেবতায়তনানি চ।
পতিতান্যুদ্ধরেদ্যস্তু স পূর্ত্তফলমশ্নুতে॥ লিখিত সং, ১৪

জীর্ণ বাপী কূপ তড়াগ ও দেবতামন্দির সংস্কার (মেরামত) করিয়া দিলে দাতা পূর্ত্তফল (মোক্ষ) লাভকরে।

কূপারাম তড়াগেষু দেবতায়তনেষু চ।
পুনঃ সংস্কার কর্ত্তা চ লভতে মৌলিকং ফলম্॥ বিষ্ণু সং, ৯১।১৯

কূপ উপবন তড়াগ ও দেব মন্দির সংস্কার (মেরামত) করিয়া দিলে কর্ত্তা প্রথম প্রস্তুত কারীর মত ফল লাভকরে।

দূষিত জল বঙ্গদেশের কি ক্ষতি করিতেছে?

দূষিত জল পান বা ব্যবহার জন্য যে কত অসুখ, পীড়া ও অকাল মৃত্যু হয়, তাহা আমরা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করিতে অক্ষম। কলেরা, উদরাময়, অজীর্ণতা প্রভৃতি রোগ দূষিত জল দ্বারা বিস্তৃতি লাভ করে। জল বাহ ব্যাধির জীবাণুগুলি রোগীর শরীর হইতে বাহিরে নির্গত হইয়া জলে মিশ্রিত হইলে, তাহাদের সংখ্যা বিশেষ রূপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যে জল, যে ব্যাধি পীড়িতের মল, কফ ও মূত্রাদি দ্বারা দূষিত হয় সেই জল সেই ব্যাধির কারণ তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

সান্নিপাতিক জ্বর, হাম বসন্ত ইত্যাদি রোগের বিষ সকল জলের সহিত মিলিত হইয়া অন্য শরীরে প্রবেশ করে। কৃমি, স্ফোটক প্রভৃতি রোগের দূষিত জলই একমাত্র কারণ।

দূষিত জল ব্যবহার জন্য আমাদের দেশের কত লোক কত কষ্ট পায় এবং অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শিশুদিগের শক্তি অতি

অল্প বলিয়া অপকারী দ্রব্যের শরীরের উপর মন্দ ক্রিয়ার গতিরোধ করিবার ক্ষমতাও অল্প হইয়া থাকে, এ নিমিত্ত দূষিত জল হইতে শীঘ্রই তাহাদের অপকার হইয়া থাকে।

কলেরা রোগ পানীয় জলের দোষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই পানীয় জল দ্বারাই কলেরা রোগ সংক্রামিত হয়। সাধারণতঃ তীর্থাদি হইতে যাত্রী সকল কলেরা রোগ লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহাদের বমন ও মল দূষিত বস্ত্রাদি জলাশয়ে ধৌত করা হইয়া থাকে। ইহাতে জলাশয়ের জল বিষাক্ত হয়। এই বিষাক্ত জল ব্যবহার করিয়া গ্রামবাসীরা কলেরা রোগাক্রান্ত হন।

এই কলিকাতা মহানগরীতে পাইখানা ও ড্রেন ইত্যাদি পরিষ্কার করাইবার জন্য যে ময়লা গঙ্গার জল ব্যবহৃত হয়, অনেকে বাসন ধৌত প্রভৃতি অন্যান্য সাংসারিক কর্ম্মেও সেই দূষিত জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। গঙ্গা নদীর উভয় তীরে অনেক কল, কারখানা ইত্যাদি আছে। তথায় হাজার হাজার কুলি খাটে। তাহাদের মল মূত্র সকলই সেপটিক্ ট্যাঙ্কের মধ্য দিয়া আসিয়া গঙ্গার জল দূষিত করে। ইহার ফলে কলেরা, উদরাময় ও অন্যান্য রোগের জীবাণু সকল এই জলের সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে আসে এবং অজ্ঞ অধিবাসীরা এই বিষ সদৃশ জল ব্যবহার করিয়া রোগগ্রস্ত হন। যদিও কেহ এই জল পানীয় রূপে বা রন্ধনাদির জন্য ব্যবহার করেন না বটে কিন্তু অনেকেই ইহা পাক ও ভোজনাদির পাত্র সমূহের ধৌত কার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে উক্ত রোগের বীজাণু সকল অবশ্য ব্যবহার্য্য পাত্রাদিতে লাগিয়া থাকে। সেই বীজাণু সংলিপ্ত পাত্রাদি ব্যবহারে বিষ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপাদন করে। এই জন্য এককালে এক পরিবারের মধ্যে অনেককে রোগাক্রান্ত হইতে দেখা গিয়াছে। এই জলকে সকলের বিষ্ঠার জল বলিয়া অস্পৃশ্য ভাবে দেখা কর্ত্তব্য। যে সকল অধিবাসীরা নদ্যাদির এইরূপ অস্পৃশ্য বিষবৎ জল ব্যবহার করেন তাঁহারা যেন এখন হইতে এই দূষিত জল ব্যবহারে বিরত হন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বর্ষা আরম্ভের সহিত আমাদের দেশে প্রায় অধিকাংশ লোকের অজীর্ণ, পেটের পীড়া ও উদরাময় রোগ দেখা যায়। বৃষ্টির জল দ্বারা মৃত্তিকা, জঙ্গল ইত্যাদির ধৌত মল জলকে দূষিত করে। জল এই সময় অতিশয় ঘোলা হইয়া থাকে। এমন

কি এই জল কলদ্বারা ফিল্‌টার হইবার পরও ঈষৎ ঘোলা থাকিয়া যায়। জলে দ্রবণীয় ও ভাসমান মৃত্তিকা ইত্যাদির অংশ আমাদের পেটের মধ্যে যাইয়া পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত করে এবং এই পরিপাক শক্তির হ্রাস জন্য তরল দাস্ত ও উদরাময় প্রভৃতি রোগ সকল উৎপন্ন হয়।

দূষিত জল ব্যবহার করিলেই যে সঙ্গে সঙ্গে পীড়া হইবে এরূপ নহে। অনেকে জল দূষিত হইয়াছে জানিয়াও তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা হয়ত মনে করেন যে যখন তাঁহারা পীড়াগ্রস্ত হইতেছেন না তখন এরূপ জল ব্যবহারে কোন ক্ষতি নাই। এরূপ ধারণার ফল নিতান্ত বিষময়। অধিকদিন যাবৎ দূষিত জল ব্যবহার করিলে শরীরের স্বাভাবিক রোগ নাশ করিবার ক্ষমতা নষ্ট হয় এবং তখন নানারূপ ব্যাধি অতি সহজেই দেহকে আক্রমণ করিয়া থাকে। দূষিত জল ব্যবহারই যে বঙ্গ দেশের অধিবাসি সমূহের রোগাধিক্যের একটী প্রধান কারণ, সেবিষয়ে মত ভেদ হইতে পারে না। ম্যালেরিয়া কনফারেন্সের সভাপতি সার্জ্জন জেনেরেল লিউকিস সাহেব বলেন যে **দূষিত জল ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্য হানিই ম্যালেরিয়া প্রসারের সহায়তা করিতেছে।**

কি প্রণালীতে ব্যবহার করিলে জল দূষিত হইবে না।

জল সম্বন্ধে নানাকথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এক্ষণে সাধারণ গৃহস্থের কি প্রণালীতে নিত্য জল ব্যবহার করা উচিত এবং কি পদ্ধতি অবলম্বন করিলে তাহাদিগের দ্বারা জল দূষিত হইবে না সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১। স্নান, ধৌত করণ ও শৌচ কর্ম্ম ইত্যাদি ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য জলের আবশ্যক। এই কার্য্য অনায়াসে তোলা জলে সম্পন্ন হইতে

পারে। যাঁহার চাকর আছে তাঁহার ত কথাই নাই আর যাঁহাদিগকে স্বয়ং সকল কার্য্য করিতে হয় তাঁহাদেরও ইহা দশ কার্য্যের মধ্যে এক কার্য্য রূপে করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেকের ২।৪ কলসী জল হইলেই যথেষ্ট।

পায়খানা ও পগার প্রভৃতি পুষ্করিণী হইতে দূরে করিবে এবং পরিত্যক্ত মলে মৃত্তিকাদি চাপা দিবে।

ঘাটে যাওয়ার পূর্ব্বে প্রস্রাব করিয়া যাওয়া উচিত। আর যদি জলের নিকটবর্ত্তী হওয়ার জন্য প্রস্রাবের বেগ উপস্থিত হয় তাহা হইলে পুষ্করিণী হইতে দূরে গিয়া প্রস্রাব করা কর্ত্তব্য।

২। বাসন মাজা, মাছ তরকারি ধোওয়া প্রভৃতি গৃহস্থের কার্য্য সকল তোলা জলে হওয়া উচিত এবং এই সকল ধৌত জল যেন পুষ্করিণী হইতে বিভিন্ন দিকের কোন পগার বা খানার দিকে যায় তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

৩। জলাশয়ের চারি পাড় পরিষ্কার রাখিতে হইবে। ইহার জন্য কেবল সামান্য পরিশ্রমের আবশ্যক। বর্ষার জল বাড়িবার পূর্ব্বে চারি পাড় পরিষ্কার করাইয়া ও আগাছা ইত্যাদি কাটাইয়া ফেলিলে জলের আর কোন দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

৪। যাহাতে বাহির হইতে দূষিত জল পুষ্করিণীতে না আসিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত প্রথমেই করা উচিত। এজন্য জলাশয়ের চারি পাড় উচ্চ করিয়া অপর দিকে ক্রমশঃ ঢালু করা কর্ত্তব্য। জলে কতক পরিমাণে মৎস্য থাকিলে জলের অনেক ময়লা খাইয়া ফেলিতে পারে।

৫। পুরাতন দূষিত জল ছেঁচিয়া ফেলিয়া পাঁক তুলিয়া ফেলিলে ও উল্লিখিত-রূপ সুবন্দোবস্ত করিলে, সকল জলাশয়েরই জল অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাল থাকিতে পারে। বৎসর বৎসর জল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। জল খারাপ হইলেই এরূপ সংস্কার করা উচিত।

(৬) পানীয় জলের জন্য পরিষ্কার জল বিশিষ্ট পুষ্করিণী পৃথক ভাবে রাখা উচিত। কেহ এই পুষ্করিণীতে নামিবে না বা স্নান করিবে না বা কোন প্রকার আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিবে না। কেবলমাত্র জল তুলিয়া লইয়া ব্যবহার করিবে।

কাপড় কাচা, বাসন মাজা ইত্যাদি কার্য্য পানীয় জলের পুষ্করিণী হইতে বহুদূরে হওয়া কর্ত্তব্য। যে সকল পুষ্করিণী হইতে পানীয় জল সংগৃহীত হয় না তথায় বাসন মাজা প্রভৃতি কার্য্য হইতে পারে কিন্তু এরূপ বাসনও পরিশেষে তোলা বিশুদ্ধ পানীয় জলে ধুইয়া লওয়া উচিত।

কূপ হইতে পানীয় জল লইতে হইলে দেখিতে হইবে যেন কোনরূপ অপরিস্কৃত পাত্র কূপের ভিতর ডোবান না হয়। এই জন্য প্রত্যেক কূপে একটী নির্দ্দিষ্ট পাত্র ও রজ্জু রাখা ভাল। যাঁহার কূপ তিনি লক্ষ্য রাখিবেন যেন এই পাত্র ও রজ্জু সর্ব্বদা পরিস্কৃত অবস্থায় থাকে।

দূষিত জল সম্বন্ধে কি প্রকারে সাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে।

Lord Carmichal in his reply to the addresses of the Murshidabad Associations said.—"Without education the people cannot realise the value and in fact the necessity of co-operation and self-help in the matter of rural sanitation."

"গ্রাম্য স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, জনসাধারণের প্রত্যেক্‌কে পৃথক ভাবে এবং সমবেত হইয়া চেষ্টা করিতে হইবে। সমবেত চেষ্টার আবশ্যকতা সাধারণে শিক্ষা ব্যতীত উপলব্ধি করিতে পারিবে না।"

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই শিক্ষা কার্য্যে কে শিক্ষক হইবে এবং জনসাধারণকে কি রূপে শিক্ষা দিবে।

জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার ভার প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালিকেই লইতে হইবে। প্রত্যেক **ধর্ম্মোপদেষ্টা বা পুরোহিত, প্রত্যেক বাড়ীর কর্ত্তা, প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি** এমন কি **প্রত্যেক গৃহ-**

কর্ত্রী নিজ নিজ ব্যক্তিবর্গকে উপদেশ দিবেন। সভাসমিতি, ক্রিয়া কলাপ মেলা ইত্যাদিতে বিশেষ রূপে জল সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য।

যে সকল কারণে জল দূষিত হয়, সাধারণের উপযুক্ত চেষ্টা থাকিলে, তাহার প্রায় সকলগুলি কারণই নিবারণ করা যাইতে পারে। ইহাতে অধিক অর্থের আবশ্যক নাই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিলে এবং যত্ন পূর্ব্বক লোককে তাহাদের নিজ উপকারের কথা বুঝাইয়া সেইরূপ করিতে বাধ্য করিলেই, দূষিত জলের অপকার হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

পুষ্করিণী হইতে তোলা জল ব্যবহার করা, পুষ্করিণীতে কোন প্রকার ময়লা পড়িতে না দেওয়া এবং তাহার জল পরিষ্কার রাখা কি অসাধ্য ব্যাপার?

যাঁহার অর্থ আছে তিনি অর্থ সাহায্য করিলেন এবং যাঁহার অর্থ নাই, তিনি খাটিয়া কাজ কর্ম্ম করিলেন—এরূপ প্রণালীতে অনেক কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে।

এমন কে আছে, যে, আপনার পিতা মাতার, ভাই ভগ্নীর বা স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতির জীবনের মঙ্গলের নিমিত্ত কেহ প্রকৃতরূপে বুঝাইতে পারিলে, তিনি তাহার মতাবলম্বী হইবে না?

পীড়া হইলে যে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, যত টাকা ঔষধাদির নিমিত্ত ব্যয় করিতে হয়, যেরূপ ভোগ-সুখে বঞ্চিত হইতে হয়, মৃত্যুর পর পরিজনের যে অসহ্য দুঃখ দুর্গতি হয়, যত প্রকারে উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হয়, চিররোগে অর্থাভাবে যত কষ্ট পাইতে হয় এবং অহিতাচরণে যেরূপ ক্ষীণ ও অল্পায়ু হইতে হয়, তাহা সকলেরই একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট না পাইয়াছে এমন লোক এদেশে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে তাঁহারা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে যত্নবান হইতেছেন না তাহার মূল কারণই অজ্ঞতা ও শিক্ষার অভাব। যেদেশে হাজারে ২০ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে পারে তাহাদের মধ্যে কয়জন মাত্র সম্যক্‌রূপে এই সকল স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে নিজে বুঝিতে পারিবে বা অপরকে শিক্ষা দিতে সচেষ্ট হইবে।

যদি প্রত্যেক শিক্ষিত লোকে সদাসর্ব্বদা এই বিষয় আলোচনা করেন ও নিরক্ষর লোকদিগকে মুখে মুখে এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দেন, তবে অতি অল্প সময়ে সহজেই জন সাধারণ মধ্যে এই জ্ঞান বিকাশ পাইতে পারে।

অনেক লোক তাস, পাসা, মামলা মকদ্দমা, দলাদলি, কলহ ও পরনিন্দা ইত্যাদিতে বৃথা সময়ক্ষেপ করিয়া সমাজকে উৎপীড়িত করেন। তাঁহারা যদি ঐরূপ কাজে লিপ্ত না হইয়া জন হিতকর জল রক্ষা ও জল দান রূপ মহৎ কার্য্যে তাঁহাদের অবসরটুকু ব্যয় করেন তাহা হইলে তাঁহারা দেশের এক মহা অভাব দূর করায় লোকসমাজে পরোপকারী বলিয়া কত প্রশংসা পান এবং স্বদেশবাসী ও স্বজাতির উপকারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও কতবিধ সুখে সুখী হইতে পারেন। তাঁহারা দেশের কাজ করেন ও দশের মধ্যে একজন হন।

স্কুলের শিক্ষকগণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার সময় জল সম্বন্ধে বিশেষ রূপে বালকদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন। বালকদিগকে গ্রামস্থ বিভিন্ন জলাশয়ের জল আনিতে বলিবেন। পরে এই সকল জলকে সহজ উপায়ে বর্ণিত পরীক্ষা দ্বারা দূষিত বা বিশুদ্ধ স্থির করিতে দিবেন। যে জলাশয়ের জল দূষিত বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাহার জল দূষিত হইবার কারণও অনুসন্ধান করিতে দিবেন এবং কি প্রকারে সেই জলাশয়ের জলে ময়লা আসিতেছে তাহাও বালকগণকে বেশ করিয়া বুঝাইবেন।

"Child is the father of the man"—বালকেরাই আবার ক্রমে পিতা হইয়া উঠিবে। যদি তাহাদের মনে দূষিত জলের অপকারিতা ভাল রূপে বদ্ধমূল করিয়া দিতে পারা যায় তাহা হইলে শীঘ্রই জলের দোষ ও জল জন্য কষ্ট নিবারিত হইবে সন্দেহ নাই।

আমাদের মেয়েদের মধ্যে গুরু ও পুরোহিত মহাশয়দের প্রাধান্য খুব বেশী। যদি তাঁহারা বার ব্রত ও পূজাদির সময়ে মেয়েদের নিকট "**জল সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় কথার**" আলাপ করেন এবং সরল ভাবে বুঝাইয়া দেন যে জল দেবতাস্বরূপ। জলকে দূষিত করিতে নাই। জলকে দূষিত করা মহা পাপ। আর জল দান, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা বা সংস্কার করিলে মহাপুণ্য সঞ্চয় ও অক্ষয় স্বর্গলাভ হয় তাহা হইলে আবার পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা গ্রামে গ্রামে দেখা যাইবে ও বঙ্গের জলকষ্ট দূর হইবে।

প্রত্যেক গ্রামের ভূম্যধিকারীর বা জমীদারবর্গেরই সর্ব্বাপেক্ষা দায়িত্ব অধিক।

গ্রামস্থ সকলে তাঁহাদিগকেই রাজা বলিয়া জানে কৃষকেরা চাষ আবাদ করিয়া তাঁহারই নিকট রাজস্ব বা খাজনা উপস্থিত করে ও আদেশ প্রতিপালন করে। জমিদারগণেরও তাহাদিগকে সন্তানের তুল্য দেখা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যাহাতে তাহারা বিশুদ্ধ পানীয় জল পায়, যাহাতে তাহারা রোগমুক্ত হইতে পারে এবং সুস্থদেহে নির্ব্বিঘ্নে সন্তান সন্ততি লইয়া বাস করিতে সমর্থ হয় এবিষয়ে প্রত্যেক জমীদারের সর্ব্বোতোভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

যে গ্রামবাসী পুষ্করিণীর জল দূষিত করিবে গ্রামের জমিদার বা পঞ্চায়েৎ তাহার সামাজিক অর্থদণ্ড করিবেন এবং এই অর্থ জলদোষ নিবারণের জন্য ব্যয়িত হইবে। বিবাহ ইত্যাদিতে গ্রামভাটী বাবৎ প্রাপ্য অর্থও এই জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত। বারোয়ারিতে যে অজস্র অর্থ ব্যয় হয় তাহার কতক পরিমাণে খরচ কমাইয়া উদ্বৃত্ত অর্থ জলকষ্ট নিবারণের জন্য দেওয়া বিধেয়।

বার, ব্রত, পূজা, শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে যথেষ্ট অর্থব্যয় না করিয়া যদি অবস্থাপন্ন লোকেরা স্ব স্ব গ্রামের পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন বা পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করান তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, নিজেও পুণ্যবান্ হইবেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

কি উপায় দ্বারা সাধারণকে জল দূষিত করা হইতে নিবৃত্ত রাখিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অজ্ঞতা ও অশিক্ষা আমাদের প্রধান শত্রু। এই অজ্ঞতার জন্যই আমরা আমাদের নিজের ব্যবহার্য্য জলকে নিজেরাই দূষিত করিয়া থাকি। এই অজ্ঞতা যাহাতে দূর হয় এবং সমগ্র গ্রামবাসীরা যাহাতে জল সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারে তাহার উপায় আমরা গত অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি।

এক্ষণে অনেক স্থানে দেখা যায় যে "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" দুষ্ট ব্যক্তিরা কিছুতেই ভাল কথা শুনিবে না বা শুনিয়াও সেই মত কাজ করিবে না এবং অন্যকেও করিতে দিবে না। এই জন্য রাজার রাজ দণ্ডের প্রয়োজন।

শাস্ত্রে যে প্রকার জল দূষকের ও দূষিত জল ব্যবহারকারীর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে, সেই প্রকার এক্ষণে জল দূষকের ও দূষিত জল ব্যবহারকারীর আইন দ্বারা দণ্ডের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত। কথায় বলে "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্" অর্থাৎ মূর্খকে লাঠি মারাই ঔষধ। সেই জন্য যাহারা জল নষ্ট করিবে বা দূষিত জল ব্যবহার করিবে তাহাদের দণ্ড হওয়ার ব্যবস্থা থাকিলে সকলেই এ কাজ হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। গ্রামের পঞ্চায়েৎও জল দূষকের সামাজিক বা অন্য কোন রূপ শাস্তি বিধান করিতে পারেন।

পানীয় জলের ব্যবহার।

জলই আমাদের জীবন, জলই নারায়ণ। এই জল যে বিশুদ্ধ ব্যবহার করা উচিত তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই।

পূর্ব্বেই আমরা জলের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ৩৮৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে কি প্রকারে বিশুদ্ধ জল পানীয় রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

আমাদের আহার্য্য দ্রব্য সকল পরিষ্কার করিয়া, বাছিয়া লইয়া আমরা খাইয়া থাকি। চাউল রন্ধনের পূর্ব্বে ধোয়া হয়, তরকারি মৎস্য ইত্যাদি সকল দ্রব্যই জলদ্বারা পরিষ্কৃত হয় কিন্তু কেবল আমরা জলকে ব্যবহারের পূর্ব্বে পরিষ্কার করিয়া লইতে সম্পূর্ণ উদাসীন। পানীয় জল সম্পূর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ হওয়া উচিত।

কলিকাতার ন্যায় বড় বড় নগরে মিউনিসিপ্যালিটী ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল জোগাইতেছে এবং গ্রামস্থ অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত লোকেরাও অনেকে ইদানীং নানাপ্রকার ফিল্‌টারের সাহায্যে জল শোধিত করিয়া পানীয়রূপে ব্যবহার করিতেছেন।

গ্রামবাসীরা দূষিত জল পান দ্বারা নানাপ্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া কত কষ্ট

পাইতেছে ও অকালে প্রাণ হারাইতেছে। তাহাদের জন্য সহজ ও নিশ্চিত ফলপ্রদ জল বিশোধনের ব্যবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইল। সর্ব্বাপেক্ষা সহজ এবং সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ উপায়—জল ফুটাইয়া লওয়া। জলকে অন্ততঃ ১৫ মিনিট কাল সিদ্ধ করিয়া লইয়া তবে ব্যবহার করা উচিত। এই প্রকার জল সিদ্ধ করিয়া লইলে জল বিশুদ্ধ হয়।

জল ফুটাইবার জন্য কাষ্ঠের আবশ্যক। অনেকে এই কাষ্ঠের অভাব জন্য ফুটাইতে অক্ষম।

ইদানীং আমাদের দেশ আগাছা ও বন দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং এই সকল আগাছা দ্বারা জল দূষিত হইতেছে ও দেশে ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হইতেছে। সকলে নিজ নিজ বসতবাটী, বাগান ও বাগিচায় যত আগাছা ও বন জঙ্গল আছে তাহা কাটাইয়া ফেলুন। পরে এতদ্দ্বারা যে জ্বালানি কাষ্ঠ পাতা ইত্যাদি পাওয়া যাইবে তাহা দ্বারা নিজ নিজ ব্যবহারের জল ফুটাইয়া লইয়া ব্যবহার করুন !

যাহার অর্থ আছে তিনি অনায়াসে জন মজুর দিয়া এ কার্য্য করাইতে পারেন। যাহার অর্থ নাই তিনি সপরিবারে নিজ নিজ কায়িক পরিশ্রম দ্বারা এই সকল বন জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিতে পারেন।

ইহাতে "এক ঢিলে দুই পাখী মরিবে" জঙ্গল পরিষ্কার করা হইবে এবং জ্বালানি কাষ্ঠাদিরও অভাব ঘুচিবে।

সকল গ্রামবাসীর ইহা করা একান্ত আবশ্যক। ইহার দ্বারা নিজের মঙ্গল হইবে, নিজ সন্তান সন্ততি প্রভৃতি ও আত্মীয়বর্গের মঙ্গল হইবে, নিজের দেশের মঙ্গল হইবে এবং ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার সুখ উপার্জিত হইবে।

জল কি প্রকারে পান করিবে—এই সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া প্রবন্ধের শেষ করিব।

যে প্রকার আহার্য্য দ্রব্যাদি উত্তম রূপে চর্ব্বণ করিয়া আস্তে আস্তে গলাধঃকরণ করিলে অল্প আহার্য্য দ্রব্যে শরীরের পুষ্টি সম্পাদিত হয় সেইরূপ তৃষ্ণার সময় তাড়াতাড়ি জল না খাইয়া আস্তে আস্তে অল্প মাত্রায় জল খাইলে তৃষ্ণার শান্তি হয়

ও শরীরও হৃষ্টপুষ্ট হয়। পিপাসা পাইলেই জল খাইবে কিন্তু একেবারে অধিক খাইতে নাই।

জলপানের সময় ও মাত্রা—কোন সময় কত জল খাইলে স্বাস্থ্যের উপকার হয়, এই সম্বন্ধে নানা মত আছে। তবে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী নিয়ম বর্ণিত হইতেছে।

(১) আহারের সঙ্গে অধিক জল খাইবে না। পিপাসা থাকিলে কেবল মাত্র যতটুকু জলে পিপাসা নিবৃত্ত হয় ততটুকু জল খাইবে। শীত গ্রীষ্ম অনুসারে মাত্রার কম বেশী হইলে কোনও অপকার হয় না।

(২) আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা আহারের সহিত অধিক জল পান করা অন্যায় যেহেতু পাচক রস সমূহ জল মিশ্রিত হওয়াতে তাদৃশ কার্য্যক্ষম থাকে না এবং অজীর্ণতাদোষ ও পেটের পীড়া হইয়া থাকে।

(৩) প্রত্যূসে মুখ হাত ধুইবার পর জল পান করিলে শরীরস্থ ক্লেদ সমূহ উত্তম রূপে ধৌত হইয়া যায় এবং মল মূত্র পরিষ্কার হয়। এই জল ঈষদুষ্ণ পান করিলে অধিক উপকার পাওয়া যায় এবং অজীর্ণ—কোষ্ঠবদ্ধতা, পাথরী ইত্যাদিরোগ উপশমিত হয় এবং দীর্ঘকাল ব্যবহারে নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়।

(৪) আহারের তিন ঘণ্টা পর বা এক ঘণ্টা পূর্ব্বে জল পান করিলে অজীর্ণ রোগীর পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায় ও ভুক্তদ্রব্যাদি সহজেই হজম হইয়া থাকে।

(৫) রাত্রে নিদ্রাযাইবার ঠিক পূর্ব্বেই জল পান করিয়া শয়ন করিলে শরীর মধ্যে জল পূর্ণ মাত্রায় ক্রিয়া করিতে পারে এবং শরীরের যাবতীয় ক্লেদ, ময়লা ইত্যাদি পরিষ্কার করিতে সক্ষম হয়।

(৬) শরীরের অভ্যন্তরস্থ ক্লেদ, ময়লা ইত্যাদি পরিষ্কারের জন্য পানীয় জল যত বিশুদ্ধ হইবে ততই ভাল এবং এই জন্য পরিশ্রুত জল (Distilled water) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা পাথরী ও অন্যান্য রোগে ব্যবহার করিলে মন্ত্রৌষধির ন্যায় সদ্যঃ ফল পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"।

প্রথম বর্ষ। } মাঘ ১৩১৯ সাল { দশম সংখ্যা।

ধূলিকণার আত্মকাহিনী।

আমি ধূলিকণা। সে আজ অনেক দিনের কথা, বহুকাল পূর্ব্বে আমি এক কৃষকের চাষের ক্ষেতে সারের গাদায় থাকিতাম। সে স্থানে যে আমি একাকী বাস করিতাম তাহা নয়; আমার বহু সঙ্গী ছিল। তাহাদের সহিত আমি কত আনন্দে কাল কাটাইতাম। একদিন সহসা দেখি বায়ু প্রবল বেগে মাঠের উপর দিয়া বহিতে লাগিল, তাহার বেগ আমরা সহ্য করিতে পারিলাম না, কে কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেলাম, এত দিনের বন্ধুগণ এক নিমেষে পৃথক্ হইয়া গেল।

যাহা হউক, আমি বায়ু পৃষ্ঠে বহুদূর উড়িয়া চলিলাম, পবন আমায় এক নগরের ভিতর লইয়া আসিল। এক গৃহস্থের বৈঠকখানার জানালা মুক্ত ছিল, বাতাস তাহার মধ্য দিয়া আমায় গৃহে ফেলিয়া দিল। আমি এক শেল্ফে যাইয়া পড়িলাম। সে স্থানে আমার ন্যায় বহু জীবের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাদের সহিত পরিচয় হইতেও বিলম্ব হইল না। আমরা গল্প গুজব করিয়া, কত মজা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম। প্রতিদিন আমাদের উপর দিয়া বাটীর ভৃত্যের ঝাড়ন চলিয়া যাইত। তাহাতে যে

আমাদের কেহ কেহ দলচ্যুত হইত না তাহা নহে। অবশেষে সেস্থান আর আমার মনস্তুষ্টি করিতে পারিল না। নূতন স্থান যখন পুরাণ হইয়া যায় তখন ভ্রমণকারীর যে দশা হয় আমারও সেই অবস্থা হইল। নূতন স্থানে যাইবার জন্য মন ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে আমি নিকটে ঝুলান কোন ছবির মাথায় যাইয়া পড়িলাম, সে স্থান দেখিলাম ধূলিকণায় পরিপূর্ণ। প্রতিদিন নব নব অতিথি আসিতেছে এবং স্থান পাইতেছে; আমাদের জন্য গৃহস্বামী যে এমন থাকিবার এবং আমোদ প্রমোদ করিবার স্থান করিয়া দিয়াছেন দেখিয়া আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। কত সুখে ও আনন্দে দিনগুলি কাটিতে লাগিল। হায়! সকল সুখই ক্ষণস্থায়ী সপ্তাহান্তে বাটীর ভৃত্যের ঝাড়ন আসিয়া আমাদের উপর পড়িল। আমরা কে কোথায় চলিয়া গেলাম। এমন সময় মৃদু সমীরণ আমায় দূরস্থিত এক গৃহে লইয়া গেল। সেটী রন্ধনশালা, আমি এক খাবারের পাত্রের উপর পড়িলাম। এমন সময়ে এক মাছি আসিয়া সেই খাদ্যের উপর বসিল। তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদে কত রোগের কত বীজাণু রহিয়াছে দেখিলাম। তাহাকে খাদ্যের উপর বসিতে দেখিয়া তাহার প্রতি আমার রাগ হইল; সে কত ময়লা জায়গা ঘুরিয়া আসিয়া কত রোগের কত বীজাণু লইয়া খাদ্যের উপর আসিয়া বসিল। যাহারা ঐ খাদ্য ভক্ষণ করিবে তাহাদের কি অনিষ্ট করিতেছে তাহা ভাবিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ হইল। কিন্তু শীঘ্রই আমায় তাহার প্রতি ঘৃণার প্রতিফল পাইতে হইল। পরে আমি তাহার বীজাণু জড়িত দেহের সহিত যুক্ত হইয়া গেলাম।

মাছিটী উড়িয়া পার্শ্বস্থিত জলপাত্রে যাইয়া ডিম্ব প্রসব করিতে লাগিল। তাহার পদ হইতে কত বীজাণু জলের সহিত মিশ্রিত হইল। ইহা দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইল।। যে তিনটী মহিলা জলপাত্র উন্মুক্ত রাখিয়া সেই গৃহে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে মনে মনে তিরস্কার করিলাম, কারণ তাঁহারা যখন সেই জল পান করিবেন তাঁহারা দেখিয়াত পান করিবেন না এবং যে বীজাণু সেই জলে মিশিয়াছে, তাহারা তাঁহাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে রোগাক্রান্ত করিবে। আমি ভাবিলাম এই মাছি ক্ষুদ্র হইলেও সামান্য নহে, ইহারা মানুষের অপকার করিতে, মানুষ মারিতে, মানুষের অপেক্ষা এমন কি বন্য জন্তুদিগের অপেক্ষাও পটু।

মাছিটী সে স্থান ত্যাগ করিয়া উড়িয়া চলিল। সে সেই বাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগরের রাস্তায় আসিল। যে স্থানে কোন পচা জিনিষের গন্ধ পাইতেছে, যে স্থানে কোন পচা মাছ বা মাংসের গন্ধ পাইতেছে সেই স্থানেই ছুটিয়া যাইয়া একবার বসিতেছে আবার পরক্ষণেই তাহা ছাড়িয়া নূতন সন্ধানে ছুটিতেছে সব দিক রাখিতে যাইয়া সে কোন দিক রাখিতে পারিতেছিল না।

অবশেষে সে রাস্তার নর্দ্দামার পার্শ্বে যে স্থানে পচা ইঁদুর পড়িয়াছিল, সেই খানে যাইয়া বসিল। সে স্থানে মাছিদের মেলা বসিয়া গিয়াছে। কত মাছি আসিতেছে ও যাইতেছে। আমার সেই স্থান ভাল লাগিতেছিল না। কি দুর্গন্ধ! কিন্তু যাহার যা ভাল লাগে না তাহাকে প্রায় তাহাই করিতে হয়। আমাদের পক্ষে এই কথা সত্য হইল। মাছিটী আমাকে সেই স্থানে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

তখন আমি দেখিলাম আমি নানা রোগের বীজাণু জড়িত। আমার সর্ব্ব শরীর নানা রোগের বীজাণু পূর্ণ। কুসঙ্গে বেড়াইলে অজ্ঞাতসারে কিরূপে আপনার অপবাদ হয় তাহা এই ঘটনা হইতে বেশ বুঝিলাম এবং বীজাণু হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। এমন সময়ে পবন আসিয়া আমায় উড়াইয়া লইয়া গেল এবং পার্শ্ব দিয়া যে এক ব্যক্তি যাইতেছিলেন তাহার নাসারন্ধ্রে ঢুকাইয়া দিল; আমার গাত্র হইতে কত বীজাণু তাহার শরীরে প্রবেশ করিল, আর আমি কোন প্রকারে তাঁহার হস্তের সাহায্যে বাহির হইয়া আবার সেই নোংরা জায়গায় পড়িলাম। আমার দ্বারা সেই ব্যক্তিটীর স্বাস্থ্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইল, তিনি এখন কোন সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইতে পারেন ইহা ভাবিয়া আমি আপনাকে মনে মনে অনেক ধিক্কার দিলাম। কুসঙ্গে থাকিলে অনিচ্ছা সত্বেও যে পরের অনিষ্ট করিতে হয় তাহা বেশ বুঝিলাম। আপনার উপর তখন অত্যন্ত ঘৃণা হইল। কিন্তু আমি জানিতাম না যে আমাকে এখনও বহু কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। এখনও কুসঙ্গ ছাড়িতে পারিব না।

আমি যখন এই সকল কথা ভাবিতেছিলাম, তখন আর একটী মাছি আমার উপর আসিয়া বসিল এবং পূর্ব্বোক্ত মাছিটীর ন্যায় তাহার পদবীজাণু আমায় শরীরে জড়াইয়া লইল কিছুক্ষণ এ ইঁদুর ও ইঁদুর করিয়া সে সেই স্থান ছাড়িয়া রাস্তা দিয়া যা

চলিল। একবার এ দোকান ; একবার ও দোকান করিয়া সে চলিল। তাহাদের কিছুই ভাল লাগে না তাহাদের কি অশান্তির মন। খাবারের দোকান, মাংসের দোকান, মদের দোকান ইত্যাদি তাহার বীজাণু জড়িত পদের ধূলি হইতে বঞ্চিত হইল না। এক খাবারের দোকানে আমার এক পুরাতন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সেই মাছিটী যখন দোকানের সম্মুখে সজ্জিত খাবারের উপর বসিল তখন তাহার সহিত দেখা হইল তিনিও আমার ন্যায় বীজাণু জড়িত। তিনি বলিলেন তিনি রাস্তায় পড়িয়াছিলেন, তার পরে রাস্তায় যখন জল দিতে আসিল তখন বায়ু আসিয়া তাহাকে খাবারের উপর রাখিয়া গিয়াছে।

মাছিটী উড়িয়া যাইতে যাইতে সহসা নগরের হাঁস্পাতালের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি দেখিলাম গৃহে, খাটে কয়েকটী মহিলা শুইয়া আছেন, তাঁহারা কেহ বা জ্বরে ভুগিতেছেন কেহ বা অন্য রোগাক্রান্ত। আমি তাঁহাদিগকে দেখিয়াই চিনিলাম তাঁহারা সেই রন্ধনশালার মহিলাগণ। আমি বুঝিলাম সেই জলে ও খাবারে জ্বরের ও অন্য রোগের বীজাণু পতিত হইয়াছিল এবং উহারা তাহাদিগকে রোগাক্রান্ত করাইয়াছে। মাছিটী আবার উড়িয়া চলিল; সে নগর ছাড়াইয়া আসিল। এমন সময় প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইয়া আমাকে তাহা হইতে পৃথক করিয়া উড়াইয়া লইয়া চলিল তখনও আমি বীজাণু পরিপূর্ণ। বায়ু আমাকে এক গৃহস্থের বাটীতে কোন জলপাত্রে ফেলিয়া দিল। সেই জলের সহিত আমার গাত্রের সকল বীজাণু মিশিয়া গেল, আমি উহাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইলাম ও পাত্রের তলায় পড়িয়া রহিলাম কিন্তু আমার মনে শান্তি রহিল না কারণ সেই জল যিনিই পান করিবেন তাঁহারই হয় ত অসুখ হইবে। অপরের অনিষ্ট সাধন করিয়া নিজের মঙ্গল করায় আমি সুখ বোধ করিলাম না।

একদিন সেই জলপাত্র হইতে জলের গেলাসে পতিত হইলাম। ভাগ্যক্রমে যিনি সেই জল পান করিবেন বলিয়া লইলেন তিনি জল অপরিষ্কার দেখিয়া ফেলিয়া দিলেন। তা না হইলে আমাকে তাহার শরীরে প্রবেশ করিতে হইত এবং তাহাতে তাঁহারও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইত। আমি বাটীর বাহিরে জলের সহিত পতিত হইলাম। ক্রমে জল শুকাইয়া যাইলে, আবার আমি বায়ু পৃষ্ঠে সে স্থান হইতে অপরস্থানে চলিলাম।

আমার দ্বারা কত লোকের কত অপকার সংঘটিত হইয়াছে তাহা ভাবিয়া আপনার উপর অত্যন্ত ঘৃণা জন্মাইল। তখন কোন স্থানে অথবা সেই বাল্যকালের ধানের মাঠে যদি ফিরিয়া যাইয়া সেই বাল্যের সঙ্গিগণের সহিত থাকিতে পারি এই ইচ্ছা হইল। বিধাতা আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। আমি পরিতাপ করিয়াছিলাম বলিয়া আমার পাপ কাটিয়া গেল।

একদিন সহসা এক প্রবল বাত্যা আমায় তাহার পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া চলিল। কত নগর, কত গ্রামের উপর দিয়া, কত নদ, নদী, পর্ব্বত, জঙ্গল, মাঠ পার করিয়া অবশেষে এক মাঠে সারের গাদার উপর ফেলিয়া দিল। আমি দেখি সেই বাল্যকালের ধানের মাঠে সারের গাদা। সেই স্থানে শৈশবকালে কত খেলিয়াছি, কত আনন্দ করিয়াছি। আমার বাল্যবন্ধুদিগের মধ্যে অল্প জনই সে স্থানে ছিলেন। তবু সেই কয়েকজনকেই পাইয়া আমি যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলাম। কি আনন্দ! আমাকে পাইয়া তাহাদিগের কি আনন্দ! আমার জীবনের শেষ ভাগ এখন অত্যন্ত সুখে ও আনন্দে কাটাইতেছি। সমস্ত জীবনসংগ্রাম শেষ করিয়া এরূপ শান্তিতে বাস করা অতি অল্প ব্যক্তিরই ঘটে। কিন্তু এখনও যে সময়ে পূর্ব্বোক্ত ভ্রমণ কাহিনী এবং আমারদ্বারা কি অপকার সাধিত হইয়াছিল মনে পড়ে এবং খাদ্যদ্রব্য, পানীয় জল ইত্যাদি পরিষ্কার কি অপরিষ্কার ইহা না দেখিয়া গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্যের যে কি প্রকার হানি করে তাহা যখন ভাবি তখনই মনোমধ্যে অশান্তি জাগিয়া উঠে। আর যে ব্যক্তিটী জল অপরিষ্কার দর্শনে উহা ফেলিয়া দিয়া আপনার ও আমার মহা উপকার করিয়াছিলেন তাঁহাকেও ধন্যবাদ প্রদান করি।

"স্বাস্থ্য সমাচার" নামক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা রোগাক্রান্ত বঙ্গদেশবাসীকে স্বাস্থ্যের বার্ত্তা শুনাইতে ও কিরূপে শরীরের স্বাস্থ্যোন্নতি হয় তাহা বলিতে প্রকাশিত হইয়াছে শুনিয়া এই ভ্রমণ কাহিনী সেই পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে পাঠাইলাম। যদি এই ক্ষুদ্র ধূলিকণার কাহিনী পাঠে কোন ব্যক্তির চক্ষু খুলিয়া যায়, কেহ যদি খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য গ্রহণ সম্বন্ধে অধিকতর সতর্ক হন তবে শ্রম সার্থক মনে করিব।

খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষা।

(পচনোৎপাদনের কারণ।)

ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী লিখিত—

এই ব্রহ্মাণ্ডের সকল দ্রব্যেরই প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে। কোন বস্তুই এই পরিবর্ত্তনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। এই পরিবর্ত্তন জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দ্রব্যের পচনই, দ্রব্যের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যখন আমরা চক্ষু কি জিহ্বা দ্বারা এই পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে পারি তখনই উহাকে পচন বলি।

আহারীয় দ্রব্য বিশেষতঃ রন্ধন করা দ্রব্য এই কারণেই শীঘ্র পচিয়া টক হইয়া যায়। আমাদের বঙ্গবাসী অধিকাংশ গৃহস্থেরই আহারীয় দ্রব্য একবেলা কি একদিন বা দুইদিন রাখিয়া আহার করিতে হয়। অধিকাংশ দরিদ্র গৃহস্থই একবেলার অন্ন ব্যঞ্জন অন্য বেলা আহার করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অনেক প্রকার আহারীয় দ্রব্য আছে যাহা সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না অথচ সেগুলি স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আহার করা নিত্য প্রয়োজন হয় সুতরাং সেগুলি সংরক্ষা করিয়া না রাখিলে চলে না। কিন্তু সেগুলি যদ্যপি পচিয়া নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে তাহা আহার করায় স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে, সে জন্য খাদ্যদ্রব্য কি উপায়ে রাখিলে পচনের হস্ত হইতে রক্ষা করা যায় তাহা বর্ণনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

(১) **বায়ুর অম্লজানই সকল দ্রব্যের পরিবর্ত্তন বা পচন উৎপাদনের প্রধান বস্তু**—ভূ-বায়ু সকল স্থানেই আছে সুতরাং সকল দ্রব্যই বায়ুর সংস্রবে আছে এবং সর্ব্বদাই সকল দ্রব্য বায়ুর অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং যে দ্রব্যে যত কমবায়ু লাগে তাহা ততবেশীক্ষণ ভাল থাকে। অনেকেই লেবু ও আম্র প্রভৃতির আচার দীর্ঘ দিন রাখিয়া আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু একটী লেবু কি আম্র খোলা বায়ুতে রাখিলে কয়েক দিন মধ্যে পচিয়া যায়; কিন্তু তৈল কিংবা শির্কা মধ্যে রাখিলে বহুকাল ভাল থাকে। তার্পিণ

তৈল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের বাষ্প অম্লজান শোষণ করিতে পারে, তাহাদের বর্ত্তমানে আবদ্ধ বায়ুতে কোন দ্রব্য রাখিয়া দিলে অনেক দিন ভাল থাকে। সকলেই সর্ব্বদা দেখিয়া থাকেন কোন ব্যঞ্জন কি ডাল কি অন্য কোন রন্ধন করা দ্রব্য দুই পাত্রে রাখিয়া যদি একটী নাড়াচাড়া করিয়া রাখা যায় ও অন্যটী নিস্পৃশ্য অবস্থায় রাখা যায় তাহা হইলে যেটী নাড়াচাড়া করা হইয়াছে সেটী একেবারে নষ্ট হইয়া যায় ও অপরটী একেবারে ঠিক অবস্থায় না থাকিলেও অনেক ভাল থাকে। মৎস্যে তৈল ও লবণ মাখাইয়া রাখিলে তাহা সহজে পচিয়া নষ্ট হয় না কারণ মৎস্যে তৈলের একটী বায়ু রোধক আবরণ পড়ে, তাহাতে বায়ুর অম্লজান পচন উৎপাদন করিতে পারে না।

বায়ুতে অম্লজান মুক্তাবস্থায় আছে এজন্য বায়ুতে যে সকল দ্রব্যের শীঘ্র পচন হয় তাহাদিগকে অঙ্গারাম্ল প্রভৃতির অম্লজানের রাসায়নিক যৌগিক বাষ্প মধ্যে মগ্ন করিয়া রাখিলে বহুকাল ভাল থাকে। আবার আমিশ্র অম্লজান কিম্বা ঘনীভূত অম্লজান বাষ্প মধ্যে রাখিলে ঐ সকল দ্রব্য, বায়ুতে পচন অপেক্ষা অল্পক্ষণ মধ্যে পচিয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে মাংস প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য যবক্ষার জান ও জলজান প্রভৃতি অম্লজান বিহীন বাষ্পে মগ্ন করিয়া রাখিলে বহুকাল ঠিক অবস্থায় থাকে। তৈল ঘৃত অনাবৃত রাখিলে যত শীঘ্র পচিয়া দুর্গন্ধ হয় উত্তমরূপে আবৃত করিয়া রাখিলে তত শীঘ্র নষ্ট হয় না। ডিম্ব ও দুগ্ধ কৌশল ক্রমে বায়ুরোধ স্থানে রাখিলে প্রায় ঠিক অবস্থায় থাকে কিন্তু বায়ুতে রাখিলে কিছুক্ষণ মধ্যেই তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল ঘটনা দ্বারা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে অম্লজান বিশিষ্ট ভূ-বায়ুই খাদ্যদ্রব্যাদির পচন উৎপাদনের প্রধান কারণ এজন্য যে দ্রব্যে যত কম বায়ু লাগে তাহা ততই ভাল থাকে। এই কারণে আমাদের সাধারণ গৃহস্থ গৃহিণীরা মুড়ি চিড়ে প্রভৃতি পাকা হাঁড়ি বা কলসীতে* রাখিয়া থাকেন ও তাহা দীর্ঘকাল ভাল থাকে বিসকুট, বিলাতি জমাট দুগ্ধ প্রভৃতি বায়ুরোধ স্থানে থাকে বলিয়াই দীর্ঘকাল ঠিক অবস্থায় থাকে।

* পাকা হাঁড়ি—দীর্ঘকাল কোন হাঁড়িতে বা কলসীতে তৈল ঘৃত প্রভৃতি রাখিলে তাহা পাকিয়া যায় বা বায়ুরোধক হয়।

(২) আর্দ্রতা পচন উৎপাদনের আর একটী কারণ—কিন্তু শুধু আর্দ্রতা কিম্বা শুধু বায়ুতে পচন জন্মাইতে পারে না। পচন উৎপাদন কালে এ দুয়ের মিলন হইয়া থাকে। চাউল অগ্নি পাক করিয়া ভাত ও মুড়ি দুইই প্রস্তুত করা হয় কিন্তু মুড়ি ভাল করিয়া আবদ্ধ বায়ুতে রাখিলে, অনেক দিন ভাল থাকে কিন্তু এবেলার ভাত ওবেলা দুর্গন্ধ ও বিপাক হইয়া যায়। কলায়ের ডাউল বহুকাল পর্য্যন্ত ভাল থাকে, কিন্তু ভিজা কিম্বা রন্ধন করা ডাউল কয়েক ঘণ্টা মধ্যে বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ হইয়া যায় আবার এই ভিজা ডাউলের বড়ী শুকাইয়া রাখিলে অনেক দিন ভাল থাকে। দুগ্ধ কাচা রাখিলে অতি শীঘ্র বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ হয় কিন্তু জ্বাল দিয়া রাখিলে অনেকক্ষণ ভাল থাকে। মাখন আর ঘৃত প্রায় একই পদার্থ মাখন শীঘ্র নষ্ট হয়, কিন্তু ঘৃত অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাল থাকে। একটী আম্র রাখিয়া দিলে কয়েক দিন মধ্যে পচিয়া যায় কিন্তু তাহা শুষ্ক করিয়া আমচুর বা আমসত্ত আকারে রাখিলে অনেক দিন ভাল থাকে। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে, আর্দ্রতাও পচন উৎপাদনের আর একটী কারণ।

তাই বলিয়া খাদ্যদ্রব্য কেবল শুষ্ক করিয়া রাখিলেই যে ভাল থাকিবে এমন নহে। সাধারণ উপায়ে আমরা খাদ্যদ্রব্য যেখানেই রাখি না কেন একেবারে বায়ুর সংস্রব ত্যাগ করা অসম্ভব। সাধারণ বায়ুতে বিশেষতঃ পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ুতে অধিক পরিমাণে জল বাষ্পাকারে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। আবার গঁদ, লবণ, শর্করা প্রভৃতি জল শোষক দ্রব্যের একটী না একটী আমাদের সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যেই বর্ত্তমান আছে। এজন্য উহারা বায়ু হইতে জল শোষণ করিয়া অতি শীঘ্রই নরম হয়। তাই খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষা করিতে হইলে কেবল তাহা শুষ্ক করিয়া রাখিলেই হইবে না, সম্পূর্ণ শুষ্ক এবং বায়ুরোধ স্থানে না রাখিলে, তাহার পচন নিবারণ করা অসম্ভব।

(৩) উত্তাপ পচন উৎপাদনের একটী বিশেষ কারণ—অনেকেই জানেন গ্রীষ্মকালে খাদ্যদ্রব্য অতি শীঘ্র পচিয়া যায় কিন্তু শীত কালে খাদ্যদ্রব্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভাল থাকে। কড়কড়া ভাত আর বাসি ব্যঞ্জন শীতকালে গরীবের একটী আদরের খাদ্য। শীত কালে বাসি অন্ন ব্যঞ্জন শীঘ্র নষ্ট হয় না। ইহার কারণ উত্তাপ না থাকা।

তাপ দ্বারা পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। তাপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের একটী প্রধান উপকরণ; তাপ দ্বারা অতি শীঘ্র দ্রব্যের পরিবর্ত্তন হয়। আমরা নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিলেও তাপের পরিবর্ত্তন ক্রিয়ার গতিরোধ করিতে পারি না। এই তাপ আমাদের দেহ হইতে কোন প্রকারে অন্তর্হিত হইলে, মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। আবার কোন দ্রব্য তাপ হইতে সম্পূর্ণ অন্তরে রাখিলে, তাহা বহুকাল অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকে।

মৎস্য মাংস কি অন্য কোন খাদ্য দ্রব্য বায়ুতে রাখিলে, অল্পক্ষণ মধ্যেই পচিয়া যায় কিন্তু সম্পূর্ণ বরফ দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলে, বহুকাল ঠিক অবস্থায় থাকে। বর্ত্তমান সময়ে বহু মৎস্য মফঃস্বল হইতে বরফ মণ্ডিত হইয়া সহরের বাজারে আমদানি হয় এবং তাহা প্রায় ঠিক অবস্থায় থাকে তাহার কারণ মৎস্যগুলিকে বরফ ঢাকা দেওয়ায় সেগুলি তাপ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। আবার কোন কোন হিম প্রধান দেশের লোক মৎস্য, মাংস প্রভৃতি দ্রুত, পচনশীল দ্রব্য-বরফ মণ্ডিত করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত ঠিক অবস্থায় রাখিয়া থাকে। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজেই বোধ হয় যে, খাদ্য দ্রব্যাদি তাপ প্রভাবে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য খাদ্য দ্রব্য যত শীতল স্থানে শীতল অবস্থায় রাখা যায় তত কাল ভাল থাকে। আমাদের দেশে বড় বড় সহর ব্যতীত সকল স্থানে সকল সময় বরফ পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীঘ্র গলিয়া যায়; সুতরাং আমাদের দেশে খাদ্য দ্রব্য বরফ দ্বারা রাখা অসম্ভব ; আমাদের দেশে খাদ্য দ্রব্য শীতল জলের উপর শীতল স্থানে রাখিলে, তাহা শীতল থাকিয়া অনেকক্ষণ ভাল থাকে। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, যে পাত্রে খাদ্য দ্রব্য ঐ অবস্থায় রক্ষা করা যাইবে, তাহা যদি স্বচ্ছিদ্র হয়, তাহা হইলে ঐ দ্রব্য শীতল থাকিলেও উহা আর্দ্রতা শোষণ করিয়া, শীঘ্র পচিয়া যাইবে। সুতরাং মাটীর পাত্রে কিম্বা ঐরূপ কোন স্বচ্ছিদ্র পাত্রে ঐ অবস্থায় কোন খাদ্য দ্রব্য রাখা কর্ত্তব্য নহে।

(৪) উল্লিখিত অম্লজান, আর্দ্রতা ও তাপ ব্যতীত শীঘ্র পচনোৎপাদনের আর একটী পদার্থ—**পচনোৎপাদক বীজ**। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, দুগ্ধ অধিকক্ষণ রাখিয়া দিলে, ক্রমে ক্রমে তাহা দধি হইয়া যায়। কিন্তু দুগ্ধে বিন্দুমাত্র

দধি দিলে অল্পক্ষণ মধ্যেই ঐ দুগ্ধ জমিয়া দধি হইয়া যায়, আমাদের দেশের গোয়ালারা ঐ প্রকার দধিবীজ দ্বারা উৎকৃষ্ট দধি প্রস্তুত করিয়া থাকে। দুগ্ধে গো-মূত্র কিম্বা অম্ল দিলেও তাহা শীঘ্র দধি হইয়া থাকে। সন্ত দুগ্ধে ছানার জল দিলে, সমস্ত দুগ্ধ ছানা হইয়া যায়। গুড় কিম্বা চিনি জলে গুলিয়া অথবা খেজুর কি আখের রস কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে শির্কা বা তাড়ি রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু বিন্দুমাত্র বমিরা বা তাহার ফেনা উহার সহিত মিলিত করিলে তৎক্ষণাৎ উহা ঐরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। নিম্ন শ্রেণীর নিঃস্ব লোকেরা নেশা করার জন্য মদের পরিবর্ত্তে উহা পান করিয়া থাকে। একটী পরিষ্কার হাঁড়িতে দুগ্ধ জ্বাল দিয়া রাখিলে, ঐ দুগ্ধ দীর্ঘ কাল ভাল থাকে। কিন্তু ঐ হাঁড়িতে যদি পূর্ব্বের দুগ্ধ কিছু লাগিয়া থাকে তবে তৎক্ষণাৎ সমুদয় দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়। এ কারণ আমাদের দেশের গৃহস্থ বা গোয়ালারা, দুগ্ধ পাত্র উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া অগ্নির উত্তাপে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করিয়া রাখে।

এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, পচন উৎপাদক বীজও খাদ্য দ্রব্যে সহজে পচনোৎপাদন করে।

পচনোৎপাদক বীজ প্রায়ই যবক্ষার জান দ্রব্য দ্বারা গঠিত। এজন্য যে সকল দ্রব্যে যবক্ষার জান যুক্ত পদার্থ নাই তাহাদের পচন শীঘ্র উৎপন্ন হয় না।

পচনোৎপাদক বীজ দ্বারা পচনশীল দ্রব্যকে দ্রুতবেগে পচাইয়া থাকে সত্য; কিন্তু আবার কতকগুলি পদার্থ এরূপ আছে যে, তাহাদিগকে উক্ত বীজ শীঘ্র পচাইতে পারে না। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য, পচনশীল অন্য দ্রব্যের সহিত মিলিত থাকিলে, উক্ত বীজ দ্বারা শীঘ্র পচিবার গুণ প্রাপ্ত হয়।

এই সকল ব্যতীত জল ও বায়ুতে সর্ব্বদা ভাসমান অবস্থায় আরও কতকগুলি পচন উৎপাদক বীজাণু বর্ত্তমান থাকে। যেমন একটী পরিষ্কার নূতন কলসীতে যদ্যপি পরিষ্কার জলও রাখা যায় তাহা হইলে ৪।৬ দিন পরে তাহার অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট সঞ্চরণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কীট কোথা হইতে আসিল? প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল কীট জলেই বর্ত্তমান ছিল, পরে কলসীর জলে তাহারা ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়াতে চক্ষুর গোচরীভূত হইয়া থাকে।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে সকল পুষ্করিণীতে বা ডোবাতে

রৌদ্র লাগে না। তাহাদের জল কিছুদিন পরে কাল বা সবুজ বর্ণ হয়। তাহাতে বড় বড় কীট ভাসমান দেখিতে পাওয়া। জলাভাবে অনেক স্থলেই ও গ্রামবাসিগণ ঐ সকল জল পান করিয়া ম্যালেরিয়া, কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড্ প্রভৃতি পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল কীট সর্ব্বদাই জলে বর্ত্তমান থাকে। বস্ত্রাদি ধৌত, স্নান, খাদ্য দ্রব্যাদি ধৌত প্রভৃতির ক্লেদ ঐ সকল কীট ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে ও ক্রমে বর্দ্ধিত হয়। নির্ম্মল বায়ু রৌদ্র ও স্রোত দ্বারা উহারা প্রতি নিয়ত নিধন প্রাপ্ত হয় ও সেই প্রকার প্রতিনিয়ত জন্মিয়া থাকে।

পরিশ্রুত বা চোয়ান জল পরিষ্কার পাত্রে নির্ব্বাতস্থানে বায়ুশূন্য অবস্থায় রাখিলে বহুদিন পর্য্যন্ত তাহা ভাল থাকে। কখনই তাহাতে কীট জন্মিতে পারে না।

জলে যেরূপ কোটী কোটী কীটাণু আছে, বায়ুতেও সেই প্রকার অসংখ্য কীট বর্ত্তমান আছে। যেমন ভাত বা ভাতের মাড় কিম্বা পায়স, দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য অনেক দিন রাখিয়া দিলে, তাহার উপরে এক প্রকার সাদা দ্রব্য পতিত হয়, তাহাকে আমরা সাধারণ কথায় "ছাতাপড়া" বলি। ঐ ছাতাপড়া দ্রব্য ঐ অবস্থায় আরও কিছু দিন রাখিয়া দিলে, তাহার মধ্যে বড় বড় কীট দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বায়ুর কীট। বায়ু মধ্যস্থ কীট সকল ঐ সকল দ্রব্যে বর্দ্ধিত হইলে আমরা তাহা দেখিতে পাই।

ঘাস ও বৃক্ষাদি বহুদিন এক স্থানে জড়িত থাকিলে, তাহাতেও ঐ প্রকার সাদা বস্তু পতিত হয়। অনেক পণ্ডিতের মতে ঐ প্রকার বীজকে বৃক্ষাণু বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। অনেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন জল ও বায়ুর কীটাণুর ন্যায় এক প্রকার কীটাণু সর্ব্বদা উদ্ভিজ্জে বিদ্যমান থাকে। তাহারা ক্রমে বায়ু ও জলের সংস্রবে বর্দ্ধিত হয়। এই সকল কারণে উদ্ভিজ্জ জাতীয় খাদ্য বহুদিন রাখিলে, তাহা পচিয়া যায়।

উল্লিখিত বিবরণ দ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হইল যে, বায়ুর অম্লজান, আর্দ্রতা, তাপ, বীজ ও বীজাণু দ্বারা দ্রব্যে পচন উৎপাদিত হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে ঐ সকল পচনোৎপাদক দ্রব্য হইতে খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষা বিষয়ে আলোচনা করিব।

আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ডাক্তার সত্যশরণ চক্রবর্ত্তী, এম্, বি, লিখিত—

পঞ্চম অধ্যায়।

পোড়া ঘা।

অগ্নি সংযোগে শরীরের কোন স্থান পুড়িয়া গেলে বা গরম তরল পদার্থে ঝলসিয়া গেলে প্রথমতঃ কাপড় অতি সাবধানে কাটিয়া ছাড়াইতে হয় এবং যদি কোথাও মাংসের সহিত জুড়িয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে উহা উত্তমরূপে তৈলে ভিজাইয়া পরে ছাড়ান উচিত! যে কোন প্রকারের তৈল যথা সুইট্ অয়েল, নারিকেল তৈল, তিসি তৈল, বাদামের তৈল, চর্ব্বি, সমান ভাগ চুনের জল ও তৈল ফেনাইয়া পুরাণ কাপড় বা লিণ্টে মাথাইয়া দগ্ধস্থানে লাগাইবে ও পরে তুলা বা ফ্ল্যানেল দ্বারা আবৃত করিবে। লক্ষ্য রাখিবে যেন হাওয়া কোন ক্রমে উহাতে না লাগে। তাহার পর উহার উপর ব্যাণ্ডেজ করিবে। ফোস্কা হইলে উহা ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া দেওয়া উচিত নহে বা দগ্ধ অংশ অগ্নির উত্তাপে আর ধরাও ভাল নহে। কখন কখন দগ্ধ অংশ ময়দা দিয়া আবৃত করা হয় পরে তুলা দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা যায়; কিন্তু এই উপায় পূর্ব্বোক্ত উপায় অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। যখন শরীরের অধিকাংশ পুড়িয়া যায় তখন এক টুক্‌রা বড় কাপড় বা লিণ্ট দিয়া আবৃত না করিয়া ছোট ছোট টুক্‌রার দ্বারা ড্রেস্ করা ভাল; কারণ পরে ড্রেস করিবার সময় একটু করিয়া ড্রেস্ করিতে পারা যায় ও তাহাতে রোগীর বেশী কষ্ট হয় না। তৈলাক্ত ড্রেসিং করিবার পর তুলার দ্বারা আবৃত করা উচিত, যদি তুলা না পাওয়া যায় ফ্ল্যানেল দিয়া আবৃত করিবে।

মুখ পুড়িয়া গেলে নিম্নলিখিত রূপ চিকিৎসা করা উচিত। লিণ্ট কাটিয়া একটী মুখোস্ তৈয়ার করিবে; ইহাতে চক্ষু, মুখ ও নাকের ছিদ্র রাখিয়া ইহাকে তৈলাক্ত করিবে ও তাহার উপর তুলা দিবে; যেন ছিদ্রগুলি আবৃত না হয় এবং ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে। পুড়িয়া গেলে যে (shock) অবসাদ হয় তাহার চিকিৎসা এইরূপে করিতে হয় :—শরীরে উত্তাপ প্রয়োগ ও উষ্ণ পানীয় প্রদান করিবে।

গলা ও পেটের পোড়া—বিশেষ বিপজ্জনক। এই স্থানগুলি পুড়িলে বিশেষ ভয়ের কারণ হয়। তৈল ও ড্রেসিং জোগাড় করিবার পূর্ব্বে বেদনাদূর করিবার জন্য এইরূপ চিকিৎসা করা যাইতে পারে—হাত বা পা পুড়িয়া গেলে গরম জলে ডুবাইয়া রাখিবে। জলে নিজের হাত হইতে কনুই পর্য্যন্ত বেশ ডুবাইয়া রাখিতে পারা যায় এরূপ গরম হওয়া উচিত। ক্ষার যুক্ত জল পোড়া চিকিৎসায় বিশেষ স্নিগ্ধকর। এক গামলা জলে এক বড় চামচ সোডা বাইকার্ব্বনেট্ মিলাইলে উত্তম ক্ষার জল প্রস্তুত হয়।

যদি কাহারও কাপড় ধরিয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে মাটীতে ফেলিবে এবং কম্বল, কোট, সতরঞ্চি এবং কার্পেট প্রভৃতি যাহা কিছু সম্মুখে পাইবে তাহা দিয়া টাইট্ করিয়া ঢাকা দিবে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে অগ্নি উপরের দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সুতরাং মাটীতে ফেলিলে কম পুড়িবার সম্ভাবনা। কোনও মোটা ঢাকা দিয়া হাওয়া বন্ধ করিলে আগুন নিবিয়া যায়। যে লোকের কাপড় ধরিয়াছে তাহাকে স্ত্রীলোকে সাহায্য দিতে হইলে মাথার দিকে যাওয়া উচিত কারণ সাহায্যকারিণীর কাপড় ধরিবার সম্ভাবনা ঐ দিকে সর্ব্বাপেক্ষা কম। ছোট শিশুদের কাপড় ধরিলে কাপড় খোলা অপেক্ষা ছিঁড়িয়া ফেলা সহজ হইলে তাহাই করা উচিত। যত শীঘ্র সম্ভব জ্বলন্ত কাপড় ছাড়াইবে।

তীব্র এসিড—শত্রুকে আহত করিবার জন্য তীব্র এসিড প্রায়ই নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। মুখে ছিটা লাগিলে ইহার দ্বারা সমূহ বিপদ হইতে পারে। চক্ষুতে লাগিলে প্রায় দৃষ্টিশক্তি যায়। চক্ষের যে কোন স্থানে লাগুক না কেন পুড়িয়া গিয়া ক্ষত উৎপাদন করে।

চিকিৎসাঃ—একটুকরা তূলা বা স্পঞ্জ ঈষৎ গরম জলে ডুবাইয়া আহত স্থানের উপর অল্প অল্প চাপ দিয়া উক্ত জল পড়িতে দিবে এবং এই উপায় দ্বারা সমস্ত নষ্ট করিয়া সাধারণ পোড়া ঘায়ের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। প্রবল তড়িজ্জনিত অজ্ঞানাবস্থার চিকিৎসা সাধারণ অজ্ঞান অবস্থার চিকিৎসা হইতে বিভিন্ন নহে। রোগীর কাপড় আল্‌গা করিয়া দিতে হইবে, তাহাকে অল্প হেলান দিয়া চিৎ করিয়া শোয়াইবে ও যাহাতে যথেষ্ট বায়ু সঞ্চালিত হয় তাহা করিবে। শীতল

জলে তোয়ালে ভিজাইয়া মুখে ও বুকে অল্প আঘাত করিবে। যদি অন্য উপায়ে জ্ঞান না হয় তাহা হইলে যতক্ষণ না জ্ঞানের সঞ্চার হয় ততক্ষণ কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস করান উচিত। রোগী যদি বৈদ্যুতিক তারে জড়িত থাকে তাহা হইলে হাত, রবার, ম্যাকিণ্টস্, কম্বল বা অন্য কোন তড়িৎ রোধক পদার্থের দস্তানা বা আবরণ দিয়া রক্ষা না করিয়া রোগীকে ছোঁয়া উচিত নহে।

———:०:———

তুষারাভিঘাত।

(Forest-bite)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শীত খুব বেশী না হইলেও এই রোগ হইতে পারে। যখন কোনও কারণ বশতঃ শরীর নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়ে যেমন অনেক দূর চলিয়া শরীর অবসন্ন ও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয় বা অধিক মদ্যপানে বিগতচেতন হইয়া শীতল বায়ুতে বিশ্রামার্থ উপবেশন করে তখন এই পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে। যদি শরীর তুষারাবৃত হইয়া পড়ে তাহা হইলে শরীরের উত্তাপ বরফ ভেদ করিয়া বাহির হইতে না পারায় জীবনী শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা পায়। যদি শরীর ক্রমাগত শীতল বায়ুর সংস্পর্শে শীতল হইতে শীতলতর হয় তাহা হইলে জীবনী শক্তি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। হিমোপহত ব্যক্তির শরীর ফ্যাকাসে দেখায় ও শীতল বোধ হয় এবং নাসিকাগ্র, ওষ্ঠদ্বয়, হস্তদ্বয় এবং পদদ্বয় ঈষৎ নীলাভ দেখায়। শরীরের প্রান্তভাগ, হস্তপদাদির অঙ্গুলী, নাসাগ্র এবং কর্ণদ্বয় কঠিন ও বরফের ন্যায় শীতল হয়। হিমোপহত ব্যক্তির অতি সাবধানতা সহকারে চিকিৎসা করা উচিত। কদাপি রোগীকে একেবারে গরম ঘরে আনা উচিত নহে। এরূপ করিলে মৃত্যু নিশ্চিত জানিবে। সর্ব্বপ্রথমে রোগীকে একটু ঠাণ্ডা ঘরে লইয়া ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করিবে। কাপড় অত্যন্ত সাবধানের সহিত ছাড়ান উচিত, কারণ অনমনীয় শরীরের অঙ্গ অল্পেই ভঙ্গ হইতে পারে। কাপড় কাটিয়া শরীরের অঙ্গ সকল ব্যাণ্ডেজ দ্বারা আবৃত করা যাইতে পারে এবং সর্ব্বশরীর বরফ দ্বারা ঘসিতে পারা যায়। যদি বরফ না পাওয়া যায়

রোগীকে শীতল জলে ডুবাইতে হইবে বা ভিজা বালির দ্বারা ঘসিতে হইবে। যদি নিশ্বাস না পড়িতে থাকে তাহা হইলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস করাইতে হইবে। ইহা কিন্তু অতিশয় সাবধানের সহিত সাধিত না হইলে হাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। ক্রমে রোগী সহজে শ্বাস প্রশ্বাস লইতে পারিলে এবং হস্তপদাদি সহজ হইয়া আসিলে অল্প গরম ঘরে রোগীকে লওয়া যাইতে পারে ও শীতল চাদর প্রভৃতির দ্বারা শরীর আবৃত করা যাইতে পারে। ক্রমশঃ গরম কাপড় দ্বারা ঘসিয়া গরম করিবে। পরিশেষে ঘর বেশী গরম করিলেও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। যদি রোগীর জ্ঞান না হয় তাহা হইলে ইথার, এমোনিয়া প্রভৃতি শোঁকান যাইতে পারে এবং অল্প উত্তেজক পানীয় যথা শীতল কফি, মাংসের সুরুয়া বা শীতল মদ্য অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। হিমোপহত স্থান যদি স্ফীত, অসাড় বা নীলাভ বা ফোস্কাযুক্ত থাকে তাহা হইলে পচিয়া যাইতে পারে। (ক্রমশঃ)

সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

যক্ষ্মসম্বন্ধে তিনটী প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। সেগুলি জানা প্রত্যেকেরই পক্ষের নিতান্ত বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যকীয়।

(১) যক্ষ্মা সংক্রামক ব্যাধি।

(২) যক্ষ্মা রোগ নিবারণ করা যাইতে পারে।

(৩) যক্ষ্মা রোগ আরোগ্য হইতে পারে।

প্রথমতঃ যক্ষ্মা বীজাণু সংঘটিত ব্যাধি—যক্ষ্মা রোগীর নিষ্ঠীবনস্থিত যক্ষ্মা বীজাণু হইতেই এই ব্যাধি এক লোক হইতে অপর লোকে সংক্রামিত হয়। সকলেই কুষ্ঠ রোগ সংক্রামক বলিয়া কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকের সহিত মিলিতে ইচ্ছা করেন না কিন্তু যক্ষ্মারোগ তদপেক্ষা অধিক সংক্রামক; যক্ষ্মারোগী সম্বন্ধে যদি সাবধান না হওয়া যায় তাহা হইলে অতি সহজেই ও অতি শীঘ্রই এই রোগ সকলকে আক্রমণ করিতে পারে।

যখন ফুসফুস্ যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয় তখন যে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা হয় তাহাতে প্রায়ই যক্ষ্মার বীজাণু পরিলক্ষিত হয় এবং অনেক স্থলে অত্যধিক সংখ্যক বীজাণু দৃষ্ট হয়। এই বীজাণুই রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ। এই বীজাণু শরীর মধ্যে যতক্ষণ না প্রবেশ লাভ করিতে পারে ততক্ষণ যক্ষ্মারোগ হইবার কোনই আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু যদি কোন ক্রমে এই বীজাণু শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে তাহা হইলে রোগ জন্মাইবার বিশেষ সুবিধা পায়। কিন্তু যে লোকের শরীরে বীজাণু প্রবেশ করে তিনি যদি সুস্থ সবলকায় ও বলিষ্ঠ হন এবং তিনি যদি এই রোগের বীজাণুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি যক্ষ্মারোগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি আমাদের আধুনিক দুঃখ দৈন্য রোগ-শোক-প্রপীড়িত ক্ষীণজীবী দুর্ব্বলকায় দেশবাসিগণের ন্যায় অসুস্থ, রুগ্ন, দুর্ব্বল ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন তাহা হইলে এই রোগ তাঁর অবশ্যম্ভাবী।

যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তি যখন হাঁচেন বা কাশেন বা জোরের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন তখন তাঁহার মুখ ও নাসিকা হইতে যে নিষ্ঠীবন কণা বা অন্য কোনরূপ জলীয় কণা বাহির হয় তাহাতে যক্ষ্মা বীজাণু থাকিতে পারে। বিশেষতঃ যক্ষ্মারোগের বৃদ্ধি অবস্থায় বীজাণু বাহির হইয়াই থাকে। এই সকল বীজাণু গৃহস্থিত বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত বায়ুকে দূষিত করিয়া ফেলে এবং যে কোন ব্যক্তি ঐ দূষিত বায়ু নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করে তাহারই শরীর মধ্যে যক্ষ্মাবীজাণু প্রবেশ করায় তাঁর রোগোৎপত্তির পথও বেশ সুগম হইয়া পড়ে।

কিন্তু সাধারণতঃ নিষ্ঠীবন হইতেই যক্ষ্মা বীজাণু দেহমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক ত্যক্ত নিষ্ঠীবন যখন রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া যায় এবং রোগের বীজাণু ধূলা ও বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে তখন ঐ ধূলা বা দূষিত বায়ু কোন ক্রমে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেই যক্ষ্মারোগের উৎপত্তি হয়। বিশেষতঃ যক্ষ্মারোগের বীজাণুর জীবনী শক্তি এত অধিক যে রৌদ্রের উত্তাপ তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারে না। বিনাশ করা দূরে থাকুক বরং তাহারা আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও প্রসারিত হইয়া পড়ে। সেই জন্য যে বাড়ীতে যক্ষ্মারোগী থাকে সেই বাড়ীতে যদি অধিক লোক বাস করে ও তাহাতে যদি প্রচুর

পরিমাণে আলোক ও বায়ু অভাব হয় তাহা হইলে সহজেই সমস্ত গৃহ দূষিত হইয়া যায় এবং সেই বাড়ীর লোকে সহজেই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। অধিকন্তু, যক্ষ্মারোগাক্রান্ত গাভী হইতে উৎপন্ন দুগ্ধ, পনীর প্রভৃতি হইতেও যক্ষ্মার বীজাণু সংক্রামিত হইবার অধিক সম্ভাবনা আছে।

দ্বিতীয়তঃ, সুখের বিষয় এই যে যক্ষ্মা সংক্রামক রোগ হইলেও ইহাকে নিবারণ করা যাইতে পারে। বীজাণুগুলি সম্বন্ধে সাবধান হইলেই আমরা সহজেই যক্ষ্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি। কিন্তু কিরূপে বীজাণুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং তাহাদিগকে দমনে রাখা যায় তাহা অতি সমস্যার বিষয় এবং সকলের আন্তরিক সহায়তা ব্যতীত এই সমস্যা ভেদ করা আদৌ সহজসাধ্য নহে। চিকিৎসকগণ ও স্বাস্থ্য বিভাগস্থ ব্যক্তিগণ যদিও এ সম্বন্ধে যত্নপর হইয়াছেন তথাপি জনসাধারণের সহায়তা ব্যতিরেকে এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার কিছুই সম্ভাবনা নাই। সাধারণ স্বাস্থ্যও যেমন প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যও তেমনি যক্ষ্মা দূরীকরণার্থ আবশ্যক।

যক্ষ্মা গৃহগত ব্যাধি। গৃহও গার্হস্থ্য জীবনের সহিতই ইহার সম্পর্ক। শুধু সাধারণের ও বক্তিগত ভাবে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় নিয়ম পালন করিয়া চলিলেই এই রোগ নিবারণ করা যায় না। প্রত্যেক গৃহ বিশেষতঃ প্রত্যেক যক্ষ্মারোগীর গৃহ স্বাস্থ্য নিবাসের ন্যায় পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন ও প্রচুর পরিমাণে আলোক ও বায়ু যুক্ত হওয়া আবশ্যক। এক কথায় বলিতে গেলে প্রত্যেক গৃহ এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য-নিবাসের ন্যায় হওয়া চাই। আর রোগীর থুতু, গয়ের ইত্যাদি বা অন্য যে কোন জিনিষ যাহাতে রোগের বীজাণু থাকার সম্ভাবনা তাহা যত শীঘ্র পারা যায় তত শীঘ্র যাহাতে ভালরূপে বিনষ্ট করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধেও বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক।

সম্যক্‌রূপে পরিচ্ছন্নতাই যক্ষ্মার বৃদ্ধি রোধ করিবার সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ ও প্রত্যক্ষ উপায়। নির্ম্মল বায়ু সেবন করিলে, বিশুদ্ধ জল পান করিলে বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য বিশেষতঃ বিশুদ্ধ দুগ্ধ প্রস্তুত খাদ্য আহার করিলে, পরিষ্কৃত ও আলোক ও বায়ু যুক্ত গৃহে বাস করিলে ও পরিষ্কৃত শয্যায় শয়ন করিলে সহজেই যক্ষ্মারোগ নিবারণ করা

যাইতে পারে এবং আমাদের প্রার্থনা এই যে যাঁহারা এই সমুদায় ব্যাপার অবগত আছেন তাঁহারা যেন তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনে এইরূপ পরিচ্ছন্নতা রাখিতে চেষ্টা করেন।

তৃতীয়তঃ, যক্ষ্মারোগ আরোগ্য হইতে পারে তাহা সকলেরই জানা উচিত। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে যক্ষ্মা রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিতে প্রায় কোন দেশেই দেখা যাইত না। অধুনাতন যক্ষ্মারোগের বীজাণুর আবিষ্কারের সহিত ও তাহাদের জীবনের ইতিহাস সম্যক্‌রূপে জানার জন্য যক্ষ্মারোগ আরোগ্য হইতেছে। আমেরিকায় যুক্তপ্রদেশে Anti-tuberculosis League প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের তত্ত্বাবধানে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত রোগীরা চিকিৎসিত হইয়া থাকেন। যক্ষ্মা যাহাতে বিস্তৃত হইতে না পারে সেইজন্য এই সকল সভা সমিতিরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। মুক্ত বাতাসে রোগীদের চিকিৎসার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে Sanatorium সকল স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল Sanatoriumএ যক্ষ্মারোগের বিশেষ চিকিৎসা, রোগীর সেবা ও শুশ্রূষা ইত্যাদির বন্দোবস্ত আছে। গরীব রোগীর চিকিৎসা গভর্ণমেণ্ট হইতে হইয়া থাকে। জার্ম্মাণি ফ্রান্স ও ইংলণ্ডেও এইরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

উপরোক্ত চিকিৎসাতে যক্ষ্মারোগ আরোগ্য হইতেছে। আমেরিকা, জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশে বৎসর বৎসর শত শত লোক যক্ষ্মারোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে। তাহা বলিয়া আমরা এ কথা বলি না যে যক্ষ্মারোগের সকল অবস্থায়ই আরোগ্য হইয়া থাকে এবং তাহা সম্ভবপর ও হয় না। কিন্তু রোগের প্রথমাবস্থায় উত্তমরূপ চিকিৎসা হইলে রোগের প্রতিকার করা যাইতে পারে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে যক্ষ্মারোগের উপযুক্ত চিকিৎসা কি? আমরা যক্ষ্মারোগের নিবারণ সম্বন্ধে যে সমস্ত স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় নিয়ম পালনের কথা বলিয়াছি সেই নিয়মগুলি পালন করিলেই যক্ষ্মারোগের প্রতীকার সাধিত হইতে পারে। কিন্তু এই নিয়মগুলি আরও উত্তমরূপে ও আরও নিয়মিতরূপে পালিত হওয়াই আবশ্যক। দিবারাত্রি প্রচুর পরিমাণে নির্ম্মল বায়ু সেবন করিলে, পুষ্টিকারক, বল বৃদ্ধিকারক ও সুপাচ্য খাদ্য ভক্ষণ করিলে, মুক্ত বাতাসে শারীরিক ব্যায়াম বিশেষতঃ গৃহের

বাহিরে গভীর নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিলে এবং অল্প অল্প করিয়া মুক্তবায়ুতে নিয়মিত-রূপে ভ্রমণ করিলে অতি সত্বরই যক্ষ্মারোগের প্রতীকার করা যাইতে পারে। কেবল যক্ষ্মারোগ যখন বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন ফুস্‌ফুসের অধিকাংশ স্থানই নষ্ট হইয়া যায় এবং স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়া যাওয়ায় সে অবস্থায় রোগের সম্পূর্ণরূপ প্রতীকারের সম্ভাবনা আর থাকে না।

নিদ্রা।

খাদ্য ও পানীয়ের ন্যায় নিদ্রা জীবন ধারণের পক্ষে বিশেষ আবশ্যকীয়। অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা গিয়াছে যে মনুষ্য এক সপ্তাহের কিঞ্চিৎ অধিক কাল বিনিদ্র অবস্থায় থাকিলে উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। কিন্তু খাদ্যের অভাবে কয়েক সপ্তাহ কাটান যায়। নিদ্রার পরিবর্ত্তে খাদ্যের দ্বারা তাহার অভাব পূরণ করা যায় না। এমন কিছুই নাই যাহা নিদ্রার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে।

গাঢ় নিদ্রার পর শরীরে যে শান্তি অনুভূত হয়, অন্য কিছুতেই সেরূপ হইতে পারে না। নিদ্রা আমাদের পরিশ্রান্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে শক্তিশালী করে, নিদ্রাদ্বারা পেশী সমূহ সবল এবং শরীরে নূতন শক্তি ও স্ফূর্ত্তি অনুভূত হয়। নিদ্রা "পরিশ্রান্তের মধুর শান্তিকর রসায়ন" দিবসের শ্রমীর হৃদয়ে তৃপ্তি দান ও তাহাকে পুনঃ কর্ম্মক্ষম করে। শরীরের পুষ্টির জন্য খাদ্যের অপেক্ষা নিদ্রার অধিক আবশ্যক।

নিদ্রা প্রকৃতির বিশেষ বিধান—কর্ম্ম জীবনের প্রথম কর্ত্তব্য। কর্ম্মই জীবন, জীবনই কর্ম্ম। কিন্তু কর্ম্ম ও জীবন দুইয়ের জন্য বিশ্রাম বিশেষ আবশ্যক। শরীরের সমস্ত যন্ত্রাদিই কিঞ্চিৎ মাত্র ক্ষয় প্রাপ্ত না হইয়া দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর চালিত হয় কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলী কর্ম্মের দ্বারা শীঘ্রই শ্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন বিশ্রাম ও নিদ্রার আবশ্যক হয়। স্নায়ুমণ্ডলী ব্যতীত শরীরের অন্যান্য যন্ত্রাদির বিশ্রাম হীন কর্ম্ম।

সমস্ত যন্ত্রাদি কর্ম্মের সহিত বিশ্রাম ও ভোগ করে। প্রমাণিত হইয়াছে যে হৃদয়ের পেশী সমূহ সময়ের ১/৩ অংশ বিশ্রাম করে। স্বাস্থ্যের জন্য পাকস্থলী, যকৃৎ, অন্ত্র প্রভৃতির বিশ্রামের আবশ্যক হয়। আমরা যখন নড়াচড়া করি শরীরের সমস্ত পেশী সঞ্চালিত হয় এবং কিছুক্ষণ পরে ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন বিশ্রামের আবশ্যক হয়। সংজ্ঞা উৎপাদনকারী স্নায়ুমণ্ডলীরও বিশ্রাম আবশ্যক হয়। যখন আমরা সংজ্ঞাহীন হইয়া শয়ন করিয়া থাকি তখন স্নায়ুমণ্ডলীর প্রকৃত বিশ্রাম হয়। স্বপ্নহীন গাঢ় নিদ্রাই সর্ব্বোত্তম বিশ্রাম। একবারে কর্ম্ম ত্যাগ কিংবা কর্ম্মের কতক অংশ বাদ দিয়াও বিশ্রাম পাওয়া যায়।

নিদ্রা রহস্য—নিদ্রা আমাদের শরীরে নবজীবনী-শক্তি প্রদান করে। শরীরের অত্যধিক ক্লান্তি হইলেই আমাদের নিদ্রার আবেশ হয় এবং মনে হয় আমাদের শরীর হইতে সমস্ত জীবনী-শক্তি লোপ পাইতেছে। কিন্তু গাঢ় নিদ্রার পর আমরা নবজীবন পাইয়া জাগরিত হই।

(১) এই শক্তি কি আমাদের গৃহীত খাদ্য হইতে আইসে? খাদ্যোদ্ভূত শক্তি রক্তের দ্বারাই সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

দেহস্থিত রক্তের ১/৬ অংশ মস্তকে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু নিদ্রার সময় রক্ত সঞ্চালনের মাত্রা আরও কমিয়া যায়। রক্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে শক্তি দান করে, কিন্তু নিদ্রার সময় মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন কম হয়। এজন্য নিদ্রার পরবর্ত্তী নবজীবনী-শক্তি যে কেবল মাত্র রক্ত হইতে আইসে এরূপ বলা যাইতে পারে না।

(২) অনেকে বলেন জাগ্রতাবস্থায় আমাদের শরীরে নানাপ্রকার বিষ উৎপন্ন হয়; এবং এই সকল বিষের ক্রিয়ার জন্য মস্তিষ্কের ও স্নায়ুমণ্ডলীর অবসাদ হয়। নিদ্রার সময় এই সকল বিষ শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। এই মত সকলে স্বীকার করেন না।

কতক্ষণ নিদ্রা যাওয়া উচিত—বয়স্ক লোকের নিদ্রার পক্ষে কোন সাধারণ নিয়ম নাই। প্রত্যেক লোকে নিজের শারীরিক অবস্থানুযায়ী নিয়ম করিবে। যতক্ষণ না ক্লান্তি হীন হইবে ততক্ষণ নিদ্রা যাইবে। নিদ্রা ভঙ্গে সমগ্র শরীরে যেন নবশক্তি আসিয়াছে এইরূপ অনুভব করিতে হইবে। নিদ্রার জন্য

নিয়মিত সময় রাখা কর্ত্তব্য। পূর্ণবয়স্ক লোকের পক্ষে নিদ্রার সময়ের সামান্য ব্যতিক্রমে কোন অনিষ্ট নাই। কথিত আছে যে মহাবীর নেপোলিয়ান বহু বৎসর রাত্রে মাত্র ৪ ঘণ্টা কাল নিদ্রায় কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ উদাহরণ অতি অল্প এবং অনুকরণ করা বিশেষ অনিষ্ট কর।

(৩) শৈশব কালে অধিক নিদ্রার আবশ্যক। এক বৎসরের শিশু যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ নিদ্রায় কাটাইবে ৪ বৎসর পর্য্যন্ত দিবস রজনীর ১/৩ ভাগ কাটাইতে পারে। ৬ হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত অন্ততঃ ১০ ঘণ্টা কাল ঘুমাইতে দেওয়া উচিত। এবং ইহার পর পূর্ণবয়স্ক হওয়া পর্য্যন্ত (লোক হিসাবে ১৮ হইতে ২১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) ৮ ঘণ্টা ঘুমান উচিত। নিদ্রার সময় আমাদের শরীরে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হয়। জাগ্রতাবস্থাতেই স্নায়ুমণ্ডলী কার্য্য করিয়া থাকে এবং যখন এই স্নায়ুমণ্ডলী দুর্ব্বল থাকে ও অনবরত কাজ করিতে অক্ষম হয় তখন অধিক বিশ্রাম আবশ্যক হয়।

(৪) বৃদ্ধ লোকের পূর্ণবয়স্কের অপেক্ষা অধিক নিদ্রার আবশ্যক। বৃদ্ধের মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হওয়ায় অল্প পরিশ্রমের পরই তাহারা ক্লান্ত হয় এজন্য তাহাদের ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া এবং প্রাতে ঘুম ভাঙ্গান উচিত নয়।

(৫) মোটালোকের অধিক নিদ্রার আবেশ হয়। যদিও স্থূল দেহির অধিক নিদ্রা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য তথাপি একবার মাত্রা কমিয়া শরীরের যাহাতে বিশেষ অনিষ্ট না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহাদিগকে পৃথক কিছুক্ষণ ঘুমাইতে দেওয়া উচিত। অতিরিক্ত নিদ্রাই যে স্থূলতা ও অলসতা আনয়ন করে তাহা নহে কিন্তু মোটা হওয়ার জন্যই অধিক নিদ্রা ও অলসতা আইসে।

(৬) সুস্থ ও মস্তিষ্কের স্বল্প পরিশ্রমী লোকের অপেক্ষা স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় ও মস্তিষ্কের অত্যধিক পরিশ্রমকারী ব্যক্তিদিগের অধিকক্ষণ নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য। ইঁহাদের পক্ষে অনেকক্ষণ নিদ্রায় কাটান উচিত। সামান্য স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় গাঢ় নিদ্রাই উপযুক্ত ঔষধ।

দেশ ও কালভেদে নিদ্রার সময়ের তারতম্য :—অধিক উত্তাপ ও অতি শীতলতা স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তপ্ত করে। এজন্য গ্রীষ্মপ্রধান ও শীতপ্রধান দেশের লোকের অধিক নিদ্রার আবশ্যক। গ্রীষ্মপ্রধান

দেশের মধ্যভাগে অত্যধিক গরম অনুভূত হয়। সেই সময় কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়া শরীরের পক্ষে অতীব হিতকর। শীতপ্রধান দেশে রাত্রে যখন শীতের মাত্রা খুব অধিক হয়, সেই সময় গাঢ় নিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনুকুল। কিন্তু দিবসে বিশ্রামের আবশ্যকতা নাই। নাতিশীতোষ্ণ দেশে, কর্ম্মের সময় ও কর্ম্মক্ষমতা অধিক হয়।

নিদ্রা যত গাঢ় হইবে, ততই অধিক ক্লান্তি নাশ করিবে। স্বপ্নপরিপূর্ণ কিংবা সজাগ নিদ্রা গাঢ় নিদ্রার ন্যায় নবজীবনী শক্তি দান করিতে পারে না। অল্পক্ষণের গাঢ় নিদ্রা, অধিকক্ষণ সজাগ নিদ্রার সমতুল্য। দেখা যাইতেছে যে কেবল স্থিতির দ্বারা নিদ্রার সুফল পাওয়া যায় না গাঢ়তার উপরও নির্ভর করে।

উপযুক্ত বিছানা—নরম বিছানায় নিদ্রা যাওয়ার অভ্যাস ভাল নয়। শক্ত বিছানাতেই শয়ন বিধেয়। কিন্তু দুর্ব্বল ও রোগী নিজের সুবিধা অনুযায়ী যাহাতে ভাল নিদ্রা হয় সেইরূপ বিছানার ব্যবস্থা করিবে।

দেশ ও সময়ভেদে বিছানারও তারতম্য হইবে।

কিরূপভাবে শয়ন করা উচিত—যাহা স্বাস্থ্যের বিশেষ অনুকুল সেরূপভাবে শয়নের অভ্যাস আমাদের ঘটিয়া উঠে না। চিৎ হইয়া শোওয়া যদিও সুবিধা জনক, তথাপি এ অভ্যাস পরিত্যাগ করাই ভাল। এরূপভাবে শয়ন করিলে পাকস্থলী স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করিতে পারে।

বাম পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করিলে পাকস্থলী হৃদয়ের উপর চাপিয়া থাকে।

দক্ষিণ পার্শ্ব ফিরিয়া শয়নে পাকস্থলী হৃদয় চাপিয়া থাকে না। যকৃৎ নিম্নভাগে থাকে। দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নই স্বাস্থ্যকর।

নিদ্রার সময় মস্তক বিশেষ উঁচু করিয়া রাখা উচিত নয়।

শয়ন গৃহ—শয়ন ঘরের মেঝে ও দেওয়াল যেন সেঁতসেঁতে না হয়। দিবসের কতক সময় যেন তাহাতে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিতে পারে। নিদ্রার সময় গৃহে বায়ু চলাচলের উত্তম ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু যেন ঠিক নিদ্রিতের শরীরের উপর দিয়া বায়ু চলাচল না করে। নিদ্রার সময় ঘরে কেরোসিনের বাতি জ্বালিয়া রাখা উচিত নয়। নিদ্রার সময় ঘর হইতে বাহিরে রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। শয়ন ঘরে টবে করিয়া গাছ রাখা স্বাস্থ্যহানিকর।

শ্বাস ক্রিয়ায়, প্রশ্বাস দ্বারা আমরা শরীরস্থ বিষাক্ত পদার্থ সমূহ পরিত্যাগ করি ও নিশ্বাস দ্বারা বায়ুস্থিত অক্সিজেন গ্রহণ করি। নিদ্রার সময় শয়ন গৃহে বায়ু চলাচলের উত্তমরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে, উপযুক্ত অক্সিজেন লাভের অভাব বশতঃ আমাদের স্বাস্থ্য হানি ঘটে।

অত্যন্ত গ্রীষ্মের জন্য ভারতের কোন কোন স্থলের লোক একবারে ফাঁকা যায়গায় শয়ন করে। কিন্তু সকল সময়ে সকল স্থানে এরূপ করা চলে না। কার্ব্বনিক এসিড্ আমাদের পক্ষে অনিষ্টকর, অধিক পরিমাণে গৃহীত হইলে শরীরে বিষের ন্যায় ক্রিয়া করে। গড়ে প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক লোকে ঘণ্টায় ১।২ কিউবিকফুট কার্ব্বনিক এসিড্ পরিত্যাগ করে। শয়ন গৃহে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অন্ততঃ ১০০০ঘন ফুট বায়ু থাকা আবশ্যক। ঘরে কোন বাতি জ্বালিলে বা আগুণ থাকিলে আরও অধিক বায়ু আবশ্যক এবং এই বায়ুর ঘণ্টায় অন্ততঃ তিন বার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। শীতপ্রধান দেশে কিম্বা ভারতে শীতের সময় এইরূপ বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গেলে, ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

যখন হঠাৎ বায়ুর তাপের পরিবর্ত্তন হয়, তখন গৃহে বায়ু চলাচলের জন্য সাবধানে ব্যবস্থা করা উচিত।

বাতি অপেক্ষা কেরোসিনের আলো অধিক পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করে। একটী মাঝারী সাইজের কেরোসিনের আলো, সাতজন মানবের দ্বারা যত বায়ু দূষিত হয় তত বায়ু দূষিত করে। একটী গ্যাসের আলো ৫টী ৬টী মানুষের অনুযায়ী কিন্তু Mantle দেওয়া আলো অনেকটা কম করে। বাতি, গ্যাস এবং কেরোসিনের আলোক দ্বারা বায়ু অধিক পরিমাণে দূষিত হয়।

বৈদ্যুতিক আলোকই এ বিষয়ে উত্তম, কিন্তু চক্ষের জন্য আলোকের উজ্জ্বলতা কম করা উচিত।

চারিদিক বন্ধ শয়ন গৃহে অগ্নি রক্ষা করা উচিত নয়, ইহাতে বায়ু দূষিত হইয়া মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে।

নিদ্রাল্পতা—অনেক অনিদ্রা রোগী দেখা যায়। এই রোগের কারণ বহুবিধ।

মস্তকে রক্তাধিক্য ও তৎসঙ্গে পদদ্বয় শীতল থাকিলে অনিদ্রা রোগ জন্মে। বদ্ধ বায়ু দ্বারা নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। অতি ও বিলম্বে ভোজন নিদ্রার বিঘ্ন ঘটায়। কোষ্ঠ বদ্ধতার দ্বারা মানসিক ও অনিদ্রা রোগ জন্মিতে পারে। শোক ও উত্তেজনার দ্বারাও নিদ্রার বিঘ্ন হয়। পেশীসমূহের চালনা না হইলেও এইরূপ হয়।

অনিদ্রা রোগ দূরীকরণ—অনিদ্রা রোগ দূর করিতে হইলে তাহার প্রকৃত কারণ দূর করিতে হইবে। উত্তম চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা করান উচিত।

নিম্ন লিখিত উপায়ে অনেক উপকার পাওয়া যায়—

যখন মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও পদদ্বয় শীতল হয় তখন কয়েক মিনিট পদদ্বয় গরম জলে রাখিয়া মুখে, চোখে ও কপালে ঠাণ্ডা জল লাগাইতে হইবে।

(১) মন হইতে সমস্ত চিন্তা দূর করিয়া লোকে নিদ্রা যাইতে পারে। মন হইতে সমস্ত চিন্তা এমন কি নিজের অনিদ্রা রোগের চিন্তাও ত্যাগ করিতে হইবে।

(২) শ্রান্তি দূর করিয়া শরীরের সমস্ত পেশী সমূহ আল্গা করিতে হইবে। পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত শরীরের সকল অংশ বিছানার উপর বিস্তৃত করিতে হইবে।

(৩) শরীরের পেশী সমূহ আল্গা করিয়া তৎসঙ্গে মন একবারে খালি করিলে শীঘ্রই নিদ্রা আসিয়া থাকে।

(৪) গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শয়নের পূর্ব্বে কপাল, ঘাড়ের পশ্চাৎ ভাগ, মুখ, পদদ্বয় ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিয়া এবং ভিজা বস্ত্র দ্বারা সমস্ত শরীর মুছিয়া ফেলা ভাল।

যখন অত্যধিক গ্রীষ্ম হয় সে সময় বৈকালিক স্নান নিদ্রার অনেক সহায়তা করে।

(৫) পরিষ্কৃত বায়ুর শ্বাস ক্রিয়াদ্বারাও নিদ্রার আবির্ভাব হইতে পারে।

(৬) শীঘ্র সমস্ত শরীর গরম জল দ্বারা মুছিয়া ফেলিলে, নিদ্রার সুবিধা হইতে পারে।

(৭) শয়নের পূর্ব্বে নির্ম্মল বায়ুযুক্ত স্থানে যতক্ষণ না ঘুম আসে ততক্ষণ বেড়াইলে কিংবা অল্প ব্যায়াম করিলে সুনিদ্রা হইতে পারে।

(৮) কথন কথনও ঘুম পাড়ানর গান গাইয়া ছেলেদের ঘুম পাড়ান হয়। ইহা Hypnotismএর ন্যায় ক্রিয়া করে।

এইরূপ উক্ত আছে নিদ্রার সময় এক একটী করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি লোপ পায়। প্রথমে চক্ষুর পাতা মুদিয়া যায় কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকে। পরে স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা যায়। তৎপরে ঘ্রাণ গ্রহণের শক্তি লোপ পায়। সকলের শেষে চিন্তা শক্তির নাশ হয়।

নিদ্রা সম্বন্ধীয় চরকোক্ত কথা

নিদ্রার বর্ণনা।

যদাতু মনসি ক্লান্তে কর্ম্মাত্মানঃ ক্লমান্বিতাঃ।
বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তন্তে তদা স্বপতি মানবঃ॥

নিদ্রায়ত্তং সুখং দুঃখং পুষ্টিঃ কার্শ্যং বলাবলম্।
বৃষতা ক্লীবতা জ্ঞানমজ্ঞানং জীবিতং ন চ॥

অকালেঽতিপ্রসঙ্গাচ্চ ন চ নিদ্রা নিষেবিতা।
সুখায়ুষী নবৈ কুর্য্যাৎ কালরাত্রিরিবাগতা॥

যথন মন ক্লান্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণ ও ক্লান্ত হইয়া নিজ নিজ বিষয় হইতে বিরত হয় তথনই মানব নিদ্রিত হয়।

সুখ, দুঃথ, পুষ্টি, কৃশতা, বল, অবল, ক্লৈব্য জ্ঞান, অজ্ঞান, জীবন, মরণ এই, সমস্ত নিদ্রার অধীন।

অযথা সময়ে নিদ্রা, অতিনিদ্রা ও অনিদ্রা এই ত্রিবিধ নিদ্রাই সুখকর ও আয়ুষ্কর হয় না সমাগত এই ত্রিবিধ নিদ্রাকে কালরাত্রি বলিয়া জানিবে।

নিদ্রার ফল।

সৈব যুক্তা পুনর্যুঙ্‌ক্তে নিদ্রা দেহসুখায়ুষা।
পুরুষং যোগিনং সিদ্ধ্যা সত্যা বুদ্ধিরিবাগতা॥

যেমন সৎসিদ্ধি দ্বারা বিবেক বুদ্ধি যোগী পুরুষকে সুখী ও আয়ুষ্মান করে তাহার ন্যায় সেই নিদ্রা যথাকালে সেবিত হইলে সুখকর ও আয়ুষ্কর হয়।

দিবানিদ্রার অধিকারী ও তাহার ফল।

গীতাধ্যয়ন মদ্য স্ত্রী কর্ম্ম ভারাধ্ব-কর্ষিতাঃ।
অজীর্ণিনঃ ক্ষতাঃ ক্ষীণা বৃদ্ধা বালা স্তথা বলাঃ॥

তৃষ্ণাতীসার শূলার্ত্তাঃ শ্বাসিনঃ হিক্কিনঃ কৃশাঃ।
পতিতাভিহতোন্মত্তাঃ শ্রান্তা যান প্রজাগরৈঃ॥

ক্রোধ শোক ভয় ক্লান্তা দিবাস্বপ্নোচিতাশ্চ যে।
সর্ব্ব এতে দিবাস্বপ্নং সেবেরন্ সার্ব্বকালিকম্॥

ধাতু সাম্যং তথা হ্যেষাং বলঞ্চাপ্যুপজায়তে।
শ্লেষ্মা পুষ্যতি চাঙ্গানি স্থৈর্য্যং ভবতি চায়ুষঃ॥

যাঁহারা গীত, অধ্যয়ন, মদ্য, মৈথুন, পরিশ্রম ও ভারবহন দ্বারা কর্ষিত আর যাঁহারা অজীর্ণরোগী, ক্ষতরোগী, ক্ষীণ, বৃদ্ধ বালক ও দুর্ব্বল,

যাঁহারা তৃষ্ণা, অতীসার ও শূলার্ত্ত, শ্বাস হিক্কাযুক্ত ও কৃশ, যাঁহারা উচ্চস্থান হইতে পতিত, অভিহত, উন্মত্ত, যানারোহণে বা রাত্রি জাগরণে শ্রান্ত।

অথবা ক্রোধ, শোক ও ভয়ে ক্লান্ত কিম্বা যাঁহারা দিবানিদ্রায় অভ্যস্ত তাঁহারা সকলেই সকল সময়ে দিবাভাগে নিদ্রা যাইতে পারেন।

দিবাভাগে নিদ্রা যাইলে ইহাদের ধাতুর সমতা ও বলবৃদ্ধি হয় আর শ্লেষ্মা ইহাদের অঙ্গ সকল পুষ্ট করে এবং ইহাদের আয়ু বৃদ্ধি হয়।

অকাল নিদ্রার ফল।

গ্রীষ্মেত্বাদানরুক্ষাণাং বর্দ্ধমানে চ ভাস্করে।
রাত্রীণাং চাতিসংক্ষেপাদ্ দিবাস্বপ্নঃ প্রশস্যতে।।
গ্রীষ্ম বর্জ্জেষু কালেষু দিবাস্বপ্নাৎ প্রকুপ্যতঃ।
শ্লেষ্ম পিত্তে দিবাস্বপ্নস্তস্মাদন্যেষু নেষ্যতে ।।
মেদস্বিনঃ স্নেহনিত্যাঃ শ্লেষ্মলাঃ শ্লেষ্ম-রোগিণঃ।
দূষীবিষার্ত্তাশ্চ দিবা ন শয়ীরন্ কদাচন ।।
হলীমকং শিরঃশূলং স্তৈমিত্যং গুরুগাত্রতা।
অঙ্গমর্দ্দোঽগ্নিনাশশ্চ প্রলেপো হৃদয়স্য চ ।।
শোথারোচক হৃল্লাস পীনসার্দ্ধাবভেদকাঃ।
কোঠারুঃ পিড়কাঃ কণ্ডূস্তন্দ্রা কাসো গলাময়াঃ ।।
স্মৃতিবুদ্ধি প্রমোহশ্চ সংরোধঃ স্রোতসাং জ্বরঃ।
ইন্দ্রিয়াণামসামর্থ্যং বিষবেগ প্রবর্ত্তনম্ ।।

গ্রীষ্মকালে দিন বাড়ে রাত্রি কমে আর উত্তরায়ণ কালধর্ম্মে দেহ রুক্ষ হয়, একারণ একালে দিবা নিদ্রা হিতকর।

গ্রীষ্মকাল ভিন্ন অন্যকালে দিবভাগে নিদ্রা যাইলে পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয় সেজন্য তাহা ত্যাগ করিবে।

যাহারা অত্যন্ত স্থূল, নিত্য স্নেহসেবী, শ্লেষ্মপ্রকৃতি, শ্লেষ্মরোগী ও দূষীবিষে আর্ত্ত, তাহারা কদাচ দিবাভাগে নিদ্রা যাইবে না।

দিবাভাগে নিদ্রা যাইলে হলীমক, শিরঃশূল, রাত্র্যন্ধতা, গাত্রগুরুতা, অঙ্গমর্দ্দ, অগ্নিমান্দ্য, হৃদয়ে কফলিপ্ততা—

শোথ, অরুচি, হৃল্লাস, পীনস, আধকপালে, কোঠ, ব্রণ, পিড়কা, কণ্ডু, তন্দ্রা, কাস ও গলরোগ—

স্মরণ-শক্তি-হীনতা বুদ্ধিনাশ স্রোতোরোধ জ্বর ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যও বিষবেগ বৃদ্ধি হয়।

ভবেন্নৃণাং দিবাস্বপ্নস্ত্বাহিতস্য নিষেবণাৎ।
তস্মাদ্ধিতা হিতং স্বপ্নং বুদ্ধা স্বপ্যাৎ সুখং বুধঃ॥
রাত্রৌ জাগরণং রুক্ষং স্নিগ্ধং প্রস্বপনং দিবা।
অরুক্ষমনভিষ্যন্দি ত্বাসীন প্রচলায়িতম্॥

সেইজন্য হিতকর ও অহিতকর নিদ্রা বিবেচনা করিয়া বিজ্ঞ মানব সুখে নিদ্রা যাইবেন।

রাত্রিজাগরণ রৌক্ষ্যকারক, দিবানিদ্রা স্নিগ্ধতাকারক, বসিয়া বসিয়া তন্দ্রা যাইলে মানব রুক্ষ বা স্নিগ্ধ কিছুই হয় না।

নিদ্রার আবশ্যকতা।

দেহবৃত্তৌ যথাহারস্তথা স্বপ্নঃ সমো মতঃ।
স্বপ্নাহার সমুত্থেতু স্থৌল্য কার্শ্যে বিশেষতঃ॥

দেহ ধারণ করিতে আহারের যেরূপ আবশ্যক যথাকালে নিদ্রার ও সেইরূপ আবশ্যক, বিশেষতঃ স্থূলতা ও কৃশতার প্রতি নিদ্রা ও আহার কারণ।

নিদ্রার উপায়।

অভ্যঙ্গোৎসাদনং স্নানং গ্রাম্যানূপৌদকা রসাঃ।
শাল্যন্নং সদধি ক্ষীরং স্নেহো মদ্যং মনঃসুখম্॥
মনসোঽনুগুণাগন্ধাঃ শব্দাঃ সম্বাহনানি চ।
চক্ষুষোস্তর্পণং লেপঃ শিরসো বদনস্য চ॥
স্বাস্তীর্ণং শয়নং বেশ্মসুখং কালস্তথোচিতঃ।
আনয়ন্ত্যচিরান্নিদ্রাং প্রনষ্টা যা নিমিত্ততঃ॥ ১

তৈলম্রক্ষণ, উৎসাদন, স্নান, গ্রাম্য আনূপ ও ঔদক মাংস রস, শালির অন্ন, দধি, দুগ্ধ, স্নেহ, মদ্য, মানসিক সুখ,

মনোহর গন্ধ ও শব্দ, সুখকর গাত্র মর্দ্দন, নেত্রের সন্তর্পণ, মাথায় ও মুখে শীতল লেপ, সুখজনক বিস্তীর্ণ শয্যা, মনোহর গৃহ, সুখজনক ব্যাপার ও উচিত কাল ইহারা বিনষ্ট (কোন কারণে অন্তর্হিত) নিদ্রাকে শীঘ্র পুনরানয়ন করে। ১

নিদ্রার প্রতিবন্ধক ও নাশের কারণ।

কায়স্য শিরসশ্চৈব বিরেকশ্ছর্দ্দনং ভয়ম্।
চিন্তা ক্রোধস্তথাধূমো ব্যায়ামো রক্তমোক্ষণম্॥
উপবাসঃ সুখাশয্যা সত্ত্বৌদার্য্যং তমোজয়ঃ।
নিদ্রা প্রসঙ্গমহিতং বারয়ন্তি সমুত্থিতম্।
এত এবচ বিজ্ঞেয়া নিদ্রানাশস্য হেতবঃ॥ ২

কায় ও মস্তকের বিরেচন, বমন, ভয়, চিন্তা, ক্রোধ, ধূম (তীক্ষ্ণ) ব্যায়াম, রক্তমোক্ষণ উপবাস, অসুখকরশয্যা, সত্বগুণের বৃদ্ধি, তমোগুণ নাশ ইহারা অহিতকারী উপস্থিত নিদ্রা নিবারণ করে এবং ইহারা নিদ্রা নাশের কারণও হয় জানিবে। ২

বাজারের খাবার।

যে মানুষ এক সময়ে অপরিপক, ফল মূল ও অসিদ্ধ মাছ মাংস ভক্ষণ করিত, বন্যজন্তু হত্যা করিয়া তাহার মাংস কাষ্ঠাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া উদর পূরণ করিত সেই মানুষ কি না আজ বিদ্যা বুদ্ধির পরিবর্দ্ধন ও রন্ধনকলার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুপক্ক ফল মূল খাইতে শিখিয়াছে ও নানাপ্রকারের খাদ্য সামগ্রী নানারকমে রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিতেছে। যে মানুষ একসময়ে বৃক্ষবল্কল, বৃক্ষপত্র বা পশুচর্ম্ম দ্বারা শরীরের নগ্নতা নিবারণ করিত; বনে জঙ্গলে, বৃক্ষকোটরে ও গিরিগহ্বরে বাস করিত, সেই মানুষ কিনা আজ তূলা, পাট প্রভৃতি হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া কত প্রকারের গাত্রাবরণ তৈয়ার করিতেছে, জঙ্গল কাটিয়া গ্রাম নগর স্থাপনা করিতেছে, ও গৃহঅট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিয়া একত্রে বসবাস করিতেছে। এই সকল প্রকৃতির অচিন্ত্য ও অনমুমেয় পরিবর্ত্তন এবং মানবের উন্নত ও পরিমার্জ্জিত বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া কার না যুগপৎ বিস্ময় ও আহ্লাদের উদ্রেক হয়? কিন্তু দুঃখ হয়,

মানুষের সভ্যতা অতিমাত্রায় উঠিয়াছে। স্বভাবের জীব এখন স্বভাবকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের মাত্রা অতিক্রম করিয়া স্বভাবের উপর রাজত্ব করিতে চলিয়াছে।

ঈশ্বর বিদ্যাবুদ্ধি দিয়াছেন খাদ্যের উপকরণ দিয়াছেন, খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য হস্তদ্বয় দিয়াছেন এক্ষণে মানুষের খাদ্য পাক করিয়া খাওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু মানুষ আজকাল এতই সুখপ্রিয় ও এতই পরনির্ভরশীল হইয়াছে যে আপনার উদরপুরণের জন্য সে অপরের প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের উপর নির্ভর করে; স্বীয় ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য বাজারের খাবার ভক্ষণ করে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ইহাতে আর দোষ কি? আমরা ত পয়সা দিয়া বাজারের খাবার কিনিয়া খাই। আমরা ত আর ভিক্ষা করিয়া লই না। একথা বলিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত তাঁহারা পয়সা দিয়া কি রকম জিনিষ কিনিতেছেন, "অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল লইতেছেন" কি না।

বাজারের খাবার প্রায় অধিকাংশ স্থলেই খারাপ ও অনিষ্টকর। প্রায় অধিকাংশ দোকানেই খাবার বাহির করিয়া সাজাইয়া রাখা হয়। তাহার পর যখন রাস্তায় জল দেওয়া হয় কিম্বা যখন জোরে বাতাস বহিতে থাকে তখন রাস্তার কত ধূলা সেই খাবারের উপর গিয়া পড়ে। আবার সেই ধূলায় যদি কলেরা, প্লেগ, বসন্ত বা ক্ষয়কাস রোগের বীজাণু থাকে তাহা হইলেই খাবার বিষাক্ত হইয়া গেল এবং সেই খাবার যিনিই খাইবেন তিনিই কলেরা, প্লেগ, বসন্ত বা ক্ষয়কাস রোগাক্রান্ত হইবেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে বাজারের খাবার খাইয়া অনেকে কলেরা রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ সেই খাবারের উপর ধূলা হইতে কোন ক্রমে কলেরাবীজাণু আসিয়া পড়িয়াছিল এবং সেই খাবার খাওয়াতে তাঁহারা কলেরা রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে সব সময় যে ধূলাতে এই সমস্ত রোগের বীজাণু থাকে তাহা ত নহে। তাহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে যখন আমাদের জানা নাই যে ধূলাতে রোগের বীজাণু আছে কি না তখন আমাদের পক্ষে বাজারের খাবার না খাওয়াই শ্রেয়স্কর, সুখ জনক ও যুক্তি সঙ্গত।

ধূলা হইতেই যে কেবল রোগের বীজাণু আসে তাহা নহে। মাছি হইতেও নানাপ্রকার রোগের বীজাণু খাবারের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া থাকে। মাছি সাধারণতঃ ময়লাযুক্ত অপরিষ্কার স্থানে গিয়া বসে। আর সেই ময়লায় যত বিষ ও যত রোগের বীজাণু থাকে সেই সমুদয়ই মাছির পায়ে জড়িত হইয়া থাকে এবং যখন সেই মাছি গিয়া খাবারের উপর বসে তখন সেই সমস্ত বিষাক্ত ও অনিষ্টকারক পদার্থ খাবারেতে সংক্রামিত হইয়া যায়। সেই সকল বাজারের খাবার খাইলেই যে রোগ উপস্থিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কেহ বলিতে পারেন যে যদি অনাবৃত স্থানে থাকিলেই এত বিপদের সম্ভাবনা তখন যে সকল দোকানে আলমারি বা গ্লাসকেসের ভিতর খাবার রক্ষিত হয় সেই সকল দোকানের খাবার খাইতে বাধা কি। অবশ্য সে সকল দোকানের খাবার তত অনিষ্টকারী নহে; কিন্তু তাহা বলিয়া যে আদৌ অপকারী নহে তাহা বলা যায় না। অধিকাংশ দোকানে খারাপ ঘৃত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খারাপ ও অনিষ্টকারক অন্যান্য উপকরণ দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। আর এই খারাপ উপকরণের দ্বারা প্রস্তুত খাবার খাইলেই অম্ল, অজীর্ণতা প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হওয়াই সম্ভব। সেইজন্যই যে সকল গ্রামে বা নগরে বাজারের খাবারে চলন খুব বেশী সেই সকল গ্রাম বা নগরের অধিবাসিগণের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯৯ জন অম্ল ও অজীর্ণতা রোগাক্রান্ত। আজ কাল বঙ্গদেশে বাজারের খাবারের এতই প্রচলন যে সেই কদন্ন ভোজীর মধ্যে যাহাকেই জিজ্ঞাসা করা যায় তাহারাই হয় অম্ল, নয় অজীর্ণতা একটী না একটী রোগ লাগিয়া আছে। ইহার জন্যই দেশব্যাপী অম্ল ও অজীর্ণতা। এই রোগে বঙ্গবাসী জীর্ণ, শীর্ণ ও কঙ্কালসার হইয়া পড়িতেছে। দেহে বল নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই। অকালে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। শরীর এত দুর্ব্বল যে ক্ষুদ্র রোগের বীজাণুকেও বাধা দিবার শক্তি নাই। শরীর যত প্রকার ব্যাধির মন্দির হইয়া উঠিতেছে। শেষে আধিব্যাধি জরাগ্রস্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। বাজারের খাবার ব্যবহারের কি ভীষণ ফল হইতেছে! ইহা দেখিয়াও কি মানুষের চৈতন্য হয় না।

তেলে ভাজা খাবার এতই জঘন্য যে তাহা আর বলা যায় না। যে তৈল ব্যবহৃত হয় তাহাতে এত ভেজাল মিশ্রিত থাকে যে সেই সরিষার তৈলের মধ্যে

সরিবার ভাগ খুজিয়া পাওয়া ভার। প্রথম সকল দোকানেই প্রায় জঘন্য উপকরণে খাবার তৈয়ারী হয় তাহা ও প্রায় অধিকাংশ স্থলেই বাসী। কোনও কোনও স্থলে এইরূপও শুনা যায় যে বাসী খাবার সিদ্ধ করিয়া সেই উপকরণের সহিত কিঞ্চিৎ নূতন উপকরণ মিশ্রিত করিয়া আবার গরম গরম খাবার তৈয়ারী হয়; আর লোকে গরম জিনিষ অনিষ্টকর নয় এই ভাবিয়া তৃপ্তির সহিত সেই সকল জিনিষ কিনিয়া খান। তাঁহারা জানেন না যে ইহার মধ্যে এত রহস্য আছে। এখন এইরূপ খাবার খাইলে যে কি ফল ফলিবে তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন।

বঙ্গীয় মহিলাগণ সাধারণতঃ একটু তেলে ভাজা খাবারের ভক্ত। বিশেষতঃ এ অঞ্চলের মহিলারা যখন কালীঘাটে যান তখন তেলে ভাজা খাবারের সেবা একটু কিছু বিশেষ রকম করিয়া থাকেন। তীর্থে পুণ্য করিতে গিয়া তাহারা রোগ কিনিয়া আনেন।

মফঃস্বলের অধিবাসিগণ যখন কলিকাতায় আসেন তখন তাঁহারা চপ্, কাট্‌লেট্ প্রভৃতি বিলাতী ধরণের খানা দেখিয়া কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল খাবারের রহস্য শুনিলে এই সকল খাবারের প্রতি ঘৃণা না হইয়া থাকিতে পারিবে না। যদি কতকগুলি কাট্‌লেট্ পড়িয়া থাকে তাহা হইলে পরদিন সেই কাট্‌লেট্ খুড়িয়া চপের ভিতর দেওয়া হয়। আবার যদি মাংসের কোর্ম্মা পড়িয়া থাকে তাহা হইলে সেই মাংসের সহিত কিছু নূতন মাংস দিয়া ও তাহাতে কিছু মসলাদি দিয়া আবার নূতন করিয়া পাক করা হয়। এই সব খাবারের যে কি বিষময় ফল তাহা এখন এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এরূপ খাবারে কলেরা হইবার ত খুবই সম্ভাবনা, না হয় ত অজীর্ণতা।

বাজারের খাবার না খাওয়াই আমাদের সর্ব্বথা মঙ্গলকর। যাঁহাদের পক্ষে জলখাবার প্রস্তুত করিয়া খাইবার সুবিধা নাই তাঁহারা অনায়াসেই মুড়ি, নারিকেল ও কলা কিনিয়া খাইতে পারেন। ব্যয় ও অল্প হয়, উদর পূরণও ভালরূপ হয় এবং পুষ্টিকর খাদ্যও খাওয়া হয়। এরূপে খাবারে রোগও কম হয়।

শাস্ত্রীয় স্বাস্থ্য কথা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবতারণ বিদ্যারত্ন লিখিত—

চরকোক্ত যোগাযোগ কথন ও বিচার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মাত্রাহীন অবিহিত পানান্ন ভোজনে।
যে প্রকার স্বাস্থ্য-হানি হয় দিনে দিনে॥
সেইমত চক্ষু কর্ণ নাসিকা রসনা।
ত্বক্ আর এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় বাসনা॥
যদ্যপি অন্যায় ভাবে করয়ে পূরণ।
সেই দোষ হেতু হয় রোগের যন্ত্রণ॥
তাই বিচারিয়া সবে জ্ঞানেন্দ্রিয় গণ।
অন্যায় ভাবেতে কেহ নাকর প্রেরণ॥
যে ইন্দ্রিয় যে যে ভাবে কার্য্যে নিয়োজিলে
জন্মায় বিবিধ রোগ মানব সকলে॥
ক্রমে তাই বিস্তারিয়া শুন সযতনে।
শুনি সাবধান হবে কর্ত্তব্য পালনে॥
মিথ্যাযোগে অতিযোগে অযোগে করাল।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ কর্ম্ম কাল॥
ঘটায় বিবিধ রোগ ক্রমে নরগণে।
স্বভাব ইহার মূল হয় বিচারণে॥
দোষান্বিত অন্নপানে জন্মে যথা রোগ।
ইহাতেও সেইমত হয় দুঃখ ভোগ॥
যেপ্রকার যোগে রোগ যেরূপে সম্ভবে।
বিস্তারিত পরিচয় ক্রমে পাবে সবে॥

স্বাস্থ্যবান্ করে যদি অহিত সেবন।
ভোজনান্তেই নাহি হয় ব্যাধির সৃজন॥
কিন্তু যদি বহুদিন করে কু-ভোজন।
অবশ্য তাহার ঘটে স্বাস্থ্যের পতন॥
যদি বহু পরিমাণে খায় অল্পদিন।
অল্পদিন মধ্যে রোগ জন্মে সুকঠিন॥
কুপথ্য সেবন মাত্রে বিলম্বে কথন।
অবশ্য জন্মায় রোগ না হয় খণ্ডন॥
অতি অল্প কুপথ্যেতে দুর্ব্বল শরীরে।
জন্মে রোগ ঘোররূপ অতীব সত্বরে॥
যেবা করে মহাদোষ হইয়া দুর্ব্বল।
তিনি শীঘ্র করে ত্যাগ এই ভূমণ্ডল॥

শব্দ যোগ।

মিথ্যাযোগ কর্কশাদি শব্দের শ্রবণ।
অতিযোগ অতিমহা শব্দের গ্রহণ॥
অযোগ শব্দের স্থির অশ্রবণ হয়।
শব্দের এ তিন যোগে কর্ণে রোগ কয়॥

স্পর্শ যোগ।

মিথ্যাযোগ হয় স্পর্শে বিষম আধার।
অপবিত্র দ্রব্য আদি অভিঘাত আর॥

অতিযোগ হয় অতি শীতোষ্ণ স্পর্শন।
আর স্নেহাদির অতি ম্রক্ষণ মর্দ্দন॥
অযোগ স্পর্শের নিত্য অস্পর্শন হয়।
স্পর্শের এতিন যোগে ত্বকে রোগোদয়॥

রূপ যোগ।

মিথ্যাযোগ হয় রূপে ঘৃণিত দর্শন।
সূক্ষ্ম দ্রব্যে দৃষ্টি আর দূরাবলোকন॥
অতিযোগ অত্যুজ্জ্বল দ্রব্যে দৃষ্টি আর।
অযোগ না রূপ দেখা এই কথা সার॥
রূপের এতিন যোগে জন্মে নেত্রে রোগ।
নাহি হয় সুখোদয় বাড়ে দুঃখ ভোগ॥

রস যোগ।

মিথ্যাযোগ হয় সদা অহিত ভোজন।
অতিযোগ সুপথ্যের অধিক সেবন॥
অযোগ ইহার নাম ভোজনের ত্যাগ।
এতিনে জিহ্বায় বাড়ে অশান্তির ভাগ॥

গন্ধ যোগ।

মিথ্যাযোগ হয় সদা দুর্গন্ধাদি যত।
অতিযোগ তীক্ষ্ণ উগ্র অতিমাত্রাযুত॥
অযোগ গন্ধের হয় আঘ্রাণ বর্জন।
এতিন গন্ধের যোগে ঘ্রাণের নাশন॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এসব অহিত সংযোগ।
সেবিত হইলে আর কত ঘটে রোগ॥

কর্ম্ম যোগ।

বাক্য মন দেহভেদে কর্ম্ম ত্রিধা হয়।
মিথ্যাযোগ অতিযোগ অযোগ তাহায়॥

(ক) বাচিক।

নিন্দাবাক্য মিথ্যাকথা অপ্রিয় কথন।
অসম্বদ্ধ প্রতিকূল কর্কশ বচন॥
মিথ্যাযোগ হয় ইহা বাচিক কর্ম্মেতে।
অতিযোগ হয় অতিভাষণ তাহাতে॥
অযোগ তাহাতে হয় সদা অকথন।
বাচিক কর্ম্মের এই ত্রিযোগ বর্ণন॥
ইহাতে নিশ্চয় ঘটে বাগিন্দ্রিয়ে রোগ।
আর বহুবিধ দুঃখ ইথে হয় ভোগ॥

(খ) মানসিক।

মিথ্যাযোগ মানসিক কর্ম্মে এই হয়।
শোক ক্রোধ লোভ মোহ মান ঈর্ষা ভয়॥
নাস্তিকতা আদি বহু প্রকার তাহাতে।
আছে জান ধ্রুব তাহা আয়ুর্ব্বেদ মতে॥
অতিযোগ হয় অতিমনন বিষয়ে।
অযোগ না চিন্তাকরা সুস্থচিত্ত হয়ে॥
মানসিক করমের যোগ এই তিন।
স্বাস্থ্য-প্রিয় মানবের ত্যাজ্য প্রতিদিন॥
ইহাতে জন্মায় নানা মানস বিকার।
প্রজ্ঞাপরাধক নাম আছয়ে ইহার॥

(গ) দৈহিক।

মিথ্যাযোগ শারীরিক কর্ম্মের নিশ্চিত।
মলমূত্র বেগরোধে চেষ্টা নিয়মিত॥
অনাগত বেগে আর সর্ব্বথা যতন।
বিষম ভাবেতে পুনস্খলন পতন॥
বিষম ভাবেতে অঙ্গ বিক্ষেপাদি আর।
অঙ্গের কণ্ডূতি তথা মর্দ্দন প্রহার॥
বিষম ভাবেতে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ।
ব্রত উপবাস আদি ক্লেশ সম্বরণ॥
অতিযোগ শারীরিক চেষ্টা অতিশয়।
অযোগ কায়িক কর্ম্মে চেষ্টা ত্যাগ হয়॥
কায়িক কর্ম্মের এই হয় তিন যোগ।
বিচারিয়া ত্যাগ কৈলে হয় শান্তিভোগ॥
নতুবা জন্মায় দেহে বিবিধ বিকার।
বহুকষ্টে যার হাতে না পায় নিস্তার॥

কালিক যোগ।

সমস্ত জগৎ হয় কালের অধীন।
কালেতে উৎপত্তি স্থিতি কালে হয় লীন॥
অনাদি অনন্ত কাল সবার জনক।
পালক বৰ্দ্ধক আর হয় বিনাশক॥
কাল অতিক্রম করি চলা অসম্ভব।
কালের বৈভব এই দৃশ্যাদৃশ্য সব॥
কাল ভিন্ন সবাকার প্রতিকার আছে।
কালের বিরুদ্ধে চেষ্টা সব হয় মিছে॥
তবে যদি ঘটে রোগ অনুচিত কালে।
ব্যবহার দোষে কিম্বা ভোজনাদি ফলে॥
তার প্রতিকার হেতু বিবিধ উপায়।
নানাশাস্ত্রে নানামত আছে দেখা যায়॥
যে কালের যেই ধর্ম্ম তাহাই উচিত।
বিপরীত ঘটনেতে হয় অনুচিত॥
শীত উষ্ণ বর্ষা এই কালের স্বভাব।
কাল ধর্ম্ম বিপর্য্যয়ে রোগ আবির্ভাব॥
কালেতেও হয় তথা ত্রিযোগ মিলিত।
যাহাতে মানব দুঃখ পায় নিয়মিত॥
মিথ্যাযোগ অতিযোগ আর যে অযোগ।
বহুবিধ রূপে নাশে বহুবিধ ভোগ॥
মিথ্যাযোগ হয় কালে ধর্ম্ম বিপর্য্যয়।
তাহার নিশ্চিত জান এই পরিচয়॥
শীতকালে গ্রীষ্ম বর্ষা, গ্রীষ্মে বর্ষা শীত।
বর্ষাকালে শীত গ্রীষ্ম, ধর্ম্ম বিপরীত॥
অতিযোগ কালে হয় স্বগুণ অধিক।
শীতে অতিশীত, গ্রীষ্মে গ্রীষ্ম সমধিক॥
বর্ষাকালে অতিবর্ষা, যদি পূর্ণ হয়।
অতিযোগ কালে তাহা জানিবে নিশ্চয়॥
অযোগ কালের হয় স্বধর্ম্ম অল্পতা।
শীতে অল্পশীত গ্রীষ্মে অত্যল্প উষ্ণতা॥
বর্ষাকালে অল্পবর্ষা যদি ধ্রুব ঘটে।
তাহাতে নিশ্চিত নর পড়য়ে সঙ্কটে॥
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্ম আর এই কাল।
মিথ্যা আদি তিন যোগে হইয়া করাল॥

নরদেহে বহুবিধ আময় জন্মায়।
সাবধান ইথে যেবা সেই রক্ষা পায়॥
ইহাদের সমযোগ স্বাস্থ্যের কারণ।
শাস্ত্রমতে সবে তাহা করিবে রক্ষণ॥
পূর্ণ অবয়ব আত্মা ইন্দ্রিয় সকল।
আর শৈশবাদি দেহ ভাব অবিকল॥
সমস্ত জীবিত কাল যদি স্থির থাকে।
পূর্ণ স্বাস্থ্যফল তাহা কহে বিজ্ঞ লোকে॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আদি যাহা আছে।
সকলের মূল বাঁন্ধা আরোগ্যের কাছে॥
নিজ নিজ দেহ ভাব বিচারিয়া মনে।
অনলস হয়ে স্বাস্থ্য পালিবে যতনে॥

স্ব অভিভাবক।

চিকিৎসক মাত্রেই স্ব স্ব রোগীর মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন। রোগী যাহাতে রোগমুক্ত হইতে পারে এইরূপ ঔষধের ব্যবস্থা লইয়াই তাঁহাদিগকে ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। রোগীকে এই ঔষধ দেওয়া হইবে রোগীকে ঐ ঔষধ দেওয়া হইবে এই লইয়া চিকিৎসকগণের মধ্যে তুমুল আলোচনা, জল্পনা শেষে আবার মতদ্বৈধতা, বাক্‌যুদ্ধ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এইরূপ ঔষধ ব্যবস্থাতে তাঁহারা দেশের যে কিছু মঙ্গল করিতেছেন না তাহা বলা হইতেছে না; কিন্তু তাঁহারা যে ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থাতেই তাহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন সেইটার সম্বন্ধেই অভিযোগ ও চিকিৎসক মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। কেবল ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া রোগীকে রোগ বিমুক্ত করিলেই যে চিকিৎসক মহোদয়গণের দায়িত্বের এবং লোকে তাঁহাদের নিকট যাহা আশা করে তাহার শেষ হইয়া গেল তাহা নহে। তখনই চিকিৎসক নামের সম্পূর্ণ সার্থকতা হয় যখন, কিরূপে থাকিলে স্বাস্থ্যলাভ করা যায় ও রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় সেই সম্বন্ধে চিকিৎসক মহাশয় সাধারণের নিকট সহজ ভাষায় বোধগম্যরূপে উপদেশ দেন ও যাহাতে লোকে সেই সকল স্বাস্থ্য সম্পাদনকর নিয়মাদি পালন করিতে পারে তাহার সুবিধা করিয়া দেন। বাস্তবিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ প্রতিষেধ কিরূপে করা যায় সেই সম্বন্ধে ব্যবস্থা করাই চিকিৎসক-সমাজের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য।

প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসকগণই স্বাস্থ্যের প্রকৃত অভিভাবক। তাঁহারা প্রহরীর ন্যায় লোকদিগকে সাবধান করিবেন এবং তাহাদিগকে বিপথ হইতে রক্ষা করিবেন। পরে যখন আর রোগের হাত হইতে এড়ান অসম্ভব হইয়া পড়িবে তখন চিকিৎসক মহাশয়েরা তাঁহাদের চিকিৎসার দ্বারা রোগীগণকে রোগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন। রোগের জন্য অপেক্ষা করা অপেক্ষা যাহাতে রোগ না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই সদ্বিবেচকের কার্য্য এবং তাহা করাই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কালে কালে কতরূপ চিকিৎসা প্রণালীর উদ্ভাবন হইল। নানারকমের চিকিৎসা বিধান আজকাল প্রচলিত হইয়াছে।

কিন্তু, জগতের মঙ্গল ও উন্নতির দিক দিয়া দেখিতে হইলে এই বিভিন্নতার মধ্যে এক অপূর্ব্ব ও মধুর সমতা সংস্থাপিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এই বিভিন্নের মিলনে এক মহাএকতারসংস্থাপন হওয়াই উত্তম; কারণ অখিল জগৎস্রষ্টা ভগবান ত বিভিন্ন রূপের মধ্যে এক, বিভিন্ন ভাবের মধ্যে এক; বিভিন্নতার ভিতর হইতেও মধুর একতার আবির্ভাবই তাঁহারই বিধান। নানা প্রকারের চিকিৎসার পদ্ধতি মিলিত হইয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মনুষ্য জাতির বহুদর্শিতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সবার মিলনে এক মধুরএকতারসংস্থাপন করাই প্রার্থনীয়। যাহা সত্য তাহা নিত্যকালের জন্য সত্য তাহা সর্ব্বলোকের পক্ষে সত্য। সকল সত্যই সেই সারাৎসার সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের নিকট হইতেই এই মরজগতে কোন না কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া প্রেরিত। কিন্তু আমরা সকলেই ভগবানের সন্তান। পিতৃ সম্পত্তিতে আমাদের সকলেরই সমাধিকার। হউক্ না কেন এ্যালোপাথি, হউক্ না কেন হোমিওপ্যাথি, হউক্ না কেন হাকিমি, আর হউক্ না কেন কবিরাজী, যাহাই হউক্ না কেন, তাহারই মধ্যে যাহা কিছু সত্য আছে যাহা কিছু আবশ্যকীয় আছে তাহাই আমাদের গ্রহণ যোগ্য তাহা গ্রহণ করিতে আমাদের সকলেরই অধিকার আছে।

জলবায়ু, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, বয়স, জাতি, অভ্যাস ও সামাজিক অবস্থাভেদে চিকিৎসার প্রণালীর পার্থক্য হইতে পারে বটে, সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে বটে; কিন্তু এই পার্থক্য এই ব্যতিক্রম ন্যায় বিজ্ঞানের অনুমোদিত। ভিন্ন ভিন্ন

চিকিৎসামতাবলম্বী ছাত্র ও চিকিৎসকগণের এক মহাসাম্য-সূত্রে গ্রথিত হইয়া একটী স্বাস্থ্যাভিভাকের দলে বদ্ধ হওয়া উচিত এবং বৈজ্ঞানিক ও ন্যায়সঙ্গতরূপে বিভিন্ন মতের ভিতর এক সাধারণ সমতা রক্ষা করিয়া স্বাস্থ্যের অভিভাবক এই নামের পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করিতে অগ্রসর হওয়া উচিত এবং দেশের ও দশের স্বাস্থ্যোন্নতি কল্যাণকল্পে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া জগৎপিতার মহাআদেশ পালনে ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য।

হে চিকিৎসক! রোগের আরোগ্য করিয়াছ বলিয়া গর্ব্বাস্ফালনে উন্মত্ত হইও না। পরমপিতা পরমেশ্বরই সকল আরোগ্যের কর্ত্তা। তুমি তাঁহারই অতুল অনুগ্রহের বলে যাহা কিছু সামান্য জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছ তাহারই দ্বারা তুমি সামান্য একটী রোগের আরোগ্য করিয়াছ, ইহাতে গর্ব্বিত ও স্ফীত হইবার কোন কথাই নাই। জানিও জগতের বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডারের তুলনায় তোমার জ্ঞান ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম। তুমি গর্ব্ব করিতেছ, তজ্জন্য তুমি তাঁহার কৃপার পাত্র। ব্রহ্মকৃপা তোমার উপর অধিষ্ঠান করুক।"

কলেরা বা বিসূচিকা।

ডাক্তার শ্রীরাজেন্দ্রকুমার ঘোষ লিখিত—

ইহা অত্যন্ত সংক্রামক ও মারাত্মক পীড়া। সময় সময় একবারে বহুস্থানে প্রাদুর্ভূত হইতে দেখা যায়। রোগীর উদ্গারিত পদার্থে এবং মলে ইহার বিষ থাকে, এজন্য ঐ উদ্গারিত পদার্থ ও মল উত্তমরূপে বীজাণু নাশক ঔষধ দ্বারা পরিষ্কার করা উচিত। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে বিসূচিকার আক্রমণ অধিক। এই রোগাক্রান্ত রোগীর মল দেখিতে চাল ধোয়ানির জলের মত এবং উদ্গারিত পদার্থও জলের ন্যায় কিন্তু গন্ধহীন। ইহার বিষ পানীয় জল, দুগ্ধ এবং বায়ু দ্বারা চালিত হয়, একারণ যেখানে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয় সেখানকার জল বা দুগ্ধ পান করা অনুচিত। পান

করিতে হইলে জল সর্ব্বদা উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইয়া পান করিবে। রোগীর মল মূত্র এবং বমনাদি মিশ্রিত বস্ত্র সকল দগ্ধ করা উচিত।

রোগীকে স্বতন্ত্র রাখা বিশেষ আবশ্যক, নতুবা নিকটবর্ত্তী সমস্ত ব্যক্তিই এই রোগাক্রান্ত হইতে পারে। কলেরার প্রাদুর্ভাব কালীন কূপের জল চুণ, ফট্‌কিরি অথবা পারম্যাঙ্গানেট্‌ অফ্‌ পটাস্‌ দ্বারা সংশোধন করিয়া ব্যবহার করিবে। প্রণালী নিম্নে বর্ণিত হইল।

(১) আগ্রার মেজর ডনলপ (Major Dunlop) সাহেব মহোদয় নিম্নলিখিত প্রণালীতে কূপে চুণ দিতে বলেন। চুণ টাট্‌কা হওয়া আবশ্যক (অর্থাৎ জলে চূণ নিক্ষেপ করিবামাত্র যেন উত্তাপ উৎপাদন করে।) কূপের ব্যাস যত হইবে তাহাকে বর্গমূল করিবে, এবং সেই সংখ্যাকে জলের পরিমাণ যত হাত বা ফিট্‌ হইবে তাহার সহিত গুণ করিবে, পরে উক্ত সংখ্যাকে ১০ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে, তত পর্যান্ত চুণ একটী কূপ পরিশোধনার্থে আবশ্যক হইয়া থাকে।

কূপের ব্যাস ৬ ফিট্‌ এবং গভীরতা ১০ ফিট্‌ হইলে, প্রথমতঃ কূপের ব্যাস ৬ ফিটের বর্গমূল বাহির করিতে হইবে, যথা ৬×৬=৩৬ পরে এই সংখ্যাকে ১০ দিয়া গুণ করিলে ৩৬×১০=৩৬০ হইবে, অবশেষে এই রাশিকে ১০ দিয়া ভাগ দিলে (৩৬০÷১০=৩৬) ভাগ ফল ৩৬ হইল। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত কূপের জন্য ৩৬ পাউণ্ড চুণ আবশ্যক।

জলেতে চুণ নিক্ষেপ করিয়া ভালরূপে কূপের জলের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে, এজন্য অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাঁশ দিয়া কূপের জল আলোড়িত করা উচিত। দুই এক দিবস পরে পুনরায় এই হিসাবে চুণ দিবে এবং উহার দ্বারা জল পরিষ্কার হইলে পর ব্যবহারোপযোগী হইবে। কিম্বা কূপে চুণ দেওয়ার পর জল তুলিয়া দিলে যে নূতন জল বাহির হয়, তাহা ব্যবহার করিলে অতি উত্তম ফল পাওয়া যায়।

আম্বালা সহরের ভীষণ বিসূচিকার প্রাদুর্ভাবে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, তথাকার কূপ সমূহে চুণ দ্বারা উপরোক্ত উপায়ে জল শোধিত করায় অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছিল এবং বিসূচিকা বিস্তৃতির হ্রাস হইয়াছিল।

(২) কূপের জল ফট্‌কিরি দ্বারাও শোধন করা যায়। ফট্‌কিরি উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কূপে নিক্ষেপ করতঃ কিয়ৎক্ষণের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কূপের জলকে আলোড়িত করিবে।

প্রফেসর বেবাস্ সাহেব (Professor A. V. Babes of Bucharest) মহোদয় নিম্ন প্রথানুসারে কূপে ফট্‌কিরি দিবার পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। এক গ্যালন জলে ২০ গ্রেণ ফট্‌কিরি কিম্বা এক ঘন ফুট জলে ১২৫ গ্রেণ ফট্‌কিরি দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক ঘন ফুটে $৬\frac{১}{৪}$ গ্যালন জল থাকে। যদ্যপি ১টী কূপের জল ৩৬০ ঘনফিট হয়, এবং প্রতি গ্যালনে ২০ গ্রেণ হিসাবে ফট্‌কিরি দেওয়া যায় ($৬\frac{১}{৪}$ গ্যালনে $৬\frac{১}{৪} \times ২০ = ১২৫$ গ্রেণ) তাহা হইলে প্রত্যেক ঘনফুট জলে ১২৫ গ্রেণ ফট্‌কিরি দেওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক ঘনফুট জলে দুই ড্রামের কিঞ্চিৎ অধিক ফট্‌কিরি প্রয়োজন হইতেছে, এজন্য স্পষ্টই বুঝা যায় যে ৩৬০ ঘনফিট জলযুক্ত কূপে প্রায় ৮ পাউণ্ড ফট্‌কিরি দেওয়া উচিত। গোল কূপ হইলে $\frac{২২}{৭} \times \left(\frac{ব্যাস}{২}\right)^{২} \times$ জলের গভীরতা ($\frac{22}{7}$ × $Radius^2$ × depth of water) এই হিসাবে জলের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা যায়।

(৩) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্বারাও কূপের জল পরিশোধিত করা যায়। ইহার দ্বারা কলেরার বীজাণুর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় এবং অন্যান্য জান্তব দূষিত পদার্থও নষ্ট হয়। ডাক্তার হ্যান্‌কিন্ (Dr. E. H. Hankin C.I.E. Bacteriologist United Provinces of Agra & Oudh) সাহেব মহোদয় কলেরার প্রাদুর্ভাব সময় তত্রস্থ কূপ সমূহে এই লবণ ব্যবহার করিয়া অতি উত্তম ফল পাইয়াছেন। ডাক্তার বিংলী (Dr. E. H. Bingley, Late Chief Medical officer of Bengal Nagpur Railway) এবং Capt. Cook Major Weinman ও Major King (Civil Surgeons of Midnapur) সাহেব মহোদয়গণের আদেশে কলেরার প্রাদুর্ভাব কালীন লেখক স্বয়ং অধিকাংশ কূপে উক্ত লবণ ব্যবহার করিয়া অত্যাশ্চর্য্য ফল পাইয়াছিলেন, এমন কি এই কূপ সমূহে উক্ত লবণ ব্যবহারে একেবারে কলেরার প্রচণ্ডতার হ্রাস হইয়াছিল।

ডাক্তার হ্যান্‌কিনের মতে কূপে চূণ ও ফট্‌কিরি দেওয়ার পরিবর্ত্তে পটাসিয়াম্ পারম্যাঙ্গানেট্ দিয়া জল শোধন করা সর্ব্বাংশে উত্তম। তিনি বলেন যে সচরাচর কূপে এক হইতে তিন আউন্স পটাস্ পারম্যাঙ্গানেট্ আবশ্যক, ইহা জলে দিলে ঈষৎ লাল বর্ণ হইবে, সন্ধ্যার সময় কূপের জলে এই লবণ নিক্ষেপ করা উচিত ; তাহা হইলে সমস্ত রাত্রি ঐ জল স্থিরভাবে থাকিতে পারে, পরে ২৪ ঘণ্টা হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঐ ঈষৎ লালবর্ণ অদৃশ্য হইলে কূপের জল ব্যবহারোপযোগী হইবে।

ডাক্তার কনিংহাম (Lieut-Col. Cunningham I.M.S. Civil Surgeon of Lahore) বলেন যে সাধারণ কূপে প্রায় দুই পাউণ্ড পটাস্ পারম্যাঙ্গনেট্ (প্রথমে সামান্য জলে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া) নিক্ষেপ করা উচিত, এবং কলেরার প্রাদুর্ভাবকালীন নিয়মিতরূপে এই লবণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনঃ পুনঃ কূপের জল পরিশোধন করা কর্ত্তব্য। কূপের জল পরিশোধন করা হইলে পর, জল তুলিবার জন্য পৃথক পাত্র ব্যবহার করিবে ; অন্য কোনও ব্যক্তিকে তাহাদের নিজের পাত্রে জল তুলিতে দিবে না। কারণ কলেরার প্রথমাবস্থায় সকলে তাহাদের নিজের পাত্র (ঘটী বা ঘড়া) ব্যবহার করে বলিয়া কলেরার বীজাণু উক্ত পাত্রে সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকে এজন্য নির্দ্দিষ্ট পাত্র ভিন্ন অন্য কোনও পাত্র কূপে ব্যবহার করা উচিত নহে। কিন্তু তত্রস্থ বড় বড় পুষ্করিণীর জলে চূণ, ফট্‌কিরি অথবা পটাসিয়াম্ পারম্যাঙ্গনেট্ দ্বারা শোধন করিতে পারা যায় না ; কারণ তাহা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ্য এজন্য সেই সকল পুষ্করিণীর জল উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইয়া পান করাই যুক্তি সিদ্ধ।

এই ভীষণ মারাত্মক পীড়ার আক্রমণ হইতে নিজে নিজে সাবধান হইবার চেষ্টা করা উচিত। নিজেরা সাবধান না হইলে কোন প্রকারে এই অকাল ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব কালীন নিম্নলিখিত নিয়মগুলি সকলের প্রতিপালন করা উচিত।

(ক) কলেরার সময় রাত্রি জাগরণ করা নিষেধ এবং একবারে অধিক ভোজন না করিয়া অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ ভোজন করা উত্তম।

(খ) খালিপেটে কলেরা রোগীর বাটী যাওয়া উচিত নহে। যাহাতে লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হয় এরূপ কাজ কদাচ করিবে না।

(গ) কলেরার প্রাদুর্ভাব কালীন প্রত্যহ লেবু, লাইম্‌জুস্, ভিনিগার অথবা দুই একবার এসিড্ সালফিউরিক্ ডিল্ (diluted) ৪।৫ ফোঁটা সেবন করিলে কলেরার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

(ঘ) **কলেরার বিষ**—পানীয়জল, দুগ্ধ এবং মক্ষিকা দ্বারা চালিত হয়। একারণ যে স্থলে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়, সেখানকার জল বা দুগ্ধ উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইয়া পান করা উচিত এবং বাজারের মিষ্টান্ন একবারে ব্যবহার করা নিষেধ।

(ঙ) সোডা ওয়াটারে কোন প্রকার জীবাণু থাকিতে পারে না, এজন্য জলের পরিবর্ত্তে ঐ সময়ে সোডা ওয়াটার ব্যবহার করা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

(চ) কূপের জল পারম্যাঙ্গানেট্ অফ্ পটাস্ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সংশোধন করিয়া ব্যবহার করা উচিত। কারণ ইহা দ্বারা কলেরার বীজাণু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় এবং অন্যান্য জান্তব দূষিত পদার্থও নষ্ট হয়।

(ছ) রোগীর উদ্গারিত পদার্থে ও মলে কলেরার বিষ থাকে, এজন্য উদ্গারিত পদার্থ ও মল উত্তমরূপে বীজাণু নাশক ঔষধ (পারক্লোরাইড্ লোসন্, ফেনাইল বা সায়েলিন) দিয়া পরিষ্কার করা উচিত। মল ও বমনাদি মিশ্রিত বস্ত্রাদি দগ্ধ করাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

(জ) যে সকল ব্যক্তির সহজে ভয়ের উদ্রেক হয়, তাহাদের কলেরা রোগীর বাটী যাওয়া এবং রোগীর বাটীতে গিয়া কদাচ কোন দ্রব্য আহার বা পান করা উচিত নহে।

(ঝ) কলেরার প্রচণ্ডতার সময় কর্পূর ও অয়েল্ ইউক্যালিপটাসের ঘ্রাণ লওয়া উত্তম।

(ঞ) বাটীতে কলেরার আক্রমণ হইলে সত্বর রোগীকে পৃথক গৃহে রাখিবার বন্দোবস্ত করা উচিত এবং রোগীর শুশ্রূষাকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে কদাচ থাকিতে দিবে না। বালক বালিকাদিগকে স্থানান্তরিত করিবে এবং সদাসর্ব্বদা তাহাদের পানীয় ও আহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

বিবিধ সংগ্রহ।

আদর্শ গোশালা—কলিকাতা মিউনিসিপালিটি একটী আদর্শ গোশালা স্থাপন করিবেন। ঐ গোশালায় ৫০টী গাভীর স্থান থাকিবে। যাহার ইচ্ছা তিনি সেখানে নিজ গাভী রাখিতে পারিবেন। প্রতি গাভীর জন্য মাসে এক টাকা করিয়া দিতে হইবে। ঘর পরিষ্কার দেখাশুনা মিউনিসিপালিটি করিবেন।

ম্যালেরিয়া—সম্প্রতি মান্দ্রাজে যে ম্যালেরিয়া কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে তাহাতে অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন যে দারিদ্র্যই ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির কারণ। সুতরাং সহজে যে এদেশে ম্যালেরিয়া দমন হইবে এরূপ আশা করা যায় না।

গত পৌষ মাসের স্বাস্থ্য-সমাচারের জল বিশোধন অধ্যায়ে বর্ণিত জল শোধন প্রক্রিয়া সকলের মধ্যে (৫) (৬) (৭) ও (৮) প্রক্রিয়া রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীহরিনাথ ঘোষ, এম, ডি, মহাশয় প্রণীত "স্বাস্থ্য-তত্ত্ব" হইতে গ্রন্থকারের অনুমতি অনুসারে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই জন্য আমরা হরিনাথ বাবুকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

মহীশূরের অন্তর্গত বাঙ্গালোর সহরে যক্ষ্মারোগ মুক্তবায়ুতে চিকিৎসার জন্য, Church of England, Zenona Mission Hospitalএর ছাতের উপর বিশেষ বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। ১৮ই জানুয়ারি তারিখে লেডি ডালি এই বিভাগের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। তথাকার রেসিডেন্সি সার্জ্জন মেজর নক্স, বলেন যে বাঙ্গালোর সহরে পর্দ্দানসিন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই রোগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে।

ম্যালেরিয়ার বিশেষ স্বাস্থ্য কমিশনর মেজর ক্রাই—বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার গ্রাম সকল পরিদর্শন করিয়া তাহার প্রথম বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিবরণীতে তিনি নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

রোগ বিশেষে মৃত্যুর হার তাহার মতে নির্ভুল নহে। এই হিসাব চৌকিদারদের কথা মত থানায় থানায় লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। চৌকিদার মৃত ব্যক্তির রোগ সম্বন্ধে সবিশেষ খবর দিতে পারে না। যে প্রকার তাহারা লোক পরম্পরায় শুনে তাহাই আসিয়া থানায় লিখাইয়া থাকে। একরোগ স্থলে অন্য রোগ এই প্রকারে সহজেই লিপিবদ্ধ হয়।

পল্লীগ্রামের চিকিৎসকগণই জন সাধারণের মধ্যে কুইনাইন ব্যবহার জন্য দোষ সকল কীর্ত্তন করেন। তাহারাই সকলকে কুইনাইন ব্যবহারে জর আটকাইয়া যাইবে এইরূপ বুঝাইয়া থাকেন ও কুইনাইনের ব্যবহারে অনেকে প্রতিবন্ধক হন।

পল্লীবাসীদের সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ের ঔষধের উপর অল্পই বিশ্বাস দেখা যায়। তাহারা বলে যে কম্পাউণ্ডার দিগকে কিছু প্রণামী না দিলে উত্তম ঔষধ পাওয়া যায় না। আরও চিকিৎসালয়ে ঔষধ লইতে আসিলে তাহাদের নিজের কার্য্য বন্ধ থাকে। এই সকল কারণে কৃষকেরা সরকারী চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত হইতে বিশেষ ইচ্ছুক নহে।

মান্দ্রাজ স্বাস্থ্য-সভায় মতিবাবু—

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষের পরিচয় বোধ হয় আমাদের দেশবাসীগণের নিকট বিশেষ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তিনি তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও কার্য্যবলে আমাদের দেশে বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী, বহুদর্শী, স্বদেশপ্রেমিক ও সর্ব্বতোমুখীপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি আমাদের দেশে বিরল। গত কয়েকবৎসর যাবৎ তিনি অমৃতবাজার পত্রিকাতে বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য, কি করিয়া ভাল হইতে পারে, কি করিয়া বঙ্গের জলকষ্ট দূরীভূত হইতে পারে এবং কি করিয়া বা ম্যালেরিয়াব্যাধিপ্রপীড়িত বঙ্গদেশে পুনরায় নব স্বাস্থ্যের সঞ্চার হইতে পারে এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা পূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। সম্প্রতি তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞানপূর্ণ ও সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠে আকৃষ্ট

হইয়া আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর মহামান্ত শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর তাঁহাকে মান্দ্রাজের স্বাস্থ্য-সভায় বঙ্গদেশের বেসরকারী সভ্য নির্ব্বাচিত করেন। সেখানেও তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত তর্কবিতর্ক করিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহার গ্রাম্য-স্বাস্থ্যোন্নতিবিধায়ক যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবগুলি শুনিয়া আমরা তাঁহার সর্ব্বজন প্রীতি ও বহুদর্শিতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।

মান্দ্রাজ স্বাস্থ্য-সভার অনেক সভ্য এই অভিমত প্রকাশ করেন যে দেশবাসীগণ অজ্ঞতা বশতঃই জল দূষিত করা প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর কার্য্য করিয়া নিজেরাই নিজেদের মৃত্যুর কারণ হয়। তাহারা যদি অজ্ঞ না হয় তাহা হইলে কি তাহারা যে জলে মল মূত্রাদি নিক্ষেপ করে, বস্ত্র ধৌতি করে আর সেই জলই পান করে এবং ইহাও বলেন যে যদি জল বিশুদ্ধ অবস্থায় রাখিতে হয় তাহা হইলে শিক্ষা বিস্তার দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানতা দূর করাই প্রথমে আবশ্যক। মতিবাবু এই অভিমতের প্রতিবাদ করেন।

তিনি বলেন যে সাধারণতঃ অজ্ঞানতা প্রযুক্ত লোকে জল দূষিত করে না। পুষ্করিণীর সংখ্যার ন্যূনতাই ইহার প্রধান কারণ। বাস্তবিক জলাভাবই ইহার কারণ। আমাদের বঙ্গদেশে প্রায় অধিকাংশ গ্রামেই পানীয় জলরূপে ব্যবহারোপযোগী পুষ্করিণীর সংখ্যা অতি অল্প। সেই জন্য লোকে বাধ্য হইয়া একটী পুষ্করিণীকেই নানাপ্রকার প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। নিকটে পুষ্করিণী না থাকায় বাধ্য হইয়াই যে পুষ্করিণীতে লোকে বাসন মাজে, বস্ত্রধাবন করে ও গো মহিষাদি স্নান করায় সেই পুষ্করিণীরই জল আবার পানীয়রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের কোনও দোষ নাই! তাহারা দায়ে পড়িয়া, বাধ্য হইয়াই এই কার্য্য করিয়া থাকে। তাহারাত আর স্বেচ্ছায় করে না। মতিবাবু আরও বলিয়াছেন যে যদি বঙ্গের পানীয় জলের অবস্থাই ভাল করিতে হয় তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে পুষ্করিণীর ভিতরের পাঁকের ও জলমধ্যস্থ আগাছাদির সংস্কার করিতে হয়। পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্ব হইতে যাহাতে আবর্জ্জনা আসিয়া পুষ্করিণীর জলের সহিত মিশিতে না পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়, গ্রামের বন জঙ্গলাদি পরিষ্কার করাইতে হয় এবং আরও নূতন নূতন বড় বড় পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দিতে হয়। এই সকল কার্য্য ব্যয় সাপেক্ষ, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে এই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া আমাদের ন্যায় দেশে বড় শক্ত।

পরে যখন এই প্রস্তাব উপস্থিত হয় যে কিরূপে প্রত্যেক সহর ও প্রত্যেক নগরে গৃহাদি নির্ম্মিত হইবে ও কিরূপ পদ্ধতিতেই বা নগরাদিস্থাপিত হইবে, তখন মতিবাবু তাঁহার মহানুভবতার ও মহচ্চিত্ততার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। তখন তিনি বলেন যে ভারতবর্ষের বড় বড় সহর ও বড় বড় নগরের এবং তাঁহারা যে সহর ও নগর সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন তাহাতে কেবল কয়েক লক্ষ দেশ-বাসীরই মঙ্গল জড়িত রাহিয়াছে। গ্রাম লইয়াই সমগ্র ভারতবর্ষ। আর ভারতের লোকের অবস্থা কিনা, তাহাদের কাহারও বা পেটের অন্ন জুটে আর কাহারও বা জুটে না। অতএব তাঁহারা যে নগর সংস্থাপনা ও কলের জলের পরিচলন প্রভৃতি ব্যয় সাধ্য কথা লইয়া আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক করিতেছেন তাহা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। আর যাহাদের পক্ষে সম্ভব পর তাহারা বোধ হয় সমগ্র লোক সংখ্যার লক্ষাংশের একাংশ মাত্র। তারপর যখন স্বাস্থ্য-সভার ব্যয় ভার কে বহন করিবে এই লইয়া মতামত প্রকাশ করা হয় তখন মতিবাবু বলেন যে যখন এ স্বাস্থ্য-সভায় কেবল নাগরিক লোকেরই মঙ্গলামঙ্গলের আলোচনা হইতেছে, তাহাদের স্বাস্থ্য বর্দ্ধনার্থই যখন কল্পনা হইতেছে এবং তাহাদের সুস্বাস্থ্য সম্পাদনের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত তাহা স্থির করা হইতেছে এবং গ্রাম্য লোকের কথার যখন ইহাতে কিছুমাত্র সংশ্রব নাই তখন সহরের লোকেরই ইহার ব্যয় ভার গ্রহণ করা উচিত। বাস্তবিক মতিবাবু যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার সদ্বিবেচনারই পরিচয় দিয়াছেন। আবার যখন এই প্রস্তাব হয় যে সহরের লোকের কিরূপে থাকা উচিত সেই সম্বন্ধে তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য একটী আদর্শ নগরও গঠিত করা হইবে তখনও মতিবাবু বলেন যে এই নূতন সহর গঠনের ব্যয়ভার সহরের লোকেরই লওয়া উচিত। সকল স্থান হইতেই দেখা যাইতেছে যে মতিবাবু যেন গ্রাম্য লোকের উকীল স্বরূপ হইয়াই তাহাদেরই উন্নতিবিধানকল্পে সাধারণের নিকট গ্রামবাসীর অভাব ও অসুখের কারণ জ্ঞাপন করিয়া তাহা দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই যে তিনি স্বেচ্ছায় বঙ্গের পল্লীস্বাস্থ্য-সংস্কার মানসে উদ্যোগপরায়ণ হইয়া লাগিয়াছেন আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন তাঁহার উত্তম সফল হয়।

প্রেরিত পত্র।

মহাশয়—

আপনার ভাদ্র মাসের স্বাস্থ্য-সমাচারে শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ ঘোষ, লিখিত "অঙ্গ-চালনা" প্রবন্ধ পাঠে জানিয়াছি "Foot-ball" Players এবং Trapeze acrobats মধ্যে অনেকেরই দেহ যথোচিত পুষ্টিলাভ করিতে অবসর পায় না" প্রভৃতি একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দেশের যুবকবৃন্দ ফুটবল খেলায় এরূপ ভাবে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে কখনও এরূপ খেলার অনিষ্ট তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিবে এরূপ বলিয়া বোধ হয় না। আমরা এইহেতু অত্রস্থানে একটী হাডু ডুডু (কপাটী) খেলার বহুল প্রচার উদ্দেশ্য, Foot-ball খেলার বহুল প্রচার জন্য যেমন নানা স্থানে Shield এবং Cup প্রদত্ত হইয়া থাকে এইরূপ আমরা একটী 'ঢাল' (Shield)- দিবার মনস্থ করিয়াছি এতদুদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রচারও করিয়াছি।

প্রায় ৫০টী দল এই খেলায় যোগদান করিয়াছে। এক্ষণে কোন কোন শিক্ষিত লোকের মুখে শুনিতে পাই এই কার্য্যে আমরা কৃতকার্য্য হইব না। যদি লোকের রুচি অন্যরূপ বলিয়া হয় তাহা হইলে আমরা দুঃখিত নহি কিন্তু ইহা নাকি Scientific খেলা নহে। এবিষয়ে আপনি অধিক বুঝেন যদি তাহাই সত্য হয় তাহা হইলে যাহাতে যুবক দিগের স্বাস্থ্য হানি হয় এবিষয় লইয়া আমরা নাড়া চাড়া করিতে ইচ্ছুক নহি আপনার মতামত জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম। যদি ইহা Scientific হয় তবে উৎসাহের সহিত এই কার্য্যে আমরা যোগদান করিতে পারি। এবং এই বিষয় লইয়া আপনার মাসিক পত্রে কিছু আলোচনা করিলে আমাদের কার্য্যের কিঞ্চিৎ সহায়তা করা হয়।

আমাদের মনে হয় এই খেলায় ফুস্‌ফুসের ব্যায়ামের কার্য্য সাধিত হয় এবং অন্যান্য অঙ্গেরও পরিচালনা হইয়া থাকে। ইতি—

বশম্বদ
শ্রীমতিলাল রায়।

উত্তর—

হাড়ু ডুড়ু খেলায় ফুটবল খেলা অপেক্ষা শরীর অল্প ক্লান্ত হয়। ফুটবল খেলায় প্রায়ই অতিরিক্ত পরিশ্রমে (over exercise) শরীরের ক্ষয়ের মাত্রা অধিক হয়। হাড়ু ডুড়ু খেলায় এরূপ অতিরিক্ত পরিশ্রমের সম্ভাবনা অল্প। এবং এই কারণে ইহা স্বাস্থ্যোন্নতির হিসাবে ফুটবল অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। ইহাতে শরীরের সমস্ত মাংসপেশী সঞ্চালিত হয় অধিকন্তু ফুস্ফুসেরও ব্যায়াম হইয়া থাকে। দোষের মধ্যে উভয় খেলাতেই অঙ্গ হানির সম্ভাবনা আছে।

গ্রাহক ও পাঠকবর্গের প্রতি—অনেকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিয়া সম্পাদকের নিকট পত্র পাঠান। যাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে লিখেন তাঁহাদিগকে পৃথক পত্র লেখা হয়। সাধারণ ভাবে যে সকল পত্র আইসে আমরা সেই সকল পত্র ও তাহার উত্তর, এইবার হইতে নিয়মিত রূপে পত্রিকায় প্রাকাশ করিব।

স্বাস্থ্যসমাচার



"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্"।

প্রথম বর্ষ। } ফাল্গুন ১৩১৯ সাল { একাদশ সংখ্যা।

খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষা।

ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী লিখিত—

পচা দ্রব্যে দুর্গন্ধের কারণ

দর্শন, স্পর্শন ও আস্বাদ ব্যতীত গন্ধ দ্বারাও আমরা দ্রব্যের পচন অনুভব করিতে পারি। জগৎপিতা আমাদিগকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দিয়াছেন তদ্দ্বারা আমরা সকল দ্রব্যের গন্ধ পাই এবং সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ বিশ্লেষণ করিতে পারি। সুগন্ধের আমরা আদর করি এবং দুর্গন্ধকে যতশীঘ্র সম্ভব পরিত্যাগ করিয়া থাকি। কোন খাদ্যদ্রব্যে যখন দুর্গন্ধ অনুভব করি তখনই তাহা পচিয়া গিয়াছে বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকি। দরিদ্রতার কঠোর শাসনে যাহারা তাহা পরিত্যাগ করিতে না পারেন তাহারা খাদ্য রক্ষার নিয়ম লঙ্ঘণ জন্য পীড়াগ্রস্ত হইয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন সুতরাং দুর্গন্ধ যুক্ত খাদ্য দ্রব্য সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। এইরূপ দুর্গন্ধ কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

যবক্ষার জান যুক্ত প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্য খোলা বায়ুতে রাখিয়া দিলে আর্দ্রতা ও তাপ প্রভাবে ঐ সকল দ্রব্যের উপাদান সম্পূর্ণরূপে অন্য দ্রব্যে পরিণত হয়। ইহাতে বায়ুর অম্লজান শোষণ করিয়া উহার অঙ্গার ভাগ অঙ্গারাম্ল বাষ্পে পরিবর্ত্তিত ও জলজান বাষ্প জলাকারে পরিণত হয়। এ ভিন্ন জলজান বাষ্প, ফস্‌ফরাস্‌, গন্ধক ও অঙ্গার প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া এক প্রকার বিষাক্ত দুর্গন্ধ বাষ্প প্রস্তুত হয়। যবক্ষারজান ও জলজান বাষ্প মিলিত হইয়া এমোনিয়া বাষ্প প্রস্তুত হয়। এই সকল কারণেই উক্ত দ্রব্যে তীব্র দুর্গন্ধ হয়। এই সকল বাষ্প ক্রমে ক্রমে বায়ুর সহিত সূক্ষ্মাণুরূপে দূরীভূত হইলে এক প্রকার লঘু কাল দ্রব্য অবশিষ্ট থাকে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাও মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া যায়। যেমন—কোন পশু পক্ষী মরিয়া কোন খোলা স্থানে পড়িয়া থাকিলে তথায় প্রথমে অতি তীব্র দুর্গন্ধ হয় কিছুদিন পর তথায় আর সেরূপ দুর্গন্ধ অনুভব হয় না।

কিছু ভাত যদি কোন খোলা হাড়িতে কয়েকদিন রাখা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় প্রথমে তাহার উপর একটী সাদা স্তর পড়িয়াছে তৎপরে তাহা দুর্গন্ধ যুক্ত হয় ও তাহাতে বড় বড় কীট দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ ভাতগুলি ক্রমে তরল হইয়া যায়। কিছুদিন পর ভাতেতে আর কীট দেখিতে পাওয়া যায় না তাহা শুষ্ক ও কালবর্ণে পরিবর্ত্তিত মাটীর ন্যায় পদার্থ রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দ্রব্যই এইরূপ জল, বায়ু, মৃত্তিকা প্রভৃতি পঞ্চভূতে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

পচন নিবারণের উপায়

(১) যবক্ষার জান যুক্ত রসপূর্ণ দ্রব্যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন—প্রাণী দেহের যবক্ষারজান যুক্ত দ্রব্যই প্রথমে পচিতে আরম্ভ হয়। আবার যবক্ষার জান দ্বারাই অণ্ড-লালিক পদার্থের অনেকাংশ প্রস্তুত হয়। এই অণ্ড-লাল সকল প্রাণিদেহে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। অণ্ড-লাল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ স্থানে রাখিলে সহজে পচিয়া যায়। এজন্য যে সকল উদ্ভিজ্জে অণ্ড-লালিক পদার্থ বিদ্যমান থাকে তাহারা শীঘ্র পচিয়া যায়। অণ্ড-লাল সংযত করিয়া রাখিলে সহজে পচিতে পারে না, কারণ উহার জলীয় অংশ পৃথক্ হইয়া যায় এবং পুনরায় তাহা জলে দ্রব হয় না। সেই কারণেই যে

সকল উপায়ে অণ্ড-লাল সংযত হয়, অথবা যে সকল পদার্থ উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া ঐ প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করে অথচ তাহা নিজেও পচনশীল নহে, সেই সকল উপায় ও সেই সকল দ্রব্যই পচন নিবারক।

শির্কা (ভিনিগার) লেবুর রস (সাইট্রিক এসিড) তেঁতুলের টক প্রভৃতি অম্ল দ্রব্যাদি ঐ শ্রেণীর। উহারা নিজে পচনশীল নহে এবং অণ্ড-লালের সহিত মিশ্রিত হইলে উহাকে সংযত করে। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্য যোগে খাদ্যদ্রব্যাদি (বিশেষতঃ যাহাতে অণ্ড-লালের ভাগ বেশী) মিলিত করিয়া রাখিলে তাহা অনেক দিন ভাল থাকে। অন্ন, ব্যঞ্জন, মাংস, মৎস্য, এবং আচার প্রভৃতি ঐ সকল দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত রাখিলে বহুকাল ভাল থাকে।

কতকগুলি কষায় দ্রব্য, যথা, খদির, বয়ড়া, হরীতকী, আমলীক, সুপারি, বাবলার ছাল, গাব, মাজুফল, ট্যানিক্ এসিড্, গ্যালিক্ এসিড, গঁদ (Gum) প্রভৃতি অণ্ড-লালের সহিত মিশ্রিত হইলে, তাহাকে কঠিন ভাবে সংযত করে এবং তাহা অদ্রবণীয় হয়। কিন্তু ইহার দ্বারা খাদ্যদ্রব্য এতই কঠিন ভাবে সংযত হয় যে, তাহা পাক রসে সহজে দ্রব হয় না। ইহা ব্যতীত ঐ সকল দ্রব্য অত্যন্ত সংকোচক বলিয়া দেহের অপকারী পদার্থ সকল, মল, মূত্র ও ঘর্ম্ম দ্বারা বহির্গত হইতে পারে না। সেজন্য ইহাদিগকে খাদ্যদ্রব্যের সংমিশ্রণে রাখিলে স্বাস্থ্যের হানি হয়।

সুরাসার (এল্‌কোহল), তার্পিণ তৈল, ক্রিয়োজোট, আলকাতরা প্রভৃতিও অণ্ড-লালকে সংযত করিতে পারে এবং তাহারা নিজেরাও পচন নিবারক ; কিন্তু ইহারা উগ্রবিষ ও তীব্র গন্ধ যুক্ত বলিয়া ইহাদের সহিত খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রক্ষা করা উচিত নহে।

লবণ ও নানাপ্রকার খনিজ পদার্থের কতকাংশ অণ্ড-লালের সহিত মিলিত হইয়া উহার কতক জলভাগ পৃথক্ করে এজন্য অণ্ড-লাল সংযত হয়। সেজন্য ধাতু ঘটিত লবণ ও খনিজ পদার্থ প্রবল পচন নিবারক না হইলেও তাহারা আংশিক পচন নিবারক। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে ফট্‌কিরি অণ্ড-লালের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে সংযত করে, এজন্য ফট্‌কিরি প্রবল পচন নিবারক কিন্তু ইহাকে খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত করা উচিত নহে কারণ ইহা প্রবল সংকোচক। সামান্য লবণ (যাহা

আমরা খাই) সোরা, নিশাদল, পটাশ টার্ট্রাস্ প্রভৃতি দ্রব্য কতকাংশে পচন নিবারক। ইহাদিগকে খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত করিলে কিছুক্ষণ খাদ্যদ্রব্য ভাল থাকে। সামান্য লবণের সহিত ফট্‌কিরি মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত রাখিলে অনেকক্ষণ ঐ খাদ্যদ্রব্য ভাল থাকে। ধাতব লবণগুলি সকলই বিষাক্ত সেজন্য তাহা খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত করিয়া রাখা উচিত নহে। তন্মধ্যে হিরাকস্ অল্প পরিমাণে খাদ্যদ্রব্যে মিশ্রিত করিলে তত ক্ষতি করিতে পারে না।

(২) **খাদ্যদ্রব্যের জল ভাগ অন্তর্হিত করা**—খাদ্য-দ্রব্যের জল ভাগ অন্তর্হিত করিতে পারিলে অথবা খাদ্যদ্রব্যের অণ্ড-লালিক পদার্থের জল ভাগ শুষ্ক করিয়া রাখিলে, তাহা দীর্ঘকাল ভাল থাকে। সেই জন্যই শুষ্ক পদার্থ পচে না। খাদ্যদ্রব্য প্রখর তাপে তৈলে কিম্বা ঘৃতে ভাজিয়া রাখিলে দীর্ঘকাল ভাল থাকে; কিন্তু তাহা অত্যন্ত গুরুপাক হয় ও তাহার তত পুষ্টিকারিতা গুণ থাকে না। তথাপি অনেক দ্রব্য ঐ অবস্থায় শুষ্ক করিয়া রাখা যাইতে পারে। মৃদু তাপে অথবা রৌদ্রেও খাদ্যদ্রব্য শুষ্ক করিয়া রাখা যাইতে পারে। এ প্রকারেও খাদ্যদ্রব্য অনেক দিন ভাল থাকে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে ১৪০ ফারেনহিট্ তাপে খাদ্যদ্রব্যের অণ্ড-লালিক পদার্থ সংযত না হইয়া শুষ্ক হইয়া যায়। এইরূপ তাপে দ্রব্যাদি শুষ্ক করিয়া রাখিলে বহুদিন পরেও ঐ দ্রব্য জলে বেশ দ্রব হয় এবং সদ্যঃ অবস্থায় ন্যায় সমুদায় সুঘ্রাণ প্রদান করে।

লবণ, চিনি, ও এল্‌কোহল, ইহারাও অত্যন্ত জল শোষক। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্য দ্বারা খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত রাখিলে, বহুদিন ভাল থাকে। লবণ যে বিলক্ষণ জলাকর্ষণ করে তাহা সকল গৃহস্থই বর্ষাকালের লবণ দেখিয়া বুঝিতে পারেন। বর্ষাকালে লবণ সাধারণতঃই ভিজা থাকে, শুষ্ক করিয়া রাখিলেও আবার তাহা জল হইয়া যায়; তাহার কারণ, লবণ বায়ুর জলীয় ভাগ অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করে। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য লবণ মিশ্রিত করিয়া রাখিলে খাদ্যদ্রব্যের জল ভাগ লবণ গ্রহণ করে।

লোণা জলে দ্রব্যাদি মগ্ন থাকিলে উহার অণ্ডলাল কতক জল ত্যাগ করে; যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, লোণা জলে মগ্ন থাকাতে একদিকে লবণ জল ভাগ

ক্রমশঃ আকর্ষণ করে ও অন্য দিকে ভূ বায়ুর অম্লজানের গতি বন্ধ করাতে লোণা দ্রব্য শীঘ্র পচিতে পারে না। মৎস্য ও মাংসে লবণ মাখাইয়া রাখিলে উহার জল ভাগ অন্তর্হৃত হইয়া শক্ত হয়, সুতরাং তাহারা অনেক দিন ভাল থাকে। সেই জন্যই লোণা মৎস্য আমাদের দেশ হইতে আসাম, শ্রীহট্ট, রংপুর, দিনাজপুর ও সুদূর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে বিক্রীত হইয়া থাকে। যদিও বর্ত্তমান সময়ে রেল কোম্পানির অনুগ্রহে বরফ মণ্ডিত মৎস্যই এক্ষণে সকল স্থানে অধিক পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে তথাপি তৎতৎ দেশবাসিগণ এখনও ঐ লোণা মৎস্যের আদর করিয়া থাকেন। লবণ সহজ প্রাপ্য ও অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। ইহা বিষাক্তও নহে অথচ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। সুতরাং খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষা করিতে হইলে লবণ মিশ্রিত করিয়া রাখা মন্দ নহে।

চিনিও জল শোষণ বিষয়ে লবণের সমকক্ষ না হইলেও নিতান্ত কম নহে। চিনিও লবণের ন্যায় বর্ষাকালে কিম্বা শৈতশেঁতে স্থানে রাখিলে সহজে ভিজিয়া যায়, তাহার কারণ চিনি বায়ুর জলীয় ভাগ গ্রহণ করে। চিনি দ্রব্যাদির জল শোষণ করিয়া শর্করা পাক (সিরাপ) প্রস্তুত করে। এই শর্করার পাক মধ্যে দ্রব্যাদি মগ্ন থাকিলে, নির্ম্মল থাকে অথচ ভূ-বায়ুর অম্লজানের গতিরোধ করে। সেই জন্যই সন্দেশ, গজা, জিলাপি প্রভৃতি মিষ্টান্ন ও বেল, আম্র, হরীতকী ও আমলকী প্রভৃতির মোরব্বা চিনি সংযোগে প্রস্তুত হওয়াতে দীর্ঘকাল ভাল থাকে। এই কারণেই ডাক্তারী অনেক ঔষধ চিনি সহযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং সহজেই বোঝা গেল যে, চিনি সংযোগে খাদ্যদ্রব্য অনেক দিন ভাল থাকে।

সুরাসার (এল্‌কোহল) দ্রব্যকে শুষ্ক করিয়া নির্ম্মল করতঃ উহার পচন নিবারণ করে। তদ্ব্যতীত ইহার নিজেরও পচন নিবারক গুণ আছে। সুরা মধ্যস্থ দ্রব্য বায়ুর অম্লজানের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পায় না। সুতরাং কোন দ্রব্য ইহাতে মগ্ন থাকিলে, সহজে পচিতে পারে না। কিন্তু ইহাতে খাদ্যদ্রব্যাদি মগ্ন রাখা কর্ত্তব্য নহে কারণ ইহার সংযোগে খাদ্যদ্রব্যের গুণের অনেক পরিবর্ত্তন হয় ও অণ্ড-লালিক পদার্থ এত কঠিন হয় যে, তাহা সহজে পাক রসে পরিপাক হয় না। ইহা ব্যতীত দ্রব্যের পুষ্টিকারিতাও অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়, যাহা হউক

তথাপি সুরা দ্রব্য সংরক্ষা বিষয়ে বেশ উপযোগী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ খাদ্য সুরাতে মগ্ন করিয়া রাখিলে প্রায় সদ্য অবস্থায় থাকে। ডাক্তারী অনেক ঔষধ বিশেষতঃ অরিষ্ট (টিংচার) ঔষধ মাত্রই ইহার দ্বারা সংরক্ষা করা হইয়া থাকে।

প্রাণিজ বস্তু সম্পূর্ণ শুষ্ক অঙ্গার চূর্ণ অথবা বালুতে মাখাইয়া, বায়ুতে রাখিয়া শুষ্ক করিলে, অনেক দিন ভাল থাকে।

(৩) শৈত্য প্রয়োগ—শৈত্য প্রয়োগ দ্বারাও খাদ্যদ্রব্য অনেক সময় ভাল থাকে। খাদ্যদ্রব্য বরফ মধ্যে রাখিলে অনেকক্ষণ ভাল থাকে। এরূপ অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য প্রায় এক পক্ষ কাল ভাল থাকে। অধুনা বরফ দ্বারা মৎস্যাদি অনেক স্থলেই রেলযোগে প্রেরিত হইয়া থাকে। পাড়াগাঁয়ে গৃহস্থের বরফ পাওয়া কঠিন। তাহাদের পক্ষে শীতল জলের উপর অথবা শীতল স্থানে খাদ্যদ্রব্য রক্ষা করা মন্দ নহে তাহাতেও ঐ সকল দ্রব্য অনেক সময় ভাল থাকিতে পারে।

(৪) তাপ প্রয়োগ—তাপ প্রয়োগ দ্বারা বায়ুর অম্লজান পৃথক করিতে পারিলে খাদ্যদ্রব্যাদি দীর্ঘকাল ভাল রাখা যাইতে পারে।

কোন পাত্রে খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া তাহাতে তাপ দিলে পাত্রস্থ বায়ু প্রসারিত হইয়া কতকটা অন্তর্হত হয়। ঐ সময় সেই পাত্রের মুখ আবদ্ধ করিলে, বাহিরের বায়ু আর ভিতরে যাইতে পারে না। আর ভিতরে যে অল্প পরিমাণে বায়ু আবদ্ধ থাকে তাহা পাত্র মধ্যস্থ দ্রব্যের সারাংশের সহিত স্থায়ী ভাবে মিলিত হইয়া যায় সুতরাং আর পচন উৎপন্ন হয় না। এই ভাবে অনেক প্রকার খাদ্যদ্রব্যের সংরক্ষা করা যায়।

খাদ্যদ্রব্যের পাত্রে অল্প পরিমাণ গন্ধক কিম্বা ফস্‌ফরাস্ দগ্ধ করিলে ঐ পাত্রের অম্লজান নষ্ট হইয়া যায়, এই অবস্থায় পাত্রটী বায়ু রোধ ভাবে বন্ধ করিলে ঐ দ্রব্য দীর্ঘকাল ভাল থাকে।

খাদ্যদ্রব্যের পাত্র মধ্যে চাপ দ্বারা অঙ্গারাম্ল বাষ্প প্রবিষ্ট করাইলে অথবা তৈল, সিরাপ, গ্লিশারিণ, সুরা প্রভৃতি দ্বারা পাত্র পূর্ণ করিয়া বায়ুরোধ ভাবে রাখিলে, ভূ বায়ুর অম্লজান পচন উৎপাদন করিতে পারে না।

এমোনিয়া বাষ্প অথবা গন্ধক পোড়াইলে যে বাষ্প হয় সেই বাষ্পে মাংসাদি রাখিলে দীর্ঘকাল ভাল থাকে।

সদ্য অঙ্গার চূর্ণ মধ্যে মৎস্য মাংস থাকিলে পচিতে পারে না। তাহার কারণ অঙ্গার চূর্ণ ঐ দ্রব্যের চারি ধারে থাকাতে ভূ বায়ুর অম্লজানকে আকর্ষণ করিয়া ঘনীভূত ভাবে রাখে এজন্য বায়ুর অম্লজান অঙ্গার চূর্ণ ভেদ করিয়া দ্রব্যাদির পচন উৎপাদন করিতে পারে না।

পরবর্ত্তি-প্রবন্ধে কোন কোন খাদ্যদ্রব্য কি উপায়ে রাখিলে দীর্ঘকাল ভাল থাকে সে বিষয়ে আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা।

ডাক্তার শ্রীসত্যশরণ চক্রবর্ত্তী, এম, বি, লিখিত—

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অজ্ঞান অবস্থা এবং ফিট্।

কোন ব্যক্তিকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের জন্য লোক পাঠাইবে ও চিকিৎসক আসিবার পূর্ব্বে গলার ও গায়ের সমস্ত আঁট কাপড় চোপড় খুলিয়া ফেলিবে। সকল প্রকার অজ্ঞান অবস্থা ও ফিটে এই দুইটী কার্য্য প্রথমেই করা উচিত। তাহার পর শরীর কি অবস্থায় আছে, কাপড় চোপড় কি অবস্থায় আছে অর্থাৎ ছিঁড়িয়া গিয়াছে কিম্বা এলোমেলো হইয়া গিয়াছে, আর চারিদিকের অবস্থা কিরূপ এইগুলি দেখিবে। রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইতে হইবে ও হস্তদ্বয় উভয় পার্শ্বে সমান ভাবে রাখিবে এবং পদদ্বয় সোজা করিয়া ছড়াইয়া দিবে।

অজ্ঞান রোগী পরীক্ষা—মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়া দেখিবে কোন ফুলা, বসা, কাটা, ছেঁড়া অথবা ফাটা আছে কি না। মুখ রাঙ্গা কি ফেকাসে তাহা দেখিবে। চক্ষু ছুইলে নড়ে কি না দেখিবে। চক্ষের মণি দুইটী

সমান ভাবে ছোট কি বড়, অথবা একটী ছোট, একটী বড় কি না তাহা দেখিবে। আলোর কম বেশীতে চোখের মণির কোনও পরিবর্ত্তন হয় কি না দেখিবে। নিশ্বাস প্রশ্বাস কিরূপ দেখিবে, অর্থাৎ নিশ্বাস ফেলিতে ও লইতে যাতনা হইতেছে বা আটকাইয়া যাইতেছে কি না, শীঘ্র শীঘ্র সামান্য ভাবে বহিতেছে কি না, ধীরে ধীরে এবং অনেক কষ্টে বহিতেছে কি না, শব্দ হইতেছে এবং নিশ্বাস ফেলিবার সময় গাল ফুলিয়া উঠিতেছে কি না দেখিবে। কান দিয়া রক্ত ও জল পড়িতেছে কি না এবং চোখ, নাক এবং মুখ দিয়া রক্ত পড়িতেছে কি না দেখিবে। খুব সাবধানে এবং আস্তে আস্তে দেখিবে পাঁজর ভাঙ্গিয়াছে কি না, আর ফুস্ফুস্ হইতে রক্ত পড়িতেছে কি না। প্রত্যেক অঙ্গ ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে দেখিবে কোন হাড় ভাঙ্গিয়াছে কি না।

অজ্ঞান অবস্থার চিকিৎসা—যদি রক্ত পড়িতে থাকে বন্ধ করিবে। যথেষ্ট বায়ু যাহাতে আসিতে পারে তাহার উপায় করিবে। যদি রাস্তায় এই ঘটনা হয় তবে লোকের ভিড় সরাইয়া দিবে, আর যদি বাটীর ভিতর হয় তবে সব দরজা জানালা খুলিয়া দিবে। যদি মুখ লাল দেখ তবে মাথা বালিসের উপর অথবা আপনার হাঁটুর উপর রাখিবে। কিন্তু মাথা উঁচু করিতে গিয়া দেখিও যেন চোয়াল বুকের দিকে ঝুলিয়া না পড়ে; কেননা তাহা হইলে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এপোপ্লেক্সি (Apoplexy) বা এপিলেপ্সি (Epilepsy) হইলে মাথা বেশী ঝুলাইয়া দিবে না। যদি মুখ ফেকাসে দেখ তবে মাথা শরীরের সমান কি একটু নীচু করিয়া রাখিবে। এমন করিয়া মাথা উঁচু বা নীচু করিবে যেন শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত না হয়। রোগী যতক্ষণ না গিলিতে পারে ততক্ষণ মুখে কিছু দিবে না কারণ গিলিতে না পারিলে গলায় শ্বাস প্রশ্বাসের পথে উহা আটকাইয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। যখন গিলিতে পারিবে খুব সাবধানে দেখিবে যাহা খাইতে দিতেছ তাহা খাইতে দিবার উপযুক্ত কি না। রোগী যখন নিশ্বাস ফেলিবে, তাহা শুঁকিয়া দেখিবে কোনও মাদক দ্রব্য বা ঔষধের গন্ধ আছে কি না।

মূর্চ্ছার লক্ষণাদি—যদি দেখ মুখ অত্যন্ত ফ্যাকাসে, ঠাণ্ডা, ঘাম হইতেছে (গায়ে হাত দিলেই বুঝিবে), অল্প অল্প নিশ্বাস বহিতেছে, নাড়ী ক্ষীণ, চক্ষের দুইটী মণিই সমভাবে অল্প বড় হইয়াছে, বুকের শব্দ খুব অল্প তবে জানিবে মূর্চ্ছা হইবার সম্ভাবনা। তখন সমস্ত আঁট কাপড় চোপড় খুলিয়া দাও, মাথা সামনের দিকে দুই হাঁটুর মধ্যে নোয়াইয়া দাও, অথবা খোলা বাতাসে লইয়া যাও; এরূপে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া দাও যে মাথা যেন নীচে থাকে; মুখে ঠাণ্ডা জলের ছিটা দাও, স্মেলিং সল্ট (Smelling salt) নাকের কাছে ধর বা নাকে নস্য দাও, উত্তেজক ঔষধ দাও এবং আবশ্যক হয় ত কৃত্রিম শ্বাসের ব্যবস্থা কর।

এপোপ্লেক্সি বা সন্ন্যাস রোগ, ও তাহার চিকিৎসা—যদি দেখ রোগী হঠাৎ কিম্বা আস্তে আস্তে অজ্ঞান হইয়া পড়িল, মুখ লাল, নাক ডাকিতেছে ও নিশ্বাস ফেলিবার সময় গাল ফুলিয়া উঠিতেছে (ফুঁ দিবার মত) চক্ষের মণি একটী অপরটী অপেক্ষা বড় হইয়াছে, কোন অঙ্গ সঞ্চালনে ক্ষমতা নাই এবং মাংসপেশী সঙ্কুচিত হইতেছে (Muscular spasm) তবে তাহা এপোপ্লেক্সি (Apoplexy) জানিবে। তখন রোগীকে শোয়াইয়া দিবে, সমস্ত কাপড় চোপড় ঢিলা করিয়া দিবে, মাথা উঁচু করিয়া রাখিবে, মাথায় বরফ অভাবে ঠাণ্ডা জল এবং পায়ে গরম জল দিতে থাকিবে এবং যত শীঘ্র পার ডাক্তার আনাইবে। যাহাতে বমি হয় এমন কোনও ঔষধ দিবে না। কোনও মাদক দ্রব্য যথা ব্রাণ্ডি, হুইস্কি, মদ ইত্যাদি কখনও খাইতে দিবে না, আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত না রোগী গিলিতে পারিবে ততক্ষণ মুখে কিছুই দিবে না।

মৃগীরোগ—যদি দেখ রোগী হঠাৎ চিৎকার করিতেছে মুখে ফেনা কাটিতেছে, জিব কামড়াইতেছে মুখের, ঘাড়ের ও গায়ের মাংসপেশীর আক্ষেপ হইতেছে, মুখ রক্তবর্ণ, ঘাড়ের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে, চক্ষে হাত দিলে নড়ে না, চক্ষের সাদা ভাগ রক্তবর্ণ, সম্পূর্ণ অথবা কিয়ৎ পরিমাণ অজ্ঞানাবস্থা ও তাহার পর গাঢ় নিদ্রা কিন্তু কিছু পরেই জাগিয়া ভেবাচেকা লাগিতেছে এবং কি কি হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছে তবে জানিও যে এপিলেপ্সি কিংবা মৃগী (Epilepsy) হইয়াছে। তখন

গায়ের এবং গলার সমস্ত আঁট কাপড় খুলিয়া ফেলিবে, মাথা উঁচু করিয়া শোয়াইয়া দিবে, যাহাতে জিব কামড়াইয়া যাইতে না পারে সেজন্য দুই চোয়ালের মধ্যে কাপড় পুরিয়া দিবে, শরীরের আক্ষেপের সময় যাহাতে আঘাত না লাগে তাহা দেখিবে, যতক্ষণ ফিট্ থাকে রোগীকে ঘুমাইতে দিবে, কি হইল তাহা তাহার নিকট কিছুই বলিবে না এবং শীঘ্র ডাক্তার আনাইবে। দুষ্ট লোকে মিছামিছি কখন কখন এপিলেপ্সি (Epilepsy) ফিট্ হইয়াছে বলিয়া ভান করে। কিন্তু রোগীর পূর্ব্বাবস্থা, এবং যে স্থানে রহিয়াছে সেখানে থাকিলে বিপদ ও দুরবস্থা হইবে ইহা জানিয়াও, সেখানে রহিয়াছে, চিমটী কাটিলে সাড়া নাই ইত্যাদি লক্ষণ, বিদ্যমান থাকিলে রোগ সত্য বলিয়া জানিবে। আর যদি দেখ লোকটার চরিত্র ভাল নয়, যেখানে অনেক লোক আসিয়া তাহার সহানুভূতি করিতে পারে এরূপ স্থলে রহিয়াছে, চক্ষে হাত দিলে নড়ে, চক্ষু অল্প খুলিয়া চারিদিকে লোকে কি করে দেখিতেছে, মুখে ফেনা রহিয়াছে কিন্তু ঐ ফেনা হাতে লইয়া একটু ঘসিলে স্পষ্ট সাবানের ফেনার মত হয়, জোরে চিমটী কাটিলে সহ্য করিতে পারে না—তবে মিছামিছি রোগের ভান জানিবে।

হিষ্টিরিয়া—যদি দেখ রোগী শরীর ও মাথা নাড়িতে নাড়িতে হঠাৎ কিন্তু সাবধানে প'ড়িয়া গেল, চক্ষু অসাড় নহে, ঠিক অজ্ঞান নহে, কিম্বা যদি উত্তেজিত হইয়া হাসিতে ও গাহিতে থাকে, এদিক ওদিক হাত ছুড়িতে থাকে, বোধ হইতেছে যেন খেঁচিতেছে এবং চারিদিকে কি রহিয়াছে জানিতে পারিতেছে না তাহা হইলে ইহা হিষ্টিরিয়া বলিয়া জানিবে। এরূপ অবস্থায় সমস্ত কাপড় আল্‌গা করিয়া দাও, শরীর ঠাণ্ডা জলে বেশ করিয়া ধুইয়া দাও, এবং এরূপ ভাবে শুশ্রূষা কর যাহাতে সে না জানিতে পারে যে লোকে তাহার প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। এইরূপ করিলেই শীঘ্র রোগীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে।

মাতাল অবস্থা—যদি রোগীকে কতক অজ্ঞান অবস্থায় দেখ, তাহাকে জাগান যাইতে পারে, মুখে ও নিশ্বাসে মদের গন্ধ থাকে, চক্ষের মণি দুইটী সমভাবে অল্প বড় হইয়াছে, চক্ষু ছুঁইলে অল্প নড়ে, টেম্পারেচার ৯৬° কি ৯৭°, নাড়ী বলবতী, খেঁচুনি নাই, কান দিয়া যদি রক্ত ও জল না পড়ে, কোন আঁচড় কি কাটা

না থাকে তবে রোগীকে মাতাল বলিয়া জানিবে। অধিক মাতাল হইলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। এরূপ অবস্থায় কাপড় আল্‌গা করিয়া দাও, বেশ বায়ুর সঞ্চালন হয় এরূপ কর ও রোগীকে এরূপ ভাবে রাখ যাহাতে সহজে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতে পারে। রোগীকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া ঢাকিয়া রাখ, গরম জলের বোতল ব্যবহার কর এবং গা ঘসিয়া দাও ও এই সকল উপায়ে রোগীকে গরমে রাখ। যদি জাগান সম্ভব হয় তবে চা কিম্বা কফি খাইতে দাও। যদি নাড়ী বেশ বলবতী থাকে তবে বমি করাইবার জন্য মাষ্টার্ড (রাই সরিসার গুঁড়া) ও অল্প গরম জল খাওয়াও। বমি হইয়া গেলে চা, মাংসের ঝোল, প্রভৃতি বলকারক দ্রব্য খাইতে দাও। মাতালকে লইয়া দৌড়ান বা ঠাণ্ডা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা উচিত নয়। মুখে মদের গন্ধ ও অজ্ঞান অবস্থা দেখিলেই রোগীকে মাতাল বলিয়া স্থির করিও না। অত্যন্ত মাতাল ব্যক্তিকে সহজে জাগাইতে হইলে জোরে তাহার কান মালিষ করিয়া দাও; কিন্তু সাবধান রোগীর পিছনে থাকিও কারণ জ্ঞান হইলে সে তোমায় মারিতে পারে।

আফিং খাওয়া—যদি কোনও ব্যক্তিকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখ এবং মুখে আফিমের গন্ধ এবং উভয় চক্ষের মণিই অতি ক্ষুদ্র হয়, তবে খুব সম্ভব আফিং খাইয়াছে জানিও।

যদি কোনও ব্যক্তিকে মদের দোকান হইতে বাহির হইতে দেখ এবং জান যে সে বড় বেশী মদ খায়, যদি দেখ টলিয়া পড়িয়া গেল এবং নিকটে গিয়া দেখ অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে, মুখে খুব মদের গন্ধ থাকিলেও যদি একটী চক্ষের মণি অপর চক্ষের মণি অপেক্ষা অধিক বড় দেখায় তাহা হইলে সম্ভবতঃ এপোপ্লেক্সি (Apoplexy) হইয়াছে জানিবে।

এপোপ্লেক্সি (Apoplexy) ও মত্ততায় প্রভেদ এই যে—(১) এপোপ্লেক্সি প্রায়ই অধিক বয়স হইলে হয় কিন্তু সকল বয়সের লোকেই মাতাল হইতে পারে। (২) মুখে কি নিশ্বাসে মদের গন্ধ না থাকিলে এপোপ্লেক্সি জানিবে। (৩) এপোপ্লেক্সি রোগে চক্ষুর মণি দুইটী প্রায়ই অসমান ও স্থির হয় কিন্তু মাতাল হইলে মণিদ্বয় সমান থাকে এবং আলোকের কম বেশীতে তাহাদের আকারের পরিবর্ত্তন হয়। (৪) এপোপ্লেক্সি রোগে নাড়ী বলবতী থাকে কিন্তু মাতাল হইলে নাড়ী

ক্ষীণ হয় বা কখন কখন নাড়ী একেবারে অনুভূত হয় না। (৫) এপোপ্লেক্সি রোগে মুখ রক্তবর্ণ হয় কিন্তু মাতাল হইলে মুখ ফেকাসে দেখায় ও শিঁটকাইয়া যায়। (৬) এপোপ্লেক্সি রোগে টেম্পারেচার স্বাভাবিকের অনেক উপরে হয় কিন্তু মত্ততাবস্থায় স্বাভাবিকের অনেক কম হয়।

যদি কোন রোগীর মুখ বিবর্ণ (ফেকাসে) ও চোপসান, চক্ষু নিস্তেজ, নাড়ী প্রায় নাই বলিলে হয়, অতি অল্প অল্প শ্বাস বহিতেছে দেখ তাহা হইলে Shock 'শক্' বলিয়া জানিবে। প্রহার, দুঃখ, বজ্রাঘাত, অস্ত্রোপচার কিম্বা তাহার ভয়, অর্থাৎ যে কোন কারণে স্নায়ুমণ্ডলীতে হঠাৎ অধিক অবসাদ আনয়ন করে তাহাই এই অবস্থার কারণ।

যদি কোনও ব্যক্তিকে ভূমিতে স্থির ভাবে ও অজ্ঞান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, যদি উভয় চক্ষের মণিই সমান ভাবে বড় হইয়া থাকে, শরীরের উপরিভাগ ফেকাসে ও শীতল, নাড়ী ক্ষীণ, নিশ্বাস প্রশ্বাস ধীরে ধীরে এবং দীর্ঘ নিশ্বাসের মত বহিতেছে ও তদ্ব্যতীত যদি মাথায় ক্ষত চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে মস্তিষ্কের বিকম্পন হইয়াছে জানিবে। যদি মস্তিষ্কের সামান্য বিকম্পন হয় তাহা হইলে আহত ব্যক্তিকে উঠাইলে প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর দিয়া আবার অজ্ঞান হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ অস্থির হয়, বমি করে এবং পরে সুস্থ হয়। কিন্তু তথাপি কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত ভ্যাবাচাকা লাগিয়া থাকে, যা তা কথা কহিতে থাকে এবং প্রায়ই অতীত ঘটনার কথা স্পষ্ট স্মরণ থাকে না। যদি গুরুতর বিকম্পন হয় তাহা হইলে উল্লিখিত খারাপ অবস্থা অধিকতর প্রকাশ পায় এবং সে সময়ে চিকিৎসকের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। এইরূপে আহত ব্যক্তিকে চিৎ করিয়া, মাথা অল্প তুলিয়া শোওয়াইবে, অন্ধকার ও নিস্তব্ধ ঘরে রাখিবে; মাথা শীতল এবং শরীরের উপরিভাগ ও হাত পায় অগ্রভাগ গরম রাখিবে এবং চিকিৎসক আনিতে পাঠাইবে।

যদি কোনও ব্যক্তির এপোপ্লেক্সি (Apoplexy) লক্ষণ দেখিতে পাও, কিন্তু চক্ষু বা নাসিকা হইতে রক্ত পড়িতে থাকে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ মাথার খুলির নিম্নভাগ ভঙ্গিয়াছে জানিও; এবং যদি তাহা হয় অথবা যদি দেখ মাথার হাড় চূর্ণ হইয়া মস্তিষ্কের দুই এক স্থানে চাপিয়া রহিয়াছে তাহা হইলে এপোপ্লেক্সি (Apoplexy) রোগে যাহা করিতে হয় তাহাই করিবে ও শীঘ্র ডাক্তার ডাকিবে।

Shock (শক্) লাগিলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা যায়।—

মুখে ভয়ের চিহ্ন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা দেহের কোন মর্ম্ম স্থানে দারুণ আঘাত। রেল সংঘর্ষণে সমস্ত দেহ আলোড়িত ও শরীরের কোন স্থান আহত হইলে সমগ্র শরীর শীতল অনুভূত হয়। রোগী কাঁপিতে থাকে এবং বলে যে শীত করিতেছে ; তাহার জ্ঞান থাকা হেতু মস্তিষ্কে কোন আঘাত লাগে নাই বুঝিতে পারা যায়। টেম্পারেচার নরমালের (Normal) অনেক নিচে থাকে। এই প্রকার অবস্থায় টেম্পারেচার কমিয়া এবং নাড়ী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া (Depression) কখন কখন মারা যাইবার সম্ভাবনা। টেম্পারেচার বাড়াইতে ও নাড়ী সতেজ করিতে যথা সাধ্য চেষ্টা করিবে। উত্তেজক ঔষধ ও পুষ্টিকারক খাদ্য দিবে এবং শরীর বেশ করিয়া গরম কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। যদি পার গরম জলের বোতলের সেক দিবে এবং বুকে হাঁটুতে ও পায়ের তলায় রাইয়ের (Mustard) পটী দিবে।

সর্দ্দিগর্ম্মিতে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।—

অনুসন্ধানে জানিতে পারা যায় যে রোগী অনেকক্ষণ ধরিয়া অধিক গরম স্থানে ছিল। রোগী হঠাৎ পীড়িত হইয়া, মূর্চ্ছা যাইবার মত হয়, মাথা ঘোরে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ করে। প্রায়ই পিপাসা থাকে, চর্ম্ম শুষ্ক ও অতিশয় গরম, মুখ রক্তবর্ণ এবং নাড়ী দ্রুত হয়। নাক ডাকিয়া নিশ্বাস পড়িতে থাকে ও রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং শেষে ধাত ছাড়িয়া যাইতে পারে।

সর্দ্দিগর্ম্মির চিকিৎসা—সর্দ্দিগর্ম্মি হইলে রোগীকে তৎক্ষণাৎ শীতল ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিবে, মাথায় মুখে শীতল জল দিতে থাকিবে, শরীর সমান ভাবে রাখিয়া মাথা বেশ উঁচু করিয়া রাখিবে, গলা ও বুক হইতে সমস্ত আঁট কাপড় আল্গা করিয়া দিবে, কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া মাথায় ও শিরদাঁড়ায় বরফের থলি ও ঠাণ্ডা জল দিতে থাকিবে এবং গিলিতে পারিলে ঠাণ্ডা জল খাইতে দিবে। উত্তেজক ঔষধ খাইতে দিবে না। কাহাকেও অচেতনাবস্থায় দেখিলেই ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইবে এবং গলার ও শরীরের টাইটকাপড় আল্গা করিয়া

দিবে। বিষ খাওয়া সন্দেহে যদি বমি করাইতে হয় তবে গলায় পাখীর পালক কিম্বা আঙ্গুল দিয়া সুড়সুড়ী দিবে অথবা বমন কারক ঔষধ যথা, রাই বড় এক চামচ ও একগ্লাস গরম জল, লবণ বড় এক চামচ ও গরম জল একগ্লাস ইত্যাদি খাইতে দিবে। ঔষধ দিবার পর যে পর্য্যন্ত না বমি হয় ততক্ষণ অল্প গরম জল প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে।

গোধূম।

পরিচয় ও রাসায়নিক উপাদান। গোধূম হইতে উৎপন্ন খাদ্যাদি এবং তাহাদের পুষ্টিকারিতা ও পরিপাক সম্বন্ধে বিচার।

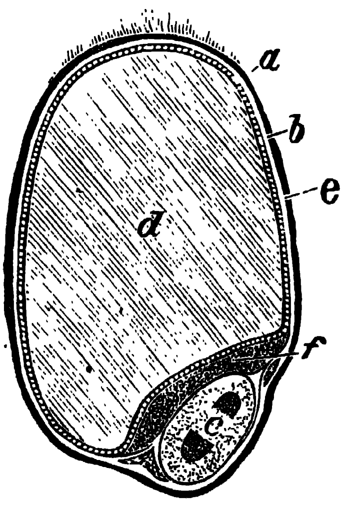
অতি প্রাচীন কাল হইতে গোধূম খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাচীন শাস্ত্র ঋগ্বেদে গোধূমের উল্লেখ দেখা যায়। খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৭০০ অব্দে চীনদেশে গোধূম উৎপন্ন হইত এইরূপও প্রমাণ পাওয়া যায়।

আঙ্গার সাহেব খৃষ্ট পূর্ব্বে ৩৩৫৯ অব্দে প্রস্তুত ইজিপ্ত দেশীয় পিরামিডের একখানি ইষ্টকেরমধ্যে একটী ছোট আকারের গোধূম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গোধূম গাছ প্রথমে কোথায় কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহার প্রকৃত বিবরণ জানিতে পারা যায় না। পৃথিবীর কোন স্থানের অরণ্যে কখনও গোধূমের গাছ আপনা হইতে জন্মিতে দেখা গিয়াছিল এ যাবৎ এরূপ কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বর্ত্তমানে গোধূম গাছ চাষের দ্বারা উৎপন্ন হয়। যতদূর জানা যায় গোধূম এশিয়া দেশেই প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল।

ডাক্তার ওয়াটসন্ ভারতীয় গোধূমকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) শ্বেত নরম, (২) শ্বেত কঠিন, (৩) লোহিত নরম ও (৪) লোহিত কঠিন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে তিন প্রকার গোধূমের উল্লেখ দেখা যায় (১) মহা গোধূম (বড়) (২) মাধূলি (ছোট) ও (৩) নিশুকি (যার রোঁয়া নাই)।

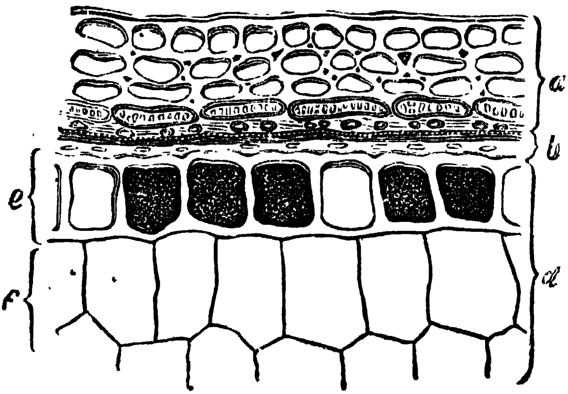
উত্তর ভারতে সাধারণতঃ নরম এবং দক্ষিণ ভারতে শক্ত গোধূম জন্মাইয়া থাকে। যুক্ত প্রদেশে ও বিহারে সাদা নরম জাতীয় গোধূমের চাষ হয় কিন্তু পাঞ্জাবে লোহিত নরম জাতীয় গোধূম উৎপন্ন হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্য, বেরার প্রদেশ, এবং বঙ্গের কতক অংশে প্রধানতঃ শ্বেত শক্ত গোধূমের চাষ হইয়া থাকে। লোহিত শক্ত গোধূম ভারতের সর্ব্ব দক্ষিণেও জন্মায়, নিম্ন বঙ্গ, উড়িষ্যা এবং ব্রহ্মদেশে কেবলমাত্র এই প্রকার গোধূমের চাষ হয়। বোম্বাই প্রদেশের অনেক স্থানে, মহীশূরের দক্ষিণে এবং মান্দ্রাজেও শক্ত গোধূম জন্মায়। বঙ্গের শ্বেত নরম গোধূমকে "দুধে" লাল নরমকে "জামালি" ধূসরবর্ণ শক্তকে "গঙ্গাজলী" এবং লাল শক্তকে "খেড়ি" বলে। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার Handbook on Indian Agriculture নামক পুস্তকে "Piusa" এবং "Nanbia" নামক আরও দুই প্রকার গোধূমের উল্লেখ করিয়াছেন।



(২) লম্বালম্বিভাবে কাটা গোধূম।

(*a*) ছাল, ও টিষ্টা। (*b*) পাতলা আবরণ। (*c*) জারম্। (*d*) শ্বেতসার পূর্ণ কোষসমূহ। (*e*) স্কুটেলম (ইহা জারম্ ও শ্বেতসারকে সংযুক্ত রাখে)।

গোধুমের গঠন—গোধূম ছোট বাদামী আকারের। ডাঁটা হইতে ইহাকে সহজেই পৃথক করা যায়। গোধূমকে লম্বা লম্বিভাবে খুব পাতলা করিয়া কাটিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিলে নিম্নলিখিত অংশ সমূহ দেখা যায়।

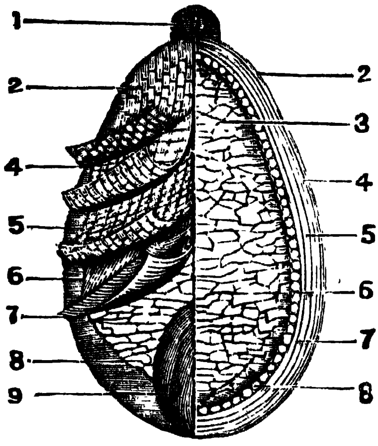


(২) গমের কোষময় গঠন।

(*a.b*) ভুষির বাহিরের দুই স্তর। (*e*) এলুরোন স্তর। (*f*) শ্বেতসারপূর্ণ কোষসমূহ।

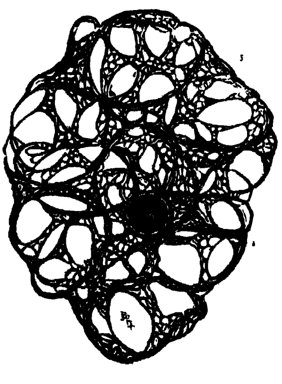
(ক) Bran—ইহা গমের বহিরাবরণ। এই আবরণ ৫টী স্তরে বিভক্ত। ইহার মধ্যে বাহিরের ৩টী হইতে গমের ভুষি হয়। বাকি দুইটী স্তর ভিতরস্থিত শস্যকে আবৃত করিয়া থাকে। এই দুই স্তরের বাহিরেরটীকে টিষ্টা বলে। ইহার জন্য গমের আটাতে রং হয়। গমের ভূষির ওজন সমগ্র গমের ২০ ভাগের ১ ভাগ।

(খ) Aleurone layer—ভুষির পরবর্ত্তী স্তরকে "এলুরোণ" স্তর বলে। ইহা ওজনে সমগ্র শস্যের ১০০ ভাগের ৮ ভাগ।

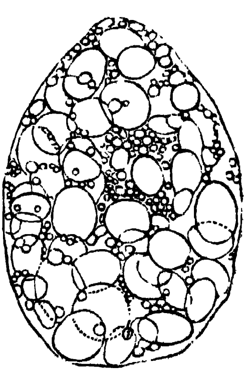


(১) রোঁয়া। (২) বহিরাবরণ। (৩) শ্বেতসার কোষ। (৪,৫,৬) মধ্যস্থিত আবরণ সমূহ। (৭) সর্ব্বনিম্ন আবরণ। (৮) এলুরোন স্তর। (৯) জায়ম্ বা গম বীজ।

(গ) **শ্বেতসার**—এলুরোন স্তরের নিম্নস্থ ভাগ বহুসংখ্যক কোষ দ্বারা গঠিত এই সমস্ত কোষ শ্বেতসার বা ময়দায় পূর্ণ। এই শ্বেতসারের সহিত কিয়ৎ পরিমাণ গ্লুটেন নামক ময়দার আমিষ জাতীয় উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়।



(৪)



(৫)

৪ চিত্রে শ্বেতসার কোষের গঠন ও ৫ চিত্রে তন্মধ্যস্থিত শ্বেতসার দেখান হইয়াছে।
শ্বেতসার কণার আকৃতি নানাপ্রকার।
একটী গমে অন্যূন দুইকোটী শ্বেতসার কণা দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঘ) The Germ or Embryo—জারম্ গোধূমের নিম্নভাগে অবস্থিত এবং শ্বেতসারে আবৃত। ইহা ওজনে সমগ্র গমের ৫০ ভাগের ১ ভাগ। গমবীজ সম্যক পুষ্ট হইলে ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িলে ইহা হইতে চারা উৎপন্ন হয়।

জারম্ প্রধানতঃ আমিষ ও স্নেহ জাতীয় উপাদানে গঠিত। "এলুরোণ" স্তরে প্রোটিড ও অতি অল্প পরিমাণ সেলুলোজ থাকে। ভূষির উপরের স্তরেই সেলুলোজের পরিমাণ অধিক। মনুষ্য ইহা পরিপাক করিতে পারে না। এই জন্য ভাল ময়দা হইতে ইহা সাধারণতঃ পৃথক রাখা হয়। কলওয়ালারা ভাল ময়দা প্রস্তুতের সময় এলুরোণের উপরিস্থিত স্তর সমূহ বাদ দিয়া থাকে। গম ভাঙ্গিবার সময় জারম্ অংশ চেপ্টাইয়া যায়, এজন্য ইহাকে সহজেই ময়দা হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। জারম্ অংশ ময়দার সহিত থাকিলে ময়দা অধিক পুষ্টিকর হয়। কিন্তু জারমে তৈলের ভাগ অধিক থাকে এবং জারমের পরিমাণ অধিক হইলে ময়দা খারাপ হয়। ইহা ব্যতীত জারমের দ্রবণীয় প্রটিড অংশ শ্বেতসারকে পরিবর্ত্তিত করে এবং রন্ধনের সময় ময়দার বর্ণ কাল করিয়া দেয়। এইরূপে ময়দার দামও কম হইয়া যায়।

ময়দার কলের প্রচলন হইবার পূর্ব্বে ভারতে গম হইতে ময়দা বাহির করিবার জন্য কেবল যাঁতা ব্যবহৃত হইত। এদেশে ময়দা করিবার জন্য গমকে পরিষ্কার করিয়া, পরে জলে ভিজাইয়া জল ঝরিবার জন্য সমস্ত রাত্রি রাখিয়া দেওয়া হয়। পরদিন প্রাতে সেই গম যাঁতায় ভাঙ্গা হয় এবং একটী মিহি চালনিতে চালিয়া মিহি ময়দা বাহির করা হয়। সময় সময় অবশিষ্ট অংশ পুনরায় গুঁড়া করিয়া, অপেক্ষাকৃত মোটা চালনিতে চালা হয়। এইরূপে আটা প্রস্তুত হয়। আটাতে ভূষির কতক অংশ থাকে। পরবর্ত্তী পরিত্যক্ত অংশে দানাদার সুজি ও ভূষি মিশ্রিত হইয়া বাহির হয়। এই মিশ্রিত পদার্থ হইতে কুলায় ঝাড়িয়া ভূষি ও সুজি পৃথক করা হয়। যে গমে গ্লুটেণের ভাগ অধিক তাহা হইতে ভাল সুজি পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানে ময়দার কলে নানাপ্রকার যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইতেছে এবং অনেক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ময়দা আটা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। কলে যাঁতার পরিবর্ত্তে লৌহ নির্ম্মিত রোলার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুইটী রোলার পাশাপাশি রাখিয়া ঘুরান হয়

এবং ইহাদের মধ্যস্থলে গম দেওয়া হয়। রোলারের চাপে গম ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যায়। রোলার দুইটী যত ঘন সন্নিবেশিত থাকিবে, গুঁড়া ততই মিহি হইবে। এই গুঁড়া গম, কলের দ্বারা চালিয়া লওয়া হয়।

বড় বড় রোলার মিলে দুই প্রকার প্রক্রিয়ায় গম ভাঙ্গা হয়। ১ম প্রক্রিয়ায় রোলার দুইটী যতদূর সম্ভব কাছা কাছি রাখা হয়, এবং গম একবার মাত্র ভাঙ্গা হইয়া থাকে। এইরূপে যে ময়দা পাওয়া যায় তাহাতে প্রায় গমের সকল অংশই থাকে। ইহাকে ইংরাজিতে Whole meal বলে।

২য় প্রক্রিয়ায় রোলার দুইটী কিছু ফাঁক করিয়া বসান হয়। প্রথমবার ভাঙ্গাতে গম হইতে কেবল মাত্র ভুষির ভাগ পৃথক হইয়া যায়। ভাঙ্গা গম চালিয়া লইয়া ভুষি পৃথক করা হয় এবং অবশিষ্ট ভাগ পুনরায় রোলারের মধ্যে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়বার ভাঙ্গিবার সময় যে রোলার ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যস্থ ফাঁক প্রথম বারের অপেক্ষা অল্প। তৃতীয়বারে দ্বিতীয় অপেক্ষা অল্প ফাঁক বিশিষ্ট রোলারের মধ্যে দেওয়া হয়। গম এইরূপে ৫।৬ বার ভাঙ্গা হয়। চালনিও নানাপ্রকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সকল কলে গম ৬ বার ভাঙ্গা হয় তাহাতে এক গম হইতে অন্যূন ৮০ প্রকারের আটা, ময়দা, সুজি, ভুষি প্রভৃতি পাওয়া যায়।

গমের রাসায়নিক উপাদান।

রাসায়নিক বিশ্লেষণে গমে নিম্নলিখিত উপাদান সমূহ পাওয়া যায়—শ্বেতসার, সলুলোজ, গঁদের ন্যায় পদার্থ, জল, শর্করা, সামান্য পরিমাণ তৈল, আমিষ জাতীয় পদার্থ ও নানাপ্রকার লবণ।

আমাদের পরীক্ষাগারে গমের বিশ্লেষণে উপরোক্ত পদার্থ সমূহ নিম্নলিখিত পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে।

জল,	আমিষ জাতীয় উপাদান,	শালি জাতীয় উপাদান,	স্নেহ জাতীয় উপাদান,	লবণ,
১১.৬	১২.৭৯	৫৩.৬৫	২.৮	১.৪২

গমে ৫টী বিভিন্ন প্রকারের আমিষ জাতীয় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—গ্লোবিউলিন, এলবুমিন, প্রটিওজ, গ্লায়াডিন, এবং গ্লুটেনিন। ইহার মধ্যে প্রথম

চারিটী অতি সামান্য মাত্রায় আছে। শেষ দুইটী গ্লুটেন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিয়ৎপরিমাণ ময়দা পাতলা কাপড়ে বাঁধিয়া জলে অনবরত ধুইলে শ্বেতসার অংশ নির্গত হইয়া যায় এবং এক প্রকার আটাবৎ পদার্থ অবশিষ্ট থাকে। ইহাই গ্লুটেন (গ্লায়াডিন+গ্লুটেনিন)। এদেশে চলিত ভাষায় ইহাকে রোলাম বলে। সামান্য পরিমাণ লবণ বা চূণ সংযোগে রোলাম দ্বারা ভগ্ন কাচ পাত্র, পুতুল ইত্যাদি জোড়া যায়।

ভূষির মধ্যে আমিষ জাতীয় উপাদান থাকিলেও তাহা পরিপাক করা যায় না। ভূষিতে সেলুলোজের অংশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেলুলোজ একরূপ কাষ্ঠ জাতীয় পদার্থ। খড়ের সেলুলোজই প্রধান উপাদান। সেলুলোজ আমাদের শরীরে কোন কাজেই আসে না। ভূষিতে লবণের অংশ যথেষ্ট। এই লবণের মধ্যে পোটাসিয়াম ফস্‌ফেটের পরিমাণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গমে সামান্য পরিমাণ বেরিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম্ ও লৌহ প্রভৃতি ধাতব পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে গম ও আটা প্রভৃতির রাসায়নিক পরীক্ষার ফল দেওয়া গেল। এই সমস্ত পরীক্ষা আমাদের পরীক্ষাগারে (Dr. Bose's Laboratory) সম্পাদিত হইয়াছে।

তালিকা নং ১।

গম হইতে প্রস্তুত ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ।

	আমিষ জাতীয় উপাদান	শালি জাতীয়	লবণ	স্নেহ জাতীয়	জল
১। গোধূম	১২.৭৯	৫৩.৬৫	১.৪৪	২.৮০	১১.৬০
২। ময়দা নং ১	১২.১৫	৫৩.৬৪	০.৭৫	২.৫৮	১১.৭২
৩। ময়দা নং ২	১২.৫৯	৪৬.৮৪	০.৮৩	২.৯০	১১.৯৬
৪। আটা নং ১	১১.৫২	৬৭.৫৩	০.৬১	২.৩৮	১১.০৬
৫। আটা নং ২	১২.৪৭	৬২.২২	০.৭০	৪.৪২	১১.৬৪
৬। সুজি	১৪.৩৮	৪৭.৪২	০.৫১	২.২৮	১০.৫২
৭। পোলার্ড নং ১	১৩.৫১	৫৪.৩৭	১.৭১	৩ ২৮	৮ ৪৫
৮। পোলার্ড নং ২	১৪.৪২	৩৩.৭০	৩.২৯	৬.৬২	১২.১০
৯। ভূষি	১৫.৪২	৩১.৩৩	৪.৮০	৪ ১৪	৮.৮৬
১০। যাঁতার আটা	১৫.২২	৫০.০০	১.৬০	৪ ৪৬	১০.২৮

তালিকা নং ২।

হাওড়ার একটী বড় কল হইতে প্রাপ্ত নমুনা সমূহের বিশ্লেষণ।

	আমিষ জাতীয় উপাদান	শালি জাতীয়	লবণ	স্নেহ জাতীয়
অত্যুৎকৃষ্ট ময়দা		৮০·৮৩	০·৪৮	১·২২
ময়দা নং ৩		৭৩ ৩৩	০·৬৩	১ ৫২
আটা নং ১	১২·০৩	৬৪ ৭৯	০·৬৮	২·২৫
আটা নং ২	১২·৬০	৫২·৩১	০ ৯৮	২·৩০
আটা নং ৩	১৪·৭০	৫১ ৪০	২·৭০	৩ ১৩
উৎকৃষ্ট সুজি	১৪ ২৬	৪৩·৩৩	০·৬১	১·৫০
মাঝারি সুজি	১১·১৫	৪৮·৭০	০·৬৩	১·৯৮
	১৫·১৫	২৮·৫৭	৪·৮৮	৮·৪২

ময়দা চিনিবার উপায়—ময়দা ভাল কি মন্দ নিঃসংশয়ে জানিতে হইলে দুরূহ রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজন। নিম্নে আমরা কতকগুলি সহজ উপায় বর্ণনা করিলাম। ইহাতে কোন ময়দা কিরূপ, তাহা মোটামুটি জানা যাইবে।

ভাল ময়দা ঈষৎ হরিদ্রাভ শ্বেতবর্ণের হয়। ময়দা মুঠা করিয়া ছাড়িয়া দিলে ছড়াইয়া পড়া উচিত। চাপ বাঁধিয়া থাকিলে বুঝিতে হইবে যে ময়দায় জলের পরিমাণ অধিক আছে। সামান্য পরিমাণ ময়দা দুই অঙ্গুলীর মধ্যে ঘসিলে, অতি মিহি দানা অনুভূত হওয়া উচিত। যে ময়দায় দানা একেবারেই অনুভব করা যায় না তাহা তত ভাল নহে। মুখের মধ্যে সামান্য ময়দা দিয়া চিবাইলে, ভাল ময়দা একেবারে মিলাইয়া যায় না। ময়দার স্বাদ অল্প মিষ্ট হওয়া উচিত। ময়দায় এক প্রকার সোঁদা গন্ধ পাওয়া যায়। যে ময়দায় সামান্য পরিমাণেও অম্ল স্বাদ আছে তাহা ভাল নহে।

গম হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন খাদ্য।

পাউরুটি—পাশ্চাত্য দেশে গম হইতে প্রস্তুত খাদ্যের মধ্যে পাউরুটিই প্রধান। পাউরুটি প্রস্তুত করিতে হইলে, বিশেষ অভিজ্ঞতা ও যত্নের আবশ্যক। ময়দার সহিত Yeast মিশ্রিত করিয়া তাহা জল দিয়া ঠাসা হয়। Yeast এক

প্রকার উদ্ভিজ্জাণু। ইহা শালি জাতীয় পদার্থকে সুরাসারে পরিণত করে এবং এই পরিবর্ত্তনের সময় কার্ব্বনডাইঅক্সাইড্ নামক বাষ্প উৎপন্ন হয়। Yeast তালের রসকে তাড়িতে পরিণত করে এবং উপরোক্ত বাষ্পের জন্য তাড়ির গাঁজলা হয়। আমাদের দেশে পাউরুটি প্রস্তুতের জন্য তাড়ি দেওয়া হয়। তাড়ি বা Yeast মিশ্রিত মাখা ময়দা কিয়ৎকাল রাখিয়া দিলে তাহা ফাঁপিয়া উঠে। প্রায় ৫ ঘণ্টা পরে মাখা ময়দার উপরিভাগ ফাটিয়া কিছু বাষ্প নির্গত হইয়া যায়। ইহার ঘণ্টা খানেক পরে ময়দার তাল আবার ফাটিলে পর তাহার সহিত আরও ময়দা ও জল মিশান হয় এবং সমস্ত ময়দাকে আর এক ঘণ্টা ফাঁপিতে দেওয়া হয়। তৎপরে মাপ মত কাটিয়া চুল্লীর মধ্যে ঘণ্টা খানেক সেকা হয়। অগ্নির তাপে ময়দামধ্যস্থিত বাষ্প পাউরুটিকে আরও ফুলাইয়া দেয় এবং ভিতরে ছোট ছোট গর্ত্ত উৎপন্ন করে। চুল্লীর মধ্যে পাউরুটির বহির্ভাগে সর্ব্বাপেক্ষা তাপের ক্রিয়া অধিক হইয়া থাকে; এই জন্য পাউরুটির বহির্ভাগের আমিষ জাতীয় উপাদান জমাট বাঁধিয়া যায় এবং ময়দার শ্বেতসার অংশ ডেক্সট্রিন নামক পদার্থে পরিণত হয়। ডেক্সট্রিনের জন্যই পাউরুটির উপরি ভাগ চক্‌চকে হয়। তাপে কিয়ৎ পরিমাণ ময়দা পুড়িয়া ঈষৎ লালবর্ণ ধারণ করে। এই পদার্থকে ইংরাজিতে "কেরামেল" বলে। তিন পোয়া ময়দা হইতে প্রায় এক সের পাউরুটি প্রস্তুত হয়। জল থাকার জন্যই ওজনের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। Yeastএর দ্বারা ময়দা ফাঁপিবার সময় ইহার কিয়দংশ সুরাসার ও বাষ্পে পরিণত হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। Yeastএর পরিবর্ত্তে ময়দার মধ্যে গ্যাস উৎপন্ন করিবার জন্য Baking powder ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ময়দার সহিত বেকিং পাউডার ও জল মিশ্রিত করিলে ময়দা আপনিই ফাঁপিয়া উঠে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে বাজারে যে সকল বেকিং পাউডার চলিত আছে তাহাদের অধিকাংশই সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেটের সহিত সোডিয়াম বাইটারটারেট কিংবা টারটারিক এসিড্ সংমিশ্রণে প্রস্তুত। বেকিং পাউডারে জল লাগিলে কারবন ডাইঅকসাইড বাষ্প উৎপন্ন হয়।

ভাল পাউরুটির উপরের খোসা পাতলা, শক্ত, মচমচে ও ঈষৎ লাল বর্ণের হয়। ভিতরে কাটিলে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখা যায়। যে পাউরুটির অভ্যন্তরস্

ছিদ্র সমূহ বড় তাহা ভাল নহে। পাউরুটির ভিতরের ভাগ হরিদ্রাভ শ্বেত বর্ণের হওয়া উচিত। যে পাউরুটি একেবারে সাদা তাহাতে আমিষ জাতীয় উপাদান অতি অল্প পরিমাণ আছে বুঝিতে হইবে। Whole meal (যে ময়দায় গমের সমস্ত ভাগই বর্ত্তমান আছে) পাউরুটির বর্ণ অপেক্ষাকৃত ঘোর।

বিস্কুট—খুব মিহি ময়দা হইতে বিস্কুট প্রস্তুত হয়। ইহাতে চিনি, মাখন, দুগ্ধ প্রভৃতি নানারূপ উপাদান মিশ্রিত থাকিতে পারে। বিস্কুটে জলের ভাগ পাউরুটি অপেক্ষা অনেক অল্প। বিস্কুট সেঁকিবার জন্য বিশেষ প্রকারের চুল্লীর প্রয়োজন। কখন কখনও বিস্কুটের সহিত অল্প পরিমাণ বেকিং পাউডার মিশ্রিত করা হয়।

রুটি—বেহার, যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে রুটির প্রচলন অধিক। বাঙ্গালা-দেশেও রুটির অল্পাধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রদেশে রুটি প্রস্তুত প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। আটা, ময়দা ও সুজি তিনেরই রুটি হইতে পারে। আটার রুটিই সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু।

বাঙ্গালা দেশে রুটি প্রস্তুত জন্য আটাতে ঈষৎ ময়ান দেওয়া হয় এবং রুটি বেলিবার জন্য চাকী বেলুন ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমে হাতে গড়া রুটির প্রচলন অধিক এবং রুটিতে মোটেই ময়ান দেওয়া হয় না। বাঙ্গালাদেশের রুটি পাতলা এবং ইহার দুই পিট সমান করিয়া সেঁকিয়া আগুনে দেওয়া হয়। পশ্চিমে রুটির এক পিট অধিক সেঁকা হয় এবং অপেক্ষাকৃত কাঁচা দিক অগ্নির উপর ধরিয়া রুটি ফুলান হয়।

রুটির আটা মাখিয়া কিয়ৎকাল রাখিয়া দিলে আটা উত্তমরূপে ভিজিতে পায় এবং রন্ধনের সময় শ্বেতসার পরিপূর্ণ প্রত্যেক কোষ ফাটিয়া যায়। কোষ মধ্য হইতে শ্বেতসার নির্গত হইয়া আসিলে পাচকরসের দ্বারা সহজেই তাহা জীর্ণ হয়। আটাকে উত্তমরূপে ভিজিবার সময় না দিলে বহুসংখ্যক কোষ অভগ্ন অবস্থায় থাকিয়া যায় এবং রুটি সহজ পরিপাচ্য হয় না। রুটি ঘি মাখাইয়া, শুষ্ক অবস্থাতেই অথবা ভিজাইয়া খাওয়া যাইতে পারে।

অনেক সময় রোগীদিগের জন্য রুটি প্রস্তুত করিতে হইলে ময়দা, আটা বা সুজি

সিদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। আটা মাখিবার পর তাহা একটী পরিষ্কৃত বস্ত্র খণ্ডে আলগা করিয়া বাঁধা হয় এবং একটী কাটির সাহায্যে হাঁড়ির মধ্যে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। হাঁড়ি জলপূর্ণ করিয়া আধ ঘণ্টাকাল ফুটাইবার পর আটা তুলিয়া লওয়া হয়। গরম অবস্থাতেই এই আটা পুনরায় উত্তমরূপে মাখিয়া তাহাতে রুটি প্রস্তুত করা হয়।

লুচি—ময়দায় প্রস্তুত খাদ্যাদির মধ্যে লুচি বাঙ্গালীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। লুচি ভাজার জন্য সাধারণতঃ খুব ভাল ময়দাই ব্যবহৃত হয়। লুচির জন্য ময়দা অল্প পরিমাণ ঘি মিশ্রিত করিয়া মাখা হয়। পরে নেচি করিয়া খুব পাতলা বেলা হয়। ঘিয়ে ভাজিবার সময় লুচি ফুলিয়া উঠে এবং একপ্রকার বাদামী রং ধারণ করে।

লুচি এবং রুটি প্রস্তুতের সময় শ্বেতসারের কতক অংশ দ্রবণীয় Dextrin এবং সামান্য ভাগ Caramelএ পরিবর্ত্তিত হয়। রুটি অপেক্ষা লুচি প্রস্তুতের সময়ই অধিক Caramel উৎপন্ন হয়।

সুজি, আটা, ময়দা হইতে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন, পিষ্টক, পায়স প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল আহারীয় দ্রব্যে অন্যান্য নানাপ্রকার উপকরণাদি থাকে বলিয়া, ইহারা আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

গমে উৎপন্ন খাদ্যাদির পরিপাক ও পুষ্টিকারিতা—

পৃথিবীতে এক দুগ্ধ ব্যতীত, গমের ন্যায় অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এমন কোন খাদ্য নাই। যদিও ইহাকে দুগ্ধের ন্যায় আদর্শ খাদ্য বলা যাইতে পারে না তথাপি গমেতে শরীর পোষণের ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত উপাদানই বর্ত্তমান। যে সকল লোকে ভাত খায় না, গমই তাহাদের প্রধান শর্করা জাতীয় খাদ্য। পাশ্চাত্য দেশে গড়ে প্রত্যেক লোকের জন্য বৎসরে প্রায় ১ পিপা ময়দা লাগে। আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে প্রত্যেক লোকের গৃহীত খাদ্যের ১।৫ অংশ গম হইতে উৎপন্ন।

চাউলের সহিত তুলনায় ময়দায় প্রোটিড জাতীয় ও খনিজ উপাদান অধিক কিন্তু শ্বেতসার কম।

যে সকল দ্রব্যে শালি জাতীয় উপাদানের প্রাধান্য এবং আমিষ ও স্নেহ জাতীয় পদার্থের অভাব দেখা যায় সেই সকল দ্রব্য অধিক আমিষ ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ যুক্ত খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

আমাদের স্বাভাবিক রুচিও এই নিয়মের বশ। আমরা রুটি ঘি মাখাইয়া, ডাল কিম্বা মাংস সহযোগে খাইতে ভালবাসি। লুচি পাঁঠার নামে অনেকেরই মুখে জল আসে। সাহেবেরাও পাউরুটির সহিত মাখন ও চিজ খায়। দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর প্রভৃতির সহিতও রুটি লুচির বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

সম ওজনের যে কোন সাধারণ খাদ্যের তুলনায় গমের পুষ্টিকারিতা অধিক। খরচের হিসাবে ধরিতে গেলেও গম অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যাদি অপেক্ষা সুলভ। গমের কেবল আমিষ অংশ তুলনা করিলেও ইহা মৎস্য মাংস অপেক্ষা সুলভ।

গমে উৎপন্ন খাদ্য দ্রব্যাদির পরিপাক মুখবিবরেই আরম্ভ হয়। মুখলালার টাইয়ালিন নামক জারক পদার্থ গমের শ্বেতসার অংশকে Maltose ও Dextrin নামক শর্করা জাতীয় দ্রব্যে পরিবর্ত্তিত করে। যত অধিক চিবান যাইবে, এই পরিবর্ত্তন ততই অধিক পরিমাণ হইবে। শুক্‌না রুটি ও বিস্কুট খাইবার সময় আমাদিগকে অধিক চর্ব্বণ করিতে হয়, এই জন্য এই সকল দ্রব্যাদির Maltose ও Dextrin পরিবর্ত্তন সহজেই হইয়া থাকে এবং পরিপাকও শীঘ্র সম্পাদিত হয়। এই কারণেই রোগীর পক্ষে ভিজা অপেক্ষা শুক্‌না রুটি প্রশস্ত। সেঁকা পাউরুটি (Toasted bread) এই কারণে কাঁচা পাউরুটি অপেক্ষা শীঘ্র হজম হয়। রুটি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলী মধ্যে প্রায় ২॥০ ঘণ্টাকাল অবস্থান করে। পাকস্থলী মধ্যে গমের আমিষ অংশের আংশিক পরিপাক হইয়া থাকে। অন্ত্রমধ্যে যাইবার পর পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র পাউরুটি খাইলে, আমিষ উপাদানের ৪।৫ অংশ শরীর মধ্যে গৃহীত হয় এবং ১।৫ মলের সহিত পরিত্যক্ত হয়। পাউরুটির সহিত দুগ্ধ প্রভৃতি অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া খাইলে প্রায় সমস্ত আমিষ ভাগই শরীর মধ্যে গৃহীত হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে কেবলমাত্র এক প্রকার খাদ্য অপেক্ষা মিশ্রিত খাদ্যের পরিপাক সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

বিলাতী বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অনেক কাল হইতে Whole meal (যাহাতে গমের সকল ভাগ বর্ত্তমান থাকে) ও সাধারণ ময়দা হইতে প্রস্তুত পাউরুটির পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। বহুসংখ্যক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, যদিও Whole meal রুটির আমিষ উপাদান অধিক তথাপি ইহা সাধারণ পাউরুটি অপেক্ষা কম পুষ্টিকর। ইহার কারণ এই যে Whole mealএ ভুষির ভাগ অধিক বলিয়া পাচক রস সমূহ শ্বেতসার ও আমিষ উপাদানের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইতে পায় না এবং এইজন্য Whole mealএর সম্যক্ পরিপাক হয় না।

বিখ্যাত হাচিসন সাহেবের মত এই—সাধারণ পাউরুটি যে Whole meal পাউরুটি অপেক্ষা উত্তম সে বিষয়ে কোন মতভেদ থাকিতে পারে না।

ভারতে পাউরুটির প্রচলন নাই। অধিকাংশ লোকেই হাতে গড়া রুটি খাইয়া থাকে।

আমাদের ল্যাবরেটারীতে **রুটির পরিপাক ও পুষ্টিকারিতা** সম্বন্ধে আমরা নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়াছি। এই পরীক্ষার বিশেষ বিবরণ ল্যাবরেটারী হইতে প্রকাশিত Food & Drugs নামক ইংরাজি পত্রিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ময়দা, সুজি ও আটার সাধারণ এবং সিদ্ধ করা দুই প্রকার রুটি পরীক্ষিত হইয়াছিল।

সাধারণ রুটিতে শতকরা প্রায় ১৫ হইতে ২৮ ভাগ জল থাকে। সিদ্ধ করা আটা, ময়দা বা সুজির রুটিতে জলের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৩৬ হইতে ৪০ ভাগ। রুটি অধিকক্ষণ সেঁকিলে জলের ভাগ আরও কমিয়া যায়। ভাতে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ জল থাকে। এজন্য রুটি ভাত অপেক্ষা অনেক শুষ্ক খাদ্য। ভাতের পরিবর্ত্তে রুটি খাইলে অধিকাংশ লোকেরই প্রস্রাবের মাত্রা কমিয়া যায়। আমাদের দেশে সর্দ্দি ইত্যাদি হইলে ভাতের পরিবর্ত্তে রুটি খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে সিদ্ধ আটা, ময়দা বা সুজির রুটি সাধারণ রুটি অপেক্ষা শীঘ্র হজম হয়। ইহার কারণ এই যে সিদ্ধ করিবার সময় শ্বেতসার পরিপূর্ণ কোষ গুলি ফাটিয়া যায় এবং পাচকরস সমূহ সহজেই তাহাদের উপর ক্রিয়া করিতে পারে। সিদ্ধ রুটির মধ্যে সুজির রুটি সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র হজম

হয়, আটার রুটি তৎপরে এবং ময়দার রুটি সর্ব্বশেষে হজম হইয়া থাকে। ময়দা হইতে আটার এই প্রভেদ যে আটাতে অধিক ভুষি থাকে। সুজিতে গমের কতক জারম অংশ থাকে।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন ভুষিপূর্ণ Whole meal রুটি অপেক্ষা সাদা ময়দার রুটিতে অধিক শ্বেতসার থাকে এবং সাদা ময়দার রুটি শীঘ্র হজম হয়। তাঁহারা বলেন যে ভুষি থাকিলে শ্বেতসারের উপর পাচক রসের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। Whole meal অপেক্ষা সাদা পাউরুটিতে Dextrin ও শর্করার পরিবর্ত্তন শীঘ্র ঘটে। আমরা দেখিয়াছি বিভিন্ন প্রকার ময়দা ও আটায় প্রস্তুত দেশীয় রুটিতে ভুষির ভাগ হজমের কোনই ব্যাঘাত করে না। অধিকন্তু আটা ও সুজির রুটিতে ভুষি থাকার জন্য শ্বেতসার অংশ চাপ বাঁধে না এবং পাচক রস সহজেই ইহার উপর ক্রিয়া করিতে পারে। এই কারণে সুজি ও আটার রুটি ময়দার রুটি অপেক্ষা শীঘ্র হজম হয়।

রোগীকে আমরা আটা ও ময়দার রুটির পরিবর্ত্তে সিদ্ধ সুজির রুটি কেন দিই এখন তাহার কারণ সহজেই বুঝান যাইতেছে। রোগের সময় পাচক রস সতেজ থাকে না, এজন্য সহজ পরিপচ্য সিদ্ধ সুজির রুটি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। আমাদের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে ময়দার রুটি যদিও সুজি ও আটার রুটির ন্যায় লঘুপথ্য নহে তথাপি ইহাতে পুষ্টিকর শ্বেতসার অংশ আটা ও সুজি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে। সিদ্ধ ও সাধারণ রুটিতে শ্বেতসার অংশ প্রায় সমপরিমাণেই থাকে। যাঁহাদের পরিপাক শক্তি পূর্ণমাত্রায় আছে তাহারা ময়দার রুটি হইতেও সমস্ত সারাংশ গ্রহণে সক্ষম।

আমিষ জাতীয় উপাদানের তুলনা করিলে দেখা যায় যে আটার রুটি ময়দার রুটি অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং সুজির রুটি ময়দার রুটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

রাসায়নিক বিশ্লেষণে কিন্তু আমিষ জাতীয় উপাদানে আটাকেই ময়দা অপেক্ষা উত্তম বলিয়া বোধ হয়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে আটার আমিষ উপাদানের কিয়দংশ পরিপাকের উপযোগী নহে। এই অংশ ভুষির সহিত সংমিলিত থাকে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও পরিপাক এই উভয় প্রকার পরীক্ষাতেই সুজির রুটি আমিষ

উপাদানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেখা যায়। সুজির আমিষ অংশ জারম্ হইতে আইসে এবং ইহার সমস্তই পরিপাকোপযোগী। সিদ্ধ রুটি ও সাধারণ রুটিতে আমিষ অংশের বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

পরিপাক ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলেও রুটির কিছু কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে, আটার রুটিতেই ইহার পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহার অধিকাংশই ভূষি।

আটার রুটিতে (বিশেষতঃ যাঁতায় ভাঙ্গা) ভূষির ভাগ বেশী বলিয়া ইহা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে:—

(১) রোগী ও যাহাদের পরিপাক শক্তি কম তাহাদের পক্ষে সিদ্ধ সুজির রুটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট

(২) সিদ্ধ রুটি সাধারণ রুটি অপেক্ষা শীঘ্র হজম হয়।

(৩) সাধারণ লোকের (যাহাদের পাক শক্তি সতেজ) রুটি সিদ্ধ করিয়া খাওয়ার কোন আবশ্যক নাই।

(৪) খাওয়ার মাত্রা নির্দ্ধারিত না থাকিলে, ময়দা, আটা কিম্বা সুজির যে কোন প্রকার রুটি হইতেই সমান পরিমাণে সারাংশ পাওয়া যায়। এজন্য প্রত্যেকেরই রুচি অনুসারে আহার করা কর্ত্তব্য। অধিক লোকেই আটার রুটি পছন্দ করেন।

(৫) যাঁহাদের কোষ্ঠ কাঠিন্য আছে তাহাদের পক্ষে আটার রুটি হিতকর।

স্তনদুগ্ধ ও শিশুর আহার।

পরমপিতা পরমেশ্বর প্রত্যেক জীবের জন্য মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর, মাতৃস্তনে অমৃত ধার স্বরূপ দুগ্ধ প্রদান করিয়াছেন। এই দুগ্ধ দ্বারা সদ্যোজাত শিশু ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়।

কিন্তু সভ্যতার কি মাহাত্ম্য। আজকালকার প্রসূতিদিগের অনেকেরই স্তনে দুগ্ধ প্রায়ই থাকে না। কোন কোন প্রসূতি শিশুকে স্তন মোটেই দেন না। এই সকল প্রসূতিদিগের সন্ততিরা গো দুগ্ধ বা "পেটেণ্ট ফুড" সকল খাইয়া থাকে।

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনুমান করিতে পারেন যে এই প্রকার শিশুপালনে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে। শৈশবাবস্থায় যত শিশুর মৃত্যু হয় তাহার অধিকাংশ আহারের অনিয়ম জন্য ঘটিয়া থাকে।

কি প্রকার শরীর পালন দ্বারা নিজস্তন হইতে সন্তান পোষণ জন্য প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ দিতে পারেন এবং শিশুদিগকে সম্যকরূপে লালন পালন করিতে পারেন এ বিষয় যদি জননীরা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করেন তাহা হইলে শিশুদিগের অকাল মৃত্যু অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইতে পারে এবং তাহাদের নিজ নিজ সংসার মধ্যে সুখ শান্তি বিরাজ করিতে থাকে।

সকল জননীই নিজ নিজ সন্তানকে সুস্থ ও সবল অবস্থায় বর্দ্ধিত করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র থাকেন। কোন জননী তাঁর নিজ সন্তানকে মেধাবী ও বলিষ্ঠ দেখিতে না চাহেন?

শিশুকে যেমন করিয়া লালন পালন করিবে শিশু সেইরূপই বর্দ্ধিত হইবে। শৈশবাস্থায় পরবর্ত্তী জীবনের আশা ভরসার বীজ সকল অঙ্কুরিত হয়। যে প্রকার আহার্য্য দেওয়া হইবে, সেইরূপ বৃক্ষে পরিণত হইবে।

ঈশ্বর এই আহার্য্য মাতৃস্তনে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যোগাইয়াছেন। এই স্তনদুগ্ধ সম্যকরূপে শিশুকে না দেওয়ার জন্য কত শিশু অকালে কাল গ্রাসে

পতিত হইতেছে তাহা এই ক্ষুদ্র লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম। কত শিশু যে রুগ্ন, দুর্ব্বল ও বিকলাঙ্গ হইয়া বাৰ্দ্ধিত হইতেছে, তাহা সংখ্যাতীত। কত লোক আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের গলগ্রহ হইয়া রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

শৈশবাবস্থায় উপযুক্ত আহার্য্য অভাবে মনুষ্য বিকলাঙ্গ হইতে পারে। খাদ্যদ্রব্য মধ্যে অস্থি সকলকে পরিপুষ্টি ও বর্দ্ধন করিবার জন্য যে বিশেষ অংশ থাকে তাহার অভাব জন্য শিশুর অস্থি অসার ভাবে বর্দ্ধিত হয় ও দেহের ভার দ্বারা ক্রমশঃ বক্রভাব ধারণ করে।

কেবল যে আহারের অভাবে শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল হয় তাহা নহে। দুর্ব্বল শরীরে রোগ অধিক প্রবল হয় এবং সত্বই ব্যাধি আক্রমণ করিয়া থাকে।

শিশুদিগের শরীরের বৃদ্ধি ও উপযুক্ত পুষ্টি কেবল ভূমিষ্ঠ হইবার পর আহারের উপর নির্ভর করে না। যখন তাহারা ভ্রূণরূপে মাতৃগর্ভে অবস্থান করে তখন মাতার শরীরের অবস্থা, তাঁহার আহার ও শরীরের অন্যান্য বিষয়ের দ্বারা নিয়মিত হয়। বারান্তরে আমরা এই সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিব।

শিশুর স্বাভাবিক আহার—সাধারণের ধারণা যে মাতৃস্তন-দুগ্ধই শিশুর একমাত্র স্বাভাবিক খাদ্য। কিন্তু সকল সময়ে মাতৃস্তন দুগ্ধ দ্বারা শিশুর সম্যক্‌রূপ বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধিত হয় না। সেইজন্য যে খাদ্য শিশুর শরীরের অভাবকে সম্পূর্ণরূপে পূরণ করে তাহাকেই আমরা শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য বলিয়া অভিহিত করিব।

এই বিশ্বজগতে প্রাণী মাত্রেরই নিজ নিজ শরীরের বিশেষত্ব দেখা যায়। শিশুদেরও সেইরূপ। ভিন্ন ভিন্ন শিশুর ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে। এইজন্য শিশুর আহার নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আমাদিগকে প্রত্যেকে শিশুর শরীরের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সকল অতিশয় যত্নের সহিত পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

শিশুর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া—শিশুর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কি? কেমন করিয়া আমরা বুঝিতে পারিব যে শিশুর পরিপাক, পুষ্ট ও বৃদ্ধি সকলই স্বাভাবিক রূপে সম্পাদিত হইতেছে?

কতকগুলি প্রতিক্রিয়া আমরা সত্ত্ব সত্ত্বই বুঝিতে পারি। কতকগুলি প্রতিক্রিয়া বুঝিতে পারা অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও সময় সাপেক্ষ।

আহার সম্যক্‌রূপ পরিপাক করিতেছে কি না তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। যদি শিশু আহারের পর তৃপ্ত হয়, না বমি করে, কোন প্রকার বেদনা বা অশান্তির লক্ষণ প্রকাশ না করে এবং তাহার কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তাহা হইলে আমরা স্বতঃই ঠিক করি যে শিশুর পরিপাক ক্রিয়া উত্তমরূপে সম্পাদিত হইতেছে এবং যে খাদ্য তাহাকে দেওয়া হইতেছে তাহা শিশুর পক্ষে যথেষ্ট।

শিশুর খাদ্য যথেষ্ট এবং উত্তমরূপ পরিপাক প্রাপ্ত হইলেও তাহার সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি নাও হইতে পারে।

উদাহরণ—শিশুদিগকে ঘন দুগ্ধ (Condensed milk), শুষ্ক দুগ্ধ (Dried milk) বা নানাপ্রকার পেটেণ্ট খাদ্যদ্রব্যাদি খাইতে দেওয়া হয় (Patent infant's food) এবং তাহারা এই প্রকার আহারে বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট রূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই প্রকারে পুষ্ট শিশুদের রিকেট্‌স ও স্কার্ভি নামক পীড়া হইতে প্রায় দেখা যায় এবং তাহারা সদাসর্ব্বদা নানারূপ রোগে ভুগিয়া থাকে।

অধ্যাপক চিডেল (Dr. Cheadle) তাহার লিখিত পুস্তকে অনেক উদাহরণ দিয়াছেন। গ্রিনউইচ সহরে শিশু প্রদর্শনী হইয়াছিল। যে শিশুটি হৃষ্টপুষ্টতা ও ওজনের আধিক্যের পুরস্কার পাইয়াছিল সেই পুনরায় তাঁহার নিকট Great Ormond Street-এর চিকিৎসালয়ে হস্ত ও পদের বক্রতা এবং শরীরের মাংসপেশী সমূহের দুর্ব্বলতার চিকিৎসার জন্য আসিয়াছিল। এই বালকটী কেবলমাত্র Condensed milk এবং Corn Flour দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

শিশুদের স্বাভাবিক খাদ্যের পরিমাণ ঠিক করিতে হইলে খাদ্য উত্তমরূপে পরিপাক পাইতেছে ও শরীরের সম্যক্‌রূপ পুষ্টি সাধিত হইতেছে কি না কেবল নির্দ্ধারণ করিলে হইবে না। কিন্তু এই সঙ্গে যাহাতে শিশুদের পরিপাক শক্তি বিকাশ পায় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যে প্রকার শিশুকে কথা কহিতে, চলাইতে ক্রমশঃ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে সেইরূপই যাহাতে শিশুর পরিপাকের ক্ষমতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় তাহার প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। যাহাতে ক্রমশঃ পরিপাক ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রসকল কার্য্যক্ষম হয় তাহার ব্যবস্থা করা বিধেয়। শিশুর পরিপাক ক্রিয়াকে নিয়ম মত শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্তন দুগ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃস্তনে দুগ্ধ আইসে। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত এই স্তন দুগ্ধের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এই পরিবর্ত্তনের সহিত শিশুর পরিপাক ক্রিয়া ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করে।

যদি শিশুদিগকে কৃত্রিম উপায়ে (স্তনদুগ্ধ ব্যতীত) শরীর তত্ত্ব বিধান অনুযায়ী আহার্য্য দিতে হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির নিয়ম যতদূর সম্ভব অনুকরণ করা আবশ্যক।

শিশুকে শরীর তত্ত্বানুযায়ী আহার্য্য দিতে হইলে তাহার পরিপাক পুষ্টি ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় সকল প্রকার আবশ্যকের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

স্তন পান—সাধারণের বিশ্বাস যে স্তনদুগ্ধ দ্বারা যে কোন শিশুকেই উৎকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিবেচনা করা উচিত। যদি শিশুকে নিয়ম মত স্তনদুগ্ধ দেওয়া হয় তাহা হইলে শিশু যে উত্তমরূপে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে প্রস্থতির শিশুকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না এবং তিনি স্বাভাবিক নিয়ম সকল পালন করিতে যত্ন করেন না। এই সকল অনিয়ম জন্য স্তনদুগ্ধ-পুষ্ট-শিশুদেরও নানা রোগ হইতে দেখা যায়। স্তনদুগ্ধ যতক্ষণ স্বাভাবিক নিয়ম মত নিঃসারিত হয় ততক্ষণ ঠিক থাকে। মাতার স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তণের সহিত তাঁহার স্তনের দুগ্ধেরও পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এবং সময় সময় এই পরিবর্ত্তন শিশুর স্বাস্থ্যের অনেক ক্ষতি করিয়া থাকে। যখন কৃত্রিম উপায়ে শিশুকে খাদ্য দেওয়া হয় তখন আমরা শিশুর আবশ্যক মত এই খাদ্যের পরিবর্ত্তন সহজেই করিতে পারি। শরীর তত্ত্বানুমোদিত উপায়ে স্তনদুগ্ধ দ্বারা শিশুকে বর্দ্ধিত করিতে হইলে, স্তনপায়ী শিশুর লক্ষণ সকল কৃত্রিম খাদ্য দ্বারা বর্দ্ধিত শিশুর ন্যায় সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক।

সময়ে সময়ে স্তনদুগ্ধ একবারেই বন্ধ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে শিশুকে কৃত্রিম খাদ্য দেওয়ার আবশ্যক হয় এবং এই সঙ্গে প্রসূতির খাদ্য দ্রব্যাদি ও স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তন করিয়া স্তনদুগ্ধের পরিবর্ত্তন করার চেষ্টা করা হয়। এইরূপ স্বাভাবিক ও কৃত্রিম খাদ্যের সংমিশ্রণের উপর অনেকের আপত্তি দেখা যায়। ভিন্ন প্রকারের খাদ্য শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিবে এ প্রকার ভুল ধারণা হইতেই অনেকে ইহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এই বিশ্বাসের কোনই ভিত্তি নাই।

কৃত্রিম ও স্বাভাবিক প্রণালীর সংমিশ্রণেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

স্তনদুগ্ধ-ইহার স্বাভাবিক ও রাসায়নিক গুণ—

প্রসবের পরে স্তন হইতে যে দুগ্ধ নিঃসৃত হয় তাহা পরবর্ত্তী কালের দুগ্ধ হইতে অনেক বিভিন্ন। প্রসবের পরেই কয়েক দিন পর্য্যন্ত যে দুগ্ধ নিঃসৃত হয় তাহাকে ইংরাজিতে Colostrum ও চলিত কথায় গাঁজাল দুগ্ধ বলে। পরবর্ত্তীকালের দুগ্ধের সহিত গাঁজাল দুগ্ধের অনেক রাসায়নিক বিভিন্নতা আছে।

(১) গাঁজাল দুগ্ধের আমিষ জাতীয় অংশ যদিও স্তন দুগ্ধের আমিষ অংশের সহিত সমান পরিমাণে থাকে কিন্তু গাঁজাল দুগ্ধে আমিষ অংশ Lact albumen ও Lact globulin রূপে অধিক পরিমাণে থাকার জন্য পাকাশয়ে ডেলা বাঁধিয়া যায় না।

(২) গাঁজাল দুগ্ধে যে চিনি বর্ত্তমান থাকে তাহা দুগ্ধশর্করা রূপে থাকে না, Dextrose রূপে থাকে। এই Dextrose বিনা পরিপাকে শরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করে।

(৩) গাঁজাল দুগ্ধে Colostrum Corpuscles নামক কতকগুলি কোষ বর্ত্তমান থাকে। গর্ভের বৃদ্ধির সহিত স্তনের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং স্তন মধ্যে দুগ্ধকণা সকল উৎপন্ন হয়। গর্ভবস্থায় দুগ্ধের আবশ্যক থাকে না এজন্য প্রসবের পূর্ব্বে Colostrum কোষ দুগ্ধকণা সমূহকে শোষণ করিয়া ফেলে এবং প্রসবের পরেও যতকাল পর্য্যন্ত না শিশুগণ তেজের সহিত দুগ্ধ

টানিয়া নিঃশেষ করিয়া খাইতে পারে, ততকাল পর্য্যন্ত স্তনদুগ্ধে Colostrum দেখা যায়।

গাঁজাল দুগ্ধ—গাঁজাল স্তনদুগ্ধ স্বাভাবিক স্তনদুগ্ধ হইতে ঈষৎ হরিদ্রাভ এবং ইহার মৃদু বিরেচক শক্তি থাকার জন্য শিশুর "মেকোনিয়াম" বা প্রথম মল পরিত্যাগের সহায়তা করে।

গাঁজাল দুগ্ধে Lact albumen ও Lact globulin রূপে আমিষ অংশ বর্ত্তমান থাকে এবং সাধারণ দুগ্ধে এতদ্ব্যতীত Casein ও বর্ত্তমান থাকে। এই কেজিন নামক আমিষ জাতীয় খাদ্য শিশুর পাকস্থলীতে জমাট বাঁধিয়া থাকে এবং পাকস্থলীতে পুনরায় পরিপাক ক্রিয়া দ্বারা দ্রবীভূত হইলে শিশুর শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। সদ্যোজাত শিশুর পাকস্থলী এই "কেজিনোজেন" নামক আমিষ পরিপাক করিতে পারে না। সেইজন্য সদ্য গাঁজাল দুগ্ধে কেজিনোজেন দেখা যায় না।

ক্রমশঃ শিশুর বয়সের সহিত দুগ্ধের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। যেমন মাতৃস্তন দুগ্ধের পরিবর্ত্তনের সহিত কেজিন নামক আমিষ দেখা যায় তেমনি শিশুর পাকস্থলী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় ও নূতন পরিপাক শক্তি প্রাপ্ত হয়।

আমাদের কৃত্রিম উপায়ে শিশুদিগকে লালন পালন করিতে হইলে শিশুর পরিপাক শক্তির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ রাখা আবশ্যক।

প্রসূতি ও ধাত্রীরা শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরে শিশুকে খাদ্য দেওয়ার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং অনেক সময় তাঁহারা সাধারণ দুগ্ধ (যাহা শিশুর পরিপাকের ক্ষমতা একেবারেই নাই) দিয়া থাকেন ও তদ্বারা কষ্ট ও রোগ আনয়ন করেন। প্রসবের পরেই শিশুকে স্তনপান করিতে দেওয়া অতি উত্তম ও যুক্তি সঙ্গত। এতদ্বারা মাতৃস্তন উত্তেজিত হয় এবং প্রসূতির জরায়ু সঙ্কুচিত হয়। শিশু যে সামান্য পরিমাণ গাঁজাল দুগ্ধ প্রাপ্ত হয় তদ্দ্বারা তাহার অন্ত্রমধ্যে আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া উত্তেজিত হয় এবং অন্ত্রমধ্যস্থিত "মেকোনিয়াম" পরিত্যক্ত হয়।

মাতৃদুগ্ধ ও ইহার বর্ণনা—শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহা মাতৃদুগ্ধে বর্ত্তমান আছে। যদি মাতৃদুগ্ধের কোন উপাদান শিশুকে বেশী দিনের জন্য খাইতে না দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়।

আমিষ জাতীয় খাদ্যই সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয়, পরে স্নেহ জাতীয়, তৎপরে শর্করা জাতীয় ও শেষে লবণ এবং অন্যান্য পদার্থ।

শরীরতত্ত্ব বিধানানুযায়ী শিশুর আহার্য্য যোগাইতে হইলে উপরোক্ত উপাদান সকলের অংশ স্বাভাবিক থাকা আবশ্যক। যদি ইহার বেশী ব্যতিক্রম হয় তাহা হইলে কুফল দেখা যায়।

স্তনদুগ্ধের বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান সমূহের পরিমাণের সামঞ্জস্য থাকিলে শিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধি সম্যক্‌রূপে হইয়া থাকে। সাধারণতঃ স্তনদুগ্ধে বিভিন্ন উপাদান সমূহ নিম্নলিখিত পরিমাণে পাওয়া যায়।

	আমিষ জাতীয়	স্নেহ জাতীয়	শালি জাতীয়	লবণ জাতীয়
শতকরা	১·৫		৬·৫	১·৫

যদি দুগ্ধে আমিষ অংশ স্বাভাবিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে দুগ্ধ উত্তম বলিয়া বিবেচিত হয়। যদি ইহাদিগের অংশ বেশী হয় তাহা হইলে সেই দুগ্ধকে খারাপ ঠিক করা হয়।

মাতৃদুগ্ধের উপাদানের তারতম্য—অতি উৎকৃষ্ট স্তনদুগ্ধেও উপাদানের অল্প বিস্তর তারতম্য দেখা যায়। দিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে স্তন দুগ্ধের পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু এই পার্থক্য বেশী হওয়া উচিত নহে। আমিষ শতকরা ১ ভাগের কম হইবে না ও ৩ ভাগের বেশী হইবে না, স্নেহ জাতীয় ৩ ভাগের কম ও ৫ ভাগের বেশী হইবে না, শাল জাতীয় ৬ হইতে ৭ ভাগের মধ্যে এবং লবণ ০·১ হইতে ০·২ এর মধ্যে হইবে।

উপরিলিখিত অংশের বিশেষ কম বেশী হইলে শিশুর পুষ্টির ক্ষতি হইয়া থাকে এবং এই দোষের প্রতিকার করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

মাখনের তারতম্য—দুগ্ধে মাখনেরই বেশী তারতম্য দেখা যায়। দুগ্ধ প্রদানের শেষাবস্থায় অর্থাৎ প্রায় ৯ মাস গত হইলে মাখনের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পাইয়া থাকে, এমন কি ২ ভাগ অথবা তদপেক্ষা আরও কমিয়া যায়।

আমিষের তারতম্য—আমিষের পরিমাণ ও জাতিগত পার্থক্য দেখা যায়। মাতার পরিশ্রম না থাকিলে, দুগ্ধে আমিষের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। খাওয়ার মাত্রা কমাইয়া ও পরিশ্রমের মাত্রা বাড়াইয়া দুগ্ধে বর্দ্ধিত আমিষ ভাগ কমান হইয়াছে এরূপ ঘটনাও জানা আছে। মানসিক উত্তেজনার দ্বারাও দুগ্ধে আমিষের ভাগ বৃদ্ধি পায়। আমিষের মাত্রা ৪ ভাগ কিম্বা তদপেক্ষাও কিছু বেশী হওয়া অদ্ভুত নয়। উপযুক্ত পুষ্টিকর দ্রব্য আহারের সহিত মাতার স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়ম পালনের কোন একটীর ব্যতিক্রম ঘটিলে স্তনদুগ্ধে আমিষের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং এরূপ দুগ্ধে শিশুর পেটের অসুখ বা অন্য প্রকার স্বাস্থ্য হানি হইতে পারে।

যে স্তনদুগ্ধে সকল সময়েই ৩ ভাগের অধিক আমিষ উপাদান থাকে তাহা ভাল নহে।

মধ্যে মধ্যে আমিষ উপাদানের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

শর্করার তারতম্য—দুগ্ধে শর্করার প্রায় তারতম্য দেখা যায় না। ইহা সকল অবস্থাতেই সমভাবে বর্ত্তমান থাকে।

স্তনদুগ্ধ দিবার ব্যবস্থা—

ইতর প্রাণীদিগের স্তন দান সম্বন্ধে কোনপ্রকার বিবেচনা শক্তি না থাকিলেও তাহারা স্বাভাবিক ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সন্তানকে পালন করে। রমণীদিগের মধ্যে স্বাভাবিক ইচ্ছা সভ্যতা, স্নেহ মমতা প্রভৃতি নানা কারণে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই জন্য কেবলমাত্র মাতা নিজ স্বাভাবিক ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিলে সন্তানের অনিষ্ট হইতে পারে। অনেক প্রসূতিই সন্তানকে যখন তখন স্তন্য পান করান। সন্তান যে কোন কারণে কাঁদিলেই তাহার মুখে স্তন দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করেন।

স্তন দুগ্ধেই শিশুর পুষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্তনদুগ্ধ দান কালেও প্রসূতির কতকগুলি নিয়ম পালন করা আবশ্যক।

(১) **পরিচ্ছন্নতা**—স্তন দুগ্ধের সহিত শিশুর পাকস্থলীতে ধূলা প্রভৃতি যাইতে পারে ও ইহাতে নানাপ্রকার রোগ আনয়ন করিতে পারে। শিশুকে খাওয়াইবার পূর্ব্বে ও পরে স্তনের বোঁটা উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলা উচিত।

স্তনের বোঁটায় দুধ লাগিয়া থাকিলে তাহাতে বীজাণু জন্মিয়া শিশুর বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে।

বাহিরে পরিষ্কার থাকিলেও বোঁটার মুখের কিছু দূষিত দুগ্ধ থাকিতে পারে সেইজন্য শিশুকে স্তনদান করিবার পূর্ব্বে কিছু দুগ্ধ গালিয়া বাহির করা উচিত।

(২) **স্তনদানের নিয়মিত সময়**—প্রথম হইতেই শিশুকে স্তন দিবার নির্দ্ধারিত সময় থাকা উচিত। শরীরের প্রত্যেক যন্ত্রেরই কার্য্যের পর বিশ্রামের আবশ্যক। যদি আহারের সময়ের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রাখিয়া স্তন দেওয়া যায় তাহা হইলে পরিপাক ক্রিয়া সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে। প্রতি বৎসর বহু স্তন্যপায়ী শিশু অনিয়মের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং অনেকে পরিপাক সম্বন্ধীয় রোগে কষ্ট পায়।

শিশু যখনই ক্রন্দন করে মাতা যদি তখনই তাহাকে স্তন দান করেন তাহা হইলে শিশুর একটী বদ অভ্যাস হইয়া যায় এবং সেটী সহজে ছাড়ান যায় না। ভাল জিনিষ শীঘ্র অভ্যাস করান যায় কিন্তু মন্দ অভ্যাস শীঘ্র ছাড়ান যায় না। স্তন্যপানের মধ্যে ব্যবধান অল্প থাকিলে দুগ্ধে আমিষ জাতীয় দ্রব্যের আধিক্য হয় এবং ইহাতে শিশুর পেটের পীড়া আনয়ন করিতে পারে।

স্তনদুগ্ধ শিশুর পাকস্থলীতে ১২ ঘণ্টাকাল থাকে। অর্দ্ধ ঘণ্টা পাকস্থলীকে বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক তাহা হইলে স্তনদানের মধ্যে অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল ব্যবধান থাকা কর্ত্তব্য।

শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলী ও আহারের মাত্রা বাড়িয়া যায়, তখন অধিক সময়ের ব্যবধান দেওয়া আবশ্যক।

(৩) **দুগ্ধের মাত্রা ঠিক রাখিতে হইবে**—অপর দুগ্ধের বেলা মাপিয়া শিশুকে পান করিতে দেওয়া হয়। স্তনদুগ্ধের বেলা শিশু নিজেই

মাত্রা ঠিক করে। সাধারণতঃ মাত্রা পূর্ণ হইলে শিশু স্তন ছাড়িয়া দেয় এবং অত্যধিক হইলে তুলিয়া ফেলে কিন্তু এ বিষয়ের নিশ্চয়তা নাই।

যদি মনে হয় যে উপরোক্ত পরিমাণে শিশুর যথোচিত পুষ্টি হইতেছে না তাহা হইলে আবশ্যকানুযায়ী মাত্রা বাড়াইতে হইবে। ১ ছটাক পরিমিত দুগ্ধ টানিয়া লইতে ভিন্ন ভিন্ন শিশুর সময়ের অনেক তারতম্য দেখা যায়। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত দুগ্ধ টানিয়া খাইতে পারগ হইলেও মাতার স্তনের অবস্থার উপর অনেক পরিমাণ নির্ভর করে। মাতার ও সন্তানের পরস্পরের সাহায্যে এই স্তনপান ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

মাতৃস্তন হইতে দুগ্ধ নিঃসরণ যদি কমাইবার আবশ্যক হয় তাহা হইলে অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা বোঁটার গোড়া চাপিয়া ধরিলেই কমান যাইতে পারে। যদি দুগ্ধ নিঃসরণ মৃদু হয় তাহা হইলে অগ্রে স্তন মর্দ্দন করিয়া পরে সন্তানের দুগ্ধ পানের সময় চাপ দিলে বেশী দুগ্ধ নির্গত হয়।

শিশুর শরীরের আবশ্যকমত স্তনদুগ্ধ যোগাইতে হইলে নিম্ন লিখিত উপায় সকলের আবশ্যক হয়।

(১) যদি স্তনদুগ্ধ পরিমাণে বেশী হয় তাহা হইলে স্তন পানের সময় মাতা স্তনের বোঁটা টিপিয়া আবশ্যকমত দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

(২) যদি মাতার দুগ্ধের দোষ থাকে তাহা হইলে মাতাকে চিকিৎসা দ্বারা দুগ্ধ দোষহীন করিতে হইবে

দুগ্ধের মাত্রা—যাহা শিশু স্তন হইতে টানিয়া লয়, স্তনে দুগ্ধের পরিমাণ ও শিশুর টানিবার শক্তি প্রভৃতি নানা কারণের উপর নির্ভর করে।

শিশু আপনা হইতেই কি পরিমাণ স্তন দুগ্ধ পান করিবে তাহা বলা অসম্ভব। শিশু খুব অল্প কি খুব অধিক পরিমাণও খাইতে পারে।

অনেক গ্রন্থকার ও বৈজ্ঞানিক কত বয়সের শিশু কত টুকু স্তন দুগ্ধ টানিয়া লইবে তাহার মোটামুটি একটা পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। তাহারা শিশুকে স্তন পান করাইয়া পূর্ব্বে ও পরে ওজন করিয়া এই পরিমাণ স্থির করিয়াছেন।

কত বয়সের শিশু কত দুগ্ধ পান করিবে আমরা নিম্নে তাহার একটী তালিকা দিতেছি।

শিশুদের বয়স অনুসারে কত পরিমাণ দুগ্ধ কয় বার খাওয়া আবশ্যক তাহার তালিকা।

শিশুর বয়স	১ম দিন	২য় দিন	৩য় হইতে ১৪শ দিন	১৫শ হইতে ২৮শ দিন	২য় মাস	৩য় মাস	৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ মাস	৬ষ্ঠ হইতে ৯ম মাস
প্রত্যেক বারের মাত্রা	১/৪ — ১/২ আউন্স	১/২ — ৩/৪ আউন্স	৩/৪ — ১ আউন্স	১ — ১৩/৪ আউন্স	২ — ৩ আউন্স	৩ — ৩৩/৪ আউন্স	৪ — ৫ আউন্স	৫ — ৬ আউন্স
কয় বার খাওয়াইতে হইবে	১০	১০	১০	১০	৮	৮	৭	
২৪ ঘণ্টার গ্রহণীয় মোট দুগ্ধের পরিমাণ	২১/২ — ৫ আউন্স	৫ — ৭১/২ আউন্স	৭১/২—১০ আউন্স	১০—১৭১/২ আউন্স	১৬—২৪ আউন্স	২৪—৩০ আউন্স	২৮—৩৫ আউন্স	৩০—৩ আউন্স

(৩) যদি দুগ্ধ পরিমাণে কম হয় তাহা হইলে স্তনদুগ্ধের সহিত অন্য দুগ্ধ দেওয়া উচিত।

শিশু অত্যাধিক বা অত্যাল্প পরিমাণে আহার পাইতেছে কি না তাহা আমাদের সর্ব্বাগ্রে দেখা আবশ্যক। পূর্ব্বে বর্ণিত তালিকাতে শিশুদের বয়স অনুসারে কত পরিমাণে দুগ্ধ কয় বার খাওয়া আবশ্যক তাহা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত পরিমাণে দুগ্ধ আহারের দ্বারা যে প্রত্যেক শিশুই সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত ও সবল দেহ প্রাপ্ত হইবে তাহা সম্ভবেনা। প্রত্যেকেরই শরীরগত স্বতন্ত্র থাকা সম্ভব।

ইহা নিরূপণের জন্য শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পরবর্ত্তী বিষয়গুলি মনোযোগ পূর্ব্বক দেখা উচিত।

(১) যদি শিশু যথেষ্ট আহার না করে তাহা হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ করা যায়।

(ক) শিশুর ওজনের বৃদ্ধি স্বাভাবিক হইতে কম হয়।

(খ) স্তন টানিবার সময় অস্থিরতা প্রকাশ করে ও আহারের শেষে সন্তোষ দেখায় না।

(গ) বমি হয় না।

(ঘ) মল অল্প অল্প এবং বারে অনেক হয়।

(ঙ) প্রস্রাব অল্প হয়।

(চ) নিদ্রা সম্পূর্ণ হয় না।

(২) যদি শিশু অধিক পরিমাণে আহার পায় তাহা হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়।

(ক) আহারের অব্যবহিত পরে বা অল্প পরে দুধ তোলা।

(খ) বদ্‌হজমের লক্ষণ অর্থাৎ পেটফাঁপা ও পেট কামড়ান।

(গ) স্তনদানের পর সম্পূর্ণ সন্তোষ।

(ঘ) শীঘ্র শীঘ্র ওজনের বৃদ্ধি।

(ঙ) অধিক পরিমাণে অনেকবার মলত্যাগ হয়।

(চ) বেশী প্রস্রাব হয়।

(ছ) মাথায় ও ঘাড়ে বেশী ঘাম হয়।

অতি নিদ্রা, অলসতা ও নিদ্রানুভাব দেখা যায়। সময় সময় উদর স্ফীতির জন্য খুব কষ্টও হইয়া থাকে।

উপরিলিখিত প্রত্যেক বিভাগের লক্ষণ সকল যদি একত্রে বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে আমাদের শিশুর অবস্থা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। তবে যদি ইহাদের মধ্যে দুই একটী বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে শিশুকে ওজন করিয়া স্তনদুগ্ধ পান করাইবে ও স্তনপান শেষ হইবার পর ওজন করিবে। যে পরিমাণে ওজন বৃদ্ধি হইবে, শিশু সেই পরিমাণে দুগ্ধ খাইয়াছে এবং এই পরিমাণ ৫১৯ পৃষ্ঠার তালিকার পরিমাণের সহিত কতদূর বিভিন্ন তাহা নির্দ্ধারণ করিলে, শিশুর দুগ্ধের মাত্রার কম বা বেশী হইতেছে কি না তাহা নির্দ্ধারিত হইব। (ক্রমশঃ)

স্তনদুগ্ধ সম্বন্ধীয় চরকোক্ত বর্ণনা।

স্তনদুগ্ধ দোষের কারণ।

অজীর্ণাসাত্ম্য বিষম বিরুদ্ধাত্যর্থ ভোজনাৎ।
লবণাম্ল কটু ক্ষার প্রক্লিন্নানাঞ্চ সেবনাৎ॥
মনঃশরীর সন্তাপাদ স্বপ্নান্নিশি চিন্তনাৎ।
আপ্তবেগ প্রতীঘাতাদপ্রাপ্তোদীরণেন চ॥
পরমান্নং গুড়কৃতং মৎস্যঞ্চ কৃশরংদধি।
অভিষ্যন্দীনি মাংসানি গ্রাম্যানূপৌদকানি চ॥
ভুক্ত্বা ভুক্ত্বা দিবাস্বপ্নান্মদ্যস্যাতিনিষেবণাৎ।
অনায়াসাদভীঘাতাৎ ক্রোধাচ্চাতঙ্ক কর্ষণৈঃ॥
দোষাঃক্ষীরবহাঃ প্রাপ্য শিরাঃস্তন্যং প্রদুষ্যচ।
কুর্য্যুরষ্টবিধং ভূয়ো দোষতস্তন্নিবোধ মে॥

অপক্ক দ্রব্য ভোজন, অসাত্ম্য ভোজন, বিষম ভোজন, বিরুদ্ধ ভোজন ও অত্যধিক লবণ অম্ল কটু ক্ষার ও পচা দ্রব্য ভোজন, মনস্তাপ, শরীরসন্তাপ, রাত্রিতে অনিদ্রা, চিন্তা, মলমূত্রাদির উপস্থিত বেগধারণ ও অনুপস্থিত বেগে যত্ন, পরমান্ন, গুড়, মৎস্য, কৃশরা, দধি, অভিষ্যন্দি দ্রব্য, গ্রাম্য আনূপ বা ঔদকমাংস ভোজন করিয়াই দিবানিদ্রা, অতিশয় মদ্যপান, শ্রমবর্জ্জন, অভিঘাত, ক্রোধ ও ব্যাধি দ্বারা কর্ষণ এই সকল কারণে বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া স্তনদুগ্ধবহ শিরা সমূহে গমনপূর্ব্বক স্তনদুগ্ধকে দূষিত করিয়া বৈবর্ণ্যাদি অষ্টবিধ স্তনদুগ্ধদোষ উৎপাদন করে। বাতাদি দোষ ভেদে অষ্ট প্রকার স্তনদুগ্ধদুষ্টি বর্ণিত হইতেছে শ্রবণ কর॥

স্তনদুগ্ধদোষ বর্ণন।

বৈরস্যং ফেনসঙ্ঘাতো রৌক্ষ্যঞ্চেত্যনিলাত্মকে।
পিত্তাদ্বৈবর্ণ্য দৌর্গন্ধ্যে স্নেহ পৈচ্ছিল্য গৌরবম্॥
কফাদ্ভবতি রুক্ষাদ্যৈ রনিলৈঃ স্বৈঃপ্রকোপণৈঃ।
ক্রুদ্ধঃক্ষীরাশ্রয়ং প্রাপ্য রসং স্তন্যস্য দূষয়েৎ॥

বাতদুষ্ট স্তনদুগ্ধ বিরস, ফেনিল ও রুক্ষ হয়। পিত্ত দুষ্ট স্তনদুগ্ধ বিবর্ণ ও দুর্গন্ধ হয়। কফদুষ্ট স্তনদুগ্ধ স্নিগ্ধ পিচ্ছিল ও গুরু হয়।

দূষিত স্তনদুগ্ধ পানফল।

বিরসং বাত সং সৃষ্টং কৃশো ভবতি তৎপিবন্।
নচাস্য স্বদতে ক্ষীরং কৃচ্ছ্রেণচ বিবর্দ্ধতে॥
তথৈব বায়ুঃ কুপিতঃ স্তন্যমন্ত র্বিলোড়য়ন্।
করোতি ফেনসঙ্ঘাতং ততঃকৃচ্ছ্রাৎ প্রবর্দ্ধতে॥
তেন ক্ষামস্বরো বালো বদ্ধবিন্মূত্র মারুতঃ।
বাতিকং শীর্ষরোগংবা পীনসং বাধি গচ্ছতি॥
পূর্ব্ববৎ কুপিতঃ স্তন্যে স্নেহং শোষয়তেঽনিলঃ।
রুক্ষং তৎ পিবতো রৌক্ষ্যাদ্বলহ্রাসশ্চ জায়তে॥

রৌক্ষ্যাদি স্বকীয় প্রকোপণ হেতুতে বায়ু প্রকুপিত হইয়া স্তনদুগ্ধে গমন করিয়া স্তনদুগ্ধের রসকে দূষিত করে। শিশু সেই বাতদুষ্ট বিরস স্তনদুগ্ধ পান করিয়া কৃশ হয়। স্তনদুগ্ধ পান করিতে চাহে না, সেই বাতদুষ্ট স্তন্য-পানে অতি কষ্টে শিশুর-দেহ-পুষ্ট হয়। কুপিত বায়ু স্তনদুগ্ধকে অন্তরে বিলোড়িত করিয়া তাহার ফেনোৎপাদন করে। সেই বাতদুষ্ট ফেনিল স্তনদুগ্ধ পানে শিশু অতি কষ্টে বর্দ্ধিত হয় আর সেই স্তন্যপানে স্বরক্ষীণ, মলমূত্রও বায়ুনিবদ্ধ এবং বাতিক শিরঃপীড়া ও পীনস রোগ উপস্থিত হয়। কুপিত বায়ু পূর্ব্ববৎ স্তনদুগ্ধে গমন করিয়া স্নেহাংশকে শুষ্ক করে তাহাতে স্তনদুগ্ধ শুষ্ক ও রুক্ষ হয়। সেইরুক্ষ স্তনদুগ্ধ পানে শিশুর রুক্ষতা ও বলহ্রাস হয়॥

পিত্তমুষ্ণাদিভিঃ ক্রুদ্ধং স্তন্যাশ্রয় মভিপ্লুতম্।
করোতি স্তন্য বৈবর্ণ্যং নীলপীতা সিতাদিকম্॥
বিবর্ণগাত্রঃ স্বিন্নঃস্যাৎ তৃষ্ণালুর্ভিন্নবিট্ শিশুঃ।
নিত্যমুষ্ণ শরীরশ্চ নাভিনন্দতি তং স্তনম্॥

উষ্ণাদি কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া স্তন্যকে আশ্রয় করত দূষিত করে। পিত্ত দূষিত স্তনদুগ্ধ, নীল পীত ও কৃষ্ণাদিবর্ণ যুক্ত হয়। পিত্তদুষ্ট স্তনদুগ্ধপান করিলে শিশুর গাত্র বিবর্ণতা, ঘর্ম্ম, অধিক তৃষ্ণা, মলের ভিন্নতা ও সদা শরীরের উষ্ণতা হয়। শিশু সেই স্তনদুগ্ধ পান করিতে চাহে না। পিত্ত পূর্ব্ববৎ কুপিত হইয়া স্তনদুগ্ধকে দুর্গন্ধ করে সেই দুর্গন্ধ স্তনদুগ্ধ পান করিলে শিশুর পাণ্ডুতা ও কামলা রোগ জন্মে॥

পূর্ব্ববৎ কুপিতে পিত্তে দৌর্গন্ধ্যং ক্ষীর মৃচ্ছতি।
পাণ্ড্বাময়স্তৎ পিবতঃকামলাচ ভবেচ্ছিশোঃ ॥
ক্রুদ্ধোগুর্ব্বাদিভিঃ শ্লেষ্মা ক্ষীরাশ্রয় গতঃস্ত্রিয়াঃ।
স্নেহান্বিতং বা তৎক্ষীরমতি স্নিগ্ধং করোতি সঃ ॥
ছর্দ্দনঃ কুন্থন স্তেন লালালুর্জায়তে শিশুঃ।
নিত্যোপদিগ্ধৈঃ স্রোতোভি র্নিদ্রা ক্লম সমন্বিতঃ ॥
শ্বাস কাস পরীতশ্চ প্রসেক-তমকান্বিতঃ।
অভিভূয় কফঃস্তন্যং পিচ্ছিলং কুরুতে যদা ॥
লালালুঃ শূনবক্ত্রাক্ষি র্জড়ঃস্যাৎ তৎপিবন্ শিশুঃ।
কফঃক্ষীরাশ্রয়গতো গুরুত্বাৎ ক্ষীর গৌরবম্ ॥
কুর্য্যাৎ স্নেহান্বিতং পীতং তদ্ভাবাৎ কফরোগবান্।
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ রোগান্ কুর্য্যাৎক্ষীরসমাশ্রিতান্ ॥

গুর্বাদি কারণে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া স্ত্রীর স্তনদুগ্ধ আশ্রয় করিয়া স্তনদুগ্ধকে স্নেহান্বিত করে। সেই কফদুষ্ট স্তনদুগ্ধ পান করিলে শিশুর বমন কুন্থন ও সদা লালাস্রাব হয়। মুখ নাসিকাস্রোতঃ সকল শ্লেষ্মলিপ্ত হওয়ায় অধিক নিদ্রা, ক্লান্তি, শ্বাস, কাস ও মুখাদির প্রসেক হয়। কুপিত কফ স্তনদুগ্ধকে দূষিত করিয়া পিচ্ছিল করে শিশু সেই পিচ্ছিল স্তনদুগ্ধ পান করিয়া লালাযুক্ত ও জড়বৎ হয়। শিশুর মুখ চক্ষু স্ফীত হইয়া থাকে। কফ স্তনদুগ্ধকে আশ্রয় করিয়া নিজ গুণে স্তনদুগ্ধের গুরুত্ব সম্পাদন করে এবং স্নিগ্ধত্ব গুণে স্তনদুগ্ধকে স্নিগ্ধ করিয়া থাকে সেই স্তনদুগ্ধ পান করিলে শিশু কফ জনিত রোগে এবং দুগ্ধসমাশ্রিত অন্যান্য বহুকারণে বহুবিধ রোগাক্রান্ত হয়।

স্তনদুগ্ধের পরীক্ষা।

স্তন্য সম্পত্তু প্রকৃতি বর্ণ গন্ধ রস স্পর্শ মৃদক পাত্রে চ দুহ্যমানং দুগ্ধমুদকং ব্যেতি প্রকৃতিভূতত্বাৎ পুষ্টিকরমারোগ্যকরঞ্চেতি। অতোহন্যথা ব্যাপন্নং জ্ঞেয়ম্।

জলপূর্ণ পাত্রে স্তনদুগ্ধ দোহন করিলে যদি জলে সম্পূর্ণ মিশ্রিত হইয়া যায় তাহা

হইলে জানিবে যে দুগ্ধে কোন দোষ নাই। সেই দুগ্ধকেই সমুচিত বর্ণ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, এই চারিটী বিশেষ গুণযুক্ত বলিয়া জানিবে অন্যরূপ হইলে বিকৃত বলিয়া স্থির করিবে।

বিকৃত স্তনদুগ্ধের লক্ষণ।

তস্য বিশেষাঃ শ্যাবারুণবর্ণং কষায়ানুরসং বিশদমনালক্ষ্যগন্ধং রুক্ষং দ্রবং ফেনিলং লঘ্বতৃপ্তিকরং কর্ষণং বাতবিকারাণাং কর্ত্তৃ বাতোপসৃষ্টং ক্ষীরমিতি জ্ঞেয়ম্।

স্তনদুগ্ধ শ্যাব বা অরুণবর্ণ, কষায়ানু রস, অপিচ্ছিল অনুচিত গন্ধ রুক্ষ পাতলা ফেনিল, ও লঘু গুণযুক্ত হইলে স্তনদুগ্ধ বাত দূষিত বলিয়া জানিবে এরূপ স্তনদুগ্ধ অতৃপ্তিকর ও বাতরোগ জনক হয়।

কৃষ্ণ নীল পীত তাম্রাবভাসং তিক্তাম্লকটুকাম্লরসং কুণপ রুধির গন্ধি ভৃশোষ্ণঞ্চ পিত্তবিকারাণাং কর্ত্তৃ পিত্তোপসৃষ্টং ক্ষীরমিতি জ্ঞেয়ম্।

স্তন দুগ্ধ, কৃষ্ণ, নীল, পীত বা তাম্রবর্ণ, তিক্ত কিম্বা কটু বা অম্লরস বিশিষ্ট শবের ন্যায় দুর্গন্ধ, রুধির গন্ধি ও উষ্ণ হইলে পিত্ত দূষিত বলিয়া জানিবে এরূপ স্তনদুগ্ধপানে শিশুর পিত্তজ রোগ জন্মে।

অত্যর্থশুক্লমতিমাধুর্যোপপন্নম্ লবণানুরসং ঘৃত তৈল বসা মজ্জ-গন্ধি পিচ্ছিল তন্তুমদুদকপাত্রেঽবসীদতি শ্লেষ্ম বিকারাণাঞ্চ কর্ত্তৃ শ্লেষ্মোপসৃষ্টং ক্ষীর মিতি জ্ঞেয়ম্।

স্তনদুগ্ধ অতিশুক্ল, অতিমধুর ও লবণানুরস, ঘৃত ও মজ্জগন্ধি, পিচ্ছিল, তন্তুমৎ ও জলে নিক্ষিপ্ত হইলে যদি মগ্ন হয় তাহা হইলে শ্লেষ্মা দূষিত বলিয়া জানিবে এইরূপ স্তনদুগ্ধ পান করিলে শিশুর শ্লেষ্মজ রোগ জন্মে।

স্তন্য দাত্রীর চিকিৎসা।

ক্ষীরে বাতাদিভির্দুষ্টে সম্ভবন্তি যদাত্মকাঃ।
তত্রাদৌ স্তন্য শুদ্ধ্যর্থং ধাত্রীং স্নেহোপপাদিতাম্॥
সংস্বেদ্য বিধিবদ্বৈদ্যো বমনেনোপ পাদয়েৎ॥

স্তনদুগ্ধ বাতাদি দ্বারা দুষ্ট হইলে যে যে দোষ উপস্থিত হয় সেই সেই দোষে স্তনদুগ্ধের শোধন জন্য ধাত্রীকে (স্তন্যদাত্রীকে) স্নেহদ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদদ্বারা স্বিন্ন করিয়া বমন কারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

বচাপ্রিয়ঙ্গু যষ্ট্যাহ্ব ফলবৎসকসর্ষপৈঃ॥
কল্কৈর্ম্বা নপটোলানাং কাথৈঃসলবণৈ র্বমেৎ।
সম্যগ্বান্তাং যথান্যায়ং কৃতসংসর্জনাং ততঃ॥
দোষকাল বলাপেক্ষী স্নেহয়িত্বা বিরেচয়েৎ
ত্রিবৃতামভয়াংবাপি ত্রিফলারসসংযুতাম্॥
পায়য়েন্মধুসংযুক্তাং বিরেকার্থং ভিষগ্বরঃ।
সম্যগ্ বিরিক্তাং মতিমান্ কৃতসংসর্জনাং পুনঃ॥
ততোদোষাবশেষঘ্নৈরন্নপানৈরুপাচরেৎ॥
শালয়ঃষষ্টিকা বাপি শ্যামাকা ভোজনে হিতাঃ॥
প্রিয়ঙ্গবঃ কোরদূষা যবা বেণুযবাস্তথা।
বংশ বেত্র কলায়াশ্চ শাকাশ্চ স্নেহসংস্কৃতাঃ॥
মুদ্গান্ মসূরান্ যূষার্থে কুলত্থাংশ্চ প্রকল্পয়েৎ॥
নিম্ববেত্রাগ্রকুলক বার্ত্তাকামলকৈঃশৃতান্॥
সব্যোষ সৈন্ধবান্ যূষান্ দাপয়েৎ স্তন্য শোধনান্।
শশান্ কপিঞ্জলানেনাং সংস্কৃতাংশ্চ প্রকল্পয়েৎ॥

শার্ঙ্গেষ্টা সপ্তপর্ণত্বগ্ বস্তগন্ধা শৃতং জলম্।
পায়য়েতাথবা স্তন্য শুদ্ধয়ে রোহিণীশৃতম্ ॥

বচ, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, মদনফল, ইন্দ্রযব, ও শ্বেতসর্ষপ ইহাদের কল্ক নিম ও পল্তার ক্বাথে আলোড়িত এবং তাহাতে সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রয়োগ দ্বারা ধাত্রীর (স্তনদাত্রীর) বমন করাইবে। সম্যক্ বমন হইলে পেয়াদিক্রমে পথ্য দিবে। তৎপরে দোষ কাল ও রোগীর বল দেখিয়া স্তন্যদাত্রীকে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ করত বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যথা ত্রিফলার ক্বাথে তেউরী বা হরীতকী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে মধু দিবে পরে তাহা ধাত্রীকে পান করাইবে সম্যক্ বিরেচন হইলে বুদ্ধিমান্ ভিষক্ তাহাকে পেয়াদি ক্রমে পথ্য দিবে। পরে দোষাবশেষ নাশক অন্নপান আহার করাইবে ॥৯৪ যথা শালি, ষষ্টিক, শ্যামা ধান্য, পিয়ঙ্গুধান্য, কোদধান্য, যব, গোধূম ও বেণু যব ইহাদের অন্ন, এবং বাঁশের কোঁড়া বেত্রাগ্র ও মটর এই সকল শাক তৈলাদি স্নেহে সংস্কৃত করিয়া খাইতে দিবে। মুগ, মসূর ও কুলথকলায়ের যূষ দিবে ॥৯৫ নিমপাতা, বেত্রাগ্র, পল্তা, বেগুণ, ও আমলকী ইহাদের ক্বাথ বা কল্কসহ ঐ মুগাদির যূষ পাক করিয়া শুঁঠ পিপুল মরিচও সৈন্ধবচূর্ণ যুক্ত করিয়া সেই যূষ (স্তনদুগ্ধ শোধনের জন্য) খাইতে দিবে। শশক, কপিঞ্জল ও হরিণের মাংস পাক করিয়া খাইতে দিবে। কাকজঙ্ঘা ছাতিম ছাল ও বনযমানী ইহাদের সহিত কিম্বা কট্‌কীর সহিত জল সিদ্ধ করিয়া (স্তনদুগ্ধ শোধনের জন্য) পান করিতে দিবে।

অমৃতা সপ্তপর্ণত্বিক্ ক্বাথশ্চৈব সনাগরম্ ॥
কিরাত তিক্তককাথং শ্লোকপাদেরিতান্ পিবেৎ ॥
ত্রীনেতান্ স্তন্যশুদ্ধ্যর্থমিতিসামান্য ভেষজম্ ॥

স্তনদুগ্ধ শোধনার্থ গুলুঞ্চ ও ছাতিম ছালের ক্বাথে শুঁঠ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করাইবে। কিম্বা চিরতার ক্বাথ পান করাইবে। এই তিনটী যোগ স্তনদুগ্ধ শোধক। স্তন্য দোষের এই সামান্য ভেষজ কথিত হইল।

শাস্ত্রীয় স্বাস্থ্য কথা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবতারণ বিদ্যারত্ন লিখিত—

চরকোক্ত রসের কার্য্য গুণ ও অতিযোগ কথন।

মধুর লবণ অম্ল কটুক কষায়।
তিক্তক এ ছয় হয় রস পরিচয়॥
এই ছয় রস গুণ কার্য্য হয় যাহা।
বর্ণিত হইবে ক্রমে যথাস্থানে তাহা॥
অতিযোগে বিশেষতঃ এ ছয় রসের।
ঘটে সুনিশ্চয় যে যে ব্যাধি মানবের॥
তাহাও বর্ণিত হবে ইহাতে নিশ্চয়।
আয়ুর্ব্বেদে নিরূপিত যেরূপ আছয়॥

মধুর রসের কার্য্য-গুণ।

মিত মাত্রায় মধুর রসের সেবন।
করে সদা রস রক্ত মাংসের বর্দ্ধন॥
ইহা মেদ মজ্জা আর ওজস্ক শুক্রের।
বর্দ্ধন করয়ে ধ্রুব দেহে মানবের॥
ইন্দ্রিয় বিমল হয় আয়ু বাড়ে আর।
বলবর্ণ বৃদ্ধি পায় ইহাতে সবার॥
বিষ পিত্ত বায়ু তৃষ্ণা প্রশমিত হয়।
করে কণ্ঠবল আর কেশে হিতোদয়॥
প্রীতির জনক ইহা জীবন বর্দ্ধক।
তৃপ্তির কারক ইহা স্থৈর্য্য সম্পাদক॥
ঘ্রাণ মুখ কণ্ঠ ওষ্ঠ জিহ্বার শোধন।
করে আর মূর্চ্ছা দাহ-রোগ প্রশমন॥
বৃংহণ কারক ক্ষীণ ক্ষতের পূরক।
ইহা সুনিশ্চিত হয় ভগ্নের যোজক॥
পিপীলিকাগণে আর ভ্রমরে সতত।
অতিপ্রিয় হয় ইহা সর্ব্বশাস্ত্র মত॥
আর হয় গুণে ইহা স্নিগ্ধ গুরু শীত।
বুঝি এর ব্যবহারে কর মনোনীত॥

মধুর রসের অতিযোগ।

মধুর রসের অতিযোগেতে অহিত।
ঘটে দেহে যথাকালে ইহা সুনিশ্চিত॥
স্থূলতা মৃদুতা আর গাত্রের গুরুতা।
অতিনিদ্রা অগ্নিমান্দ্য আর অলসতা॥
কণ্ঠে মাংসবৃদ্ধি আর অরুচি জন্মায়।
বিসূচিকা শ্বাস কাস আর প্রতিশ্যায়॥
অলসক শীত জ্বর আনাহ সতত।
মুখের মাধুর্য্য বমি সংজ্ঞা হয় হত॥
স্বরনাশ গলগণ্ড গলশোথ আর।
শ্লীপদ নেত্রাভিষ্যন্দ জন্মে সবাকার॥
লিপ্ততা ধমনী-গল-বস্তির সর্ব্বদা।
আর কত কফকৃত জন্মে রোগ সদা॥

অম্ল রসের কার্য্য-গুণ।

আহারে জন্মায় রুচি অগ্নিদীপ্তি করে।
দেহ পুষ্টিকরে তেজ বাড়ায় শরীরে॥

অম্লরসে হয় দৃঢ় ইন্দ্রিয় সকল।
আর মিত ব্যবহারে বাড়ে দেহবল॥
অম্লরসেতে বায়ুর অনুলোম হয়।
হৃদয়ের হয় তৃপ্তি লালাস্রাবোদয়॥
ভুক্তদ্রব্য ক্লিন্ন জীর্ণ আর অধোনীত।
হয় আর দেহ মন ইহাতে সুপ্রীত॥
অম্লরস গুণে লঘু উষ্ণ স্নিগ্ধ হয়।
ধ্রুব মিত ব্যবহারে করে সুখোদয়॥

অম্ল রসের অতিযোগ।

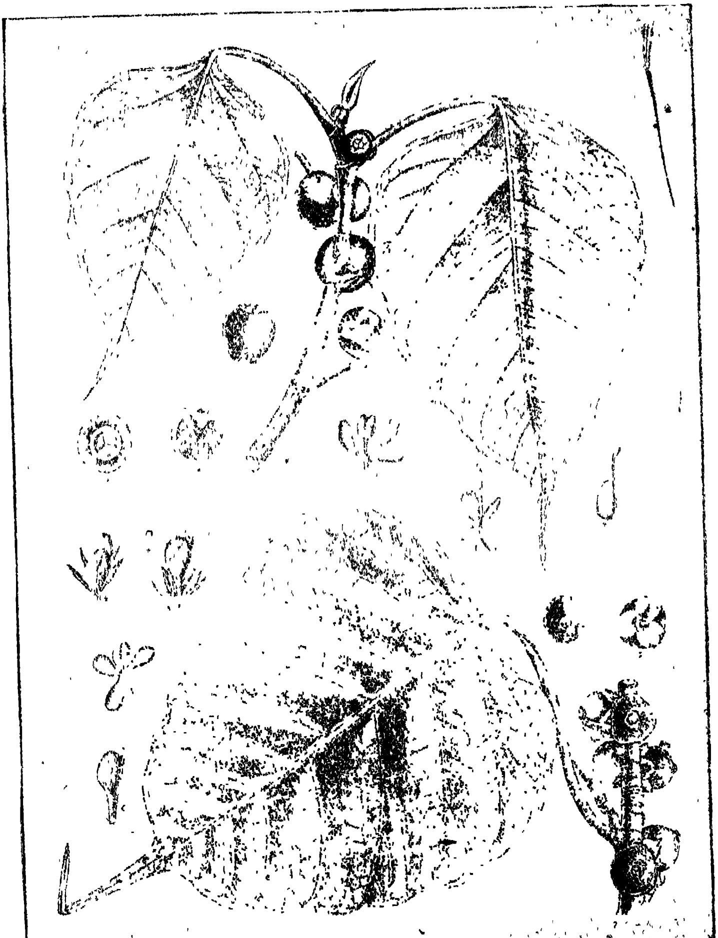
অধিক সেবিত হ'লে নিশ্চিত ইহাতে।
জন্মে রোগ বহুবিধ মানব দেহেতে॥
দন্তহর্ষ রোমহর্ষ জন্মে সুনিশ্চিত।
ক্ষুধামান্দ্য হয় আর নেত্র সন্মীলিত॥
শরীর শিথিল হয় পিত্ত বাড়ে আর।
রক্ত বিদূষিত করে দেহে সবাকার॥
ক্ষীণ ক্ষত কৃশ আর দুর্ব্বল দেহেতে।
শোথ উৎপাদিত করে ধ্রুব মানবেতে॥
উষ্ণ গুণ হেতু করে শ্লেষ্মাকে তরল।
পাকায় প্রচ্যুত শোথ ব্রণাঙ্গ সকল॥
মাংসকে বিদগ্ধ করে, কণ্ঠে বক্ষে আর।
প্রদাহ জন্মায় ধ্রুব বিবিধ প্রকার॥
স্বাস্থ্যপ্রিয় জনগণ বিচারিয়া মনে।
মিত ভাবে লইবেক ইহা প্রয়োজনে॥

লবণ রসের কার্য্য-গুণ।

পাচন লবণ রস অগ্নির দীপক।
স্রাবকর ঘনীভূত মলাদি ছেদক॥
বিকাশী ভেদক আর তীক্ষ্ণ বিরেচন।
হয় অধঃস্রংসী করে স্তব্ধতা নাশন॥
অবকাশ করে ইহা বায়ু নাশে আর।
হরে বিবদ্ধতা রোগ দেহে সবাকার॥
সংঘাতে বিনাশে, করে সর্ব্বরসে জয়।
মুখস্রাব করে আর কফ নিঃসারয়॥
স্রোতের শোধন আর দেহের মৃদুতা।
করয়ে সাধন ইহা শাস্ত্রের বারতা॥
আহারে জন্মায় রুচি ভোগে যোগ্য হয়।
নাতি গুরু স্নিগ্ধ উষ্ণ গুণ পরিচয়॥
লবণ রসের হয় গুণ এই সব।
কিন্তু অতি যোগে হয় রোগের উদ্ভব॥

লবণ রসের অতিযোগ।

লবণ রসের অতিযোগেতে অহিত।
করে যাহা শুন তাহা শাস্ত্রের লিখিত॥
করে পিত্ত প্রকুপিত রক্তের বর্দ্ধন।
তৃষ্ণা মূর্চ্ছা মোহ তাপ আর উদ্বোধন।
অঙ্গকে বিদীর্ণ করে মাংসকে সংহারে।
কুষ্ঠকে গলিত আর বিষ বৃদ্ধি করে॥
করে দন্তচ্যুত, পুরুষত্ব নাশে আর।
ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হয় ইহাতে সবার॥
পলিত খালিত্য বলি রক্তপিত্ত আর।
অম্লপিত্ত ইন্দ্রলুপ্ত দেহে সবাকার॥
বিচর্চ্চিকা বাতরক্ত বিসর্প জন্মায়।
লবণ রসের নিত্য অধিক সেবায়॥



অশ্বত্থের পত্র, পুষ্প ও ফল

RCM 'INDIAN MEDI. NAL PL..

স্বাস্থ্যসমাচার

"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্"।

প্রথম বর্ষ। } ১৩১৯ সাল { দ্বাদশ সংখ্যা।

কুমার তন্ত্র।

ডাক্তার শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম, বি, লিখিত—

স্থষ্টি লীলাময়। বিধাতার প্রেরণায় মানুষের বংশবৃদ্ধি লালসা বলবতী। তাঁহার ইঙ্গিত লক্ষ্য করিতে যাহারা অক্ষম, তাহারাই সন্তানকে বিলাস বিভ্রমের বিষম বাধা অথবা কল্পিত দারিদ্র্যের ভবিষ্য কারণ স্বরূপ মনে করিয়া নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ নিবারণ অথবা গর্ভ বিনাশ করে। সভ্যতালোকোদ্ভাসিত কোন কোন পাশ্চাত্য প্রদেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি স্থগিত রাখা হয়। জার্ম্মেনীতে ক্রমশঃ জন্ম সংখ্যার হ্রাস হইতেছে; হাজারে ৪০এর পরিবর্ত্তে ৩০টী জন্ম হইতেছে। মনে কর সমগ্র জার্ম্মেনীতে জনসংখ্যা যদি ছয় কোটী (৬,০০,০০,০০০) ধরা যায়, তাহা হইলে ইতি পূর্ব্বে প্রতিবৎসর $\frac{৬,০০,০০,০০০ \times ৪০}{১,০০০}$ = ২৪ লক্ষ শিশু জন্ম গ্রহণ করিত, এখন ১৮ লক্ষ শিশু জন্ম গ্রহণ করে; প্রতিবৎসরে জনসংখ্যা হইতে ছয় লক্ষ কমিতেছে। এই গণনা অনুসারে একশত বৎসরে জার্ম্মেনী জনশূণ্য অরণ্যে পরিণত হইবে। এই জন্ম সংখ্যা হ্রাসের কারণ কোন কোন

পণ্ডিতের মতে প্রেমহীন বিবাহ। ইহার প্রতিকারের জন্য তাঁহারা প্রেম শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতেছেন। জড়বাদ প্রধান সভ্যতার এই ত পরিণাম!

সেই সভ্যতার আলোক যাহাদের অন্তরে বিকীর্ণ হয় নাই তাহারা পুত্র মুখ দর্শনের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল। আমাদের দেশের ত কথাই নাই, ইহুদিগের মধ্যেও সন্তান লাভেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। অনেক ইহুদি রমণী "বাচ্চা" দেখিবার উদ্দেশ্যে অন্যত্র দুই তিনবার অস্ত্র করাইয়া বিফল মনোরথ হইয়া আমার নিকট পুনর্ব্বার অস্ত্র চিকিৎসার জন্য আসিয়াছেন। আমাদের মা লক্ষ্মীরাও এমন কষ্ট নাই যাহা পুত্র কামনায় স্বীকার না করিতে পারেন। আমাদের দেশে শিশুর এত আদর ও সম্ভ্রম যে সাধকেরা ভগবানকে শিশুর সজ্জায় সাজাইয়া ক্রোড়ে লইয়া দুগ্ধ, নবনী প্রভৃতি নানাবিধ সুখাদ্য খাওয়াইয়া তৃপ্তিলাভ করেন। গোপালরূপী এ হেন শিশু সহস্রে সহস্রে প্রতিবৎসর আমাদের অসাবধানতা বশতঃ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, এই কথা শুনিয়া কি মা লক্ষ্মীরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? এই এক কলিকাতা সহরে প্রতিবৎসর সার্দ্ধ চারি হাজার শিশু জন্মের এক বৎসরের মধ্যেই মাতৃক্রোড় অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই সার্দ্ধ চারি হাজার শিশুর জননী যদি জানিতেন যে তাঁহারা চেষ্টা করিলে তাঁহাদের প্রাণাধিক সন্তানদের রোগ ও মৃত্যু নিবারণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে প্রাণপণে কি তাঁহারা সেই চেষ্টা করিতেন না? অথচ যে সমস্ত রোগে শিশুদের অকাল মৃত্যু হয়, উপায় জানা থাকিলে এবং চেষ্টা করিলে সেই সমুদয় রোগ নিবারণ করা যায়।

আধুনিক শিক্ষিত মহিলারাও যে সকলে শিশুপালন নিয়মাবলী সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত আছেন তাহা নহে। বালিকা বিংশতি বর্ষ ধরিয়া লরেটো মধ্য বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে; মিহিস্বরে ইংরাজী বুলি ইংরাজ বিবির ন্যায় বলিতে শিখিয়াছে; বিবির ন্যায় নিঃশব্দে কাঁটা চামচ সংযোগে আহার করিতে শিখিয়াছে এবং ত্বরিত অঙ্গুলি সঞ্চালনে পিয়ানো বাদনে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে। এই সমুদয় শিক্ষা করিয়াছে কিন্তু কিপ্রকারে গৃহিণী ও জননী হইয়া শিশু পালন করিতে হয় সে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। কালক্রমে বিবাহের কতিপয় বৎসর পরে একটী পুত্র সন্তানজ ন্ম গ্রহণ

করিল। বালিকার মাতা বলিলেন "মেয়ের শরীর বড় দুর্ব্বল, একটী স্তন্যদায়িণী ধাত্রী রাখা হউক"। আগ্রা হইতে স্তন্যদায়িণী আনীত হইল। বিদেশে আসিয়া সেই ধাত্রী রুগ্ন হইয়া পড়িল এবং স্তন্য দুগ্ধের হ্রাস হইল। শিশু স্তন না টানিলে দুগ্ধ শুকাইয়া যায়; সুতরাং শিশুর জননীরও স্তনে দুগ্ধ রহিল না। অগত্যা শিশুকে গোদুগ্ধ পান করাইতে হইল। বালিকা বা বালিকার মাতা ঢোকা দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে জানেন না অথবা আহার করাইবার নিয়মও জানেন না। শিশু উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইল। বড় বড় চিকিৎসকেরা দিনে পাঁচবার করিয়া আসিতে লাগিলেন। জলের মতন অর্থ ঢালিয়াও শিশুকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করা গেল না।

আমাদের বালিকারা এই শিক্ষা পায় যে বর্ব্বর হিন্দুরমণীগণ সাগরে নিজ সন্তান ভাসাইয়া দিত; কিন্তু তাহারা যে স্বয়ং জননী হইয়া অজ্ঞানতা বশতঃ কত সন্তান কাল সাগরে ভাসাইয়া দিতেছে, তাহার সংখ্যা কে নিরূপণ করে?

অতএব শিশুমৃত্যু নিবারণ করিতে হইলে, প্রথমতঃ বালিকাদের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিশু পালন বিদ্যা অবশ্য শিক্ষনীয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। বালক ও বালিকার শিক্ষা প্রণালী এক ছাঁচে গঠিত হইতে পারে না। তাহা যদি হইত, বিধাতা আগন্তুক শিশুর আহার বিহারের জন্য নারীদেহে এত ব্যবস্থা করিতেন না। বিধাতার ব্যবস্থা যাহারা লঙ্ঘন করিতে চায়, তাহারাই সমরপন্থিনী সফ্রেজ বাদিনীদের ন্যায় সমাজে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। বালিকাদের শিশু পালন শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটী আপত্তি আছে—লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত। শিক্ষিতা বালিকারা গল্প পড়িতে পড়িতে 'স্তন' কিম্বা 'প্রসব' শব্দ দেখিলে শিহরিয়া উঠে। এই প্রকার অস্বাভাবিক লজ্জাশীলতার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যদেশে আন্দোলন চলিতেছে। এই বিষয়ে মার্কিন পণ্ডিত হাওয়ার্ড কেলির মুখবন্ধ সমন্বিত একখানা সুন্দর গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ধাত্রীদিগের প্রসব কুশলতা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিশু খাদ্যের গুণাগুণ ও পালনের নিয়মাবলী শিক্ষা করা আবশ্যক।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক সহরে এক একটী স্বাস্থ্য সমিতি সংস্থাপন করিয়া সময়ে সময়ে মুদ্রিত শিশুপালনের নিয়মাবলী প্রতি গ্রামে গ্রাম্য সমিতির সাহায্যে বিতরণ করা প্রার্থনীয়।

চতুর্থতঃ, স্বাস্থ্য সমিতির উদ্যোগে প্রত্যেক সহরে ও গ্রামে সুলভ মূল্যে বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী একটী গোশালা স্থাপন করিয়াছেন। গৃহস্থেরা তথায় গরু রাখিতে পারে। মফঃস্বলেও এই ব্যবস্থা হইতে পারে।

গ্রাম অঞ্চলেও এখন গরু অপেক্ষা মহিষের আদর অধিক দেখা যায়। মহিষ দুগ্ধে অপেক্ষাকৃত অধিক (প্রায় দ্বিগুণ) মাখন আছে। সেই দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিলেও ভাল সর পড়ে। কিন্তু মাখনের পরিমাণ ঠিক থাকিলেও অস্থি গঠনের উপাদান প্রভৃতির হ্রাস হয়। এইজন্য এই প্রকার দুগ্ধপায়ী শিশুরা প্রায়ই জীর্ণ শীর্ণ হয় এবং বিলম্বে দন্তোদ্গম ও বিলম্বে অস্থি গঠন প্রভৃতি রিকেট (Ricket) রোগের লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই প্রকার শিশুদের প্রায়ই সর্দ্দি কাশী হইয়া থাকে। ১৯১০ সালে কলিকাতায় জন্মের এক বৎসরের মধ্যে ৪,৫০০ শিশুর মৃত্যু হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১,৫০০ শিশুর মৃত্যুর কারণ সর্দ্দি কাশী। এতদিন আমরা গোয়ালাদিগকে দুগ্ধ ভেজাল করিবার জন্য তিরস্কার করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখন শিক্ষিত নামধারী ভদ্র লোকেরাও জল মিশ্রিত মহিষ দুগ্ধ বিক্রয় করিতেছেন, অধিকন্তু মাসান্তে টাকায় চারি সের হিসাবে মূল্য ধরিয়া বিলের "কড়া" তাগাদা করিতেছেন।

পঞ্চমতঃ, প্রত্যেক গ্রামে গোচারণের জন্য মাঠ রাখা উচিত। আমি যখন শ্রীহট্ট অঞ্চলে কোন সবডিভিসনের মেডিক্যাল অফিসার ছিলাম, সেই সময় ভদ্র লোকেরা এই উদ্দেশ্যে একটী সভা আহ্বান করিয়া আমাকে উপস্থিত থাকিতে বলিয়াছিলেন। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "এই জন্য কি আবার সভা ডাকিতে হয়"। কিন্তু তৎপরে গ্রাম পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখি মানুষ আপনার উদর পূর্ত্তির জন্য সমুদয় ভূমি অধিকার করিয়াছে, আর সেই দুগ্ধ প্রসবিনী গোমাতার আহারের কোন ব্যবস্থা নাই। বাল্যকালে দেখিতাম

বিস্তৃত হরিত শস্যাচ্ছাদিত গোষ্ঠে গোকুল সচ্ছন্দে! বিচরণ করিত এবং গোপালেরা শীতল তরুচ্ছায়ায় বসিয়া বেণু বাদন পূর্ব্বক সুমধুর গ্রাম্য সঙ্গীতে দিগন্ত প্লাবিত করিয়া সেই হৃষ্টপুষ্ট গাভীদল ও ক্রীড়াশীল বৎসবৃন্দের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিত। এখন আর সে গোষ্ঠও নাই, সে গোষ্ঠবিহারও নাই।

সে দিন কি আর ফিরে আসে ?
ফিরে আসে, ফিরে আসে, ফিরে আসে ?

*　　*　　*

ভরিলে ক্ষেত্র কনক শস্য মঞ্জরে,
ছুটে না ত চাষী গীত প্লাবিত করি প্রান্তরে,
আর প্রান্তরে আর প্রান্তরে আর প্রান্তরে।
চরে না ত ধেনু,　　　　বাজে না ত বেণু,
নাচে না তটিনী কুলরমণীকলভাষে
উল্লাসে, উল্লাসে, উল্লাসে।

খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষা।

ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী লিখিত—

নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য।

আমরা প্রতিদিন যে সকল দ্রব্য আহার করি ঐ সকল দ্রব্য মধ্যে কতকগুলি দ্রব্যকে একদিন বা দুই দিন এবং কোন কোনটীকে আরও বেশী দিন সংরক্ষা করিয়া সেবন করা প্রয়োজন হইয়া থাকে। অবস্থানুযায়ী সকলে সকল প্রকার টাট্‌কা দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে না, আবার কতকগুলি দ্রব্য সহজে প্রাপ্ত হওয়াও যায় না সুতরাং সে সকল দ্রব্য সংস্থান করিয়া রাখা প্রয়োজন হয়। ঐ সকল দ্রব্য কি উপায়ে রক্ষা করিলে স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী থাকে তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা (বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের লোকে) যে সকল দ্রব্য রাখিয়া সেবন করি তাহার কতকগুলি দ্রব্য স্বাস্থ্যের উপযোগী করিয়া রক্ষা করার বিষয় নিম্নে বিবৃত করা গেল।

পর্য্যুষিত অন্ন (পান্তা ভাত)—আমাদের দেশে পান্তা ভাত চির প্রসিদ্ধ, সুখসেব্য উপাদেয় খাদ্য। বিজয়ার দিন মা ভগবতী না'ল পান্তা খাইয়া যাত্রা করেন। কবি গাইয়াছেন—

পান্তা খেয়ে শান্ত হয়ে
কাপড় দিয়ে গায়,
গরু চরাতে পাঁচন হাতে
রাখাল মাঠে ধায়।

সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে পান্তা ভাত খাইলে শরীর সবল ও কার্য্যক্ষম হয়। কৃষকগণ পান্তা খাইয়া খোলা মাঠে রৌদ্রে থাকিয়াও রৌদ্রের গরম সহ্য করিতে সক্ষম হয়। ইহা ব্যতীত পান্তা ভাত অধিক সেবন করা যায় এবং ব্যাঞ্জনাদি ব্যতিরেকেও আহার করিতে কষ্ট হয় না। আয়ুর্ব্বেদে পর্য্যুষিত অন্ন রক্ত পিত্ত প্রমেহ ও মূর্চ্ছাদি বায়ু বিকারের উপকারক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে তাপ প্রভাবে খাদ্যদ্রব্যাদি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায় সেজন্য সাধারণ গৃহস্থগণ ভাতে শীতল জল দিয়া রাখিয়া পর দিন সেবন করে। ইহাতে তাপ প্রভাবে অন্নে পচনোৎপাদন হইতে পারে না। কিন্তু একদিনের বেশী থাকিলেই ইহাতে পচনোৎপাদন হইয়া থাকে কারণ ঐ জল ততক্ষণ গরম হইয়া ভাতে পচনোৎপাদনের সাহায্য করে।

গরম ভাতে জল দিয়া রাখিলে তাহা ভাল থাকে না ও সুস্বাদু হয় না। ঠাণ্ডা ভাতে ঠাণ্ডা জল দিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে স্থানে বেশী গরম না লাগে সে স্থানে রাখা উচিত। হাঁড়ি বেশ পরিষ্কার করিয়া পোড়াইয়া তৎপরে ঐ প্রকারে রাখিলে তাহা খাইতে সুস্বাদু হয়। হাঁড়ির মুখ বেশ করিয়া ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য নতুবা কোন প্রকার বিষাক্ত পদার্থ পতিত হইয়া অথবা কোন কীট কিম্বা ইন্দুর, সর্প ইত্যাদি ইহা আহার করিয়া বিষাক্ত করিতে পারে। আমরা অনেক স্থলে সেরূপ বিপদ ঘটিতে দেখিয়াছি।

চাউল, গুড়, অন্ন প্রভৃতি যখন পচিয়া উৎসেচন হয় তখন তাহা বকযন্ত্রে চোয়াইয়া মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেই জন্য পান্তা ভাতে সুরাবীর্য্য বর্ত্তমান থাকে বুঝিতে পারা যায়। এই হেতুই তাহা সেবনে স্ফূর্ত্তি বোধ হইয়া থাকে।

পান্তা ভাত উৎসেচন হইবার পূর্ব্বে সেবন করা কর্ত্তব্য। উৎসেচন হইলে, প্রথমে ইহাতে অম্লস্বাদ পাওয়া যায় কারণ তখন উহাতে এসিটিক্ এসিড্ উৎপন্ন হয়। তৎপর ক্রমে তাহাতে পচনোৎপাদন হইয়া দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ যুক্ত হয়।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালেই পান্তাভাত করা হয়, তৎপরে ক্রমে শীত পড়ায় ঐ ভাতে যে সামান্য উৎসেচন হয় তাহা হিম প্রভাবে দূরীভূত হয় সুতরাং তখন আর পান্তা ভাত সুস্বাদু ও সুখসেব্য হয় না।

(২) পাঁকালি ভাত (জল দেওয়া ভাত)—গ্রীষ্মের প্রখর তাপে যখন আহারে রুচি থাকে না এবং ঠাণ্ডা দ্রব্য আহারে প্রবৃত্তি জন্মে ও সুখকর হয়, তখন সাধারণ গৃহস্থগণ মধ্যাহ্নের অন্ন ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া রাত্রে আহার করিয়া থাকেন, ইহাও পর্য্যুষিত অন্নের ন্যায়। কেবল মাত্র ইহাতে পান্তা ভাতের ন্যায় এসিটিক্ এসিড্ সম্পূর্ণরূপে উৎপন্ন হয় না।

(৩) কড়কড়া ভাত (বাসি ভাত)—শীতের সময় কড়কড়া ভাত সরপড়া ব্যঞ্জন বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য। সাধারণ গৃহস্থগণ ইহা শীতকালে সুখজনক সুখাদ্য বলিয়া সেবন করিয়া থাকে। ইহাতে অন্নের গুণের কোন পরিবর্ত্তন হয় না কেবল অন্নের অণ্ডলালিক পদার্থ কিয়ৎপরিমাণে সংযত হয় মাত্র।

(৪) পায়সান্ন (পায়েস)—দুগ্ধ এবং চিনি মিশ্রিত করিয়া যে অন্ন পাক করা যায়, তাহা বাসি করিয়া এক দিন কিম্বা এক বেলা রাখিয়া আহার করা যাইতে পারে তাহাতে তাহার গুণের কোন লাঘব হয় না এবং চিনি সংযুক্ত থাকা হেতু ইহা সহজে নষ্ট হইতে পারে না।

(৫) পোলাও—নানাপ্রকার খাদ্য মসলা ও ঘৃত সংযোগে পোলাও পাক করা হইয়া থাকে। পোলাও গরম খাইবার নিয়ম কিন্তু ইহা ঘৃতসংযুক্ত থাকা হেতু একবেলা কি একদিন রাখিয়া পুনরায় গরম করিয়া আহার করা

যাইতে পারে। তাহাতে শীত প্রভাবে ইহার ঘৃত সংযত হয় মাত্র। তদ্ব্যতীত ইহার গুণের কোন ব্যত্যয় হয় না।

দাউল—অনেক সময় একবেলার রন্ধন করা দাউল অন্য বেলা আহার করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেজন্য অনেক গৃহস্থের সেগুলি ভাল করিয়া সংরক্ষা করা প্রয়োজন হয়। যদ্যপি রন্ধনের পরেই (গ্রীষ্মের সময়) কোন একটী পাত্রে গরম দাউল ঢালিয়া তাহা না ঘাঁটিয়া কোন ঠাণ্ডা স্থানে অথবা ঠাণ্ডা জলের উপর বসাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে তাহা পচিয়া যায় না বা বিস্বাদ হয় না। শীতের দিনে যদ্যপি ঐরূপ না ঘাঁটিয়া রাখা যায় তবে তাহা দুবেলা পর্য্যন্ত ভাল থাকে।

সকলেই দেখিয়া থাকিবেন মসুর, মুগ, ও মাসকলায়ের দাউলগুলি শীঘ্র পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া যায়। তাহার কারণ তাহাতে মাংস ঘটিত দ্রব্য এবং অণ্ড-লাল ময় পদার্থ অধিক থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অণ্ড-লাল জলের সহিত থাকিলে শীঘ্র পচিয়া যায়। ঐ সকল দাউল ভিন্ন, মটর খেঁসারি প্রভৃতি দাউল প্রথমে অম্লস্বাদ ও পরে তাহা বিস্বাদ এবং দুর্গন্ধ যুক্ত হয়। ঐ অম্ল দাউল পান্তা ভাতের সহিত অনেকেই মুখপ্রিয় বলিয়া আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐরূপ আহার স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অম্ল সংযুক্ত দ্রব্য রাখিলে তাহা শীঘ্র পচিতে পারে না। সেজন্য ঐ দাউলগুলি যদ্যপি অম্ল সংযুক্ত রন্ধন করা হয় অথবা অম্ল মিশ্রিত করিয়া রাখা হয় তাহা হইলে উহা পচিয়া বিস্বাদ ও স্বাস্থ্যের হানি জনক হয় না।

দাউলের বড়ি—ইহা বাঙ্গালী গৃহস্থের প্রিয় খাদ্য। দাউল বাটিয়া তাহা ফেনাইলে তাহাতে ফার্ম্মেণ্টেশন (Fermentation) বা শির্কাম্ল উৎপন্ন হয় তখন বড়ি দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ বায়ুরোধ স্থানে (পাকা হাঁড়িতে) রাখিলে ভাল থাকে কিন্তু গ্রীষ্মকালে কোন প্রকারেই ইহা ভাল থাকে না। জলাকর্ষণ করিয়া নষ্ট হইয়া যায়।

ব্যঞ্জন—শীতকালে সরপড়া ব্যঞ্জন বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য যে সকল মৎস্য তৈলাক্ত সেই সকল মৎস্যের ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া পূর্ব্বদিন রাত্রে অস্পৃশ্য অবস্থায়

ঠাণ্ডাস্থানে রাখিলে তাহা জমিয়া থাকে এবং বেশ সুস্বাদু হয়। গ্রীষ্মের দিনে তাহা রক্ষা করা অসম্ভব। যত্তপি গ্রীষ্মের দিনে রক্ষা করা প্রয়োজন হয় তবে ঠাণ্ডা জলে বসাইয়া রাখিলে ভাল থাকে।

কাঁচা মৎস্য ও মাংস—কাঁচা মৎস্য ও মাংসের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মৎস্য ও মাংসে তৈল ও লবণ মাখাইয়া রাখিলে তাহার উপর তৈলের একটী আবরণ পড়ায় তাহতে বায়ুরোধ হয় ও লবণের জলাকর্ষণ শক্তি থাকায় তাহাতে শীতলতা আনয়ন করে বলিয়া এই মৎস্য ও মাংস দীর্ঘ সময় ভাল থাকে। লবণ জলে ডুবাইয়া রাখিলে মৎস্য বহুক্ষণ ভাল থাকে। লবণ দিয়া ঢাকিয়া বায়ুরোধ অবস্থায় রাখিলে তাহা সহজে নষ্ট হয় না। কিন্তু তৈলাক্ত মৎস্য ও মৎস্যের মুড়া (মস্তক) তৈলাক্ত বলিয়া শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়।

তৈল ঘৃত—বায়ুরোধ করিয়া রাখিলে অনেক দিন টাট্‌কা অবস্থায় থাকে।

জলপান—(মুড়ি, চিড়ে ও খই) এগুলি গরম অবস্থায় বায়ুরোধ ভাবে (পাকা হাঁড়িতে) রাখিলে দীর্ঘ কাল সত্ত অবস্থায় থাকে।

মাখন ও ছানা—ঠাণ্ডা জলে রাখিলে অনেকক্ষণ ভাল থাকে নতুবা শীঘ্র পচিয়া যায়।

দধি, ঘোল ও মাঠা—ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিলে ঘোল বা মাঠা কিছুক্ষণ ভাল থাকে। শীতের দিনে ঐ সকল ২।৩ দিন পর্য্যন্ত ভাল থাকে কিন্তু গ্রীষ্মের দিনে শীঘ্রই উহাতে কীট জন্মিতে দেখা যায়।

দুগ্ধ—কাঁচা দুগ্ধ অধিকক্ষণ রাখা যায় না তাহা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া অম্ল গুণ বিশিষ্ট হইয়া যায়। দুগ্ধ আমাদের দেশে সর্ব্বদাই সুলভ মূল্যেই হউক আর দুর্ম্মূল্যেই হউক পাওয়া যায় সেজন্য আমাদের দেশে ইহা রক্ষা করিবার তত প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ইংরাজি সভ্যতার অনুকরণে, প্রাতঃকালে চা পান জন্য ও গৃহিণীদিগের স্তনদুগ্ধের অল্পতা হেতু দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানের জন্য প্রাতঃকালে বা অধিক রাত্রে বা রেল ষ্টীমারে যখন দুগ্ধের প্রয়োজন হয় তখন বিলাতি জমাট দুগ্ধ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু আমরা যত্তপি নিম্নলিখিত উপায়ে দুগ্ধ সংরক্ষা করি, তবে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহা রক্ষা করা যাইতে পারে।

দুগ্ধ ঘন করিয়া অধিক পরিমাণে চিনি মিশ্রিত করিয়া জাল দিয়া বেশ ঢাকিয়া রাখিলে তাহা অনেক দিন ভাল থাকে।

দুগ্ধ গরম জলের ভাপে ঘন করিয়া চিনি মিশ্রিত করতঃ বায়ুরোধ ভাবে রাখিলে দীর্ঘ কাল ভাল থাকে।

দুগ্ধ সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করিয়া বায়ুরোধ ভাবে রাখিলে অনেক দিন ভাল থাকে। ঐগুলি পুনরায় গরম জল দ্বারা গুলিয়া তরল দুগ্ধের ন্যায় করিয়া পান করা কর্ত্তব্য।

(ভিন্ন প্রবন্ধে দুগ্ধের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।)

গুড়—গুড় অনেক কার্য্যে লাগে, গুড় দ্বারা চিনি প্রস্তুত হয়, মুড়কি প্রস্তুত হয়, ইহা ব্যতীত পিষ্টকাদি নানাপ্রকার খাদ্যেই গুড়ের প্রয়োজন। মদ্য প্রস্তুতের প্রধান উপাদান গুড়। গুড় রাখিয়া দিলে তাহাতে এক প্রকার কীট দেখিতে পাওয়া যায় কিছুদিন পরে ঐ কীটগুলি তাহাতেই নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু গুড়ের স্বাদের কোন পরিবর্ত্তন হয় না এবং স্বাস্থ্যরক্ষার কোন হানি করে না। পুরাতন গুড় নূতন গুড় অপেক্ষা গুণ বিশিষ্ট।

মধু—বায়ুরোধ ভাবে রাখিলে দীর্ঘকাল ভাল থাকে। নতুবা জল হইয়া যায়।

আচার—তৈল বা শির্কা দ্বারা আবৃত রাখিলে বহুদিন ভাল থাকে। লেবুর আচার লেবুর রসেই ভাল থাকে। লেবুর রস করিয়া সেই রসে লেবু ডুবাইয়া রাখিলে তাহা শীঘ্র নষ্ট হয় না।

মোরব্বা—চিনির রসে পাক করিয়া রাখিলে অনেক দিন ভাল থাকে।

কাঁজি, আমানি—নূতন হাঁড়িতে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ ভাবে শুদ্ধাচারে জল দিয়া তাহাতে গরম আউষ ধান্যের চাউলের অন্ন রাখিয়া দিলে ঐ জল অম্লরসযুক্ত হইলেই তাহাকে কাঁজি বলে। ইহাতে প্রতিদিনসামান্য পরিমাণে গরম ভাত দিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে রাখিলে ইহা দীর্ঘকাল ভাল থাকে। নতুবা ইহা পচিয়া ইহাতে কীট জন্মিয়া থাকে। কিম্বদন্তী এই যে কোন প্রকার অশুদ্ধাচারে ছুঁইলে ইহা নষ্ট হইয়া যায়।

ইহা ভেদক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও পিত্ত শোধক। দাহজ্বর, বমন, শূল, আধ্মান ও অজীর্ণ রোগের উপকারক।

কাঁজি বড়া—একটী নূতন হাঁড়িতে সরিসার তৈল মাখাইয়া তাহাতে জল ও ভাজা বড়া এবং রাই, জিরা, লবণ, হরিদ্রা ও শুঁটের গুড়া উপযুক্ত পরিমাণে রাখিয়া তিনদিন পর্য্যন্ত ঐ হাঁড়িরমুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে পরে উহা অম্ল হইলে সেবন করিবে। ইহা রুচিকর, বায়ু নাশক ও শ্লেষ্মা বর্দ্ধক।

বিস্কুট—বায়ুরোধ ভাবে থাকে বলিয়া দীর্ঘকাল ভাল থাকে। বায়ু লাগিলেই নষ্ট হইয়া যায়।

কাসুন্দি—(কাসুন)—নূতন হঁড়িতে ভাল করিয়া রাখিলে অথবা বোতলে পুরিয়া রাখিলে দীর্ঘকাল ভাল থাকে।

জল—জল চুয়াইয়া বা বৃষ্টির জল বোতলে পুরিয়া রাখিলে দীর্ঘকাল ভাল থাকে তাহাতে কোন কীট জন্মে না। জল ফুটাইয়া রাখিলেও অনেক দিন ভাল থাকে। গঙ্গার জল অনেক দিন রাখিলেও তাহাতে কীট জন্মিতে দেখা যায় না। জলে কর্পূর দিয়া রাখিলে তাহা সহজে নষ্ট হয় না। কিন্তু সকল অবস্থাতেই ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

বরফ—কম্বল অথবা করাতের গুঁড়া দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা গলিয়া যায় না।

উল্লিখিত দ্রব্য ব্যতীত আরও কতকগুলি দ্রব্য শুষ্ক করিয়া রাখিলে ভাল থাকে বাহুল্য ভয়ে তাহা বিবৃত করা হইল না।

স্বাস্থ্য নিবাস।

যখন ডাক্তার কিংবা কবিরাজ দেখেন যে ঔষধের দ্বারা রোগীর কোন উপকার হইতেছে না, তখন তাহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইতে বলেন। এই সময় কোন স্থান রোগীর রোগ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

দুর্ব্বল, অসুস্থ এবং বর্ত্তমান সহরবাসী জীবিকা অর্জ্জনে বিশেষ পরিশ্রমী ব্যক্তি যখন শরীর অতিশয় বলহীন মনে করেন তখন কোন স্থানে যাইলে পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবেন তাহার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

যে সকল ব্যক্তি সবেমাত্র কোন রোগ হইতে সারিয়া উঠিয়াছেন এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল তাহারাও পূর্ব্ববল শীঘ্র ফিরিয়া পাইবার জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে ব্যস্ত হন।

কিন্তু কোন স্থান কোন রোগীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল সকল সময়ে সহজে তাহার উত্তর পাওয়া যায় না।

এই প্রবন্ধে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে বা ভারতের কোন নির্দ্দিষ্ট স্বাস্থ্যকর স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিব না। কেবল কতকগুলি প্রধান ও সাধারণ বিষয়ের আলোচনা করিব। ইহাতে সাধারণে নিজেদের বিচার ও অভিজ্ঞতা দ্বারা যে কোন লোকের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থান নির্ব্বাচনে সক্ষম হইবেন।

আদর্শ আবহাওয়া কি? এই প্রশ্নের উত্তর স্বাস্থ্যবান লোকের পক্ষে একরূপ এবং রুগ্ন লোকের পক্ষে অন্যরূপ। আবহাওয়ার গুণে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোকের প্রকৃতি ভিন্নরূপ হয়। পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানের জল, বায়ু ও উত্তাপ তাহাদের অনুপযোগী উদ্ভিদ ও প্রাণীর ধ্বংস এবং উপযোগী প্রাণী ও উদ্ভিদাদির বৃদ্ধি সাধন করে।

স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী আবহাওয়া, রোগীর পক্ষে আদর্শ নাও হইতে পারে এমন কি সময়ে সময়ে বিশেষ অনিষ্টকর হওয়া সম্ভব।

"স্বাস্থ্যনিবাস" পেটেণ্ট ঔষধের ন্যায় নহে। বিশেষ রোগের বিশেষ পেটেণ্ট ঔষধের ন্যায় "জ্বরের স্বাস্থ্য নিবাস", "বাতের স্বাস্থ্য নিবাস" কিংবা "অজীর্ণতার

স্বাস্থ্য নিবাস" থাকিতে পারে না। জ্বরের নানা কারণ থাকিতে পারে। কারণের বিভিন্নতার জন্যও স্বাস্থ্য নিবাসের পার্থক্যের আবশ্যক হয়। ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন লোকের অজীর্ণ রোগ জন্মে। একস্থানের আবহাওয়া রোগীর পক্ষে শিশিভরা একদাগ ঔষধের মতন নহে, ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহারও পরিবর্ত্তন হয়।

রোগীর উপযুক্ত চিকিৎসা—

কেবল বায়ু পরিবর্ত্তনেই বিশেষ উপকার হইবে স্থির করিয়া, অন্য সকল বিষয়ে লক্ষ্য না রাখা এবং রোগীকে স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠান বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। এইরূপে কেবল স্বাস্থ্যকর স্থানের উপর নির্ভর করিয়া অনেক জীবন নষ্ট হইয়াছে। স্বাস্থ্য নিবাসে রোগীর স্বাস্থ্যের বিশেষ উপযোগী এবং বায়ু ও রৌদ্র চলাচল করে এইরূপ বাস গৃহ নির্ব্বাচন করিতে হইবে। রোগীর খাদ্য, খাদ্যের পরিমাণ এবং আহারের সময় উপযুক্ত-চিকিৎসক ঠিক করিয়া দিবেন। রোগীর ব্যায়ামের প্রকৃতি, ব্যায়ামের এবং বিশ্রামের সময় নির্দ্ধারিত থাকিবে, স্নানের এবং পোষাকের ব্যবস্থা, যাহাতে নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় ও মন প্রফুল্ল থাকে সকল বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। রোগীকে খাদ্যাদি সম্বন্ধে লোভ, অধিক পরিশ্রম এবং ঠাণ্ডালাগান প্রভৃতি হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে হইবে। স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া রোগীর আবশ্যকানুযায়ী চিকিৎসা পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। অনেক রোগীরই সর্ব্বদা ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকার আপত্তি আছে। কিন্তু ইহা সত্য যে, যদি কোন রোগী ডাক্তারের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে থাকে তাহা হইলে কোন স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য না গিয়াও তাহার রোগ মুক্তি হয়। আসল কথা যে বাটীতে রোগী সমস্ত সময় নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি তত লক্ষ্য রাখে না, নিয়মিত ব্যায়াম, সময়ে পরিমিত আহার, মানসিক শ্রম ত্যাগ করিয়া মুক্ত বায়ুতে থাকা, প্রভৃতি নিয়মগুলি ঠিক পালন করে না। উপযুক্ত ডাক্তারের অধীনে, উপযুক্ত সরঞ্জাম সজ্জিত স্বাস্থ্য নিবাসই রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

আবহাওয়া কি ?—

আমরা কোন স্থানের আবহাওয়া বলিলে তথাকার বায়ু, জল প্রভৃতির মানব শরীরের সহিত সম্বন্ধের কথা মনে করি।

অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন—

পূর্ব্বে বায়ুকে সকলে মৌলিক পদার্থ বলিয়া জানিত। অষ্টাদশ শতাব্দির মধ্যভাগে মহামতি পৃষ্টলে (Priestly) আবিষ্কার করেন যে বায়ু, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই দুই মৌলিকে গঠিত যৌগিক পদার্থ। বায়ুতে পরিমাণে ২১ ভাগ অক্সিজেন ও ৭৯ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ওজনে ২৩ ভাগ অক্সিজেন ও ৭৭ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। যতদিন আমরা বাঁচিয়া থাকি ততকাল বায়ু গ্রহণ ও পরিত্যাগ করি। বায়ু চলাচলের সুবিধা ও অসুবিধানুযায়ী এবং অধিক লোকের শ্বাস প্রশ্বাস ও অগ্নি আলো প্রভৃতি নানা কারণে স্থান ভেদে অক্সিজেনের মাত্রার তারতম্য হয়।

একটী নাট্যশালার বায়ু পরীক্ষা করিয়া ২০·৫ ভাগ এবং একটী আদালতে ২০·৬ ভাগ অক্সিজেন পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষার দ্বারা বৃষ্টির সময় ও পরে শুক্না ও কোয়াশার সময় অপেক্ষা বায়ুতে অধিক অক্সিজেন পাওয়া যায়।

যদিও অক্সিজেন পরিমাণের তারতম্যতা $\frac{1}{১০}$ ভাগের অধিক প্রায়ই হয় না, তথাপি যে পরিমাণ বায়ু আমরা গ্রহণ করি তাহার তুলনায় এই তারতম্যতা বিশেষ কম নহে।

কার্ব্বনিক্ এসিড্। বায়ুতে শতকরা ·০৩ ভাগ কার্ব্বনিক এসিড্ বাষ্প আছে। প্রাণীগণ আক্সিজেন গ্রহণ করিয়া কার্ব্বনিক্ এসিড্ পরিত্যাগ করে এবং উদ্ভিদ সমূহ সূর্য্যালোকে কার্ব্বণ গ্রহণ করিয়া অক্সিজেন পরিত্যাগ করে।

জনপূর্ণ একটী আদালতের ১০,০০০ ভাগ বায়ুতে ২০ এবং নাট্যশালার ১০,০০০ ভাগ বায়ুতে ৩২ ভাগ কার্ব্বনিক এসিড বাষ্প পাওয়া গিয়াছে। ছাত্রপূর্ণ বিদ্যালয়ের ১০,০০০ ভাগ বায়ুতে ২০ হইতে ৫৮ ভাগ পর্য্যন্ত কার্ব্বনিক্ এসিড্ পাওয়া গিয়াছিল।

ওজন বাষ্প। বায়ুতে অতি অল্প পরিমাণ ওজন বাষ্প আছে। ওজন মন্দ বায়ুকে শোধিত করিয়া বিশুদ্ধ অবস্থায় রাখে। সহরের অন্তঃস্থল অপেক্ষা ফাকা দিকে অধিক ওজন বাষ্প থাকে।

এমোনিয়া বাষ্প :—বায়ুতে অতি অল্প পরিমাণ এমোনিয়া বাষ্প

থাকে। বৃষ্টির দ্বারা এই বাষ্প মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ মধ্যে নীত হয়। এইরূপে প্রতি বৎসর প্রায় এক একর (তিন বিঘা) জমিতে ১৫ সের এমোনিয়া আইসে।

ধূলিকণা—বড় বড় সহরে প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটারে ১৫০,০০০ ধূলিকণা পাওয়া গিয়াছে। (এক কিউবিক ইঞ্চি ১৫ কিউবিক সেন্টিমিটারের সমান।) সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে যত উপরে উঠা যায় ধূলিকণার ভাগ ততই কমিয়া যায়।

পরীক্ষার দ্বারা, উচ্চতা হিসাবে বায়ুতে ধূলিকণার যেরূপ তারতম্যতা দেখা গিয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা	ধূলিকণার সংখ্যা (প্রতি কিউবিক সিন্টিমিটরে)
৬,৭০০ ফিট্	৫৫০
৮,২০০ „	৪৮০
৮,৪০০ „	৫১৩
১০,৬৬৫ „	৬০৬
১১,০০০ „	২৫৭
১৩,২০০ „	২১৯

পর্ব্বতের উপরিস্থত বায়ুতে অল্প পরিমাণ ধূলিকণা থাকে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থায় ধূলিকণারও তারতম্য হয়। ধূলিকণায় জান্তব ও ধাতব দুই প্রকার অনু থাকে। ধূলিতে জীবাণু, উদ্ভিজ্জাণু, পুষ্পরেণু, পতঙ্গাদির শরীরের অংশ প্রভৃতি নানা প্রকার জান্তব পদার্থ থাকে। ধূলিতে রোগ বীজাণুও থাকিতে পারে।

যে সকল স্থানের বায়ুতে জীবাণু নাই, সেই স্থানেই যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসার পক্ষে উত্তম। বিষাক্ত জান্তব কণাপূর্ণ ধূলি লাগিতে না দিয়া ক্ষত শীঘ্র সারান যায়।

কয়লার খনির বায়ুতে সকল সময়ে কয়লার গুঁড়াপূর্ণ থাকে। নানা প্রকার শিল্পের কারখানার বায়ু সকল সময়ে ধূলিকণাপূর্ণ থাকে। নিশ্বাস গৃহীত বায়ুর সহিত তৎসমুদয় আমাদের ফুসফুসে নীত হয়।

বায়ুর চাপ ও গুরুত্ব—

অন্যান্য তরল পদার্থের ন্যায় বায়ুর চাপ চতুর্দ্দিকেই অনুভূত হইয়া থাকে।

আমরা বায়ু সমুদ্রের নিম্নদেশে বাস করি এজন্য কয়েক মাইল উপরিস্থিত বায়ুর অবস্থা আমরা সম্যক্ রূপে জ্ঞাত নহি। জার্ম্মন ডাক্তার বার্সন্ (Dr. Berson) ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বেলুনে ৩০ হাজার ফিট্ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। অক্সিজেনের সাহায্যে তাঁহাকে নিশ্বাস প্রশ্বাস চালাইতে হইয়াছিল। ঊর্দ্ধে তাঁহার তাপমান যন্ত্রের পারদ ০ ডীগ্রীর—৫৪ ডিগ্রী নিচে নামিয়াছিল। বেরোমিটার ৩০ হইতে ৯ ইঞ্চিতে নামিয়াছিল।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে বায়ুস্তরের সীমা ঊর্দ্ধে প্রায় ৫০ মাইল। ইহার উপরে বায়ু এত তরল অবস্থায় আছে। যে তাহা বক্তব্য নহে।

বায়ুস্তরের যত উপরে উঠা যায় বায়ুর চাপও তত কমিতে থাকে। নিম্নস্তরের বায়ু অপেক্ষা উপরি স্তরের বায়ু লঘু ও অধিক তরল এবং তাহাতে অক্সিজেনের পরিমাণও কম। এজন্য অধিক ঊর্দ্ধে উঠিলে অক্সিজেনের পরিমাণ সমান রাখিবার জন্য নিশ্বাস প্রশ্বাস গভীর হয়। গভীর শ্বাস গ্রহণে বক্ষের পরিধি বৃদ্ধি পায় এবং ফুস্ফুসের সমস্ত কোষই বায়ুপূর্ণ হয় বলিয়া সর্দ্দি জমিতে পায় না। কাহার কাহারও উচ্চ পার্ব্বত্য স্থানে বাস করিলে, কতকগুলি উপসর্গ উপস্থিত হয়। সুনিদ্রার অভাব, নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট, বুক ধড়ফড়ানি, মাথা ঘোরা, গা বমি বমি করা ইত্যাদি লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়। কিছু দিনের মধ্যে এই সকল উপসর্গ নিবারণ না হইলে রোগীর পার্ব্বত্য স্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অভ্যাস হইয়া গেলে পার্ব্বত্য স্থানে ক্ষুধা অধিক হয়। কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস গভীর হয়।

জলীয় বাষ্প বায়ু অপেক্ষা লঘু। এজন্য শুষ্ক বায়ু জলীয় বাষ্প মিশ্রিত বায়ু অপেক্ষা ভারী। সমপরিমাণ জলীয় বাষ্প মিশ্রিত বায়ুর তুলনায় আমরা শুষ্ক বায়ু হইতে অধিক পরিমাণ অক্সিজেন পাইয়া থাকি। সারজন্ হারসেল গণনার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে পৃথিবীর উপর বায়ুর চাপের পরিমান প্রায় ৬০,০০০,০০ সের। সহসা চাপের তারতম্যতায় কাহার কাহারও শরীর খারাপ হয়

জলীয় বাষ্প মিশ্রিত বায়ু লঘু বলিয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে এবং উপরে অপেক্ষাকৃত শীতল স্থানে পৌছিলে এই বাষ্প মেঘে পরিণত হয়। হিমালয় পর্ব্বতে

২৩,০০০ ফুট উপরে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সমুদ্র পৃষ্ঠের বায়ুর প্রায় ১০ ভাগের ভাগ। তদপেক্ষা উপরে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আরও অল্প।

জল এবং এমন কি বরফ হইতেও সদাসর্ব্বদা জলীয় বাষ্প উত্থিত হয়। এই বাষ্প সাধারণতঃ বাতাসের সহিত অদৃশ্যভাবে থাকে। বায়ুর তাপ যত অধিক হইবে, এই অদৃশ্য বাষ্পের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাইবে। এক ঘন ফুট বায়ুতে ০° ডিগ্রী টেম্পারেচারে অর্দ্ধ গ্রেন মাত্র জলীয় বাষ্প অদৃশ্যভাবে থাকিতে পারে। ৬° ডিগ্রীতে এই অদৃশ্য বাষ্পের পরিমাণ প্রায় ৫½ গ্রেন এবং ৮° ডিগ্রীতে ১১ গ্রেন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

গরম ও জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু কোন কারণে শীতল হইলে কোয়াসা, শিশির প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এজন্য উষ্ণপ্রধান স্যাঁতসেঁতে নদীতীরস্থ স্থান সমূহে প্রাতে ও সন্ধ্যায় কোয়াসার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

স্বাস্থ্য-নিবাস নির্দ্ধারণের জন্য তথাকার বৃষ্টির কাল, প্রকৃতি ও পরিমাণ জানা আবশ্যক। চিরাপুঞ্জিতে বৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। এক বৎসরের বৃষ্টির পরিমাণ ৫০০ ইঞ্চি। দাক্ষিণাত্যে নিতান্ত অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে।

শুষ্ক বায়ুতে ত্বক ও ফুস্‌ফুস্ হইতে জলীয় বাষ্প অধিক পরিমাণে শোষিত হয়। সিক্ত বায়ুতে ইহার বিপরীত লক্ষিত হয়। বায়ু সদাসর্ব্বদা সিক্ত থাকিলে ক্ষুধামান্দ্য, কার্য্যে অনিচ্ছা, শারীরিক দুর্ব্বলতা ও উদরের পীড়া হইবার সম্ভাবনা অধিক। উষ্ণপ্রধান সিক্ত প্রদেশ সমূহের অধিবাসীগণের মধ্যে উৎসাহের অভাব ও অলসতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সদা পরিবর্ত্তনশীল আবহাওয়ার জন্য উত্তর আমেরিকার অধিবাসীগণের স্বভাব উৎসাহপূর্ণ দেখা যায়। শুষ্ক মরুময় আরবদেশে যুদ্ধপটু, উৎসাহী বেদুইনদিগের বাসস্থান। শীতপ্রধান সিক্ত প্রদেশে গাত্র ঘর্ম্মাক্ত থাকিবার জন্য ঠাণ্ডা লাগিয়া বাত ও সর্দ্দি সহজেই আক্রমণ করিতে পারে। বঙ্গদেশে হঠাৎ বৃষ্টি ইত্যাদির জন্য ঠাণ্ডা পড়িলে এই কারণে এই সকল ব্যাধির প্রকোপ অধিক হয়।

শীতপ্রধান ও শুষ্কদেশে ঠাণ্ডায় তত অপকার করে না। কারণ চর্ম্মস্থ রক্তবাহিনী ধমনী সমূহ সঙ্কুচিত থাকার জন্য, শরীরের তাপ নষ্ট হয় না। তিব্বত ও কাশ্মীর দেশ এই কারণে স্বাস্থ্যকর।

বর্ষাকালে সিমলা ও দার্জ্জিলিং এর বায়ু সিক্ত থাকে এজন্য এরূপ স্বাস্থ্যকর স্থানেও এই সময়ে নানারূপ পীড়া হইতে দেখা যায়।

সূর্য্যোত্তাপ ও তাহার ক্রিয়া—

বায়ু মণ্ডলের তাপ সূর্য্য হইতে আসিয়া থাকে। পৃথিবীর নিজের তাপ ১১৬ ডিগ্রী। সূর্য্যোত্তাপ না পাইলে সকলকেই জমিয়া যাইতে হইত। সূর্য্য কিরণ বায়ু মণ্ডলে পতিত হইলে বায়ু অতি সামান্য পরিমাণ তাপই গ্রহণ করিয়া থাকে। সূর্য্যোত্তাপ বায়ু মণ্ডল ভেদ করিয়া পৃথিবীকে তাপযুক্ত করে এবং বায়ু পৃথিবী হইতে তাপ গ্রহণ করিয়া থাকে। বায়ুর নিম্নস্তরে তাপ গ্রহণ ক্ষমতা উপরিস্তর অপেক্ষা অধিক। সূর্য্য হইতে যে পরিমাণে তাপ আইসে বায়ুও সেই পরিমাণে উত্তপ্ত হয়। সূর্য্য কিরণ সোজা ভাবে পড়িলে যে পরিমাণে উত্তাপ পাওয়া যায়, বক্র ভাবে পড়িলে তাহা অপেক্ষা অনেক কম উত্তাপ আইসে। একবর্গ মাইলের উপর যে পরিমাণ সূর্য্যোত্তাপ পড়ে তাঁহাতে প্রায় ১৫৬৮০ মণ জলকে ফুটাইতে পারা যায়।

সূর্য্যোত্তাপের জন্যই বায়ু চলাচল করে এবং ইহা হইতেই ঝড়, বৃষ্টি হইয়া থাকে। দিবসের তাপ দ্বিপ্রহরের পরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুভূত হয়, ইহার কারণ এই যে ভূমণ্ডলস্থ দ্রব্যাদি উত্তপ্ত হইতে কিয়ৎ সময় লাগে এবং এই সকল দ্রব্যের সংস্পর্শে আসিয়া বায়ুর তাপ বৃদ্ধি পায় ইহাতে আমরাও গ্রীষ্মাধিক্য অনুভব করি। জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিতে অনেকটা তাপ ব্যয়িত হইয়া যায়। এই কারণে সমুদ্রের উপরিস্থিত বায়ুর উত্তাপের পরিমাণের অধিক পরিবর্ত্তন হয় না। সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থান সমূহও এই জন্য গ্রীষ্মকালে অধিক উত্তপ্ত হয় না।

সূর্য্যোত্তাপ মৃত্তিকাদিতে ও বায়ুর নিম্নস্তরের মধ্যে সঞ্চিত থাকে বলিয়া আমরা উর্দ্ধে উঠিলে শৈত্যানুভব করিয়া থাকি। হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম অংশে ৯,৬০০ ফিট উর্দ্ধে তাপের পরিমাণ প্রায় ইংলণ্ডের অনুরূপ। হিমালয়ের অধিকাংশ স্বাস্থ্যকর স্থানই ৬,০০০ হইতে ৭,০০০ ফুটের মধ্যে অবস্থিত। এই সকল স্থানের তাপ গড়ে ৬° ডিগ্রী। Latitude অনুসারে সূর্য্যোত্তাপের তারতম্য হইয়া থাকে। নিকটে সমুদ্র থাকার জন্য এবং মৃত্তিকার প্রকৃতি অনুসারে তাপের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কোন

কোন স্থলে ঋতু বিশেষে ঠাণ্ডা কিংবা গরম হাওয়া বহিয়া থাকে। কলিকাতা ও বঙ্গের অন্যান্য স্থানে শীতকালে উত্তরাঞ্চল হইতে শীতল বায়ু বহিয়া থাকে।

দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে সঞ্চালিত বায়ু প্রবাহের জন্য এক স্থানের বায়ু শীতল বা উষ্ণ হইতে পারে। উষ্ণ Gulf streamএর জন্য ইংলণ্ডের আবহাওয়ার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইংলণ্ড ও লেব্রেডর এক ল্যাটিটিউডে অবস্থিত হইলেও ইংলণ্ডের তাপ ল্যাব্রেডর অপেক্ষা প্রায় ৫০° ডিগ্রী কম হইয়াছে এবং মেরু প্রদেশে উত্তাপ প্রায় ১০০° ডিগ্রী বাড়িয়াছে।

মৃত্তিকা জল অপেক্ষা শীঘ্র উত্তপ্ত এবং শীঘ্র শীতল হয়। জলশূন্য মরু প্রদেশে দিবারাত্রির মধ্যে প্রায় ৪০° ডিগ্রী তাপের পার্থক্য দেখা যায়। সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপ সমূহে এই পার্থক্য ৫০° ডিগ্রী। দিবা রাত্রির মধ্যে পাঞ্জাবে ৩০° হইতে ৪০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপের পার্থক্য হয়। মধ্য প্রদেশে ২০° হইতে ৩০° ডিগ্রী, কলিকাতায় ১৬° ডিগ্রী, বোম্বায়ে ৮° ডিগ্রী এবং সিংহলে ৬° ডিগ্রীর পার্থক্য দেখা যায়।

উর্দ্ধে উঠিলেও দিবা রাত্রির তাপের প্রভেদ কম দৃষ্ট হয়। মুসৌরী প্রায় ৬,০০০ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত এবং এস্থানে দিবা রাত্রির মধ্যে ১৩° ডিগ্রী প্রভেদ লক্ষিত হয়। ইহার নিকটস্থ সমতল ক্ষেত্রে প্রভেদের মাত্রা প্রায় ২৪° ডিগ্রী।

সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানে সেরূপ তাপের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। পর্ব্বতের উপরেও সেইরূপ। পর্ব্বতে দিবসে ঠাণ্ডা হাওয়া উপর হইতে নীচের দিকে নামে এবং রাত্রে নীচ হইতে গরম হাওয়া উপরে উঠিতে থাকে।

সূর্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাপ সর্ব্বাপেক্ষা কম থাকে এবং বেলা দুই তিনটার সময় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। ঋতুভেদে সময়ের কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে আরও অধিক বেলায় তাপ বৃদ্ধি পায়। তাপের বাৎসরিক তারতম্য বিষুবরেখা হইতে আরম্ভ করিয়া মেরু প্রদেশের দিকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। কলম্বোতে ইহার পরিমাণ ৩½° ডিগ্রী, বোম্বাইয়ে ১১° ডিগ্রী, কলিকাতায় ২১° ডিগ্রী এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৩০° হইতে ৪০° ডিগ্রী।

সূর্য্যমণ্ডলে ১১ বৎসর অন্তর কলঙ্করেখা দেখা যায় এবং ইহাতে পৃথিবীর তাপেরও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাপ

ভারতবর্ষে, উত্তর আফ্রিকায়, লোহিত সমুদ্রে, পারস্যোপসাগরে, এবং অষ্ট্রেলিয়ায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাহারা মরুভূমিতে ১৩০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ দেখা গিয়াছে। সিন্ধু প্রদেশের জেকোবাবাদ নগরে ১২০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ উঠে। মেরু প্রদেশ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শীতল নহে। উত্তর পূর্ব্ব সাইবিরিয়া এবং উত্তর পূর্ব্ব আমেরিকায় শীত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু যে পরিমাণ সূর্য্যোত্তাপ আসিতে দেয়, পৃথিবী হইতে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প পরিমাণ তাপ এইরূপ সিক্ত বায়ুর মধ্য দিয়া ফিরিয়া যাইতে সক্ষম হয়। এই কারণে শুষ্ক প্রদেশ সমূহে রাত্রি দিবস হইতে অনেক অধিক শীতল হইয়া থাকে এবং সিক্ত প্রদেশ সমূহে দিবসের তাপ থাকিয়া যায় বলিয়া রাত্রিকালে অসহ্য গরম হয়।

মৃত্তিকার রং যত অধিক শ্বেত বর্ণের হইবে ইহা তত অল্প তাপ গ্রহণে সক্ষম হইবে। মৃত্তিকার বর্ণ বৃক্ষ লতাদির সংমিশ্রণে যত অধিক ঘোর হইবে ইহাতে তত অধিক তাপ সঞ্চিত থাকিবে। ডাক্তার পার্কার বলেন—গ্রীষ্মাধিক্যে শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, পরিপাকের ব্যাঘাত এবং অন্যান্য নানাবিধ উপদ্রব হইয়া থাকে। ইংরাজি গৃহ-চিকিৎসা প্রণেতা মুর সাহেবের মতে অভ্যাস না থাকিলে অত্যধিক গ্রীষ্মে উপরিউক্ত সমস্ত উপদ্রব ব্যতীত রক্তাল্পতাও ঘটিতে পারে।

জল—

কোন স্থানের আবহাওয়া, বায়ু ব্যতীত জলের প্রকৃতির উপরেও বিশেষরূপ নির্ভর করিয়া থাকে। মৃত্তিকার প্রকৃতি অনুসারে জলে নানারূপ পদার্থ দ্রবণীয় বা ভাসমান অবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং ইহার জন্য জলের গুণের তারতম্য দৃষ্ট হয়। এই কারণে স্বাস্থ্য-নিবাস স্থিরীকরণের পূর্ব্বে জলের অবস্থা সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। পল্লীগ্রামে অনেক স্থলেই পুষ্করিণীর বদ্ধ জলে মনুষ্য ও পশ্বাদির স্নান, কাপড় কাচা প্রভৃতি কারণে জল একবারে অস্পৃশ্য হইয়া পড়ে এবং এরূপ স্থান অন্যান্য বিষয়ে যতই স্বাস্থ্যকর হউক না কেন কেবল জলের দোষে তথাকার অধিবাসিগণ নিয়ত পীড়িত হন। অপরিষ্কার বদ্ধ জলে ম্যালেরিয়াবাহী মশকের জন্ম হয় এবং এরূপ জল সহজেই কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজাণু দ্বারা কলুষিত হইতে পারে।

ঝরণা ও কূপের জলে নানাপ্রকার ধাতব পদার্থ বর্ত্তমান থাকিতে পারে এবং এরূপ জলের উপাদান ভেদে তাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী বা উপকারী হইতে পারে। আমরা সাধারণতঃ অমুক স্থানের জল হজমী বলিয়া থাকি; সকল সময়ে এই গুণ জলের নহে। কোন কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে স্বাভাবিক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে; এরূপ উষ্ণ প্রস্রবণে গন্ধক, লৌহ প্রভৃতি ধাতব পদার্থ, প্রায়ই বিদ্যমান থাকে, জলে লৌহের ভাগ অধিক থাকিলে তাহাতে কোষ্ঠ কাঠিন্য উপস্থিত হয়; ম্যাগনেসিয়াম লবণ থাকিলে কোষ্ঠ তারল্য হয়।

কোন কোন জলে স্নান করিলে শরীর ভার বোধ হয়, আবার কোন জলে স্নানে শরীরে স্ফূর্ত্তি বোধ হইয়া থাকে। নদীতে নূতন বর্ষার জল আসিলে তাহাতে স্নান করিলে অনেকেই অসুস্থ হইয়া পড়েন।

মৃত্তিকা—

মৃত্তিকার প্রকৃতি রসবাহি বা রসাবরোধক হইতে পারে। যে সকল প্রদেশ রসবাহি মৃত্তিকার দ্বারা গঠিত তাহা শুষ্ক অবস্থায় থাকে। মৃত্তিকা রসাবরোধক হইলে স্থান সেঁৎসেঁতে হয় ও সামান্য কারণে জল জমিয়া থাকে।

কটকের মৃত্তিকা রসবাহী এজন্য সেখানে ম্যালেরিয়া নাই। কোন স্থানের সন্নিকটে পর্ব্বতাদি থাকিলে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

খাদ্যদ্রব্যাদি—

স্বাস্থ্য-নিবাস ঠিক করিতে হইলে তথায় কি কি খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় তাহা জানা আবশ্যক। কোন কোন রোগের পক্ষে দুগ্ধ অত্যাবশ্যকীয়। কাহারও ফল মূলের অধিক প্রয়োজন এবং কাহারও মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি খাদ্যের আবশ্যক। যে স্বাস্থ্য-নিবাসে উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহাই রোগীর পক্ষে উপযোগী।

খরচ ও যাতায়াতের সুবিধা—

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। এজন্য স্বাস্থ্য নিবাস এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থে স্বল্পব্যয়ে তথায় থাকিতে পারেন। স্বাস্থ্য-নিবাসে বাড়ী ভাড়া, খাদ্যাদি ও চিকিৎসকের খরচা কম হওয়া উচিত। দুর্গম প্রদেশে

স্বাস্থ্য-নিবাস হইলে রোগীর যাতায়াতের বড়ই অসুবিধা হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য-নিবাস এরূপ হওয়া কর্ত্তব্য যেন রোগী বিনা ক্লেশে তথায় যাইতে পারেন।

স্বাস্থ্য-নিবাস নির্ব্বাচন—

পেটেণ্ট ঔষধের ন্যায় অসুখের নাম শুনিয়াই স্বাস্থ্য-নিবাসের নির্ব্বাচন করা যায় না। রোগের কারণ ও লক্ষণাদি নির্দ্ধারণ করিয়া স্থির করা উচিত। স্বাস্থ্য-নিবাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সন্ধান লওয়া আবশ্যক।

(১) দিবা রাত্র ও ঋতুভেদে তথাকার তাপের পরিমাণ কি।

(২) কোন কোন সময়ে এবং কি পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়।

(৩) ঋতুভেদে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কিরূপ থাকে।

(৪) মেঘ, কোয়াসা ও শিশিরপাত কি প্রকার।

(৫) বায়ুর গতি ও প্রকৃতি কি।

(৬) বায়ুতে কি পরিমাণ ধূলা আছে এবং ঋতুভেদে ইহার পরিমাণ কিরূপ কমে বাড়ে। ধূলিকণাতে জান্তব বা ধাতব কি প্রকারের অণু সমূহ বর্ত্তমান আছে।

(৭) যে সমস্ত লোক ঐ স্থানে পূর্ব্বে গিয়াছেন তাঁহারা কিরূপ উপকার পাইয়াছেন।

(৮) স্বাস্থ্য-নিবাস এবং তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য কিরূপ। বাসগৃহ কিরূপ পাওয়া যাইতে পারে। তথাকার খাদ্যদ্রব্যাদি ও পানীয় জলের অবস্থা কি প্রকার। উপযুক্ত চিকিৎসক পাওয়া যায় কি না।

(৯) স্বাস্থ্য-নিবাসে যাতায়াতের সুবিধা কিরূপ।

(১০) যাতায়াতের ও থাকিবার খরচা কত।

উপরিউক্ত সমস্ত খবরগুলি সব সময় আবশ্যক না হইতে পারে। ভারতবর্ষে যে সকল স্বাস্থ্য-নিবাসের উপযুক্ত স্থান আছে, তাহার মধ্যে সকলগুলি আমাদের জানা নাই। চিকিৎসক ও সাধারণ লোকের সমবেত চেষ্টায় এই সমস্ত স্থান নিরূপণ করা যাইতে পারে।

আকস্মিক বিপদের চিকিৎসা।

ডাক্তার শ্রীসত্যশরণ চক্রবর্ত্তী, এম, বি, লিখিত—

সপ্তম অধ্যায়।

স্প্রেন (মচ্‌কান) Sprain.

গাঁইটের চারিদিকে যে লিগামেণ্ট (Ligament) বা ক্যাপস্যুল (Capsule) আছে তাহা সহসা পাক বা মোচড় খাইয়া বাড়িয়া যাওয়া কিম্বা ছিঁড়িয়া যাওয়াকে স্প্রেন (Sprain) কহে।

কারণ—গাঁইটের উপর পতন বা গাঁইটের কোনরূপ অস্বাভাবিক ও হঠাৎ চালন দ্বারা ইহা হইয়া থাকে।

লক্ষণ—ইহাতে আঘাত স্থানে বেদনা ও উত্তাপ হয় সেই স্থান ফুলিয়া উঠে এবং পরে সেই স্থানের চামড়ার বর্ণ পরিবর্ত্তন হয়।

চিকিৎসা—আহত স্থান স্থির ভাবে রাখ। হাতের গাঁইট আহত হইলে স্প্লিণ্টে ভালরূপ গদি দিয়া হাত বেশ করিয়া বাঁধিয়া দাও এবং হাত স্লিং বা বন্ধনীর দ্বারা গলায় ঝুলাইয়া দাও। হাতে বা কব্জিতে আঘাত লাগিলে হাতের সম্মুখে স্প্লিণ্ট লাগাও। যদি পা মচকাইয়া যায় তবে রোগীকে বিছানায় শোয়াইয়া পায়ের পিছনে স্প্লিণ্ট লাগাও এবং পা একটু উঁচু করিয়া রাখ। পা স্থির ভাবে রাখিয়া গাঁইটে ঠাণ্ডা জলের পটি বাঁধিয়া দাও। যদি ঠাণ্ডা সহ্য না হয় বা অতিরিক্ত বেদনা বোধ হয় তাহা হইলে যতদূর সহ্য হয় গরম জলে গাঁইট ভিজাইয়া দাও বা ভুষির সেক দাও।

ডিস্‌লোকেসন্ (সন্ধিচ্যুতি) Dislocation.

গাঁইটের কোনও হাড়ের স্থানচ্যুতিকে ডিস্‌লোকেসন্ কহে।

কারণ—স্প্রেনরই মত কিন্তু আরও অধিকতর রূপে আহত হওয়া।

লক্ষণ—

(ক) গাঁইটের বক্রভাব।

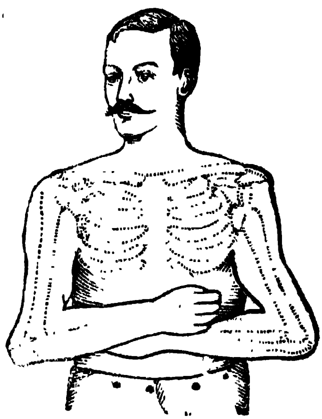
(খ) স্থানচ্যুত হাড়ের অগ্রভাগ, ত্বকের নীচে অনুভব করা যাইতে পারে।

(গ) ঐ অঙ্গের দৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তন।

(ঘ) সন্ধিস্থলের চালন রহিত হওন।

(ঙ) চালনে গাঁইটে অধিকতর বেদনা।

(চ) যখন অপর কেহ ঐ অঙ্গ নাড়িতে চেষ্টা করে তখন তাহার অপেক্ষাকৃত **স্থিরতা** (গ্রন্থির নিকটের হাঁড় ভাঙ্গার সহিত তফাৎ)—ভাঙ্গিলেই অঙ্গে **অস্বাভাবিক গতিশীলতা** দৃষ্ট হয়।



বামদিকের স্কন্ধ ও দক্ষিণ দিকের কুনুইয়ের গ্রন্থিচ্যুতি।

চিকিৎসা—বেদনা কমাইবার জন্য ঐ অঙ্গ সম্পূর্ণরূপে স্থির ভাবে রাখ। রোগীকে সহজ ভাবে শোয়াইয়া রাখ এবং ডাক্তার ডাকিতে পাঠাও। সন্ধিচ্যুত হাড় পুনঃ স্থাপিত (Reduce) করিতে চেষ্টা করিও না।

ফ্রাক্চার্, অস্থিভঙ্গ। (Fracture.)

হাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়াকে ফ্রাক্চার্ কহে।

কারণ—

(ক) সোজা ধাক্কা—ইহাতে হাড় আঘাত স্থানে ভাঙ্গে।

(খ) বাঁকা ধাক্কা—ইহাতে হাড় আঘাত স্থান হইতে কিছু দূরে ভাঙ্গে। যেমন,—প্রসারিত হাতের উপর আঘাত লাগিলে কণ্ঠের হাড় ভাঙ্গে। উচ্চ স্থান হইতে পদদ্বয়ের উপর ভর দিয়া পড়িলে মস্তকের তলদেশের হাড় ভাঙ্গিয়া যায়।

(গ) পেশীর কার্য্য—পেশীর সহসা অতিরিক্ত সঙ্কোচনেও হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। যেমন লাফাইবার সময় হাঁটুর মালাইচাকি (Patella) ভাঙ্গে।

অমিশ্রিত এবং মিশ্রিত ভেদে ফ্রাক্চার দুই প্রকার।

(ক) অমিশ্রিত—বা সিম্পল (Simple) যখন কেবলমাত্র হাড় ভাঙ্গে।

(খ) মিশ্রিত—বা কম্পাউণ্ড (Compound) যখন হাড় ভাঙ্গার সহিত উহার উপরের চামড়ার উপর পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়। ভাঙ্গা হাড় বায়ুর সহিত সংস্পৃষ্ট হয়।



টিবিয়ার মিশ্রিত (কম্পাউণ্ড) ফ্রাক্চার্।

ফ্রাক্‌চার্‌কে (Fracture) নিম্নলিখিত শ্রেণীগুলিতেও বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা :—

(১) চূর্ণিত—(Comminuted) যখন হাড় অনেক অংশে বিভক্ত হইয়া যায়।



দক্ষিণ ফিমারের চূর্ণিত অস্থিভঙ্গ।

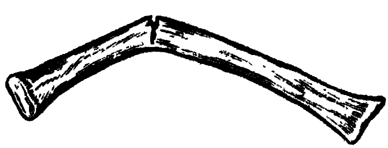
(২) জটিল—(Complicated) যখন হাড় ভাঙ্গাতে পার্শ্বস্থ কোনও কোমল অংশ আহত হয়; যেমন শিরা বা স্নায়ুর ছেদন, গাঁইট ছিন্ন হওয়া, শরীরের ভিতরের যন্ত্র সমূহের যেমন ফুস্‌ফুস, মূত্রাধার ইত্যাদির ক্ষতি।

(৩) অনুপ্রবিষ্ট—Impacted যখন হাড় ভাঙ্গিবার পর এক অংশ অপর অংশের মধ্যে প্রবেশ করে।



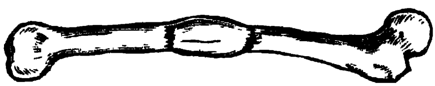
দক্ষিণ ফিমারের নিম্নঅংশে একত্রিত অস্থি ভঙ্গ।

(৪) গ্রিনষ্টিক—Greenstick যখন হাড় বাঁকিয়া যায় বা অসম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গে। ইহা প্রায়ই শিশুদের মধ্যে দেখা যায়।



রেডিয়াসের গ্রীনষ্টিক্ অস্থি ভঙ্গ।

ভগ্নহাড়ের সংস্কার—ভগ্ন হাড়দ্বয় এবং ছিন্ন পেরিয়সটিয়মের (Periosteum) মধ্যস্থ ব্যবধান কেলাস (Callus) নামক এক প্রকার নরম নূতন বস্তুতে পরিপূর্ণ হয়। ইহা ভাঙ্গা হাড়দ্বয়কে একত্রিত রাখে। ক্রমে এই নরম বস্তু ফাইব্রাস টিস্যুতে (Fibrous tissue)তে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহাতে লাইম সল্ট (Lime salt) জমিয়া হাড় উৎপন্ন হয়। প্রথম প্রথম এই নূতন হাড় ভাঙ্গা হাড়ের চতুর্দ্দিকে অনুভব করা যায় কিন্তু পরে সম্পূর্ণরূপে মিলাইয়া যায়। যদি ভাঙ্গা অংশ সম্পূর্ণ স্থির ভাবে না রাখা হয় তাহা হইলে কেলাস (Callus) ফাইব্রাস (Fibrous) ভাবেই রহিয়া যায় এবং হাড়ের দ্বারা হাড় জোড়া না লাগিয়া ফল্‌স্ যয়েণ্ট (False joint) বা মিথ্যা গ্রন্থি হইয়া থাকে।



ফিমারের ভগ্ন অংশদ্বয় কেলাস দ্বারা আবৃত।

হাড় ভাঙ্গার লক্ষণ :—

(ক) আঘাত স্থানে বেদনা, ফুলা এবং বক্রভাব (Deformity)।

(খ) যে স্থান সঞ্চালিত হয় না সেই স্থানের অস্বাভাবিক চালন ;

(গ) উক্ত অঙ্গের শক্তি হীনতা।

(ঘ) আহত অঙ্গের হ্রাস প্রাপ্তি।

(ঙ) ক্রেপিটাস (Crepitus)—অর্থাৎ যখন ভাঙ্গা হাড়ের দুই প্রান্ত নাড়া যায় তখন এক প্রকার ঘর্ষণ শব্দ অনুভব করা যায়।

চিকিৎসা—নিম্নলিখিত বিষয় দুইটীতে তৎক্ষণাৎ মনোযোগী হওয়া :

(ক) অধিকতর ক্ষতি হইতে না দেওয়া।

(খ) আহত ব্যক্তিকে সাবধানে উপযুক্ত স্থানে বহন করা।

(ক) অধিকতর ক্ষতি হইতে না দেওয়া—ইহার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অবলম্বন করিবে।

(১) যে স্থানে আঘাত ঘটিয়াছে সেই স্থানেই রোগীকে দেখা উচিত; বিশেষতঃ পায়ের আঘাতে।

(২) স্প্লিণ্ট (Splint) এবং ব্যাণ্ডেজ (Bandage) প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত অঙ্গ ছুঁইও না। কেবলমাত্র কি হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য যতটুকু আবশ্যক ছুঁইতে পার।

(৩) হাড় ভাঙ্গা নির্ণয় করিতে এবং স্প্লিণ্ট (Splint) পরাইতে যতদূর সম্ভব যত্ন ও ধীরতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ অসাবধানতার সহিত নাড়া চাড়া করিলে ভগ্ন হাড়ের দ্বারা অমিশ্রিত ফ্রাক্চার (Simple Fracture) মিশ্রিত বা জটিলে (Compound Fracture) পরিণত হইতে পারে। যে সকল হাড় ত্বকের অব্যবহিত নীচে আছে, যেমন টিবিয়া (Tibia) ও ক্লাভিকেল্ (Clavicle) বা কণ্ঠাস্থি, তাহাদিগের জন্য বিশেষরূপে সাবধান হওয়া উচিত।

(৪) যদি ফ্রাকচার (Fracture) সহজ বা অমিশ্র হয় এবং রক্তস্রাব না থাকে তাহা হইলে কাপড় না সরাইয়া ভগ্ন অস্থিদ্বয়কে নিম্নলিখিত ভাবে পরস্পর একত্রে আন। প্রথমে ভগ্নস্থানের উপর ও নিম্নে ধীর, কিন্তু দৃঢ়ভাবে ধরিয়া এক সঙ্গে উঠাও। পরে ইহাকে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার জন্য ধীর ভাবে (Extension) এক্সটেন্সন ও কাউন্টার এক্সটেন্সন (Counter Extension) দাও। অর্থাৎ ভগ্ন হাড়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে বিপরীত দিকে টানিতে হইবে।

(৫) এই অবস্থায় ঐ অঙ্গকে স্প্লিণ্ট (Splint) এবং ব্যাণ্ডেজের (Bandage) দ্বারা স্থায়ী কর।

স্প্লিণ্ট (Splint) বাড়।

ইহা কঠিন বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত এবং যে স্থানের স্বাভাবিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হয় কিম্বা যেখানে অতিরিক্ত চালনা হ্রাস করিবার আবশ্যক হয় সেই স্থানে ইহা লাগান হয়। ইহা নানাপ্রকার দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিত হয় এবং যে অঙ্গে লাগান হয়, ভালরূপে বসাইবার জন্য সেই অঙ্গের আকৃতি দেওয়া হয়।

যে সময়ে ফ্রাক্‌চার (Fracture) হয় সেই সময় রোগীর চতুর্দ্দিকস্থ অনেক দ্রব্য হইতে প্রথম সাহায্যার্থে স্পিল্‌ণ্ট তৈয়ারী হইতে পারে ; যেমন,— (১) গৃহে—চিকের কাটি, জুতার কাগজের বাক্স, পেষ্টবোর্ড, খবরের কাগজ, মদের বোতলঢাকনা, ছাতা, লাঠি, মোজার ভিতর খড় বা বিচালি পুরিয়া ; (২) কারখানায়—কাঠের টুকরা, লাঠি, গজকাঠি ; (৩) সৈন্য নিবাসের মধ্যে—উরুভঙ্গে—বন্দুক ; পা ভাঙ্গায়—তলোয়ার (Sword, bayonet), হাত ভাঙ্গায়—কিরিচ।

প্রথম সাহায্যার্থে এই সকল স্পিল্‌ণ্ট কঠিন দ্রব্য দ্বারা তৈয়ারী করা উচিত কেননা তাহারা যেন অস্থির ভগ্ন অংশ গুলিকে একত্রিত রাখিতে পারে। ইহারা লম্বে ভঙ্গ অস্থির নিম্ন গাঁটের বাহিরে যাইবে এবং প্রস্থে যে অঙ্গে লাগান হইবে তাহার ন্যায় হইবে। স্পিল্‌ণ্ট (Splint) লাগাইবার পূর্ব্বে স্পিল্‌ণ্টের যে দিক শরীর স্পর্শ করিবে তাহাতে তূলা, ফ্লানেল, পাট প্রভৃতি নরম বস্তু দ্বারা ভালরূপে গদি আঁটিবে (যে স্থানের কাপড় সরান না হয় সে স্থানে দরকার নাই)। এই গদি স্পি ণ্টের ধারের উপর দিয়া অপর দিক পর্য্যন্ত যাইবে।

স্পিল্‌ণ্ট (Splint) লাগাইতে দুই জন ব্যক্তির আবশ্যক হয়। একজন উপরিলিখিত রূপে এক্সটেন্সন (Extension) এবং কাউন্‌টার এক্সটেন্সন্ (Counter Extension) বজায় রাখে, ও অপর ব্যক্তি ভগ্ন অঙ্গের (Limb) দুই ধারে (Splint) স্পিল্‌ণ্ট পরায় এবং ফিতা, বেল্ট, তেকোনা ব্যাণ্ডেজ (Triangular bandage) বা পটি দ্বারা বাঁধিয়া দেয়। ব্যাণ্ডেজের সমুদায় গাঁইট বাহিরের স্পিল্‌ণ্ট (Splint) এর গায়ে থাকিবে এবং কোনটাই হাড়ের উপর থাকিবে না। তেকোনা (Triangular) ব্যাণ্ডেজের দ্বারা কিরূপে স্পিল্‌ণ্ট বাঁধা হয় তাহা অপর স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রথম সাহায্যার্থে স্পিল্‌ণ্ট (Splint) এরূপ ভাবে লাগাইবে যেন আবশ্যক হইলে সহজে খোলা যায়। হাড় ভাঙ্গিলেই আহত ব্যক্তি অল্প বিস্তর অবসন্ন অর্থাৎ কিছু Shock পায়। এই জন্য রোগীকে গরম কাপড় ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত।

আহত ব্যক্তিকে উপযুক্ত ভাবে স্থানান্তরে বহন করিবার নিয়ম—

Fracture (ফ্রাক্‌চার) হইলে যে পর্য্যন্ত না ভাঙ্গা হাড় বাঁধা হয় সে পর্য্যন্ত রোগীকে নড়ান উচিত নয়। সে-চলিতে সক্ষম হইলেও তাহাকে একাকী যাইতে দেওয়া উচিত নয় কারণ Fracture (ফ্রাক্‌চার) হইবার পর অবসন্নতা, মাথা ঘোরা, অচৈতন্যতা প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা। হস্তের ফ্রাক্‌চারে (Fracture) রোগী কিছু সাহায্য পাইলে চলিতে পারে। পায়ের ফ্রাক্‌চারে (Fracture) রোগীকে সকল অবস্থাতেই ষ্ট্রেচারে (Stretcher) করিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইবে। (Stretcher (ষ্ট্রেচার) প্রস্তুত ও বহন করিবার প্রণালী অন্য পরিচ্ছদে দেখ।)

কম্পাউণ্ড ফ্রাক্‌চারের (Compound Fracture) অব্যবহিত পরের (Immediate) চিকিৎসা।—

আবশ্যক মত আহত স্থান হইতে অতি যত্নের সহিত কাপড় সরাও। আহত হস্তের জামা খুলিতে হইলে সুস্থ হস্তের দিকে প্রথম খোলা উচিত। না পারিলে কাপড় কাটিয়া ফেলিবে। ট্রাউজার (Trouser) পরা থাকিলে বাহিরের দিকের সেলাই কাটিয়া খোলা ভাল। জুতা কাটিয়া পা বাহির করা কখন কখন আবশ্যক হয়। রক্তস্রাব থাকিলে ঐ অঙ্গ উঁচু করিয়া ধর বা ক্ষতের উপরের ধমনী চাপিয়া ধর। যেমন করিয়া হউক প্রথমে রক্তস্রাব বন্ধ করিবে। যদি বহন যান (Stretcher) ও উপযুক্ত চিকিৎসক শীঘ্র পাওয়া না যায় তাহা হইলে ক্ষতে ময়লা ঢুকিতে না পারে এরূপ ভাবে পরিষ্কার প্যাড (Pad) চাপা দাও এবং উপরোক্ত ভাবে স্প্লিণ্ট লাগাইয়া রোগীকে সরাইয়া লইয়া যাও। উপযুক্ত সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলে ক্ষত স্থান এণ্টিসেপ্টিক্ সলিউসান (Antiseptic solution) দ্বারা ১২শ পরিচ্ছদের নিয়ম অনুসারে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া এণ্টিসেপ্টিক্ ড্রেসিং (Antiseptic dressing) লাগাইয়া এবং স্প্লিণ্ট (Splint) বাঁধিয়া তাহার পর রোগীকে লইয়া যাও।

শিশুদিগের প্রতি ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় উপদেশ।

মনুষ্যের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বাল্যকালের শিক্ষার উপর নির্ভর করে। চরিত্র গঠনের জন্য এই তিনটীরই সামঞ্জস্য আবশ্যক। মনুষ্যের স্বভাব ও চরিত্র যৌবনাবস্থাতেই পরিস্ফুট হয় কিন্তু ইহার বীজ নিতান্ত শৈশবাস্থায় অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। ভবিষ্য জীবনে চরিত্র গঠন কোন পথে হইবে শৈশবের ঘটনাবলী দ্বারাই তাহা নির্দ্দিষ্ট হয়।

যে সকল মানসিক ভাব চরিত্র গঠনে সহায়তা করে তাহাদের মধ্যে কামপ্রবৃত্তি একটী প্রধান। সাধারণের ধারণা এই যে কামপ্রবৃত্তি যৌবন কালেই আবির্ভূত হয় কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ্ আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে জন্মকাল হইতেই কামপ্রবৃত্তির উন্মেষ হইয়া থাকে; যৌবনে ইহা পরিপুষ্টি লাভ করে মাত্র। শৈশবের ও যৌবনের কামপ্রবৃত্তির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। বাল্য জীবনে প্রথম ৫ বৎসরের মধ্যে এই প্রবৃত্তির যে ভাবে উন্মেষ হয় ভবিষ্য জীবনে চরিত্রেরও সেই ভাবে গঠন হইয়া থাকে। এজন্য শিশুকালেও যাহাতে সৎশিক্ষার অভাব না হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ রাখা কর্ত্তব্য।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের মতে কামপ্রবৃত্তির ক্রম বিকাশ হইতেই প্রেম, স্নেহ, সহানুভূতি, সাহস, কবিত্বশক্তি ইত্যাদি উচ্চভাব সমূহ উদ্ভূত হইয়াছে। অসৎশিক্ষা বা অন্য কোন কারণে এই ক্রম বিকাশের ব্যতিক্রম ঘটিলে নানাপ্রকার নৈতিক ও মানসিক অবনতি ঘটিতে পারে। একজন জর্ম্মান মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বহু গবেষণা ও পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি মানসিক ব্যাধি শৈশবকালে কামপ্রবৃত্তির ক্রম বিকাশের ব্যতিক্রমেই উৎপন্ন হয়।

শিশুদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধারণা শক্তি সম্বন্ধে আমাদের অনেকরই ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে। অনেক পিতা মাতাই দেড় বৎসর বা দুইবৎসর বয়স্ক শিশুর নিকট কথাবার্ত্তা ও অন্যান্য বিষয়ে যে সংযমের আবশ্যক আছে তাহা মনে করেন না। অতি অল্প বয়স হইতেই সন্তানকে পৃথক শয্যায় শয়ন করান উচিত। দাসদাসীদিগের সংস্পর্শেও অনেক সময় শিশুগণ কুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়; এ বিষয়ে বিশেষে লক্ষ রাখা আবশ্যক।

সন্তানকে উপযুক্ত ভাবে পালন করিতে হইলে তাহাকে এক পক্ষে যেরূপ অসৎশিক্ষা হইতে বিরত রাখিতে হইবে, অপর পক্ষে সেরূপ কামবৃত্তি সম্বন্ধীয় তাহার স্বাভাবিক কৌতুহল সমূহ সদুত্তর দানে চরিতার্থ করা নিতান্ত আবশ্যক। অনেকেই এসম্বন্ধে সন্তানদিগের সহিত আলোচনা লজ্জাকর মনে করেন এবং তাহাদিগের স্বাভাবিক কৌতুহল কল্পিত উত্তর দানে বা তাড়না করিয়া নিরস্ত করেন। শিশুর মনে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ভগ্নী কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিল এই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক এবং পিতা মাতার নিকট হইতে এই প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলে শিশু নিজেই ইহার একটী কাল্পনিক কারণ ঠিক করিয়া লয়। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এরূপ কাল্পনিক ধারণা কোন কোন সময়ে শিশুর মনোবৃত্তির উন্নতির ব্যাঘাত করে। পিতা মাতা সন্তান উৎপাদন সম্বন্ধে মিথ্যা কারণ দর্শাইলে শিশু বড় হইলে তাঁহাদের কথায় আস্থাহীন হয়।

শিশুর বয়স ও বুদ্ধির হিসাবে তাহার প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া তাহার কৌতুহল নিরাকরণ করা উচিত। মাতা নিজে সন্তানকে অবসর বুঝিয়া এই সমস্ত বিষয় বুঝাইবার ভার লইবেন। ইহাতে কোন প্রকার মিথ্যা লজ্জা বা দ্বিধা করিলে চলিবে না। সন্তান মাতাকে লজ্জিত বা দ্বিধাযুক্ত দেখিলে তাহারও মনে লজ্জার বা দ্বিধার ভাব আসিবে। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালকদিগের শিক্ষার ভার পিতা গ্রহণ করিবেন এবং বালিকাদিগের শিক্ষার ভার মাতার উপরেই ন্যস্ত থাকিবে।

পিতা মাতা ও সন্তানের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস থাকিলে সন্তান বহুবিধ প্রলোভন হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। বালকগণ তাহাদের বন্ধুবর্গের নিকট হইতে বা অন্যরূপ ধৃষণীয় উপায়ে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে এবং নানারূপ প্রলোভনের মধ্যে পতিত হয়; পূর্ব্বেই পিতা মাতা কর্ত্তৃক এই সমস্ত বিষয়ে সাবধান হইয়া থাকিলে তাহারা সহজেই নিজেকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে।

যৌবনের প্রারম্ভে বালক বালিকাদিগের শারীরিক ও মানসিক নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে এবং এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের জন্য তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত।

ঋতুমতী হইবার পুর্ব্বে বালিকাদিগকে ঋতুকালে কি কি পরিবর্ত্তন হয় এবং জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে হইলে মাতার নিজের এ সম্বন্ধে জানা থাকা আবশ্যক। বালকদিগের যৌবন উন্মেষের সহিত মধ্যে মধ্যে স্বপ্নদোষ হইয়া থাকে ; পুর্ব্ব হইতে এ সমস্ত বিষয় জানা থাকিলে তাহারা এই স্বাভাবিক ঘটনাকে রোগ বলিয়া মনে করিবে না। অনেক সময় বালকদিগের যৌবনোদ্ভেদের সহিত এই সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকিলে তাহারা অজ্ঞানতা বশতঃ নিতান্ত ভীত হইয়া পড়ে এবং ইহাকে কুৎসিত রোগ মনে করিয়া লজ্জার জন্য পিতা মাতার নিকট এ সমস্ত বিষয় বলিতে পারে না। এই মনঃকল্পিত ব্যাধি হইতে উদ্ধার লাভের জন্য তাহারা বন্ধুবর্গের পরামর্শে এবং নানারূপ পেটেন্ট ঔষধের বিজ্ঞাপনে ভুলিয়া বহুবিধ ঔষধ খাইয়া সুস্থ শরীর ব্যস্ত করিয়া তোলে এবং দারুণ দুশ্চিন্তার জন্য শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা দ্বারা আক্রান্ত হয়। আমাদের দেশে এইরূপে ছাত্রদিগের মধ্যে যে কত অমূল্য স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

যৌবনের প্রারম্ভে বালক বালিকাদিগকে অত্যধিক মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম করিতে দেওয়া উচিত নহে। এই সময়ে মুক্তবায়ু সেবন এবং নিয়মিত ব্যায়াম ও খেলা ধূলা শরীরের পক্ষে উপকারী। বর্দ্ধনশীল বালক বালিকাদের অন্ততঃ আট নয় ঘণ্টাকাল ঘুমান উচিত এবং এই হিসাবে পাঠের সময় নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। পিতা মাতার পক্ষে স্বীয় সন্তানের জন্য বন্ধু নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে কিন্তু তাঁহারা সহজেই পুত্র কন্যাদিগের সহিত অনুপযুক্ত বন্ধুবর্গের ঘনিষ্টতা নিবারণ করিতে পারেন।

মুষ্টিযোগ বিচার।

পরম পিতা পরমেশ্বর ইহজগতের জন্য কিছুই বৃথা সৃজন করেন নাই। তরু, লতা, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য ও পশু পক্ষ্যাদি যাবতীয় পদার্থ দেখা যায় সকলেই এক এক ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ বা অপরের আহার্য্য যোগাইতেছে, কেহ বা অপরের বিনাশ সাধন করিতেছে, কেহ বা অপরকে রোগ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে।

রোগ মনুষ্যের নিত্য নৈমিত্তিক সহচর। রোগ নানা আকারে আমাদের শরীরে সদা বাস করিতেছে। নানা প্রকার রোগের বীজাণু সকল আমাদের শরীরে প্রায়ই বর্ত্তমান আছে। তবে যখন আমরা সুস্থ অবস্থায় থাকি তখন তাহারা কেবল শরীর মধ্যে অবস্থান করে মাত্র। কোন প্রকার বিষক্রিয়া প্রকাশ দ্বারা রোগ উৎপাদন করে না। শরীরের অভ্যন্তরস্থ রক্তের শ্বেত কণিকা সকল সদাসর্ব্বদা এই সকল বহিঃশত্রুকে সংযত করিয়া রাখে।

তবে স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটিলে এই সকল নিরীহ জীবাণুরা বিষক্ষরণ করে। হেলে সাপ কেউটে সাপে পরিণত হয়। এই বিষজন্য শরীরে রোগ উপস্থিত হয়। তখন রোগী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় ও রোগের প্রতিকারের জন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থামত ঔষধ সেবন করে এবং এই ঔষধ রূপ শেল রোগ শত্রুকে দমন করে।

কিন্তু সকল সময় সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় সুচিকিৎসক প্রাওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়ে। রোগ শত্রু সুবিধা পাইয়া নিজের বিষজাল ক্রমশঃ বিস্তার করিয়া রোগীর প্রাণ সংশয় উপস্থিত করে।

যে প্রকার শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অস্ত্র শস্ত্রাদির অভাবে শত্রুকে মুষ্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত, পদাঘাত ইত্যাদির দ্বারা দমন করিবার সহজ ব্যবস্থা আছে সেই প্রকার রোগ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে উপযুক্ত চিকিৎসক ও ঔষধাদির অভাবে মুষ্টিযোগ রূপ অনায়াসপ্রাপ্ত, বিনা ব্যয়সাধ্য তরুলতাদির দ্বারা রোগের দমন হইয়া থাকে এবং আরোগ্যের পথ উন্মুক্ত হয়।

যত প্রকার বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ও ওষধি সকল আমরা দেখিতে পাই তাহাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু রোগ দমনে ক্ষমতা আছে। আমাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার জন্য আমরা তাহাদের গুণাগুণ জানিবার চেষ্টা করি না বা জানিলেও সামান্য ভাবিয়া অবজ্ঞাও ঘৃণা করিয়া তাহাদিগকে রোগ প্রতিকারের জন্য ব্যবহার করি না। ইহা কি আক্ষেপের বিষয়!

আজ চিকিৎসকবর্গ গর্ব্বিত ভাবে বলিতেছেন আমরা Rational treatment করিয়া থাকি। হাতুড়ে বা মেয়েলি ভাবে ঔষধ প্রয়োগ করি না। কিন্তু এই যে Rational treatmentএর ঔষধ সকল তাহারা কোথা হইতে পাইলেন। এই Cinchona যাহা আজ Allopathy ঔষধের মুকুট মণি, যাহা হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর নাশক একমাত্র ঔষধ Quinine উৎপন্ন হয় তাহা তাঁহাদিগকে কে শিখাইল।

ভগবান যেখানে ব্যাধির সৃষ্টি করিয়াছেন সেই খানেই তাঁহার ঔষধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা অজ্ঞ, বিজ্ঞান আলোকে গর্ব্বিত সেইজন্য পরম পিতার অযাচিত দান সকলের প্রতি দৃকপাত করি না। রোগ হইলে নামজাদা ডাক্তার চাই, দামি ঔষধ চাই ধুমধাম চাই তবে রোগের প্রতিকার হইবে।

যেখানে রোগ সেই খানেই তাহার ঔষধ পাইবেন। যেখানে Malariaর আদি আবাস ভূমি সেই খানেই Cinchona বৃক্ষের বিস্তার। যেখানে যে ব্যাধি সেই খানেই তাহার প্রতিকার আছে।

স্পেনদেশীয় কাউণ্টেস সিঙ্কোনা নামক এক সম্ভ্রান্ত রমণী ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে পেরুদেশে গিয়াছিলেন। তিনি সেথানে কম্পজ্বর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তৎকাল প্রচলিত চিকিৎসকদিগের কোন ঔষধে তাঁহার রোগ উপশম করিতে পারে নাই। পেরুদেশস্থ আদিম অধিবাসীদিগের উপদেশ ক্রমে তিনি তথাকার এক বৃক্ষের ত্বক্ সিদ্ধ করিয়া খাইয়া জ্বরমুক্ত হন। তিনি ইউরোপ প্রত্যাবর্ত্তন কালে এই বহুমূল্য পেরুদেশীয় বৃক্ষের ত্বক সংগ্রহ করিয়া আনেন। প্রথমতঃ ইউরোপে এই ত্বক ব্যবহার জন্য অত্যন্ত বাধা ও আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল। পরে সেই সম্ভ্রান্ত মহিলার চেষ্টাতে অনেক জ্বর রোগী আরোগ্য হয় এবং ইউরোপ খণ্ডে ইহা ক্রমশঃ বিস্তৃতি

লাভ করে। কাউণ্টেস সিঙ্কোনার নামে এই ত্বক সিঙ্কোনা বার্ক নামে ইউরোপে অভিহিত হয়। ইহা হইতেই ম্যালেরিয়া রোগ নাশক কুইনাইন প্রস্তুত হয়।

অধিকাংশ স্থলেই অজ্ঞ লোকদের দ্বারা উদ্ভিজ্জ ঔষধাদির রোগ আরোগ্যের ক্ষমতা চিকিৎসকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বাত ব্যাধিতে সেলিসিন নামক ঔষধের আশ্চর্য্য ক্রিয়া ডাক্তার "ম্যাকলাগান" অতি অদ্ভুতরূপে আবিস্কার করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে জল বায়ু দূষিত হইয়া যেখানে রোগ উৎপন্ন করে, সেই দূষিত জল বায়ু আবার সেই রোগের ঔষধও উৎপাদন করিয়া থাকে। আর্দ্র স্থানে যে প্রকার বাত ব্যাধি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আর্দ্র স্থানের বৃক্ষাদির ভিতর তিনি বাত ব্যাধির ঔষধ অন্বেষণ করিয়াছিলেন। উইলো বৃক্ষ আর্দ্রস্থানে অধিক পরিমাণে জন্মায় বলিয়া বাত ব্যাধির চিকিৎসার জন্য তিনি ইহা প্রথম পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার ফলে উইলো বৃক্ষ হইতে বাতব্যাধির পক্ষে মহোপকারী 'সেলিসিন' নামক ঔষধ আবিষ্কৃত হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার কোন ইংরাজ ডাক্তার হটেণ্টোদিগের দ্বারা উইলো গাছ সিদ্ধ করিয়া, জ্বর ও গ্রন্থিস্ফীতি রোগে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছেন।

আমাদের এই রোগ ও দরিদ্রতা ক্লিষ্টদেশে লোকে চিকিৎসক ও ঔষধের অভাবে নানাপ্রকার রোগে কষ্ট পাইতেছে এবং অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে ঈশ্বরের কৃপায় ঔষধাদির অভাব নাই। প্রত্যেক বৃক্ষাদির কোন না কোন ভৈষজ্য শক্তি আছে। এই সকল শক্তি কতক বা আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে কতক বা স্থানীয় লোকেরা বিদিত আছে এবং লোক পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু এই ভারতবর্ষে একই বৃক্ষ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। এমন কি এই বাঙ্গালা দেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন নাম দেখা যায়। আবার অনেক স্থলে এই সকল ঔষধের উপযুক্ত মাত্রা না জানা থাকায় কোন উপকার দেখা যায় না বা বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়।

অনেক সময় গাছ না চিনিবার জন্য একের পরিবর্ত্তে অন্যটী ব্যবহৃত হওয়ায় উপকার হয় না বা অপকার দেখা যায়।

এই সকল অভাব যথাসম্ভব দূরীকরণার্থ আমরা ধারাবাহিক ক্রমে আমাদের সাধারণ বৃক্ষাদির **ভিন্ন নাম তাহাদের আকৃতি বর্ণন ও স্বরূপ নির্ণয়**—(চিত্রাদির দ্বারা)—তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের গুণাগুণ (মুল, ত্বক, স্কন্ধ, আঠা, পাতা, পুষ্প, ফল ও বীজ) সকল, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অংশের রাসায়নিক উপাদান ও তাহার বিশ্লেষণ, ইহাদের জন্তুদিগের ও মনুষ্য শরীরের উপর ক্রিয়া, কি প্রকার রোগ বিনাশ করে তাহার বিচার এই সকল যতদূর সম্ভব সাধারণের অবগতির জন্য সহজ ভাষায় প্রকাশ করিব। এক্ষণে পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট এই সুবৃহৎ কার্য্যের জন্য প্রার্থনা করিয়া আগামী বৈশাখ হইতে ধারাবাহিক ক্রমে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। চিকিৎসকমণ্ডলী ও জনসাধারণে এ বিষয়ে আমাদের তথ্যাদি সংগ্রহ দ্বারা সাহায্য করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

বৈশাখ মাসের প্রথমেই আমরা অশ্বথ ও শাল্মলী তরু সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশ করিব। যদি কেহ এই সকল বৃক্ষাদির ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদিগকে জ্ঞাপন করেন তাহা হইলে কৃতার্থ হইব।

প্রেরিত পত্র।

মাননীয় মহাশয়ঃ—

মাঘ মাসের স্বাস্থ্য-সমাচার পত্রিকায় "স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয়" প্রশ্নের উত্তর কি ব্যক্তিগত ভাবে কি সাধারণ ভাবে প্রদত্ত হইবে জানিয়া গ্রাহক ও পাঠক বর্গ বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছেন। অনুগ্রহ প্রকাশে নিম্নলিখিত প্রশ্নটীর যথাযথ উত্তর দানে আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

আহার, নিদ্রা ও ব্যায়াম, শরীর রক্ষার্থ তিনই উপযুক্ত ভাবে সেব্য। পল্লীগ্রামে স্কুলের সংখ্যা খুবই কম—অধিকাংশ স্থলে বালকদিগকে ১ হইতে ৪ মাইল পর্য্যন্ত

দূরবর্ত্তী স্কুলে যাতায়াত করিতে হয়। বেলা ৯টার সময় পেট ভরিয়া আহার করিয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া স্কুলে যায় পরে ৪টার পরে খালি পেটে আবার বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। এরূপ অবস্থায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ অনিবার্য্য। কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয়ে এতদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই তাহাদের সাধ্যায়াত্ত নহে এমতাবস্থায় কিরূপ ব্যায়াম তাহাদের অনুষ্ঠেয় বা আদৌ অনুষ্ঠেয় কি না? গ্রীষ্মাবকাশের পূর্ব্বে এপ্রিল, মে এই দুই মাস প্রাতঃকালে স্কুল হয় কারণ দারুণ গ্রীষ্মবশতঃ দুইপ্রহর বেলায় স্কুলের কার্য্য চলিতেই পারে না। প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত স্কুল হয়—পরে সেই ১০টার পরে ছাত্রগণ যখন তাহাদের ৩।৪ মাইল দূরবর্ত্তী গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয় তখন তাহাদের ক্লেশ অবর্ণনীয়। এই সময়ে ছেলেদের প্রায়ই সর্দ্দিগর্ম্মি হয় এবং সারাটা বৎসর একই ভাবে কাটিয়া যায়। এই অবস্থায় স্ব স্ব গ্রামে বিকালে তাহারা খেলা করে। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে কতদূর অনুকূল জানাইবেন।

আপনার পত্রিকায় ছাত্র ও তাহাদের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য বিষয়ে বিশদ আলোচনা হইলে সাধারণে বাধিত হইবে।

বশংবদ—

শ্রী নরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী।

Rayra P.O. *Jessore Dist.*

উত্তর—

আহারের পর কিয়ৎকাল বিশ্রাম না করিয়া রৌদ্রের সময় ৩।৪ মাইল দূরবর্ত্তী স্কুলে যাওয়া বালকদিকের পক্ষে কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ অনিবার্য্য। পরিপাকের সময় পাকস্থলীতে অধিক পরিমাণ রক্ত সঞ্চালনের আবশ্যক, এই সময় ব্যায়াম বা অধিক চলাফেরা করিলে রক্ত পাকস্থলীতে না যাইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে চালিত হয় এবং ইহাতে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়। এজন্য আহারের পর এক ঘণ্টাকাল বিশ্রাম না করিয়া অধিক দূরবর্ত্তী স্থানে গমনাগমন উচিত নহে। বালকদিগের আহারের সময় এরূপভাবে নির্দ্ধারিত করা উচিত যেন তাহারা বিশ্রামের

জন্য এই অবসর পায়। ইহাতে গৃহস্থের কিছু অসুবিধা হইতে পারে কিন্তু বালকদিগের স্বাস্থ্যের তুলনায় এ অসুবিধা ধর্ত্তব্য নহে। স্কুলে পৌছিয়া অন্তত ১০।১৫ মিনিট কাল বিশ্রাম করিয়া পাঠে মন নিবেশ করা কর্ত্তব্য।

যে সকল বালককে ৩।৪ মাইল হাঁটিয়া স্কুলে যাওয়া আসা করিতে হয় তাহাদের অপর কোনরূপ ব্যায়ামের বিশেষ আবশ্যক নাই। চলিবার সময় ব্যায়াম করিতেছি এই ধারণা মনে রাখিলেই যথেষ্ট ব্যায়াম করা হইবে। এই সম্বন্ধে আমাদের ভাদ্র মাসের স্বাস্থ্য-সমাচারে প্রকাশিত "অঙ্গচালনা" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালকেরা স্কুল হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় কিছু ব্যায়াম করিতে পারে। সকলের পক্ষেই বৈকালে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মুক্ত স্থানে বায়ু সেবন প্রশস্ত। প্রাতঃকালে স্কুল করিয়া বৈকালে সামান্য ব্যায়াম করা যাইতে পারে।

—o—

মাননীয় মহাশয় ঃ—

* * * ১। নাভিতে তৈল দিলে ঠোঁট ফাটেনা ইহা সত্য কিনা। নাভির সহিত ঠোঁটের Physiological ও Anatomical সম্বন্ধ কি? স্বাস্থ্য-সমাচারে ইহার উত্তর দিয়া সুখী করিবেন।

২। এদেশে লোকে মাথা নেড়া করিয়া টিকির কাছে একটু চুল রাখে। বাঙ্গালীদের টিকি নাই বলিয়া ঘৃণা করে বলে টিকি না থাকিলে হিন্দু নয় মুসলমান। টিকি রাখার কোন Physiological necessity বা উপকারিতা আছে কি না? বা না রাখায় কোন ক্ষতি আছে কি না?

৩। মাথা নেড়া করা উচিত না বড় চুল রাখা উচিত কিসে বেশী লাভ কিসে ক্ষতি হয় (শরীরের ও Mental activityর পক্ষে)।

৪। বাঙ্গালীদের কোন Head dress নাই, জগতের সকল জাতীর আছে ইহার History কি? বাড়ীর বাহির হইলে Head dress ব্যবহার উচিত কি না? হানিকর না উপকারক?

যথাযথ উত্তর প্রকাশিত হইলে বাধিত হইব। বিনীত—

শ্রীকুমারেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

হিসলপ কলেজ, নাগপুর।

উত্তর—

১। নাভিতে তৈল দিলে ঠোঁট না ফাটিবার কোনরূপ কারণ জানা নাই।

২। টিকি রাখা ধর্ম্মমূলক সংস্কার মাত্র। ইহার সহিত স্বাস্থ্যের কোন সম্বন্ধ নাই।

৩। চুল অধিক বড় রাখিলে নানা প্রকার অসুবিধা আছে; মাথা পরিস্কার রাখিবার জন্য অধিক যত্নের আবশ্যক হয়; স্নানের পর চুল শুষ্ক হইতেও অনেক সময় লাগে। অনেক সময় ছোট করিয়া চুল কাটিলে মাথা ধরা সারিতে দেখা যায়। মস্তক মুণ্ডন করিলে সামান্য কারণেই মস্তকে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা এবং রৌদ্রে চলিবার পক্ষেও বিশেষ অসুবিধা হয়।

মাথার চুল রাখা বা না রাখায় মানসিক বা শারীরিক শক্তির কোন ব্যতিক্রম হয় না।

৪। Head dressএর Histroy আমাদের জানা নাই।

রৌদ্র কিম্বা বৃষ্টিতে বাহিরে যাইতে হইলে মস্তকে আবরণ থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্য সময়ে স্বাস্থ্যের হিসাবে টুপি, পাগড়ী প্রভৃতির কোনই আবশ্যক নাই।

মান্যবরেষু—

আধিব্যাধি ক্লিষ্ট, রোগশোক জর্জ্জরিত বঙ্গদেশে দেশোন্নতির প্রথম সোপান স্বরূপ স্বাস্থ্যোন্নতি উদ্দেশ্যে প্রচারিত "স্বাস্থ্য-সমাচার"এর আবির্ভাব নিদাঘতপ্ত মরুপ্রদেশে নবীন নীরদের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। দীর্ণ জীর্ণ শীর্ণ বঙ্গবাসীগণ নির্ম্মল পানীয়জলে শুষ্ককণ্ঠ শীতল করিবার জন্য তৃষিতনেত্রে নব আবির্ভূত জলদজালের প্রতি তাকাইয়া আছে। বিধাতৃবিধানে "স্বাস্থ্য-সমাচার" সুপথে সুপরিচালিত হইয়া নিজ সদুদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হউক, দেশের অশেষবিধ উপকার দ্বারা সফলতা লাভ করুক, এই অধঃপতিত অমানুষপূর্ণ দেশকে সমুন্নত, শান্তিময় ও মনুষ্যত্ব পূর্ণ করিয়া নূতন ভাবে সৃজিত করুক ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

বর্ত্তমানে চারিদিকেই স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা চলিতেছে, গভর্ণমেণ্টও ইহার জন্য নানাপ্রকার উদ্যোগ আয়োজন এবং নানাবিধ ভাবে এই সমস্ত কার্য্যে সাহায্য প্রদান

করিয়েছেন। এ সমস্ত লক্ষণ অবশ্যই শুভ ও আশাপ্রদ বলিতে হইবে। এই শুভ অবসরে স্বাস্থ্য-সমাচারের প্রকাশে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ এই পত্রিকায় যেরূপ সাধারণের বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষকভাবে প্রবন্ধাদি লিখিত হইতেছে তাহাতে দেশবাসী ইহা হইতে মহৎ উপকার লাভের যথেষ্ট আশা করিতে পারেন।

ইংরাজিতে একটী প্রবাদ আছে প্রতিকার আরোগ্য লাভ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। এই সুবিজ্ঞ বচন অনুসারে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ রোগ হইতে মুক্তিলাভ অপেক্ষা রোগ প্রতিকারের চেষ্টায় অধিক মনোযোগী দেখিয়া আমরা পরম সুখী হইয়াছি। দেশবাসী সকলে সমভাবে উদ্যোগী না হইলে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি যে অসম্ভব তাহা বলাই বাহুল্য, এজন্য একার্য্যে সকলেরই নিজ নিজ সাধ্য ও যোগ্যতা অনুসারে যোগদান প্রার্থনীয়। জ্ঞানবান এ বিষয়ে জ্ঞানদান করুন, কর্ম্মী প্রকৃত হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন, শিক্ষক ইহার শিক্ষা প্রদান করুন, ছাত্র সেই শিক্ষা সাদরে গ্রহণ করুন, ইহাই স্বাস্থ্যোন্নতির বিধানের প্রকৃষ্ট পথ।

দেশে কোন নূতন সংস্কার আনয়ন করিয়া দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিতে হইলে ভবিষ্য বংশধর নবীন যুবক ও বালকগণের মধ্যে তাহার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। অতএব দেশের স্থায়ীভাবে স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান করিতে হইলেও শৈশব সময় হইতেই দেশবাসীদিগকে সেইরূপ শিক্ষিত ও চালিত করিতে হইবে। তাহারা নিজেরা এই নূতনভাবে অভ্যস্ত হইয়া গেলে এবং পরে পুত্র পরিবারকে সেইভাবে প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিলে তবেই সমগ্র দেশের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া আকাঙ্ক্ষিত সংস্কার দৃঢ়স্থাপিত হইবে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়াই প্রকৃত স্বাস্থ্যোন্নতির ভিত্তিস্থাপন মানসে স্থানীয় পল্লীসমাজের অধীনে হুগলী জেলার অন্তর্গত জীরাট বলাগড় গ্রামে কয়েকটী "ব্যায়ামাগার" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদিগের দরিদ্র দেশের ও রুগ্ন, দুর্ব্বল দেশবাসীবর্গের উপযোগী করিবার জন্যই তাহাতে সাধ্যমত স্বল্পব্যয়সাধ্য ও দেশীয় ব্যায়ামাদিরই ব্যবস্থা হইয়াছে। "স্বাস্থ্য-সমাচার" পত্রিকার এ বিষয়ে পোষকতা ও আগ্রহ দেখিয়া আমরা এই দীন সদনুষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সাহসী হইয়াছি।

সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সুবিধার জন্য এই ব্যায়ামাগারের কার্য্য বৈকালে দেড় ঘণ্টাকাল হইয়া থাকে।

প্রথম অর্দ্ধঘণ্টা—উন্মুক্ত স্থানে বা পুষ্পোদ্যান মধ্যে বসিয়া নির্দ্দিষ্ট পুস্তক হইতে নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক পাঠ পড়া হয় এবং সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

দ্বিতীয় অর্দ্ধঘণ্টা—শ্রেণীবিভাগে ডাম্বেল, মুদ্গর বা বার (Parallel bar) সহযোগে নিয়মমত ব্যায়াম করান হয়। যাহার পক্ষে যেরূপ ব্যায়াম উপযোগী বা পছন্দ স্বেচ্ছানুসারে তাহার জন্য তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ব্যায়াম শেষে সকলে একত্রে ড্রিল শিক্ষা করিয়া থাকে।

তৃতীয় অর্দ্ধঘণ্টা—বয়স ও শক্তি অনুসারে শ্রেণী বিভাগে হাড়ুড়ু বা চুকপাটি, গিজো বা হিঙ্গেদাঁড়ি এবং তালামারামারি ও ভেকলম্ফ প্রভৃতি দেশীয় খেলা হইয়া থাকে। শেষোক্তগুলি অল্প বয়স্ক বালকদিগের জন্যই নির্দ্দিষ্ট।

সর্ব্বশেষে ১০।১৫ মিনিটকাল সকলে একত্রে মিলিত হইয়া সংস্কৃত বা বাঙ্গালা স্তবস্তোত্রাদি পাঠ করিয়া কার্য্য শেষ করে।

এই প্রকারে সামান্যভাবে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক শিক্ষার সামঞ্জস্যে প্রকৃত সুশিক্ষা ও পূর্ণ স্বাস্থ্য-বিধানের চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু এই সমস্ত নিয়মানুযায়ী ব্যায়ামের নীরসতার জন্য ও দেশীয় ক্রীড়াগুলির ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিশ ব্যাড্‌মিন্‌টন্‌ প্রভৃতি বিদেশীয় ক্রীড়ার ন্যায় নয়ন ও হৃদয় রঞ্জন শক্তি না থাকায় অনেক সময়ে ব্যায়ামাগারের কার্য্যহানি হইয়া থাকে, প্রায়ই সভাগণের উৎসাহ ও উপস্থিতি সমভাবে থাকে না; কিন্তু আমরা স্বল্প ব্যয়ে দেশীয় বালকগণের উপযোগী হৃদয়গ্রাহী, কৌতুহলোদ্দীপক ক্রীড়ার সন্ধান করিতে পারি নাই। এজন্য এ বিষয়ে আপনাদিগের ন্যায় সুবিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সহায়তা প্রার্থনা করি। এ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ ও সূক্ষ্ম আলোচনা প্রভৃতি দ্বারা কৃতি সাধ্য সমুন্নত ব্যায়ামপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া সেই মতে সারা বাঙ্গালাময় আদর্শ ব্যায়ামাগারের প্রতিষ্ঠা দ্বারা বাঙ্গালীর জীবন গঠনে যত্ন করিলে যে স্বদেশের ও স্বজাতির মহৎ কল্যাণ করা হইবে ইহা সুনিশ্চিত। আশা করি এ বিষয়ে আপনাদের যত্নের ত্রুটি হইবে না। নিবেদন ইতি—

বশম্বদ—

শ্রীযামিনী কান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

স্বাস্থ্য-সমাচারের পাঠকবর্গ এই পত্রের উত্তরে নিজ নিজ অভিমত লিখিয়া পাঠাইলে পরে তাহা প্রকাশ করা হইবে।

গভর্ণমেণ্ট ও রোগ প্রতিকার।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভায় সারজেন জেনারেল লিউকিস্ সাহেব কতকগুলি রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। লিউকিস্ সাহেব দেখাইয়াছেন যে ম্যালেরিয়াই আমাদের দেশে অন্যান্য রোগ অপেক্ষা অধিক মৃত্যু ও স্বাস্থ্য হানি ঘটাইতেছে। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ প্লেগ ও বিসূচিকা অপেক্ষা অধিক এবং ভারতবর্ষে এমন কোন প্রদেশ নাই যেখানে স্বল্প বিস্তর ম্যালেরিয়া নাই। ভারত গভর্ণমেণ্ট ম্যালেরিয়া দমনের জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট ম্যালেরিয়া বিস্তৃতি ও কারণ নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে ৮ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। কি উপায় অবলম্বন করিলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হ্রাস করা যাইতে পারে ইহাঁরা সেই সম্বন্ধে নানারূপ পন্থা অনুসন্ধান করিতেছেন। এই সকল অনুসন্ধানে যে ব্যয় হইবে ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহা বহন করিতে প্রস্তুত আছেন। এই উদ্দেশ্যে মান্দ্রাজে ২৮,০০০ টাকা এবং বোম্বায়ে ৫০,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। সিন্ধু ও কানাড়া প্রদেশে ২১,৩৮০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গদেশের অবস্থা অন্য প্রদেশ হইতে বিভিন্ন। জঙ্গল ও গাছ পালার আধিক্যের জন্য বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া অধিক। জঙ্গল পরিষ্কার করিলে ম্যালেরিয়া কমে কিনা দেখিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশে ৫০,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। যুক্ত-প্রদেশে সাহারনপুর, নাগিনা, কোশি, কৈরানা, মিরাট প্রভৃতি স্থানে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হইয়াছে। সাহারনপুর, নাগিনা ও কোশি প্রদেশে মশক ধ্বংসের জন্য ১০,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

পাঞ্জাবে পলওয়াল নগরে ম্যালেরিয়া অধিক এবং এই স্থানের ম্যালেরিয়া দূরীকরণার্থে ৩৫,০০০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে কিয়াকপু নগরে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা উচিত সে সম্বন্ধে তথাকার ম্যালেরিয়া কমিশন কতকগুলি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দিল্লী নগরেও ম্যালেরিয়ার অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হইয়াছে। এবং কি উপায় অবলম্বন

করিলে ভারতের নূতন রাজধানীকে ম্যালেরিয়াশূন্য করা যাইতে পারিবে তাহা স্থিরীকৃত করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাইতেছেন এবং আবশ্যক হইলে আরও অর্থব্যয় করিতে রাজি আছেন।

মান্দ্রাজে ম্যালেরিয়া সমিতি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে ধান্য ক্ষেত্রাদিতে ম্যালেরিয়াবাহী মশক শাবক জন্মাইবার সম্ভাবনা অল্প। এক্ষণে কিরূপ আবাদি জমিতে ম্যালেরিয়াবাহী মশক জন্মাইতে পারে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছে। কোন কোন জীব এই মশক শাবকের শত্রু এবং কোন ঔষধের সাহায্যে মশক শাবক ধ্বংস করা যাইতে পারে তাহারও অনুসন্ধান চলিতেছে।

ম্যালেরিয়া সমিতিতে অধ্যাপক হাউলেট সাহেব কীট পতঙ্গাদির বুদ্ধি বৃত্তি সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি বলেন যে মশক প্রভৃতির বিশেষ বিবেচনা শক্তি নাই। ইহারা যন্ত্র চালিত পুত্তলিকার ন্যায় গন্ধ, বর্ণ প্রভৃতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া দংশন করিয়া থাকে। আমরা যদি কোন কোন অবস্থায় মশককুল আকৃষ্ট হয় নির্ণয় করিতে পারি তাহা হইলে মশক ধ্বংসের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

ভারতবর্ষে পীতজ্বর (Yellow fever) নাই। কিন্তু পানামা খাল কাটা হইলে এই পথে ভারতবর্ষে পীতজ্বর আসিতে পারে। পীতজ্বর সাধারণ মশকের দ্বারা সংক্রামিত হয় এবং রোগ-বীজাণু-যুক্ত-মশক জাহাজে পণ্য দ্রব্যাদির সহিত সহজেই ভারতবর্ষে আসিতে পারে। এই সকল জাহাজকে ভারতবর্ষে আসিতে হইলে হনলুলু বন্দর দিয়া আসিতে হয় এবং এই স্থানে বিশেষ রূপ পরীক্ষা না করিয়া জাহাজ ছাড়া হয় না। আজকাল যে পথে জাহাজ আসে তথাকার জল বায়ুর গুণে জাহাজস্থ সমস্ত মশকই মরিয়া যায়। এই কারণেই ভারতে এতদিন পীতজ্বর আসে নাই। ভারতীয় বন্দর সমূহে যাহাতে মশক বংশ বৃদ্ধি না পায় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। বন্দর ও তন্নিকটস্থ স্থানে ভাঙ্গা টিন, টব, বোতল, বাক্স, পীপা প্রভৃতি পড়িয়া থাকিলে তাহাতে জল জমে ও মশক উৎপন্ন হয়। চৌবাচ্ছা মশক জন্মাইবার পক্ষে প্রশস্ত স্থান। ২৪ ঘণ্টা কলে জল থাকিলে চৌবাচ্ছার আবশ্যক হয় না এবং মশক জন্মাইতে পারে না এবং নানাপ্রকারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ও বিশেষ সুবিধা হয়।

গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যসভা প্লেগ সম্বন্ধে দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন।

(১ম) শস্য ভাণ্ডার সমূহ হইতেই প্লেগ বিস্তৃতি লাভ করে।

(২য়) এক বৎসর প্লেগ যে পল্লীতে সর্ব্বশেষে দেখা দেয় পর বৎসর সেই স্থান হইতেই প্লেগ প্রথম আরম্ভ হয়। "প্যারেল ল্যাবরেটরীতে" পরীক্ষার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে প্লেগ বীজ শস্যাদির মধ্যে নিহিত থাকে এবং মুষিকের দ্বারা সংক্রামিত হয়। শস্য নষ্ট না করিয়া কি প্রকারে প্লেগ বীজাণু নষ্ট করা হইতে পারে সে সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে। যে পল্লীতে শেষে প্লেগ দেখা দিয়াছে সেই পল্লীর উপর প্লেগ কর্ম্মচারীগণের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

কালাজ্বর সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট এক সমিতি গঠন করিয়াছেন। সারজেন জেনারল ব্যানারমেন ইহার সভাপতি। পরীক্ষা যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় যে ছারপোকাই এই রোগের বীজাণু বহন করিয়া থাকে। এই রোগ সম্বন্ধে কোন বিষয়েই আমাদের ভাল রূপ জানা নাই।

মেজার গ্রীগ্ কলেরা সম্বন্ধে এই স্থির করিয়াছেন যে রোগী আরোগ্য হইবার পরও তাহার মলে কলেরা বীজাণু নির্গত হয় এজন্য এরূপ ব্যক্তি কলেরা সংক্রামণের সহায়তা করে।

সুস্থব্যক্তি কলেরা রোগীর সংস্পর্শে আসিলে নিজে পীড়িত না হইয়াও কলেরা রোগ ব্যাপ্ত করিতে পারে। মক্ষিকার দ্বারাই কলেরা সংক্রামিত হইয়া থাকে।

কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি ব্যাধি পানীয় জলের সাহায্যেই সংক্রামিত হয় এজন্য লিউকিস্ সাহেব জলের অবস্থা নির্ণয়ের কোন সহজ উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলিতেছেন।

বিবিধ সংগ্রহ।

চিত্র পরিচয় :—অশ্বত্থ একটী মহাদ্রুম। বৈশাখ মাসে ইহার ব্যবহার ও গুণাগুণ সম্বন্ধে বিচার প্রকাশিত হইবে। এ সংখ্যায় আমরা অশ্বত্থের পাতা, পুষ্প, ফল ইত্যাদির প্রতিকৃতি দিলাম। লেফ্‌টনেণ্ট কর্ণেল কে, আর, কীর্ত্তিকার, আই, এম্, এস্; মেজার বি, ডি, বসু, আই, এম্, এস্, এবং শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ বি, এ, বি, এস্, সি; প্রভৃতি মহোদয়গণ প্রণীত ও এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত সুবৃহৎ গ্রন্থ "The Indian Medicinal Plantsএর চিত্রের অনুকরণে ও তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে এই ছবি করা হইয়াছে।

জলকষ্ট নিবারণের জন্য গভর্ণমেণ্টের অর্থ দান :—পল্লীগ্রামের জলকষ্ট নিবারণের জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড সমূহের হস্তে নিম্নলিখিত অর্থ দান করিয়াছেন :—বর্দ্ধমান ৩,০০০; বীরভূম ২,০২৩; বাঁকুড়া ১,২৯৮; মেদিনীপুর ১,৬৭৯; হুগলী ১,৮[illegible]; হাওড়া ১,০১১; ২৪ পরগণা ২,৯৯৭; নদীয়া ২,৯৩৩; মুর্শীদাবাদ ১,৯৫৬; যশোহর ৩২৬; খুলনা ২,৮৩৮; ঢাকা ৩,০০০; ময়মনসিংহ ৩,০০০; ফরিদপুর ৩,০০০; বাখরগঞ্জ ২,৯১৮; চট্টগ্রাম ১,৪৬৩; ত্রিপুরা ১০৪, নোয়াখালী ৩,০০০; রাজসাহী ৩,০০০; দিনাজপুর ১,৭৭৫; জলপাইগুড়ী ১,৮১৯; রংপুর ৪২০; বগুড়া ৪১৫; পাবনা ১,১২১; মালদা ১,৭৯১। গভর্ণমেণ্ট মোটের উপর ৪৮,০০৪ টাকা দান করিয়াছেন।